সমালোচনা-সংগ্রহ

তৃতীয় সংস্করণ
(তৃতীয় মুদ্রণ)

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত
১৯৪৫

Reprint—1589 B.T.—December, 1945—A.

PRINTED IN INDIA

PRINTED AND PUBLISHED BY NISHITCHANDRA SEN,
SUPERINTENDENT (OFFG.), CALCUTTA UNIVERSITY PRE-
48, HAZRA ROAD, BALLYGUNGE, CALCUTTA.

সূচী

সাহিত্য-প্রসঙ্গ

বিষয়	প্রকাশ-কাল	লেখক	পত্রাঙ্ক
সম্পাদকের মন্তব্য			।/০
গীতিকাব্য	১২৮০	বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	১
পলাশির যুদ্ধ	১২৮২	কালীপ্রসন্ন ঘোষ	৪
প্রাচীন কবি ও আধুনিক কবি	১২৮৯	অজ্ঞাত	১৫
দশমহাবিদ্যা	১২৮৯	অজ্ঞাত	২৩
সমালোচনা ও সমালোচক	১২৯০	ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়	৩৮
সুকুমার সাহিত্যের প্রকৃতি	১২৯৩	ঐ	৪৭
রাজসিংহ	১৩০০	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	৫১
মানসী	১৩০০	প্রিয়নাথ সেন	৫৭
প্রাচীন সাহিত্যালোচনা	১৩০১	হীরেন্দ্রনাথ দত্ত	৭০
মহাকাব্যের লক্ষণ	১৩০৯	রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	৭৭
সাহিত্য সমালোচনা	১৩১০	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	৮৮
কথা সাহিত্য	১৩১৫	দীনেশচন্দ্র সেন	৯৪
নাট্যকার	১৩১৭	গিরিশচন্দ্র ঘোষ	১০৪
নাটকত্ব	১৩১৮	দ্বিজেন্দ্রলাল রায়	১০৭
কবিতার কষ্টিপাথর	১৩২২	বিপিনচন্দ্র পাল	১১১
বাঙ্গালার গীতিকবিতা	১৩২৩	চিত্তরঞ্জন দাশ	১১৬
আধুনিক বঙ্গসাহিত্যে "মা"	১৩২৩	জিতেন্দ্রলাল বসু	১২৫
সাহিত্যে "রূপান্তর"	১৩২৪	বিপিনচন্দ্র পাল	১৩৩

কবি-প্রসঙ্গ

রামপ্রসাদ	১২৮২	পূর্ণচন্দ্র বসু	১৪১
দীনবন্ধু মিত্র	১২৮৩	বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	১৪৭
ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত	১২৯২	ঐ	১৫৪
জয়দেব	১২৯৩	অক্ষয়চন্দ্র সরকার	১৭০

বিষয়	প্রকাশ-কাল	লেখক	পত্রাঙ্ক
বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস	১২৯৬	বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর	১৭৭
প্যারীচাঁদ মিত্র	১২৯৯	বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	১৮৫
বঙ্কিমচন্দ্র	১৩০০	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	১৮৯
বিহারীলাল	১৩০১	ঐ	১৯৯
মুকুন্দরাম ও ভারতচন্দ্র	১৩০১	রমেশচন্দ্র দত্ত	২১০
নবীনচন্দ্র	১৩১৫	পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়	২২৩
কবি হেমচন্দ্র	১৩১৯	ঐ	২২৮
মহাকবি মধুসূদন	১৩২৩	সুরেশচন্দ্র সমাজপতি	২৩৭
কৃত্তিবাস	১৩২৩	স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়	২৪২

[দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রবন্ধ ব্যতীত সমুদয় প্রবন্ধের স্বত্বাধিকারিগণের অনুমতিক্রমে প্রবন্ধগুলি মুদ্রিত হইল। এইজন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ স্বত্বাধিকারিগণের প্রত্যেকের নিকট কৃতজ্ঞ।]

সম্পাদকের মন্তব্য

বাঙ্গালা সমালোচন-সাহিত্যের বয়স তেমন বেশী না হইলেও সাহিত্য-সমাজে ইহার জন্ম-ইতিহাস-সম্বন্ধে একটি ভ্রান্ত মতের প্রচলন দেখা যায়। 'ভবানীপুর-সাহিত্য-সম্মিলনে' মনীষী বিপিনচন্দ্র পাল তাঁহার 'অভিভাষণে'র একস্থানে বলেন, "বঙ্কিমচন্দ্রই প্রথমে বঙ্গদর্শনে বাংলাতে সাহিত্য-সমালোচনার পথ দেখাইয়া দেন। তাঁর পূর্ব্বে সাহিত্য-সমালোচনা কাকে বলে, বাংলায় কেহ জানিত বলিয়া বোধ হয় না।" শুধু বিপিনচন্দ্রের নহে, আরও অনেকের রচনায় এইরূপ মন্তব্য পরিদৃষ্ট হয়। বিপিন বাবুর পূর্ব্বে, পণ্ডিতপ্রবর হরপ্রসাদও তাঁহার 'বঙ্কিমবাবু ও উত্তরচরিত'-শীর্ষক প্রবন্ধে এই প্রকার মতই প্রচার করিয়াছিলেন। কিন্তু ইতিহাসের সাক্ষ্য গ্রহণ করিলে, এই প্রচলিত মতকে সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে পারা যায় না।

ইউরোপীয় সাহিত্য-সমালোচনার অনুকরণে বাঙ্গালা সমালোচনার যে সৃষ্টি হইয়াছে, এ কথা অবশ্য অস্বীকার্য্য নহে। কিন্তু সে সৃষ্টির সূত্রপাত বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার বঙ্গদর্শনে করিয়াছিলেন, এমন কথা বলিলে ভুল হইবে। বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গসাহিত্যে যে সমালোচন-প্রতিভার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন, তাহা সত্যই অনন্যসাধারণ। তাঁহারই হাতে পড়িয়া এ জিনিষটার যে সবিশেষ উৎকর্ষ-লাভ ঘটে, সে বিষয়েও সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহার উৎপত্তি হইয়াছিল রাজেন্দ্রলাল মিত্র-সম্পাদিত 'বিবিধার্থ-সংগ্রহ'-নামক মাসিক পত্রে।

এই কাগজখানি বঙ্গদর্শন-প্রকাশের প্রায় একুশ বৎসর পূর্ব্বে প্রকাশিত হয়। বিবিধার্থ-সংগ্রহে বিদ্যাসাগর, প্যারীচাঁদ, রামনারায়ণ, রঙ্গলাল, মধুসূদন, দীনবন্ধু প্রভৃতি বহু বিখ্যাত গ্রন্থকারের বহু গ্রন্থের সমালোচনা দেখিতে পাওয়া যায়। এ সব সমালোচনা কে বা কাহারা লিখিতেন, তাহা এখন নিশ্চিতরূপে বলা সুকঠিন। তবে দেখিতে পাই, নাট্যকার মনোমোহন বসু মহাশয় ২৫শে জ্যৈষ্ঠ, ১২৮০ সালে তাঁহার 'মধ্যস্থ-'নামক সাপ্তাহিক পত্রে লিখিয়া গিয়াছেন, "মৃত বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয়ের মুখে শুনিয়াছিলাম, তিনিই বিবিধার্থ-সংগ্রহে ইহার (সমালোচনার) প্রথম পথ-প্রদর্শন করেন।" এ কথা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে কালীপ্রসন্নকেই বঙ্গসাহিত্যের আদি সমালোচক বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে হইবে। আমরা অবশ্য এ কথায় অবিশ্বাস করিবার তেমন কোনও কারণ দেখি না।

রাজেন্দ্রলালের পর কালীপ্রসন্নই বিবিধার্থ-সংগ্রহের সম্পাদক-পদে নিযুক্ত হন। এই সময়ে এই কাগজের 'ভূমিকা'য় তিনি রাজেন্দ্রলাল-সম্পাদিত বিবিধার্থ-সংগ্রহে

প্রকাশিত সমালোচনার উদ্দেশে যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহাতে যেন ঐ উক্তিরই ইঙ্গিত আছে বলিয়া মনে করি। তিনি লিখিয়াছিলেন, "বিবিধার্থ নিয়ত শুদ্ধ সাধারণের হিতচেষ্টায় বিব্রত ছিল; ভ্রমেও কখন কাহার নিন্দা বা সম্পদ্-সুলভ সম্মান-লোভে ধনীর উপাসনা করে নাই। প্রকৃত প্রস্তাবে নূতন গ্রন্থের সমালোচন-সময়ে কখন কখন কোন কোন গ্রন্থকারের উপরে কটাক্ষের আভাস হইয়াছিল, কিন্তু তাহা ভানমাত্র; তাহাতে কেবল গ্রন্থই উদ্দেশ্য, কদাপি কোন গ্রন্থকারের নিন্দা অভিধেয় হয় নাই। তাহা পরিশুদ্ধ সরল-হৃদয়-সম্ভূত, তাহাতে দোষ বা রোষের লেশও লক্ষিত হয় না; বরং ভারতবর্ষীয় বর্ত্তমান গ্রন্থকারকুলের কল্যাণ-সাধনই তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য।" —এই লেখাটুকুর মধ্যে আত্মগত কৈফিয়তেরই একটু আভাস নাই কি?

বিবিধার্থ সংগ্রহের আরও একটি কৃতিত্বের কথা এখানে স্মরণযোগ্য। যে 'সমালোচনা'-শব্দ আজকাল আমাদের একটি ঘরোয়া কথার মতন হইয়া দাঁড়াইয়াছে, সে শব্দটিও বিবিধার্থ-সংগ্রহের সৃষ্টি। ইহার পূর্ব্বে এ শব্দের ব্যবহার আর কোথাও দেখিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না। আধুনিক কোনও কোনও লেখক এ শব্দের প্রতি প্রসন্ন নহেন। 'সম্' ও 'আ' এই দুই উপসর্গের একই প্রকার অর্থ ভাবিয়া তাঁহারা সংস্কৃত 'আলোচনা'-শব্দের পূর্ব্বে 'সম্' উপসর্গের সংযোগকে অসঙ্গত বলিয়া ঘোষণা করেন। তাঁহারা বলেন, ইংরাজী Criticism শব্দের প্রতিবাক্য-হিসাবে 'আলোচনা' ও 'সমালোচনা' এই দুই শব্দের মধ্যে যদি কোনটিকে রাখিতে হয়, তবে 'সম্'কে বাদ দিয়া 'আলোচনা'কে রক্ষা করাই শ্রেয়ঃ। আমাদের কিন্তু অন্যরূপ ধারণা। মনে হয়, পণ্ডিতেরা 'নিরুক্তে'র 'সমাম্নায়ঃ' ও 'সমাম্নাতঃ' শব্দ দুইটির যে ভাবে অর্থ করিয়া থাকেন, সেই ভাবে 'সমালোচনা' শব্দটিকে যদি আমরা বুঝিবার চেষ্টা করি, তাহা হইলে দেখিতে পাইব যে, উহার 'সম্' ও 'আ' এই দুই উপসর্গেরই রীতিমত সঙ্গতি, সার্থকতা ও উপযোগিতা আছে। সমালোচনা অর্থে 'সম্' অর্থাৎ সম্যক্, 'আ' অর্থাৎ পরিপাটীর সহিত এবং 'লোচন' অর্থাৎ ঈক্ষণ। সুতরাং বলিতে হয়, ইংরাজী 'Criticism' শব্দের প্রতিবাক্য-হিসাবে যিনি এই শব্দের সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহার শব্দ-গঠন-শক্তি প্রশংসনীয়; এবং এই জন্যই বোধ হয়, ভূদেব, রাজনারায়ণ, বঙ্কিমচন্দ্র, অক্ষয়চন্দ্র প্রভৃতি সেকালের পণ্ডিত ও চিন্তাশীল লেখকেরা এই শব্দটিকে গ্রহণ করিতে বিন্দুমাত্র সঙ্কোচবোধ করেন নাই। রবীন্দ্রনাথের রচনায় ঐ শব্দের বহুল ব্যবহার আছে বলিলে যথেষ্ট হইবে না—'সমালোচনা' নামে তাঁহার একখানি গ্রন্থও আমরা দেখিয়াছি। এই সঙ্কলন-গ্রন্থে তাঁহার রচিত 'সাহিত্য-সমালোচনা' ও ঠাকুরদাসের লিখিত 'সমালোচনা ও সমালোচক' নামে যে দুইটি প্রবন্ধ আছে, তাহাও এ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। সুতরাং সাহিত্য-সংসারে এই শব্দ যখন এমন ভাবে চলিয়া গিয়াছে, তখন ইহা ঠিক হউক আর না হউক, ইহার বিরুদ্ধে কিছু বলিতে গেলে কেহ তাহা শুনিবে না। আমরাও শুনি নাই। তাই এই সংগ্রহ-পুস্তকের নামকরণ হইয়াছে সমালোচনা-সংগ্রহ।

বিবিধার্থ-সংগ্রহ যে সমালোচনা-পদ্ধতির প্রবর্ত্তন করেন, সেই পদ্ধতি-অনুসারে বাঙ্গালা-গ্রন্থের সমালোচনা পরে 'রহস্য সন্দর্ভ,' 'সর্ব্বার্থ সংগ্রহ,' ঢাকার 'মিত্র প্রকাশ' প্রভৃতি পত্রিকায় সমানে সতেজে চলিয়াছিল। তারপর বঙ্কিমের বঙ্গদর্শনের অভ্যুদয়। এই বঙ্গদর্শনে বঙ্কিম-কৃত সমালোচনার উদ্দেশে এত লেখক এত প্রশংসার কথা কহিয়াছেন যে, এখানে আমাদের আর কিছু না বলিলেও চলে। তবে প্রসঙ্গক্রমে এটুকু বলা প্রয়োজন যে, বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্য-সমালোচনার যে আদর্শ প্রতিষ্ঠা করেন. সেই আদর্শের অনুসরণে সে-সময়ে অক্ষয়চন্দ্র সরকার, কালীপ্রসন্ন ঘোষ, চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি কয়েকজন প্রতিভাশালী লেখক উহার পুষ্টি-সাধনে অগ্রসর হইয়াছিলেন। ইহার অল্প কাল পরেই, এ ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ দেখা দেন। বলা বাহুল্য যে. অনতিবিলম্বেই তাঁহার সমালোচনা-নৈপুণ্যের যশঃ-সৌরভ চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইতে আরম্ভ হয়। বস্তুতঃ বঙ্কিমচন্দ্রের পর, বাঙ্গালা সামালোচন-সাহিত্যের নূতন রূপের প্রবর্ত্তক-হিসাবে যদি কাহারও নাম করিতে হয়, তাহা হইলে তাঁহার নামই অবশ্য-করণীয়।

এই সংগ্রহ-পুস্তকে বিষয়-হিসাবে 'সাহিত্য-প্রসঙ্গ' ও 'কবি-প্রসঙ্গ' নামে দুইটি বিভাগ করা হইয়াছে। 'কবি-প্রসঙ্গে' যাঁহাদের কথা আছে, তাঁহাদের মধ্যে একমাত্র জয়দেব ব্যতীত আর সকলেই বঙ্গ-ভাষার কবি। জয়দেব বাঙ্গালী কবি হইলেও তাঁহার কাব্য সংস্কৃত ভাষায় রচিত। সুতরাং এরূপ প্রশ্ন অনেকের মনে জাগিতে পারে যে. উক্ত প্রসঙ্গ-মধ্যে জয়দেব প্রবেশ-লাভ করিলেন কেন?

এই 'কেন'রই একটু উত্তর এখানে দিতেছি। বাঙ্গালা-গীতি-কবিতার আদি উৎস নিরূপণ করিতে গিয়া আমাদের দেশের বড় বড় লেখকগণের মধ্যে কেহ বৌদ্ধ দোঁহার, আর কেহ বা সুরদাস প্রভৃতির হিন্দী কবিতার উল্লেখ করিয়াছেন। আমাদের কিন্তু মনে হয়, চণ্ডীদাসাদি কবিগণ 'জয়দেবের ভাষা. জয়দেবের ছন্দ, জয়দেবের পদ-বিন্যাস-পদ্ধতি ও সঙ্গীত-রীতি'র নিকট যেরূপ ঋণী, তেমন আর কাহারও নিকট নহেন। এই কথাটাই 'জয়দেব'-প্রবন্ধে অতি পরিপাটীর সহিত বুঝাইয়া বলা হইয়াছে।

আসল কথা, কলেজের ছাত্রগণ বঙ্গসাহিত্য-সম্বন্ধে যাহাতে নানা জ্ঞাতব্য তত্ত্ব ও তথ্য জানিতে পারেন, যাহাতে সাহিত্য-বিষয়ে তাঁহাদের বিচার-বুদ্ধির উন্মেষ ঘটে, সেই দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই এই পুস্তক-সম্পাদনের প্রয়াস পাইয়াছি। কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বর্ত্তমান ভাইস্-চ্যান্সেলার শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, এম্.এ. বি.এল্, ব্যারিষ্টার-এট্-ল, এম্.এল্.এ. মহোদয়েরও আমার উপর এইরূপ নির্দ্দেশ ছিল। সে নির্দ্দেশ-প্রতিপালনের যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি। চেষ্টা সফল হইয়াছে কিনা, বলিতে পারি না। তবে এ ধরণের সংগ্রহ-পুস্তক বঙ্গভাষায় যে এই প্রথম প্রকাশিত হইল, এ কথা বোধ হয় কেহ অস্বীকার করিবেন না।

পরিশেষে বক্তব্য, এই সংগ্রহ-পুস্তকে যে সমস্ত প্রবন্ধের সন্নিবেশ করিয়াছি, প্রায় সকলগুলিই বিভিন্ন সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। কেবল বঙ্কিমচন্দ্র-লিখিত

'ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত', 'প্যারীচাঁদ মিত্র' ও 'দীনবন্ধু মিত্র'—এই তিনটি প্রবন্ধ ঐ তিন গ্রন্থকারের 'গ্রন্থাবলী'তে ভূমিকা-স্বরূপ প্রকাশিত হয়। যাহা হউক, প্রবন্ধগুলিকে এই পুস্তকে সাজাইবার সময়ে প্রবন্ধ-রচয়িতৃগণের জন্ম-তারিখ বা তাঁহাদের খ্যাতি-প্রতিপত্তির দিকে আমরা লক্ষ্য রাখি নাই। প্রবন্ধসমূহের প্রথম প্রকাশের কালানুযায়ী যথাক্রমে উহাদিগকে বিন্যস্ত করা হইয়াছে।

১৯৩৭

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায়

দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপন

১৯৩৭ সালে এই গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ মুদ্রিত হইয়াছিল। প্রথম সংস্করণের ছয়টি প্রবন্ধ এই সংস্করণে বর্জিত, এবং তৎপরিবর্ত্তে এগারটি প্রবন্ধ সংযোজিত হইল।

১৯৩৯

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায়

তৃতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপন

এই সংস্করণে দ্বিতীয় সংস্করণের চারিটি প্রবন্ধ বাদ দিয়া তৎস্থানে সাতটি প্রবন্ধ যোগ করা হইয়াছে।

১৯৪৩

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায়

সাহিত্য-প্রসঙ্গ

সমালোচনা-সংগ্রহ

গীতিকাব্য

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

কাব্য কাহাকে বলে, তাহা অনেকে বুঝাইবার জন্য যত্ন করিয়াছেন, কিন্তু কাহারও যত্ন সফল হইয়াছে কি না সন্দেহ। ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, দুই ব্যক্তি কখনও এক প্রকার অর্থ করেন নাই। কিন্তু কাব্যের যথার্থ লক্ষণসম্বন্ধে মতভেদ থাকিলেও কাব্য একই পদার্থ সন্দেহ নাই। সেই পদার্থ কি, তাহা কেহ বুঝাইতে পারুন বা না পারুন, কাব্যপ্রিয় ব্যক্তিমাত্রেই এক প্রকার অনুভব করিতে পারেন।

কাব্যের লক্ষণ যাহাই হউক না কেন, আমাদিগের বিবেচনায় অনেকগুলিন গ্রন্থ, যাহার প্রতি সচরাচর কাব্য-নাম প্রযুক্ত হয় না, তাহাও কাব্য। মহাভারত, রামায়ণ ইতিহাস বলিয়া খ্যাত হইলেও তাহা কাব্য; শ্রীমদ্‌ভাগবত পুরাণ বলিয়া খ্যাত হইলেও তাহা অংশবিশেষে কাব্য। স্কটের উপন্যাসগুলিকে আমরা উৎকৃষ্ট কাব্য বলিয়া স্বীকার করি। নাটককে আমরা কাব্য-মধ্যে গণ্য করি, তাহা বলা বাহুল্য।

ভারতবর্ষীয় এবং পাশ্চাত্য আলঙ্কারিকেরা কাব্যকে নানা শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। তাহার মধ্যে অনেকগুলিন বিভাগ অনর্থক বলিয়া বোধ হয়। তাঁহাদিগের কথিত তিনটি শ্রেণী গ্রহণ করিলেই যথেষ্ট হয়; যথা—১ম দৃশ্যকাব্য, অর্থাৎ নাটকাদি; ২য় আখ্যানকাব্য অথবা মহাকাব্য; রঘুবংশের ন্যায় বংশাবলীর উপাখ্যান, রামায়ণের ন্যায় ব্যক্তি-বিশেষের চরিত, শিশুপাল-বধের ন্যায় ঘটনা-বিশেষের বিবরণ, সকলই ইহার অন্তর্গত; বাসবদত্তা, কাদম্বরী প্রভৃতি গদ্যকাব্য ইহার অন্তর্গত এবং আধুনিক উপন্যাসসকল এই শ্রেণীভুক্ত। ৩য় খণ্ডকাব্য,—যে কোন কাব্য প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত নহে, তাহাকেই আমরা খণ্ডকাব্য বলিলাম।

দেখা যাইতেছে যে, এই ত্রিবিধ কাব্যের রূপগত বিলক্ষণ বৈষম্য আছে; কিন্তু রূপগত বৈষম্য প্রকৃত বৈষম্য নহে। দৃশ্যকাব্য সচরাচর কথোপকথনেই রচিত হয় এবং রঙ্গাঙ্গনে অভিনীত হইতে পারে, কিন্তু যাহাই কথোপকথনে গ্রথিত এবং অভিনয়োপযোগী, তাহাই যে নাটক বা তৎশ্রেণীস্থ, এমত নহে। এ দেশের লোকের সাধারণতঃ উপরি-উক্ত ভ্রান্তিমূলক সংস্কার আছে। এই জন্য নিত্য দেখা যায় যে, কথোপকথনে

গ্রথিত অসংখ্য পুস্তক নাটক বলিয়া প্রচারিত, পঠিত, এবং অভিনীত হইতেছে। বাস্তবিক, তাহার মধ্যে অনেকগুলিন নাটক নহে। পাশ্চাত্ত্য ভাষায় অনেকগুলিন উৎকৃষ্ট কাব্য আছে, যাহা নাটকের ন্যায় কথোপকথনে গ্রথিত, কিন্তু বস্তুতঃ নাটক নহে। "Comus," "Manfred," "Faust" ইহার উদাহরণ। অনেকে শকুন্তলা ও উত্তররামচরিতকেও নাটক বলিয়া স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন, ইংরেজি ও গ্রীকভাষা ভিন্ন কোন ভাষায় প্রকৃত নাটক নাই। পক্ষান্তরে, গেটে বলিয়াছেন যে, প্রকৃত নাটকের পক্ষে, কথোপকথনে গ্রন্থন বা অভিনয়ের উপযোগিতা নিতান্ত আবশ্যক নহে। আমাদিগের বিবেচনায় "Bride of Lammermoor"কে নাটক বলিলে অন্যায় হয় না। ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে, আখ্যানকাব্যও নাটকাকারে প্রণীত হইতে পারে; অথবা গীত-পরম্পরায় সন্নিবেশিত হইয়া গীতিকাব্যের রূপ ধারণ করিতে পারে। বাঙ্গালা ভাষায় শেষোক্ত বিষয়ের উদাহরণের অভাব নাই। পক্ষান্তরে, দেখা গিয়াছে অনেক খণ্ডকাব্য মহাকাব্যের আকারে রচিত হইয়াছে। যদি কোন একটি সামান্য উপাখ্যানের সূত্রে গ্রথিত কাব্যমালাকে আখ্যানকাব্য বা মহাকাব্য নাম দেওয়া বিধেয় হয়, তবে "Excursion" এবং "Childe Harold"কে ঐ নাম দিতে হয়, কিন্তু আমাদিগের বিবেচনায় ঐ দুই কাব্য খণ্ড-কাব্যের সংগ্রহ মাত্র।

খণ্ডকাব্য-মধ্যে আমরা অনেক প্রকার কাব্যের স্থান করিয়াছি। তন্মধ্যে একপ্রকার কাব্য প্রাধান্য লাভ করিয়া ইউরোপে গীতিকাব্য (Lyric) নামে খ্যাত হইয়াছে। অদ্য সেই শ্রেণীর কাব্যের কথায় আমাদিগের প্রয়োজন।

ইউরোপে কোন বস্তু একটি পৃথক্ নাম প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া আমাদিগের দেশেও যে একটি পৃথক্ নাম দিতে হইবে, এমত নহে। যেখানে বস্তুগত কোন পার্থক্য নাই, সেখানে নামের পার্থক্য অনর্থক এবং অনিষ্টজনক; কিন্তু যেখানে বস্তুগুলি পৃথক্, সেখানে নামও পৃথক্ হওয়া আবশ্যক। যদি এমত কোনও বস্তু থাকে যে, তাহার জন্য গীতিকাব্যনামটি গ্রহণ করা আবশ্যক, তবে অবশ্য ইউরোপের নিকট আমাদিগকে ঋণী হইতে হইবে।

গীত মনুষ্যের একপ্রকার স্বভাবজাত। মনের ভাব কেবল কথায় ব্যক্ত হইতে পারে, কিন্তু কণ্ঠ-ভঙ্গীতে তাহা স্পষ্টীকৃত হয়। 'আঃ' এই শব্দ কণ্ঠ-ভঙ্গীর গুণে দুঃখবোধক হইতে পারে, বিরক্তিবাচক হইতে পারে এবং ব্যঙ্গোক্তিও হইতে পারে। "তোমাকে না দেখিয়া আমি মরিলাম"—ইহা শুধু বলিলে দুঃখ বুঝাইতে পারে, কিন্তু উপযুক্ত স্বর-ভঙ্গীর সহিত বলিলে দুঃখ শতগুণ অধিক বুঝাইবে। এই স্বর-বৈচিত্র্যের পরিণামই সঙ্গীত। সুতরাং মনের বেগ-প্রকাশের জন্য আগ্রহাতিশয্য-প্রযুক্ত মনুষ্য সঙ্গীতপ্রিয় এবং তৎসাধনে স্বভাবতঃ যত্নশীল।

কিন্তু অর্থযুক্ত বাক্য ভিন্ন চিত্ত-ভাব ব্যক্ত হয় না; অতএব সঙ্গীতের সঙ্গে বাক্যের সংযোগ আবশ্যক। সেই সংযোগোৎপন্ন পদকে গীত বলা যায়।

গীতের জন্য বাক্য-বিন্যাস করিলে দেখা যায় যে, কোন নিয়মাধীন বাক্য-বিন্যাস করিলেই গীতের পারিপাট্য হয়। সেই সকল নিয়মগুলির পরিজ্ঞানেই ছন্দের সৃষ্টি।

গীতের পারিপাট্য-জন্য আবশ্যক দুইটি,—স্বর-চাতুর্য্য এবং শব্দ-চাতুর্য্য। এই দুইটি পৃথক্ পৃথক্ দুইটি ক্ষমতার উপর নির্ভর করে। দুইটি ক্ষমতাই একজনের সচরাচর ঘটে না। যিনি সুকবি, তিনিই সুগায়ক, ইহা অতি বিরল।

কাজে কাজেই একজন গীত রচনা করেন, আর একজন গান করেন। এইরূপে গীত হইতে গীতিকাব্যের পার্থক্য জন্মে। গীত হওয়াই গীতিকাব্যের আদিম উদ্দেশ্য; কিন্তু যখন দেখা গেল যে, গীত না হইলেও কেবল ছন্দোবিশিষ্ট রচনাই আনন্দদায়ক এবং সম্পূর্ণ চিত্তভাবব্যঞ্জক, তখন গীতোদ্দেশ্য দূরে রহিল; অগেয় গীতিকাব্য রচিত হইতে লাগিল।

অতএব গীতের যে উদ্দেশ্য, যে কাব্যের সেই উদ্দেশ্য, তাহাই গীতিকাব্য। বক্তার ভাবোচ্ছ্বাসের পরিস্ফুটতামাত্র যাহার উদ্দেশ্য, সেই কাব্যই গীতিকাব্য।

বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস প্রভৃতি বৈষ্ণব-কবিদিগের রচনা, ভারতচন্দ্রের রসমঞ্জরী, মাইকেল মধুসূদন দত্তের ব্রজাঙ্গনা কাব্য, হেম বাবুর কবিতাবলী, ইহাই বাঙ্গালা ভাষায় উৎকৃষ্ট গীতিকাব্য। অবকাশরঞ্জিনী আর একখানি উৎকৃষ্ট গীতিকাব্য।*

যখন হৃদয় কোন বিশেষ ভাবে আচ্ছন্ন হয়,—স্নেহ কি শোক, কি ভয়, কি যাহাই হউক, তাহার সমুদায়াংশ কখন ব্যক্ত হয় না: কতকটা ব্যক্ত হয়, কতকটা ব্যক্ত হয় না। যাহা ব্যক্ত হয়, তাহা ক্রিয়ার দ্বারা বা কথার দ্বারা। সেই ক্রিয়া এবং কথা নাটককারের সামগ্রী। যেটুকু অব্যক্ত থাকে, সেইটুকু গীতিকাব্য-প্রণেতার সামগ্রী। যেটুকু সচরাচর অদৃষ্ট, অদর্শনীয় এবং অন্যের অননুমেয় অথচ ভাবাপন্ন ব্যক্তির রুদ্ধ হৃদয়-মধ্যে উচ্ছ্বসিত, তাহা তাঁহাকে ব্যক্ত করিতে হইবে। মহাকাব্যের বিশেষ গুণ এই যে, কবির উভয়বিধ অধিকার থাকে। ব্যক্তব্য এবং অব্যক্তব্য উভয়ই তাঁহার আয়ত্ত। মহাকাব্য, নাটক এবং গীতিকাব্যে এই একটি প্রধান প্রভেদ বলিয়া বোধ হয়। অনেক নাটক-কর্ত্তা তাহা বুঝেন না, সুতরাং তাঁহাদিগের নায়ক-নায়িকার চরিত্র অপ্রাকৃত এবং বাগাড়ম্বরবিশিষ্ট হইয়া উঠে। সত্য বটে যে, গীতিকাব্য-লেখককেও বাক্যের দ্বারাই রসোদ্ভাবন করিতে হইবে; নাটককারেরও সেই বাক্য সহায়। কিন্তু যে বাক্য ব্যক্তব্য, নাটককার কেবল তাহাই বলাইতে পারেন। যাহা অব্যক্তব্য, তাহাতে গীতিকাব্যকারের অধিকার। উদাহরণ ভিন্ন ইহা অনেকে বুঝিতে পারিবেন না। কিন্তু এ বিষয়ের একটি উত্তম উদাহরণ উত্তরচরিত-সমালোচনায় উদ্ধৃত হইয়াছে। সীতা-বিসর্জ্জন-কালে ও তৎপরে রামের ব্যবহারে যে তারতম্য ভবভূতির নাটকে এবং বাল্মীকির রামায়ণে দেখা যায়, তাহার আলোচনা করিলে

* যখন এই প্রবন্ধ লিখিত হয়, তখন রবীন্দ্রবাবুর কাব্যসকল প্রকাশিত হয় নাই।

এই কথা হৃদয়ঙ্গম হইবে। রামের চিত্তে যখন যে ভাবের উদয় হইতেছে, ভবভূতি তৎক্ষণাৎ তাহা লেখনীমুখে ধৃত করিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছেন; ব্যক্তব্য এবং অব্যক্তব্য উভয়ই তিনি স্বকৃত নাটক-মধ্যগত করিয়াছেন। ইহাতে নাটকোচিত কার্য্য না করিয়া গীতিকাব্যকারের অধিকারে প্রবেশ করিয়াছেন। বাল্মীকি তাহা না করিয়া কেবল রামের কার্য্যগুলিই বর্ণিত করিয়াছেন এবং তত্তৎ-কার্য্য-সম্পাদনার্থ যতখানি ভাব-ব্যক্তি আবশ্যক, তাহাই ব্যক্ত করিয়াছেন। ভবভূতি-কৃত ঐ রাম-বিলাপের সঙ্গে ডেস্‌ডিমোনা-বধের পর ওথেলোর বিলাপের বিশেষ করিয়া তুলনা করিলেও এ কথা বুঝা যাইবে। সেক্ষপীয়র এমত কোন কথাই তৎকালে ওথেলোর মুখে ব্যক্ত করেন নাই, যাহা তৎকালীন কার্য্যার্থ বা অন্যের কথার উত্তরে ব্যক্ত করা প্রয়োজন হইতেছে না, ব্যক্তব্যের অতিরিক্ত তিনি এক রেখাও যান নাই। তিনি ভবভূতির ন্যায় নায়কের হৃদয়ানুসন্ধান করিয়া ভিতর হইতে এক একটি ভাব টানিয়া আনিয়া একে একে গণনা করিয়া সারি দিয়া সাজান নাই। অথচ কে না বলিবে যে, রামের মুখে যে দুঃখ ভবভূতি ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহার সহস্রগুণ দুঃখ সেক্ষপীয়র ওথেলোর মুখে ব্যক্ত করিয়াছেন।

সহজেই অনুমেয় যে, যাহা ব্যক্তব্য, তাহা পর-সম্বন্ধীয় বা কোন কার্য্যোদ্দিষ্ট, যাহা অব্যক্তব্য, তাহা আত্মচিত্ত-সম্বন্ধীয়; উক্তিমাত্র তাহার উদ্দেশ্য। এরূপ কথা যে নাটকে একেবারে সন্নিবেশিত হইতে পারে না, এমত নহে; বরং অনেক সময়ে হওয়া আবশ্যক। কিন্তু ইহা কখন নাটকের উদ্দেশ্য হইতে পারে না। নাটকের যাহা উদ্দেশ্য, তাহার আনুষঙ্গিকতা-বশতঃ প্রয়োজন-মত কদাচিৎ সন্নিবেশিত হয়।

[বঙ্গদর্শন, ১২৮০]

পলাশির যুদ্ধ

কালীপ্রসন্ন ঘোষ

মনুষ্য-জগতে নিখুঁত রূপ নাই এবং নিখুঁত কাব্য নাই। কবিবর শ্রীযুক্ত বাবু নবীনচন্দ্র সেনের এই কাব্যখানিও সর্ব্বাংশে নিখুঁত নহে। তবে, এ কথা তথাপি অক্ষুব্ধ চিত্তে বলা যাইতে পারে যে, 'পলাশির যুদ্ধ' কাব্যে সর্ব্বত্রই তাঁহার অসাধারণ কবিত্বের নিদর্শন রহিয়াছে। ইহা নিশ্চয়ই বাঙ্গালা ভাষার কণ্ঠহারে একটি কমনীয় আভরণ-স্বরূপ গ্রথিত হইবে, এবং যত দিন এই ভাষা জীবিত থাকিবে, ততদিনই ইহার প্রফুল্লকান্তি বঙ্গবাসীর হৃদয়-দর্পণে প্রতিফলিত হইবে।

এই কাব্যের বিষয় পলাশির প্রসিদ্ধ যুদ্ধ, অথবা নবাব সিরাজদ্দৌলার পতন এবং বঙ্গে ইংরেজ-রাজশ্রীর প্রথম অভ্যুদয়। এদেশীয়েরা সাধারণতঃ যে সকল বিষয়ের আদর করিয়া থাকেন, এই কাব্যে তাহা প্রাপ্ত হওয়া যায় না। ইহাতে দেবতা নাই, গন্ধর্ব্ব নাই, দেবাসুরের যুদ্ধ নাই, তপোবন প্রভৃতির বর্ণনা নাই, জটাচীরধারী তাপসদিগের কঠোর তপস্যার কথা অথবা শৈবাল-সমাদৃতা পদ্মিনীর ন্যায় বল্কলাবৃতা তপস্বিকন্যাদিগের প্রেম, বিরহ ও অশ্রুবর্ষণ প্রভৃতি ভারতপ্রিয় হৃদয়হারি বৃত্তান্তনিচয়েরও উল্লেখ নাই। কিন্তু তথাচ ইহাতে যাহা আছে, তাহা পাঠ করিবার সময়ে হৃদয় অনির্ব্বচনীয় আনন্দে উছলিয়া উঠে এবং কল্পনা অনন্ত সমুদ্রে ভাসমান হয়।

পলাশির যুদ্ধ বলিলে বালকেরা মার্শম্যান সাহেবের ইতিহাস-পুস্তক স্মরণ করে, এবং বৃদ্ধেরা বিলাতের কোন প্রসঙ্গ মনে করিয়া বীতস্পৃহ হন। কিন্তু যাঁহাদিগের চক্ষু দৃষ্টিশক্তি লাভ করিয়াছে, এবং বুদ্ধি চিন্তা-সহযোগে আমাদিগের কবির কল্পনার সঙ্গে উড্ডীন হইতে পারিবে, তাঁহাদিগের নিকট বঙ্গীয় কবির বীণার জন্য ইহা অপেক্ষা উচ্চতর বিষয় সম্ভবে না। পলাশির যুদ্ধ বর্ত্তমান ভারত-ইতিবৃত্তের প্রথম পৃষ্ঠা; পলাশির যুদ্ধ ভারতের নিয়তি-নেমির শেষ আবর্ত্ত। ভাগীরথী ও কালিন্দীর ন্যায় দুইটি পুরাণপ্রসিদ্ধ স্রোতস্বতী দুই দিক্‌ হইতে প্রবাহিত হইয়া যেখানে আসিয়া প্রণয়ভরে পরস্পরকে আলিঙ্গন করে, অনেকে ভক্তিরসার্দ্রচিত্তে সেই স্থানকে তীর্থস্থান বলিয়া পূজা করেন। আবার, সমুদ্রের পর্ব্বোচ্ছ্বাস-প্রবাহসকল যে স্থলে আসিয়া ভৈরবরবে পরস্পর-প্রহৃত হয়, এবং ভয়াবহ তরঙ্গমালা সৃজন করিয়া তটভূমি প্রকম্পিত করে, অনেকে প্রকৃতির গরিমায় মুগ্ধ হইয়া তাদৃশ স্থানকে বৈজ্ঞানিকের দৃশ্যস্থান বলিয়া আদর করেন। এই গণনায়, পলাশির ক্ষেত্র মহাতীর্থ ও মহাদৃশ্য। এখানে পূর্ব্ব ও পশ্চিম পরস্পর সম্মিলিত হয়; এখানে প্রাচীন সভ্যতা ও আধুনিক উন্নতি এই দুই প্রতিকূল স্রোত পরস্পর পরস্পরকে আঘাত ও প্রতিঘাত করে; এখানে বংশপরম্পরায় সহস্র কোটি লোকের ললাট-লেখার পরীক্ষা হইয়া যায়; এখানে দুই মহাদেশের দুইটি ইতিহাস, কালের এক কুক্ষিতে যুগপৎ নিমজ্জিত হইয়া, একীভূত নূতন মূর্ত্তিতে ভাসিয়া উঠে; এবং বঙ্গভূমি, ভারতবর্ষ ও সমস্ত এসিয়া-ভূখণ্ডে এইক্ষণ যে পরিবর্ত্তনের চক্র অবিরাম গতিতে অহর্নিশ চলিতেছে, প্রকৃত প্রস্তাবে এখানেই তাহা প্রথম চালনা পায়। যদি ইতিহাসে পলাশির যুদ্ধ না থাকিত, তবে এদেশের অবস্থা এইক্ষণ কিরূপ হইত, তাহা চিন্তা করাও কঠিন। লোকে এইক্ষণ যে যুগান্তপ্রলয় ও অভিনব সৃষ্টি দেখিয়া কখনও আশায় উৎফুল্ল, কখনও বিষাদে অবসন্ন হইতেছে, তাহার চিহ্নও কুত্রাপি পরিলক্ষিত হইত কি না, সন্দেহের কথা। বস্তুতঃ সমালোচ্য গ্রন্থে পলাশির যুদ্ধ যে ভাবে কল্পিত হইয়াছে, তাহা অতি উচ্চ শ্রেণীর কল্পনার পরিচয় দেয়, এবং সমগ্র চিত্রটিকে হৃদয়ে গ্রহণ করিতে হইলে ইতিহাস-শৈলের ঊর্দ্ধতন শৃঙ্গে আরোহণ করিয়া ভারতের মানচিত্রকে পুনরায় কবির চক্ষে নিরীক্ষণ করা আবশ্যক হয়। নহিলে পলাশির যুদ্ধ কিছুই নহে।

আমরা শুদ্ধ কল্পিত বিষয়ের উচচতা, প্রসার ও অতুল গৌরব স্মরণ করিয়াই কবির প্রশংসা করিতেছি না। এই কল্পনায় নবীনবাবুর আর একটি বিশেষ প্রশংসা আছে। তিনি যে পথে গমন করিয়াছেন, সে পথে কেহই তাঁহার পূর্ব্বে পাদক্রম করেন নাই। তিনি যে 'মণিপূর্ণ খনিতে' সাহস-সহকারে প্রবিষ্ট হইয়াছেন, তাহার অভ্যন্তরে কেহই তাঁহার জন্য আলোকবর্ত্তিকা স্থাপন করেন নাই। বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস প্রভৃতির সময় হইতে এদেশে যিনিই যে কোন কাব্য প্রণয়ন করিয়াছেন, তিনিই একটি পুরাতন অবলম্ব পাইয়াছেন। কেহ পুরান ফুলে নূতন মালা গাঁথিয়াছেন; কেহ নূতন ফুলে পুরান সূত্র ব্যবহার করিয়াছেন। নবীনবাবুর তাহা হয় নাই। তাঁহার অবলম্ব স্বহৃদয় ও স্বকীয় কল্পনা মাত্র। তাঁহার জন্য বাল্মীকিও মণি বেধ করিয়া যান নাই, এবং কবি-কল্প-পাদপ ব্যাসদেবও অনন্তরত্নরাশি সাজাইয়া রাখেন নাই। তাঁহাকে প্রায় সমস্তই স্বহস্তে সঞ্চয়ন ও স্বহস্তে গ্রন্থন করিতে হইয়াছে। ইহা সামান্য অভিমানের কথা নহে।

পলাশির যুদ্ধ কাব্য অনতিবৃহৎ পাঁচটি সর্গে বিভক্ত। ইহার প্রথম সর্গে নবাব বিদ্রোহীদিগের ষড়্‌যন্ত্র ও কূটমন্ত্রণা, দ্বিতীয় সর্গে ব্রিটিশ সেনার শিবির-সন্নিবেশ, তৃতীয় সর্গে পলাশি-ক্ষেত্রের বর্ণনা-প্রসঙ্গে সিরাজদ্দৌলার তদানীন্তন অবস্থা-বর্ণন ইত্যাদি, চতুর্থ সর্গে যুদ্ধ এবং পঞ্চম সর্গে শেষ আশা অথবা সিরাজদ্দৌলার শোচনীয় উপাংশু-হত্যা।

প্রথম সর্গের আরম্ভ যেমন গম্ভীর, তেমনই মনোহর। বোধ হয়, মেঘনাদ-বধের আরম্ভ বিনা বাঙ্গালার কোন কাব্যের প্রারম্ভ-বর্ণনাতেই এইরূপ ভয়ঙ্কর গাম্ভীর্য্য এবং এইরূপ পরিম্লান মনোহারিত্ব প্রদর্শিত হয় নাই। অভ্রভেদী পর্ব্বত কি অনন্ত-বিস্তারিত সমুদ্রাদির বর্ণনাতে মনে এক গাম্ভীর্য্যের আবেশ হয়। ইহা সেইরূপ গাম্ভীর্য্য নহে। কোন অলৌকিক-রূপলাবণ্যবতী অঙ্গনা, কি মৃদুবাহিনী স্রোতস্বিনী, কিংবা সরোবিলাসিনী ফুল্ল কমলিনী প্রভৃতির বর্ণনাতেও উৎকৃষ্ট কবিরা মনোহারিত্ব সৃজন করিতে পারেন।

এই মনোহারিত্ব সেই প্রকারের নহে। যদি কোন প্রতিভাশালী চিত্রকর বিষাদের প্রতিমূর্ত্তি আঁকিয়া তুলিতে সমর্থ হইতেন, এবং সেই মূর্ত্তিতে আতঙ্ক ও আশা এই উভয়ের বিরোধ এবং শোকের মলিনতা ভালরূপে ফলাইতে পারিতেন, তবে তাহাকেই ইহার উপমাস্থল বলিয়া নির্দ্দেশ করিতাম। পড়িবার সময়ে প্রতীতি হয়, যেন প্রকৃতি আপনি আসিয়া আজন্মদুঃখিনী বঙ্গভূমির দুঃখে করুণকণ্ঠে বিলাপ করিতেছেন, আর সমস্ত সংসার ভয়ে, বিস্ময়ে এবং শোকভরে স্তম্ভিত হইয়া অনন্য-মনে ও অনন্যকর্ণে সেই বিলাপ শ্রবণ করিতেছে।

দিগন্তব্যাপী অন্ধকারের বর্ণনায় এই অংশে একটি আশ্চর্য্য পংক্তি কবির লেখনী হইতে হঠাৎ স্খলিত হইয়াছে :—

"তিমিরে অনন্যকায় শূন্য ধরাতল"

সংস্কৃতে অনুবাদ করিলে এই পংক্তিটিকে মহাকবি ভারবির নিম্নোদ্ধৃত প্রসিদ্ধ শ্লোকার্দ্ধের সঙ্গে অকুতোভয়ে গাঁথিয়া দেওয়া যাইতে পারে :—

"ভবতি দীপ্তিরদীপিতকন্দরা
তিমিরসংবলিতেব বিবস্বতঃ।"

এই সর্গের মধ্যে কিছু দূরে প্রবিষ্ট হইলে যবন-নিপাতের নিদানীভূত ভারত-বিখ্যাত জগৎশেঠের নিভৃত মন্ত্রভবন। এই মন্ত্রণা-চিত্রে অনুকৃতির কিঞ্চিৎ ছায়া আছে।

যাঁহারা মিল্টনের স্বর্গভ্রংশ কাব্যের দ্বিতীয় সর্গে পাণ্ডিমোনিয়মের সেই লোম-হর্ষণ বর্ণনা পাঠ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের নিকট ইহা বিস্ময়কর কি বিচিত্র বোধ না হইতে পারে। কিন্তু অনুকৃতির ছায়া আছে বলিয়াই যে ইহা কোন প্রকারে অযশের কারণ হইয়াছে, এমন নহে। আদৌ, পলাশির যুদ্ধে এই অংশ অপরিহার্য্য। এটুকু ছাড়িয়া দিলে ইতিহাসকে লঙ্ঘন করা হয়। দ্বিতীয়তঃ, এই মন্ত্রণায় যাঁহারা অধিনায়ক, তাঁহাদিগের সহিত পাণ্ডিমোনিয়মের মন্ত্রণাধিনায়কদিগের অনেক বৈলক্ষণ্য। ইঁহারা রক্ত-মাংসের মনুষ্য, তাহারা কবিকল্পিত অপদেবতা। ইঁহাদিগের শোক, দুঃখ, মর্ম্মব্যথা এবং আশা ও ভয় আমরা বুঝিতে পারি; তাহাদিগের সমস্তই মানবীয় সহানুভূতির বহির্ভূত।

কূটচক্রবদ্ধ মন্ত্রণাকারীদিগের প্রত্যেকেই সিরাজদ্দৌলার ঘোরতর বিদ্বেষী ও মর্ম্মান্তিক শত্রু ছিলেন। সিরাজের সর্ব্বনাশ হউক এবং তদীয় সিংহাসন এই মুহূর্ত্তেই বিচূর্ণিত হইয়া যাউক ইহা প্রত্যেকেরই প্রাণগত কামনা ছিল। কিন্তু কবি অতি সাবধানে, অতি সুকৌশলে, ইঁহাদিগের এক এক জনের মনের ভাব এক এক রূপ ভাষায় প্রকাশিত করিয়া চরিত্রের বৈচিত্র্য রক্ষা করিয়াছেন এবং সেই সঙ্গে স্বকীয় লোকপ্রতিজ্ঞতা এবং শাব্দিক ক্ষমতারও পরিচয় দিয়াছেন। মন্ত্রিবর রায়দুর্ল্লভ কপট ধার্ম্মিক। তাঁহার মন কূর্ম্মশুণ্ডবৎ;—উহা একবার বাহিরে আসে, আরবার সঙ্কুচিত হইয়া অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। তিনি কিছুই পরিষ্কার দেখিতে পান না। যেখানে পদ নিক্ষেপ করিতে যান, সেখানেই তাঁহার কণ্টক-ভয়। যাঁহাদিগের সহিত মন্ত্রণা করিতে আসিয়াছেন, তাঁহাদিগকেও তিনি সম্যক্ বিশ্বাস করেন না। শেষে, প্রাণ-ভয়কে পাপ-ভয় বলেন, এবং এইরূপ লোকের যেমন হইয়া থাকে, মনের কথা মনেই রাখিয়া ইহার এবং উহার মুখপানে চাহিয়া থাকেন। তাঁহার পর জগৎশেঠ। যেমন পাণ্ডবসভায় ভীম, তেমন এই সভায় জগৎশেঠ;—অকপট, অসন্দিগ্ধচিত্ত, অটল সাহসপূর্ণ, এবং অভিমানবিষে জর্জরিত। শেঠবরের হৃদয়ের ক্রোধ আগ্নেয়গিরির মত; উহা হইতে যাহা কিছু উদ্গীর্ণ হয়, তাহাই শ্রোতার অঙ্গে 'তপ্ত লোষ্ট্রসম' নিপতিত হয়; কথায় ধমনীতে অগ্নিস্রোত প্রবাহিত করিয়া দেয়।

জগৎশেঠের প্রতিজ্ঞাও ভীমের ন্যায়; শুনিলেই হৃদয় চমকিয়া উঠে এবং যেন এতক্ষণ পরে পুরুষ-সম্মুখে আসিয়াছি এইরূপ প্রতীতি জন্মে;—

সম্ভব, হইবে লুপ্ত শারদ চন্দ্রমা
অসম্ভব, হবে লুপ্ত শেঠের গরিমা।"
*   *   *   *

"সাধিতে প্রতিজ্ঞা যদি হয় প্রয়োজন,
উপাড়িব একা নভো-নক্ষত্র-মণ্ডল,
সুমেরু সিন্ধুর জলে দিব বিসর্জন,
লইব ইন্দ্রের বজ্র পাতি বক্ষঃস্থল।
যদি পাপিষ্টের থাকে সহস্র পরাণ;
সহস্র হলেও তবু নাহি পরিত্রাণ।"

রাজনগরেশ্বর মহারাজ রাজবল্লভের কথায় বিষের মিশ্রণ আছে, তড়িৎ-বেগ নাই; কথা যেন ফুটে ফুটে হইয়াও দুঃখভরে কণ্ঠলগ্ন হইয়া থাকে। কিন্তু ঐ যে অস্ফুট কথা; তাহাতেও—

"*   *   *   উঠিল কাঁপিয়া
দুরু দুরু করি মিরজাফরের হিয়া।"

রাজা কৃষ্ণচন্দ্র প্রকৃত ধার্ম্মিক, পাপদ্বেষী, পবিত্র ও পরদুঃখকাতর। তিনি যখন আলিবর্দ্দির অকলঙ্ক চিত্রপটের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া সিরাজের কলঙ্ক-পঙ্কিল কুৎসিত প্রতিমূর্ত্তি নিরীক্ষণ করেন, তখন ঘৃণায় তাঁহার আত্মা জর্জ্জরিত হয়। কিন্তু তিনি জগৎশেঠের মত সাহসী নহেন, রাজবল্লভের মত কূটভাষীও নহেন। তাঁহার পরামর্শ স্পষ্ট কথা। চক্রীদিগের মধ্যে তাঁহারই চক্রান্ত নাই, কারণ তিনি মীমাংসা-কারী। আমরা প্রস্তাব-বাহুল্য-ভয়ে রাণী ভবানীর কথা হইতে পাঠকের জন্য কিছুই উদ্ধৃত করিতে না পারিয়া নিতান্ত দুঃখিত রহিলাম। কিন্তু ইহা বলিতে পারি যে, যিনিই সেই অমৃতাভিষিক্ত বিষ কি বিষাক্ত অমৃত পান করিবেন, তিনিই পদে পদে কবিবর নবীনচন্দ্রকে হৃদয় খুলিয়া সাধুবাদ দিবেন। যদি কোন ব্যক্তি সুগভীর নিদ্রার মধ্যে সহসা কোন অশ্রুতপূর্ব্ব অদ্ভুত শব্দ শ্রবণ করিয়া জাগিয়া বসেন, তাহা হইলে তাঁহার চিত্ত যেরূপ নানাবিধ অচিন্তনীয় ভাবে তৎকালে আলোড়িত হয়, এই কাব্যের প্রথম সর্গ হইতে দ্বিতীয় সর্গে অবতীর্ণ হওয়া মাত্র পাঠকের অসাবধান চিত্তও সহসা সেইরূপ আলোড়িত হইয়া উঠে।

প্রথম সর্গের সমস্ত কথাই পূর্ব্বে এক একবার নিশার দুঃস্বপ্নের মত অলীক বোধ হয়; অথবা ঘোরান্ধ-রজনীতে অকস্মাৎ মেঘ-গর্জন শ্রবণ করিলে কিংবা অকস্মাৎ দামিনীর ক্ষণস্থায়ী চমক দেখিলে, তাহা যেমন শ্রুতি কি দৃষ্টির বিভ্রম বলিয়া বিশ্বাস জন্মে, সেইরূপ যাহা কিছু শুনিয়াছি এবং যাহা কিছু দেখিয়াছি সমস্তই যেন মনের ভ্রান্তি, এইরূপ বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা করে। কিন্তু দ্বিতীয় সর্গে প্রবেশ করিলেই সেই প্রীতিকর ভ্রম ও প্রিয় বিশ্বাস তিরোহিত হইয়া যায়; এবং যাহা দেখি নাই

তাহা দেখিয়া এবং যাহা শুনি নাই তাহা শুনিয়া, মন বিস্ময়ের পর ভয়ে এবং ভয়ের পর বিস্ময়ে বিস্ফারিত ও সঙ্কুচিত হয়। কোথায় ইংলণ্ড, আর কোথায় বঙ্গভূমি! কিন্তু এখন কি শুনি, আর কি দেখি! না—

"ব্রিটিশের রণবাদ্য বাজে ঝম ঝম
হইতেছে পদাতিক-পদ-সঞ্চলন
তালে তালে, বাজে অস্ত্র ঝনন ঝনন,
হ্রেষিছে তুরঙ্গ রঙ্গে, গর্জিছে বারণ।
থেকে থেকে বীর-কণ্ঠ সৈনিকের স্বরে,
ঘুরিছে ফিরিছে সৈন্য, ভুজঙ্গ যেমতি
সাপুড়িয়া-মন্ত্র-বলে; কভু অস্ত্র করে,
কভু স্কন্ধে; ধীরপদ, কভু দ্রুতগতি।
'ড্রমের' ঝর্ঝর রব, বিপুল ঝঙ্কার,
বিজ্ঞাপিছে ব্রিটিশের বীর অহঙ্কার।"

এই সর্গে সমরোন্মুখ-সৈনিকদিগের মনের ভাব আঁকিতে যাইয়া কবি মধ্যস্থলে আশার যে একটি 'বন্দনা' করিয়াছেন, তাহা বহুকাল স্মরণ থাকিবে। এই বন্দনাটিকে স্কটলণ্ড-দেশীয় প্রসিদ্ধ কবি ক্যাম্বেলের আশা-নামক কবিতার সহিত মিলাইয়া পড়িলে পাঠকবর্গ নিরতিশয় আনন্দ অনুভব করিবেন। ক্যাম্বেলের আশা পৃথ্বীলোক পরিত্যাগ করিয়া উর্দ্ধতম গগনে বিচরণ করে; নবীনবাবুর আশা স্নেহগদ্‌গদ প্রিয়কণ্ঠের ন্যায় হৃদয়ের রন্ধ্রে রন্ধ্রে সঞ্চরণ করিয়া প্রাণ-মন কাড়িয়া লয়। দুইটিই সুন্দর ও সুখদর্শন; কিন্তু একটি মধ্যাহ্ন-সূর্য্যের খরজ্যোতি; আর একটি লঘুমেঘাবৃত চন্দ্রমার শীতল কান্তি; একটি সুদূরবর্ত্তিনী, আর একটি মর্ম্মস্পর্শিনী। যিনি ব্রিটিশ-সেনার প্রাণ, পলাশি-যুদ্ধের প্রধান নায়ক এবং ভারতের ইংরাজ-রাজমহিমার প্রথম প্রতিষ্ঠাতা, সেই চিরবিশ্রুতনামা দুর্দ্ধর্ষপ্রকৃতি ক্লাইবের সহিত এতক্ষণ কাহারও সাক্ষাৎ হয় নাই। তিনি কোথায় ছিলেন, কেন বঙ্গে আসিলেন, এবং বঙ্গে আসিয়াই বা আজ কি কারণে কাটোয়া-শিবিরে তরুতলে একাকী গভীর চিন্তায় নিমগ্ন, কবি আখ্যায়িকার প্রচলিত রীত্যনুসারে ইতঃপূর্ব্বে তাহার কিছুই বলেন নাই, কিন্তু আশার নিকট জিজ্ঞাসাচ্ছলে যে ভাবে বীরবরকে সহসা অভিনয়-ভূমিতে আনয়ন করিয়াছেন, তাহা অতি সুচারু হইয়াছে। এইরূপ পট-পরিবর্ত্তনে মনে কৌতূহলের উদ্দীপন হয়, এবং উত্তরোত্তর চিত্রগুলি দেখিবার জন্য চিত্ত স্বভাবতঃই উৎসুক হইয়া উঠে। ক্লাইবের তৎকালীন মুখচ্ছবি এবং মনোগত ভাবের যেরূপ বর্ণনা হইয়াছে, তাহাও আমাদিগের নিকট প্রশংসনীয় বোধ হইল।

নবীনবাবু, বর্ণনীয় বীরপুরুষের চক্ষু এবং দৃষ্টির প্রতিই সমধিক মনোযোগ দিয়াছেন। বোধ হয়, যদি তিনি তাহার অধর, ওষ্ঠ, নাসা, ভ্রূযুগ এবং উপবেশন-ভঙ্গিমাকেও ঐ সঙ্গে আঁকিয়া তুলিতেন, তাহা হইলে বিজ্ঞানেরও সম্মান রক্ষা পাইত এবং বর্ণনাও চমৎকারিণী হইত। ক্লাইবের বর্ণনায় কিঞ্চিৎ ন্যূনতা থাকিলেও, যিনি

ধ্যানযোগে তদীয় মানস-চক্ষুর সম্মুখবর্ত্তিনী হইয়া এই ক্ষুদ্রতাময় নরলোকে ক্ষণকাল বিরাজ করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার দিকে চাহিলেই সকল কথা ভুলিয়া যাই। একবার নয়ন ভরিয়া ঐ মূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিলে, নবীনবাবুকে কখনই প্রশংসার সামান্য উপহার দিতে প্রবৃত্তি হয় না; প্রশংসা করিবার ইচ্ছা তখন প্রীতি ও ভক্তিতে পরিণত হয়। যখন বীর-কেশরী ক্লাইব, সংশয়-দোলায় দোলায়িত হইয়া আশার হিল্লোলে একবার উপরে উঠিতেছেন এবং পরিণাম-চিন্তায় আবার জড়সড় হইয়া ভূতলে পড়িতেছেন; যখন সম্পদ্ ও বিপদ্, বিজয় ও পরাজয় এবং কীর্ত্তি ও অকীর্ত্তির বিভিন্ন মূর্ত্তি তাঁহার কল্পনানেত্রে ক্ষণে ক্ষণে প্রতিভাসিত হইয়া তাঁহাকে ভয়ানকরূপে বিলোড়ন করিতেছে; এবং যখন অপমানের বৃশ্চিক-দংশন, লোভের অঙ্কুশ-তাড়না এবং অভিমানের প্রদীপ্ত-বহ্নি তাঁহার চিত্তকে এক অনির্ব্বচনীয় উৎসাহে স্ফীত করিয়া তুলিতেছে, এমন সময়ে রাজরাজেশ্বরীরূপিণী এক দিব্য রমণী আরাধ্য দেবতার ন্যায় অথবা মূর্ত্তিমতী সিদ্ধি কি জয়শ্রীর ন্যায়, অন্ধকার-গৃহে দীপালোকবৎ, অকস্মাৎ তাঁহার নিকটে আবির্ভূতা হইলেন। তখন,—

> "সহস্র ভাস্কর তেজে গগন-প্রাঙ্গণ
> ভাতিল উপরে, নিম্নে হাসিল ভূতল;
> নামিল আলোকরাশি ছাড়িয়া গগন,
> সবিস্ময়ে সেনাপতি দেখিলা তখনি
> জ্যোতির্ব্বিমণ্ডিতা এক অপূর্ব্ব রমণী।"

এই রমণী-চিত্র অপ্রতিম। এই অলৌকিক রূপরাশি-দর্শনে অতি নিকৃষ্টস্বভাব মনুষ্যেরও কিছুকালের জন্য আত্মবিস্মৃতি হয়, এবং যে পবিত্রতা তাহাকে কখন স্পর্শ করে নাই, তাহা আসিয়া তাহাতে আবিষ্ট হয়।

অভয়া মা ভৈঃ রবে ক্লাইবের আকুল প্রাণকে আশ্বস্ত করিয়া, তাঁহার নির্ব্বাণোন্মুখ সাহসকে পুনরায় উদ্দীপ্ত করিয়া দিয়া, আকাশবাণীর মত যে কয়টি কথা বলিলেন, তাহা শুনিবার জন্য হৃদয় যারপরনাই অধীর হয়, অথচ শুনিয়া দুঃখের মুর্ম্মুর-দাহনে দগ্ধ হইয়া যায়।

ইহা একটি অবধারিত কথা যে, কাব্যের প্রধান পরীক্ষাস্থল পাঠকের হৃদয়। তার্কিকের ভাষা, সোপানের পর সোপানে আরোহণ করিয়া, বুদ্ধিকে সম্বোধন করে; কবির কণ্ঠ-লহরী, তর্কের কুটিল পথে পরিভ্রমণ না করিয়া, একেবারে গিয়া হৃদয়ের মর্ম্মস্থানে স্পৃষ্ট হয়। সুতরাং যে কাব্য যে পরিমাণে হৃদয়ের উপর কর্ত্তৃত্ব করিতে পারে,—শ্রোতা কি পাঠকের হৃদয়নিহিত নিদ্রিত ভাবসমূহকে উদ্বোধিত করিয়া দেয়, সেই কাব্য সেই পরিমাণে কৃতার্থতা লাভ করে। আর, যে কাব্য যে পরিমাণে হৃদয়কে স্পর্শ করিতে অথবা হৃদয়ের নিকটস্থ হইতে অসমর্থ থাকে, সেই কাব্য সেই পরিমাণে অকাব্য-মধ্যে পরিগণিত হয়। পোপ এবং বায়রণে ইহার উদাহরণ দেখ। পোপের লেখা পড়িবার সময়ে তোমার প্রথমেই এই প্রতীতি হয় যে, তুমি কোন সাবধান লোকের নিকটে বসিয়াছ। উত্তরোত্তর কথার গাঁথনিতে সাবধানতা, ভাবের সমাবেশে

সাবধানতা, এবং পদবিন্যাসেও সেই সাবধানতা। যেন প্রত্যেক শব্দ শত পরীক্ষার পর গৃহীত হইয়াছে, এবং প্রত্যেক ভাব শতবার শোধিত হইয়া কবির হৃদয় হইতে বাহিরে আসিয়াছে। বায়রণের লেখায় এই সাবধানতার চিহ্নমাত্রও বিলোকিত হয় না। উহা নিশীথে বংশীধ্বনির মত, অথবা বাতবিক্ষোভিত স্রোতস্বিনীর বিলাপ-ধ্বনির মত। শ্রবণমাত্রেই চিত্ত পাগলের ন্যায় নাচিয়া উঠে। কি শুনিলাম, কে শুনাইল, ইহা বিচার করিবার অবসর থাকে না ; প্রাণ আকুল হইয়া পড়িতেছে, কেবল এই মাত্র ধারণা থাকে। কখনও বিরক্তি বোধ হয়, কখনও বা মনে প্রীতির সঞ্চার হয় ; কখনও আত্মা অশান্তিতে ছটফট করে, কখনও বা শান্তির ক্ষণস্থায়ী সুখ-স্পর্শে ক্ষণকালের জন্য সুখের আস্বাদ পায়। কিন্তু সেই অনির্ব্বচনীয় আকুলিত ভাব কিছুতেই প্রশমিত হয় না ; উহা ক্রমশঃই পরিবর্দ্ধিত হইয়া শেষে সমস্ত হৃদয়কে তরঙ্গায়িত করিয়া তুলে। উল্লিখিত কবিদ্বয়ে শক্তি-বিষয়ে এত তারতম্য কিসে? এই প্রশ্নে সকলেই এই উত্তর দিবে যে, একজন বুদ্ধির কবি, আর এক জন হৃদয়ের কবি ; পিঞ্জর-রুদ্ধ গৃহশুক এবং প্রমত্ত বন-বিহঙ্গ। যিনি বুদ্ধির কবি, তিনি 'যেহেতু' এবং 'অতএব' দিয়া বুদ্ধিমান্‌দিগকে প্রবোধ দেন ; কিন্তু তাঁহার সেই সুমার্জিত ও সুসঙ্গত কথা শ্রুত হইয়াও অশ্রুতবৎ থাকে। যিনি হৃদয়ের কবি, তিনি তানমানে দৃক্‌পাত না করিয়া, মনের সুখে কি মনের দুঃখে হৃদয়ের গীত গাইয়া ফেলেন ; কিন্তু সেই বন্য সঙ্গীত বিশৃঙ্খল হইলেও হৃদয়ে হৃদয়ে প্রতিধ্বনিত হয় এবং এক তানে শত তান সৃজন করে।

পলাশির যুদ্ধ এই শেষোক্ত শ্রেণীর কাব্য। ইহা হৃদয়-রূপ জীবন্ত প্রস্রবণ হইতে নিঃসৃত হইয়াছে, এবং ইহার প্রত্যেক কবিতা, ও প্রতি পংক্তিতেই সজীবতার পরিচয় রহিয়াছে। আমরা ইহাকে বায়রণের কোন কাব্যের সহিত তুলনা করিতে ইচ্ছা করি না। কারণ, সে তুলনায় ইহা অবশ্যই হীনপ্রভ প্রতীয়মান হইবে।

কিন্তু বায়রণের কবিতায় যে দৃক্‌পাতশূন্য বন্যভাব এবং যে অদ্ভুত মাদকতা আছে, ইহাতেও অনেক স্থলেই তাহার অনুরূপ পদার্থ পরিলক্ষিত হয়। কোন কৃত্রিম কবি কদাপি 'পলাশির যুদ্ধ' প্রণয়নে সমর্থ হইত না। ইহার লেখকের হৃদয়ে চির-বসন্ত, চির-যৌবন। তাঁহাতে বার্দ্ধক্যের জড়তা নাই, চিন্তামাত্র-পরায়ণের সাবধানতা নাই, এবং ভাবিয়া ভাবিয়া পদবিন্যাসেরও অবকাশ নাই। কিন্তু লেখা তথাপি হৃদয়-স্পর্শিনী। আমরা নিম্নে তৃতীয় সর্গের আরম্ভ হইতে কতিপয় পংক্তি উদ্ধৃত করিলাম। নবীনচন্দ্রকে কেন অসাবধান বলি এবং অসাবধান বলিয়াও কেন অকৃত্রিম কবি বলি, ইহা হইতেই তাহা সংক্ষেপে বুঝাইয়া দিতে পারিব।

"এই কি পলাশিক্ষেত্র? এই সে প্রাঙ্গণ?
যেইখানে,—কি বলিব?—বলিব কেমনে!
স্মরিলে সে সব কথা বাঙ্গালীর মন
ডুবে শোক-জলে, অশ্রু ঝরে দু'নয়নে ;—

যেইখানে মোগলের মুকুট-রতন
খসিয়া পড়িল আহা! পলাশির রণে?
যেইখানে চিরকুচি স্বাধীনতা-ধন
হারাইল অবহেলে পাপাত্মা যবনে?
দুর্ব্বল বাঙ্গালী আজি, সজল নয়নে,
গাবে সে দুঃখের কথা, তবে, হে কল্পনে!
অতিক্রমি সান্ত্রীদল, যন্ত্রীদল মাঝে
গাইছে যথায় যত কোকিলগঞ্জিনী
বিদ্যুৎবরণী বামা; মনোহর সাজে
নাচিছে নর্ত্তকীবৃন্দ মানসমোহিনী,
ডুবিয়া ডুবিয়া যেন সঙ্গীত-সাগরে;
পশি সশঙ্কিতে, সেই সিরাজ-শিবিরে
সাবধান, সশঙ্কিতে, কম্পিত অন্তরে,
না বহে নিশ্বাস যেন, অতি ধীরে ধীরে,
কহ সখি! কহ দুঃখ-বিকম্পিত স্বরে,
শত বৎসরের কথা বিষণ্ণ অন্তরে।"

উল্লিখিত প্রথম কবিতাটির প্রথমার্দ্ধ পড়িবার সময়ে মনে সর্ব্বাগ্রে ইহাই ধারণা হয় যে, কবি একজন অতীব সহৃদয় এবং অতি প্রগাঢ় চিন্তাশীল ব্যক্তি। তিনি কল্পনা-যোগে সেই ভারত-বিশ্রুত পলাশি-প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইয়াছেন, এবং উপস্থিত হইয়াই চিন্তাবেশে অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহার মন আর তাঁহাতে নাই। হৃদয়ে গভীর শোকসিন্ধু উথলিয়া উঠিয়াছে এবং শোকবশে নয়নযুগল হইতে দরদর-ধারে নিঃশব্দ অশ্রু-ধারা নিপতিত হইতেছে। ইহার পরই জিজ্ঞাসা, এ শোক কি?——না, মোগলের দুঃখে দুঃখ, শত্রুর জন্য সহানুভূতি, উৎপীড়কের জন্য উৎপীড়িতের সকরুণ খেদ, অথবা কারণ বিনা কার্য্য। ভাল, শোকের স্রোতই প্রবাহিত হউক; অকস্মাৎ আবার ক্রোধের স্ফূর্ত্তি কোথা হইতে? পাঠকের চিত্ত এইরূপ বিবিধ প্রশ্নে বিলোড়িত হইতেছে এবং কবি-কল্পনার অন্তরতম প্রদেশে প্রবিষ্ট হইয়া মীমাংসার অনুসন্ধান করিতেছে, ইহার মধ্যেই সহসা এক নূতন কথা। কোথায় কোটিকল্প লোকের অদৃষ্টের ফলাফল-গণনা, আর কোথায় রূপসীবৃন্দের রূপের তরঙ্গ! কিন্তু কবি যেই ভারতের ভাগ্যসূত্র করে ধারণ করিয়া নবাব সিরাজদ্দৌলার শিবিরস্থ বিলাস-গৃহে ধীরে ধীরে প্রবেশ করিলেন, অমনি সকল কথা পাসরিয়া একেবারে সেই বিলাস-সরসীতে ভাসিয়া গেলেন।

আমরা পূর্ব্বে যে অসাবধানতার কথা বলিয়াছি, ইহাই সেই অসাবধানতা;——এক গীতের মধ্যে আর এক গীত, এক রাগিণীর মধ্যে আর এক রাগিণী। কিন্তু এই অসাবধানতার মধ্যেও স্বভাবের কি চমৎকার শোভা রহিয়াছে! কি আশ্চর্য্য সহৃদয়তাই প্রকাশিত হইয়াছে! তরঙ্গের পৃষ্ঠে তরঙ্গের ন্যায় উদ্বেল হৃদয়-সমুদ্রে

মুহুর্মুহুঃ ভাব-পরিবর্ত্ত হইতেছে, আর আত্মবিস্মৃত কবি সেই সমস্ত চঞ্চল ভাবকে বর্ণ-তুলিকা লইয়া অবিরাম চিত্রিত করিতেছেন। মনের এই অবস্থায় কি কখনও সাবধান হওয়া সম্ভবপর হয়? অথবা তর্কশাস্ত্রকে প্রবোধ দিবার জন্য অত সাবধান হইয়া চলিলে, কবিতা কি কখনও চল-সৌদামিনীর মত এরূপ স্ফূর্ত্তিমতী ও হৃদয়গ্রাহিণী হইয়া থাকে? কবি এই সর্গে আর একটি অসাধারণ ক্ষমতা দেখাইয়াছেন। রমণীর রূপ-বর্ণনায়, নৃত্য-গীতের বর্ণনায় এবং হাব, ভাব, লীলা, রঙ্গ এবং বিলাস-বিভ্রমের বর্ণনায় প্রায়ই মনুষ্যের চিত্ত তরলিত হয়। কিন্তু এই সর্গে তাদৃশ বর্ণনা-সকল পাঠ করিবার সময়েও চিত্ত তরলিত না হইয়া, যেন কি দুঃখে, বিষণ্ন ও ভারাক্রান্ত হইয়া পড়ে;—অবিরল বৃষ্টিধারার মধ্যে রৌদ্রের বিষাদ-মাখা হাস্যের ন্যায়, অথবা প্রভাতের নিভু-নিভু দীপশিখার ন্যায় পাঠকের চক্ষে সমস্তই নিরানন্দ আনন্দের মূর্ত্তি ধারণ করে। সংস্কৃত অলঙ্কার-শাস্ত্রের অন্ধভক্তেরা আদিরসকে করুণরসের নিত্য-বিরোধী বলেন। যিনি আদিরসের উদ্দীপক বর্ণনাতেও এইরূপ কারুণ্যের উদ্বোধন করিতে কৃতকার্য্য হইয়াছেন, তাঁহাকে মহাকবি বলিব কি না, এই প্রশ্ন দইবার উত্থাপন করা অনাবশ্যক। পলাশি-যুদ্ধের চতুর্থ সর্গ বঙ্গবাসী-মাত্রেরই অভিমানের বিষয়। বাঙ্গালায় এমন সামগ্রী অল্প আছে। ইহার যে অংশ পাঠ করিবে, সেই অংশেই মোহিত ও পুলকিত হইবে; এবং যতবার পড়িবে, তত বারই নূতন আনন্দ অনুভব করিবে। কি রস, কি রচনা, সর্ব্বাংশেই ইহা যারপরনাই মাদক ও মনোহর।

ইহার পর পুনরায় যুদ্ধ, যুদ্ধে মিরজাফরের বিশ্বাসঘাতকতা এবং প্রতারণা, এবং বঙ্গেশ্বরের পরাজয় ও পলায়ন। কবি তৎকালে কল্পনানেত্রে অস্ত-গমনোন্মুখ ভাস্করের প্রতি চাহিয়া যে কয়েকটি কবিতা সম্বোধন করিয়াছেন, ভারতবাসীর অশ্রুজল ভিন্ন তাহার আর প্রতিদান সম্ভবে না। প্রিয়-বিয়োগ-বিধুর কামিনী-কণ্ঠের বিলাপ শুনিয়াছি, এবং ত্রিতন্ত্রীর কাঁদো কাঁদো মৃদুনিনাদ শুনিয়াছি; কিন্তু কিছুতেই প্রাণ এমন আলোড়িত হয় নাই। যদি এই বাক্য কয়টি কবির মুখ-নিঃসৃত না হইয়া স্বদেশ-বৎসল মোহনলালের মুখ হইতে নিঃসারিত হইত তবে আর কথাই ছিল না।*

মুর্শিদাবাদের বুদ্ধিমান্ লোকেরা মিরজাফরকে কর্ণেল ক্লাইবের গর্দ্দভ বলিত। পঞ্চম সর্গে সেই গর্দ্দভ-শ্রেষ্ঠের সিংহাসনে অভিষেক এবং সিরাজদ্দৌলার নিধন। কবি এই সর্গটিকে 'শেষ আশা' নাম দিয়াছেন। যদি আমাদের ইচ্ছা অনুসৃত হইত, তবে আমরা ইহার এক নাম রাখিতাম—মহাপাতক, আর এক নাম রাখিতাম—আশার নির্ব্বাণ। এখানেই সকলের সকল আশা ফুরাইল, প্রদীপ চিরদিনের তরে নিভিয়া গেল। এই সর্গের সমুদয় অংশ সমান হৃদ্য হয় নাই, কিন্তু এক একটি স্থান আশ্চর্য্য। পাঠক কখন দুঃখে গলিয়া পড়িবেন, কখন ভয়ে স্তম্ভিতবৎ হইবেন। যখন মনুষ্যকুলের চির-কলঙ্ক কুমার মিরণের জনৈক পাপ-সহচর কারাগারের গভীর অন্ধকার

* পরে মোহনলালের মুখে দেওয়া হইয়াছে।

ভেদ করিয়া সিরাজের শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিয়াছে এবং সেই দুঃখজর্জরিত, অর্দ্ধমৃত, হতভাগ্য যুবার শিরশ্ছেদের জন্য করে খড়্গ তুলিয়াছে, তখন দয়ার্দ্রচিত্ত কবি উপদেশ করিতেছেন—

"রে নির্দ্দয় অনুচর ! কৃতঘ্ন হৃদয়ে
কি কাজে উদ্যত আজি নাহি কিরে জ্ঞান ?
কেমনে রে দুরাচার ! কেমনে নির্ভয়ে
নাশিতে উদ্যত আজি নবাবের প্রাণ ?"

* * * *

"ডুবিবে, ডুবিছে, পাপী, আপনি আপন ;
শৃঙ্গচ্যুত শিলাখণ্ড ত্যজিয়া শিখর
পড়ে যবে ধরাতলে, কি কাজ তখন
আঘাত করিয়া তার পৃষ্ঠের উপর ?"

'পলাশির যুদ্ধ' কাব্যের ভাষা কিরূপ হৃদয়হারিণী হইয়াছে, তাহার উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। বস্তুতঃ এরূপ সরস, সরল ও সুখপাঠ্য কবিতা এদেশীয়েরা অধিক দেখেন নাই। আমাদিগের বিবেচনায় ইংরেজি ভাষার সহিত ওয়াল্টার স্কটের "লেডি অব্ দি লেক" নামক কাব্যের যে সম্বন্ধ, বাঙ্গালা ভাষার সহিত 'পলাশির যুদ্ধ' কাব্যের সেই সম্বন্ধ থাকিবে। তবে, কবিবর নবীনচন্দ্র ইংরেজী ভাষার প্রাণগত রসকে বাঙ্গালা ভাষায় ঢালিতে গিয়া স্বজাতির যেমন কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন, মধ্যে মধ্যে তেমনি দুই একটি অসহ্য অপরাধও করিয়াছেন ; যথা,—'পাড়া-প্রতিবাসী-ত্রাস,'— 'চিত হয়ে পড়ে দাও দাঁড়ে টান' ইত্যাদি। গ্রাম্যতা-দোষে দূষিত এইরূপ এক একটি পংক্তি, দুগ্ধ-কুম্ভে গোময়ের প্রক্ষেপের ন্যায়, এক একটি মনোহর কবিতাকে একেবারে নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে। কিন্তু কবি কিছু কিছু পরেই আবার এমন এক একটি সুধানিস্যন্দিনী কবিতা বঙ্গ-ভারতীর কণ্ঠে তুলিয়া দিয়াছেন যে, দেখিয়া তাঁহার সকল অপরাধ ভুলিয়া গিয়াছি। নিম্নে ইহার উদাহরণ দেখ :—

"শোভিছে একটি রবি পশ্চিম গগনে,
ভাসিছে সহস্র রবি জাহ্নবী-জীবনে।"

* * * *

"প্রিয়ে কেবোলাইনা আমার !
যেই প্রেম অশ্রুরাশি আজি অভাগার
ঝরিতেছে নিরবধি,
তরল না হত যদি
গাঁথিতাম সেই হার তব উপহার—
কি ছার ইহার কাছে গোলকন্দাহার।"

পলাশির যুদ্ধে এরূপ কবিতা এবং এইরূপ ললিত পদাবলীর অভাব নাই। যেন লেখনী অবিরত মুক্তাফল প্রসব করিয়াছে। যখন বাল্মীকি কবিতা লিখিয়াছিলেন,

তখন তাঁহাকে পরকীয় পদানুসরণ করিতে হয় নাই ; যখন হোমর বীররসে মত্ত হইয়া বজ্রগম্ভীরস্বরে সেই এক গীত গাইয়াছিলেন, তখন তাঁহাকে আর কাহারও কণ্ঠানুকরণ করিতে হয় নাই। কিন্তু নূতন কবিদিগের সে সৌভাগ্য সম্ভবে না। তাঁহারা প্রকৃতির নিকট যত না শিখিয়া থাকেন পূর্ব্বতন কবি-সম্প্রদায়ের নিকট তাহা অপেক্ষা অধিক শিখেন। সুতরাং তাঁহারা অনুকারী। নবীনবাবুও অনুকরণের অপবাদ হইতে নির্ম্মুক্ত নহেন। সিরাজদ্দৌলার বিকট স্বপ্ন-দর্শনে সেক্সপীয়রের তৃতীয় রিচার্ড নামক নাটকের স্বপ্ন-দর্শন স্পষ্ট প্রতিভাত রহিয়াছে ; চাইল্ডে হেরল্ডের তৃতীয় কাণ্ডস্থ কতিপয় কবিতায় নৃত্য-গীতের যাদৃক্ বর্ণনা আছে, পলাশির যুদ্ধে কোন কোন কবিতায় তাহার ছায়া পড়িয়াছে, এবং বায়রণ ও স্কটকে আরও অনেক স্থলে অনুকরণ করা হইয়াছে। ইহাকে আমরা দোষ বলি না। কারণ, এ দোষে সকলেই সমান দোষী। দোষ অথবা অপূর্ণতার কথা বলিতে হইলে পলাশির যুদ্ধের বিশেষ দোষ কিংবা অপূর্ণতা এই যে, ইহাতে মনুষ্য-চরিত্রের বিশদ চিত্র নাই। ইহার পাঠাবসানে মনে কতকগুলি অত্যুৎকৃষ্ট ভাব এবং অত্যুৎকৃষ্ট বর্ণনা দৃঢ়-নিবদ্ধ থাকে, কিন্তু উৎকৃষ্ট কি অপকৃষ্ট কোন একটি চরিত্র তেমন চিত্রিত থাকে না।

নবীনবাবু প্রতিভা-সম্পন্ন ব্যক্তি। আমরা ভরসা করি, তিনি ভবিষ্যতে আমাদিগের এই ক্ষোভ দূর করিবেন। বঙ্গভাষা স্বদেশহিতৈষী সহৃদয় বঙ্গবাসীর প্রাণ-স্বরূপ। সেই বঙ্গভাষা যাঁহা কর্ত্তৃক অলঙ্কৃত হইল, তাঁহাকে অবশ্য আমরা ভালবাসিব। এবং যাঁহাকে ভালবাসিব তাঁহার নিকট কেন না আশা করিব?

[বান্ধব—১২৮২]

প্রাচীন কবি ও আধুনিক কবি

তাড়িত-সংযোগে মৃত ব্যক্তিও যেমন দৃশ্যতঃ চেতনা প্রাপ্ত হয়, আমাদের আধুনিক কবিতাসকলও সেইরূপ দৃশ্যতঃ কবিতা বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু তাহা হইতে যদি বিদেশীয় কবিতার তাড়িত-প্রভাব নির্ব্বাসিত করা যায় ত দেখিতে পাইবে যে, সে-সকল কবিতা প্রকৃত প্রস্তাবে হীনশক্তি নির্জীব সামগ্রী মাত্র। প্রকৃত হৃদয়-উচ্ছ্বাসের যে একটি দুর্দ্দমনীয় অমোঘ শক্তি আছে, তাহা আধুনিক বঙ্গীয় কবিতাতে প্রায়ই দৃষ্টিগোচর হয় না। আর, তাহা কেমন করিয়াই বা হইবে? আধুনিক বঙ্গীয় কবির অন্তর-দৃষ্টি যে একেবারেই নাই, তাহা শত-সহস্র উদাহরণ-দ্বারা প্রমাণ করা যাইতে পারে।

যখন দেখিতে পাই যে, আধুনিক একজন 'মহাকবি' নরক-বর্ণনা করিতে গিয়া Dante ও Virgil-এর ক্রীতদাস-স্বরূপে তাঁহাদের অনুগামী হইয়াছেন, যখন দেখি প্রখ্যাত কবিগণ বীররসে দেশ মাতাইতে গিয়া সংজ্ঞাহীন উন্মত্ত প্রলাপে নিজে মাতিয়া উঠেন, যখন দেখি একজন কৃতবিদ্য পয়ার-রচয়িতা আদিরসের অবতারণাতে Byron প্রভৃতির সর্ব্বনাশ-সাধন করিয়া থাকেন, যখন দেখিতে পাই যে এই সকল "অদ্বিতীয় মহাকবির" অনুগামী নিকৃষ্টতর কবিরা ভাঙ্গা বা কচি-কণ্ঠে সেই একই সুর নানা প্রকারে ভাঁজিয়া ব্যাস-বাল্মীকির মস্তক মুণ্ডন করিতেছে,—তখন ধৃতরাষ্ট্রের মত আমাদিগকেও বলিতে হয় যে, "যখন এই সকল দেখিলাম ও শুনিলাম, তখন এ দেশের কবিতার জয়ের আশা আর করি না!" যদি এমন দেখিতাম যে, বঙ্গ-কবিতা-কাননে নানাপ্রকার দেশীয় বন-ফুলগাছের মাঝে মাঝে বিদেশীয় ফুলগাছের কলমের চারাসকল রোপিত হইয়াছে, তাহা হইলেও আমরা বিশেষ ক্ষতি বোধ করিতাম না; কিন্তু এখন দেখিতেছি যে, সেই সকল কলমের চারাই মহাতেজস্বী হইয়া বন-ফুল-দলকে একেবারে নিহত করিয়াছে। বাস্তবিক দেখিতে পাই যে, আধুনিক কবিতাতে আমাদের প্রকৃতিগত অনেকগুলি মনোভাব আর স্থান পায় না,—এখনকার বিলাতী আবহাওয়ার প্রভাবে সে বন-ফুলগুলি আর ফুটে না।

যে কেহ ঈষৎ-মাত্র যত্নের সহিত অবিকৃত বঙ্গীয় হৃদয় ও প্রকৃত দেশজ কবিতা দেখিয়াছেন, তিনিই বলিবেন যে, অবিকৃত বঙ্গীয় হৃদয়ে অভিমানের ভাব অতি প্রবল, প্রকৃত দেশজ কবিতাতে অভিমানের সঙ্গীতই জাজ্বল্যমান। সমগ্র ইংরাজি সাহিত্যে অভিমানে গদ্গদ একটিমাত্রও হৃদয়-উচ্ছ্বাস নাই,—এমন কি, ইংরাজি ভাষাতে অভিমানের একটিও প্রতিশব্দ নাই। ইংরাজি কবিতাতে নবপ্রেমের ঊষারাগ আছে, সুতরাং আধুনিক বঙ্গীয় কবিতাতে তাহা প্রচুর পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়; ইংরাজি কবিতাতে প্রেমের জ্বলন্ত মধ্যাহ্ন-তীব্রতার অনল-উচ্ছ্বাস আছে, বঙ্গীয় কবি তাহাকে জ্বলন্ততর করিয়া, পৃথিবীকে জ্বালাইয়া, স্বর্গ-মর্ত্ত-রসাতল করিয়া, প্রলয়ের সর্ব্বনাশী ঝটিকাকে আহ্বান করিয়াও নিরস্ত হইতে চাহেন না; আবার, ইংরাজি কবিতাতে প্রেমের নিরাশা-রূপ অমা-শর্ব্বরীর ঘোরতমসাচ্ছন্ন বিভীষিকার অবতারণা আছে, সুতরাং আধুনিক বঙ্গীয় কবিতাতেও ঘোরতর নিবিড়তর অমা-শর্ব্বরী আমরা সচরাচর দেখিতে পাই;—কিন্তু আমরা এইমাত্র জিজ্ঞাসা করিতে চাহি যে, অভিমানের গোধূলি আমরা আধুনিক কবিতায় কোথায় দেখিতে পাই? সেই যে সেই অভিমান, যে অভিমান প্রেমের কোন ধার ধারিতে চাহিতেছে না, অথচ সকল ধার শোধিতে হৃদয়ের নিভৃত কক্ষে প্রাণপণে যত্ন করিতেছে, যে অভিমান প্রকাশ্যরূপে স্ফূর্ত্তি পাইতে প্রয়াস পাইয়াও অকাতরে—নীরবে—প্রাণের ভিতর প্রাণ ঢাকিয়াও চক্ষুর জল সংবরণ করিতে প্রাণ দিয়াও যত্ন করিতেছে,—যে অভিমান লীলাময় মানের অবরোধ কাটিয়া ও হৃদয়ভেদী নিরাশার আশার মধ্যেও থাকিয়া এ-কূল ও-কূল দুকূল দেখিয়া মর্ম্মের অতলস্পর্শে লুকাইতে চেষ্টা করিতেছে,—সেই প্রকৃত

ভালবাসার জ্বলন্ত অভিমান আধুনিক কবিতায় কোথায়?—সে অভিমান ইংরাজি কবিতাতে নাই, সে অভিমান ইংরাজি প্রকৃতিতে নাই। সেই জন্যই তাহা আধুনিক বঙ্গীয় কবিতাতেও নাই। অভিমানে যে-একটি পরাধীনতা—যে-একটি প্রাণ-ঢালা নির্ভরের ভাব আছে, তাহার সহিত ইংরাজি হৃদয়ের স্বাভাবিক স্বতন্ত্র ভাবের কখনই ঐক্য হইতে পারে না। বঙ্গীয় হৃদয় ভালবাসার সমুদ্রে প্রাণ-মন-হৃদয়—সর্ব্বস্ব অকাতরে বিসর্জন দেয়, কিন্তু ইংরাজি-হৃদয় ভালবাসার সমুদ্রে আত্ম-বিসর্জন করিয়াও নিজের নিজত্ব কখনই ভুলিতে পারে না। ভালবাসার স্থলে বঙ্গীয় হৃদয় এই বলিবে যে, "হে হৃদয়সর্ব্বস্ব! আমি তোমারই—তোমাতেই আমার জীবন, তোমাতেই আমার মৃত্যু,—তোমা ছাড়া আমার আমিত্বই নাই।"—কিন্তু ইংরাজি হৃদয় বলিবে যে, "হে হৃদয়সর্ব্বস্ব! তোমাকে আমি প্রাণের সহিত ভালবাসি, তোমাকে নহিলে আমি সুখী হইতে পারি না।" গভীর প্রেমেতেও ইংরাজি হৃদয় কখনই নিজের স্বাতন্ত্র্য, স্বাধীন নিজত্ব একেবারে বিসর্জন করে না। প্রেমের অপমানে—প্রেমের নির্ম্মম তাচ্ছিল্যে একটি ইংরাজি হৃদয় উগ্রভাবে ইহাই বলিবে যে,

'I wish you were dead, my dear;
I would give you, had I to give
Some death too bitter to fear:
It is better to die than live.
I wish you were stricken of thunder,
And burnt with a bright flame through,
Consumed and cloven in sunder,
I dead at your feet like you."

ইহাতে জ্বলন্ত ভালবাসার কিছু অভাব নাই,—নহিলে শেষ পঙ্‌ক্তিতে সে-ও মরিতে চাহিবে কেন?—কিন্তু সে জ্বলন্ত ভালবাসা-সত্ত্বেও ইংরাজি হৃদয় নিজের নিজত্ব, নিজের স্বাতন্ত্র্য ভুলিতে পারে নাই। এরূপ স্থলে একটি অবিকৃত বঙ্গীয় হৃদয় এই বলিয়া কাঁদিবে,—

"দৈবযোগে যদি প্রাণনাথ! হ'ল এ পথে আগমন,
কও কথা, একবার কও কথা, তোলো ও বিধুবদন!
প্রণয় ভেঙ্গেছে ভেঙ্গেছে তায় লজ্জা কি?
এমন ত প্রেম ভাঙ্গাভাঙ্গি অনেকের দেখি!
আমার কপালে নাই সুখ—
বিধাতা হ'ল বিমুখ,
আমি সাগর সেঁচেও সখা, মাণিক পেলাম না!
দাঁড়াও—দাঁড়াও প্রাণনাথ! বদন ঢেকে যেও না!

তোমায় ভালবাসি—তাই
চোখের দেখা দেখ্‌তে চাই,
কিছু থাক' থাক' বোলে ধোরে রাখ্‌ব না—
শুধু দেখা দিলে তোমার মান যাবে না।
তুমি যাতে ভাল থাক', সেই ভাল,
গেল গেল বিচ্ছেদে প্রাণ আমারই গেল।
তোমার পরের প্রতি নির্ভর,
আমি ত ভাবি না পর—
তুমি চক্ষু মুদে আমায় দুঃখ দিও না।"

মর্ম্মভেদী প্রেমের অপমানেও এরূপ অসীম উদারতা—প্রোজ্জ্বল ভালবাসা-সত্ত্বেও এরূপ সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসিনীর বৈরাগ্য—বৈরাগ্যে এরূপ অনুরাগ—অনুরাগে এরূপ বৈরাগ্য—এমন কে কোথায় আর দেখিয়াছেন? ইংরাজি সাহিত্যে ত কখনই দেখিতে পাইবেন না। এরূপ প্রেমের অপমান-স্থলে একটি ইংরাজি হৃদয় প্রকৃত কবি Tennyson-এর মুখ দিয়া এই বলিবে,—

" Better thou and I were lying, hidden
from the heart's disgrace,
Rolled in one another's arms, and
silent in a last embrace.
* * * *
Am I mad, that I should cherish that
which bears but bitter fruit,
I will pluck it from my bosom, though
my heart be at the root ?"

ইহাই প্রকৃত ইংরাজি হৃদয়—ইহাই প্রকৃত ইংরাজি প্রতিজ্ঞা। ইহার যে একটি বিশেষ সৌন্দর্য্য আছে, তাহা আমরা অস্বীকার করি না; কিন্তু ইহাও আমরা স্বীকার করি না যে, উহা আমাদের দেশজ হৃদয়ের উচ্ছ্বাস হইতে পারে। ইংলণ্ডের lily পুষ্প ইংলণ্ডেরই পুষ্প, তাহা প্রচণ্ড উত্তর-বাতাসেও অক্ষুণ্ণ থাকিতে পারে, কিন্তু বঙ্গীয় হৃদয় যে নিতান্তই কামিনীকুসুম-সদৃশ, মৃদুল দক্ষিণ-বাতাসেও তাহার পাপ্‌ড়ী ঝরিয়া পড়ে—কি করিব? প্রকৃত কবি ত কামিনীকুসুমকে কামিনীকুসুম-রূপেই বর্ণনা করিবেন। কিন্তু ও রূপ বর্ণনার কথা দূরে থাক, আজকাল দু'একখানি মাত্র কাব্য ব্যতীত অভিমানের কবিতা ত কোথাও দেখিতে পাই না। কিন্তু যে-কেহ বঙ্গীয় হৃদয় সামান্য যত্নের সহিতও দেখিয়াছেন, তিনিই বলিবেন যে, তাহা বীররসে তেজস্বী নহে, মহান্ ভাবে প্রশস্ত নহে—তাহা করুণরসে মগ্ন, তাহা ভালবাসাতেই উথলিত, এবং অভিমানই সেই ভালবাসার সফেনতরঙ্গ-ভঙ্গ। কি বাল্যকালে পিতামাতা-সম্পর্কে, কি যৌবনে প্রণয়-সম্পর্কে, কি প্রৌঢ়ে বা বার্দ্ধক্যে দেবতা-সম্পর্কে—আমাদের অভিমানের ভাবই বিশেষ প্রবল, অভিমানই আমাদের হৃদয়ের একটি বিশেষত্ব।

সংবৎসর পরে যখন পার্ব্বতী কৈলাসপুরী অন্ধকার করিয়া পাষাণ মা-বাপের ঘরে আসিলেন, তখন মহাদেবের জন্য তাঁহার আর দুঃখ নাই,—মা-বাপকে পাইয়া তাঁহার হৃদয়ের দিগন্তব্যাপী উল্লাস নাই,—তিনি অভিমানেই গদ্‌গদ—অভিমানেই উন্মত্ত। একজন দেশজ কবি এরূপ স্থলে আমাদের নববিবাহিত বালিকা-হৃদয় কতদূর বুঝিয়াছিলেন, তাহা এই সঙ্গীতটিতেই বুঝিতে পারিবেন,—

"পুরবাসী বলে, 'উমার মা, তোর হারা-তারা এল ওই।'
শুনে পাগলিনীর প্রায়, অমনি রাণী ধায়,
'কই উমা।' বলি, 'কই।'
কেঁদে রাণী বলে, 'আমার উমা এলে;
একবার আয় মা, একবার আয় মা,
একবার আয় মা, করি কোলে।'
অমনি দু'বাহু পসারি মায়ের গলা ধরি,
অভিমানে কাঁদি, রাণীরে বলে—
'কই, মেযে ব'লে আন্তে গিয়েছিলে?
তোমার পাষাণ প্রাণ, আমার পিতাও পাষাণ
জেনে' এলাম আপনা হ'তে, গেলেনাক' নিতে,
রব না, যাব দু'দিন গেলে।'"

এই সমস্ত সঙ্গীতটিতে আমরা যে এক মনোহর ছবি দেখিতে পাইতেছি, সেরূপ মনোহর একখানিও ছবি কি আধুনিক কবিতাতে কোথাও দেখিতে পাওয়া যায়? সেই নববিবাহিতা নব বালিকা যে কেমন করিয়া আজ বৎসরেকের পরে অভিমান-ভরে মায়ের কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িল—সেই গৌরকান্তি মুখমণ্ডল কেমন আরক্তিম হইয়া উঠিয়াছে—সেই দরবিগলিত সুদীর্ঘ অর্দ্ধ-মুদ্রিত নয়ন দু'টি, পাছে মায়ের সঙ্গে চোখে চোখে দেখা হয়, এই ভয়েই যেন নতপল্লব—সেই এক একটি কথার পরে এক একটি মর্ম্মভেদী দীর্ঘশ্বাস! আবার ও দিকে মেনকারাণী লজ্জায় ও কষ্টে কোন কথাই কহিতে পারিতেছেন না, অথচ প্রাণের দুহিতাকে কোলে পাইয়া আনন্দে তাঁহার হৃদয় উথলিয়া উঠিতেছে; দুহিতার প্রত্যেক কথায় ও দীর্ঘনিঃশ্বাসে আরও আরও তাহাকে বক্ষে টানিয়া লইতেছেন; মায়ের চোখের জলে ও মেয়ের চোখের জলে গঙ্গার মত আর একটি পবিত্র নদী যেন হিমালয় বাহিয়া প্রবাহিত হইতেছে—আবার দু'জনেই মুগ্ধ—দু'জনেই নিস্তব্ধ! অনেকক্ষণ পরে মেনকারাণীও অভিমানের উত্তরে অভিমান করিয়া বলিতেছেন,—

"সুধাই তাই ও গো ঈশানি!
যার উমা জগতের মা,
তার কি মা এমন হয়?
হ্যাঁগো প্রাণের তারা,
সেও কি উমা-হারা রয়?

মা, তোর শ্রীমুখ না হেরে, যে দুঃখ অন্তরে,
ছিলাম মণিহীনা ফণী দিবা-যামিনী।
ভাল, মা গো, মা তোর যেন পাষাণী,
তুই ত জগৎ-জননী,
ভাল, তা বোলে মা, একবার মায়ে তোমার
মনে কর কৈ গো তারিণি?
কৈলাস-শিখরে শঙ্করের ঘরে
গিয়ে মা, ভুলে থাক মায়,
মা বোলে করিস না মা, মনেতে,—
এ দুঃখ বলি গো মা, কায়?
বালিকা-দুহিতায় না হেরে মা, নয়নে,
গেছে অশ্রুজলে দিন, ও মা হর-অঙ্গনে!
আমি একে মা, অবলা, তাতে গো অচলা,
শক্তিহীন শক্তি-তত্ত্বে, ঈশানি।"

এই ভুবনমোহিনী প্রতিমা কোন্ আধুনিক কবি দেখাইতে পারেন? এমন সহজ, সরল, হৃদ্‌গত ভাব লইয়া কোন্ কবি অনন্ত-তুষাররাশির উপরে শারদ-জ্যোৎস্না ফুটাইতে পারেন? তবুও স্বীকার করিতে হয় যে, মাতা ও দুহিতার সম্পর্কে অভিমান ততটা তীব্র হইতে পারে না; কেন-না, উভয়েরই উভয়ের ভালবাসার উপর সহজ বিশ্বাস আছে—উভয়েই মনে মনে কতকটা জানেন যে, কেহই কাহারও পরিত্যাজ্য নহে,—এই জন্যই ইহা বিশেষ দ্রষ্টব্য। বুঝিতে হইবে যে, এরূপ মর্ম্মগত বিশ্বাসের স্থলেও বঙ্গীয় হৃদয়ে অভিমান উথলিয়া উঠে; কারণ, আমাদের কোমল প্রাণে ভালবাসার সকল অবস্থাই—কি স্নেহ, কি প্রেম, কি প্রণয়—ভালবাসার সকল অবস্থাতেই অভিমান প্রধান। প্রকৃত প্রস্তাবে প্রেমই অভিমানের অরাজকতার রাজ্য; কারণ, প্রেমেতে ভালবাসার উপর মর্ম্মগত বিশ্বাস লইয়াই টানাটানি। একেবারে বিশ্বাস না থাকিলে ত নিরাশা-শ্মশানে আসিয়া পড়িতে হয়, আবার মনের দৃঢ় অথচ অপ্রকাশিত বিশ্বাস থাকিলে অভিমান লীলাময় "মানেতে" অবনত হইয়া পড়ে। (কিন্তু যেখানে ঐ মনের বিশ্বাস থাকিয়া যেন নাই, আবার না থাকিয়াও যেন আছে—সেখানে আলোকের সঙ্গে অন্ধকারের দেখা হইয়াও হইতেছে না, মিশিয়াও মিশিতেছে না,—হৃদয়ের সেই সায়ং গোধূলির অবস্থাটিই অভিমানের অবস্থা।) এরূপ অবস্থায় কোন কথাই প্রায় কহা যায় না, এক একটি কথা প্রত্যেক পঞ্জরে আটক খাইয়া কণ্ঠ হইতে সাবধানে, অতি সন্তপণে, অতি ভয়ে ভয়ে, ভাঙ্গা-ভাঙ্গা স্বরে বাহির হয়। কিন্তু যদি ঐ চঞ্চল বিশ্বাসে একটুও দাঁড়াইবার স্থল হয়, তখন অভিমান কতকটা মুখর হইয়া পড়ে, অতি ধীরে ধীরে—অতি প্রশান্তভাবেও কতকটা যেন মুখর হইয়া পড়ে। নেত্রদ্বয় ভিতরে ভিতরে অশ্রুতে আকুল, ধরানিবিষ্ট,—কিন্তু দৃশ্যতঃ চক্ষে জল নাই, রসনায় জড়তা নাই,—

অভিমান বরং ঈষৎ ভ্রূকুটি করিয়া এইরূপে চাপা-কান্না কাঁদিতে গিয়াও দিবালোকে বিদ্যুতের ম্লান হাসি হাসিয়া বলিতে থাকে,—

"নূতন যারা, তোমার তারা নয়নের তারা,
একি স্থূলে ভুল,
যেন আঁখির শূল,
কেন তায় আদর করা ?
কোথায় শিখ্‌লে নাথ! এমন মন-রাখা ?
বুঝতে নারি ভাব, এ কি ভাব, তোমার আজ সখা!
ত্যাজ্য ধনের বাড়ায়ে সম্মান—
কেন কর পূজ্য ধনের অপমান ?
ছিঃ ছিঃ নাথ! বলো না 'প্রাণ,'
ইথে হাসবে লোকে, আমার পাকে,
শেষে কি হবে অপমান!
যারে প্রাণ সঁপেছ, সেই এখন প্রাণ!
আমায় বোলে 'প্রাণ'—প্রাণ জুড়াবে না,
শুনলে সে আবার, পাবে নাথ, প্রাণে যাতনা।
আমায় কোরে অন্তরের অন্তর, অন্যে অন্তরে দিয়েছ স্থান।
যথায় তব নব ভাব, তারে 'প্রাণ' বলো গে—হবে তার সুখ,
আমায় কেন বোলে 'প্রাণ' বাড়াও দ্বিগুণ দুখ ?
ভেবেছিলাম প্রাণনাথ! গিয়েছে সে দিন,
এখন হলাম 'প্রাণ'—কেবল কথার 'প্রাণ,' কিন্তু কর্ম্মে ফলহীন।
তোমার বিচ্ছেদ হে আমার গলার হার,
করব অনাদর কি দোষে বল হে তাহার!
চোখের দেখা মুখের আলাপন,
এখন তাই লক্ষ লাভ জ্ঞান!"

এই প্রেমের কথা ছাড়িয়া দিয়া ইষ্ট-দেবতার সম্পর্কে যে এক প্রকার অভিমান আছে, তাহা বঙ্গীয় হৃদয় ব্যতীত আর কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। ইষ্ট-দেবতা বা ঈশ্বরের উপরে আবার অভিমান—এ কথা শুনিলেই অনেকে চমকিয়া উঠিবেন, হয়ত অনেকে তাহা "পাষণ্ড-নাস্তিকের" প্রলাপ মনে করিয়া শুনিতে চাহিবেন না। যে দেশে বা যে ধর্ম্মে ইষ্ট-দেবতা বা ঈশ্বরকে "মা" বলিয়া ডাকিতে জানে না, সে দেশের বা সে ধর্ম্মের লোক ত এরূপ অভিমানের মর্ম্মই বুঝিতে পারিবে না; কারণ, "পিতা" বলিতেই যে ভাবটি আমাদের মনে আসে, তাহার সহিত ভক্তির সম্পর্কই অধিক। কিন্তু মাতা ? "মা"—ঐ একটি অক্ষরের শব্দের ভিতরে কি অপার, অগাধ, অতলস্পর্শ স্নেহের প্রকৃত মহাকাব্য অবরুদ্ধ রহিয়াছে। তিনি আমাদের ভক্তির বিষয়, কি ভালবাসার বিষয়, ভয়ের বিষয়, কি আব্‌দারের বিষয়,

তাহা আমরা জানি না, জানিতে চাহিও না ;—তিনি আমাদের মা, তাঁহার সুকোমল পক্ষচ্ছায়ায় আমরা দিন-দিন প্রতিপালিত, দিন-দিন বর্দ্ধিত—দিন-দিন উল্লসিত। তিনি ভিন্ন ব্যক্তি হইলেও আমি তাঁহার দেহের অঙ্গীভূত, তাঁহার হৃদয়ের রুধির, তাঁহার প্রাণের প্রাণ! সুখ হইলে উল্লাসে তাঁহার বক্ষে গিয়া পড়িব, দুঃখেতে তাঁহারই বক্ষে মুখ লুকাইয়া কাঁদিব, অনুরাগে তাঁহার কোলে মাথা রাখিব,—আবার রাগে তাঁহারই উপর উপদ্রব করিব। বালক-কালে যখন আমরা মায়ের উপর অভিমান করিয়া ভাত খাইতে চাহিতাম না, তখন ভাত না খাইলে যে আমাদের কষ্ট হইবে, তাহা ত ভাবিতাম না ; কিন্তু আমি ভাত খাইলাম না বলিয়া মায়ের মনে যে আঘাত লাগিবে, সেই আঘাতের উপর লক্ষ্য করিয়াই ত আমরা দূরে দূরে থাকিতে পারিতাম।—যেন মনে মনে বুঝিতাম যে, আমার ক্ষুধার যাতনার অপেক্ষাও মায়ের মর্ম্ম-যাতনা অধিকতর তীব্র হইবে, এবং সেই জ্ঞানেই—সেই অহঙ্কারেই আমরা ভাত ছাড়িয়া উঠিয়া যাইতাম। আজ যদি আমার ইষ্ট-দেবতাকে সেই আমার মা-ভাবে না দেখিতে পারিলাম ত আমার ইষ্ট-দেবতার থাকা আর না-থাকা—আমার ভরসার পক্ষে, সাহসের পক্ষে, উল্লাসের পক্ষে প্রায়ই সমান হইয়া পড়ে। যাঁহারা জগদীশ্বরকে প্রকৃত মা বলিয়া জানেন, যাঁহারা সংসারের অত্যাচারে, বিপদের ঘূর্ণিবাত্যায়, হৃদয়ের শূলবেদনায় অস্থির হইয়া ইহলোকের মা অপেক্ষাও মাতৃতর ঈশ্বরকে মা বলিয়া ডাকিয়া উঠেন, তাঁহাদের মনের সাহস ও ভরসা, উল্লাস ও শান্তি অনিবার্য্য। তবে মায়ের উপর অভিমান হইবে কেন?—তাহারও আবার বিলক্ষণ কারণ আছে।

বিশ্বাস দুই প্রকার—একটি মনের বিশ্বাস, আর একটি মর্ম্মের বিশ্বাস। মা-সম্পর্কে অনেক সময়ে আমাদের মর্ম্মের বিশ্বাস ঠিক থাকিলেও কোন বিশেষ অবস্থাগত ব্যবহারে মনের বিশ্বাস বিচঞ্চল হইয়া পড়ে। যখন নানা প্রকার জ্বালা-যন্ত্রণার মধ্যে পড়িয়া আমরা আপনাদিগকে নিতান্ত নিঃসহায় মনে করি, তখন এই ভাবি যে, আমার অমন "মা" থাকিতে কেনই-বা যন্ত্রণা পাইব ;—অথচ যন্ত্রণা পাইতেছি, কল্পনার যন্ত্রণা নয়,—প্রকৃত কঠোর যন্ত্রণায় ভুগিতেছি ; তখন আমার ইষ্ট-দেবতার স্নেহের উপর কতকটা মনের অবিশ্বাস আসিয়া পড়ে, কিন্তু মর্ম্মের বিশ্বাস একেবারে যায় না, এবং যায় না বলিয়াই আমরা নিতান্ত দুর্ব্বল, নিঃসহায়, আশ্রয়হীন, শিশুর মত এই বলিয়া দারুণ অভিমান-ভরে কাঁদিতে থাকি,—

"'মা'—'মা'—ব'লে আর ডাক্‌ব না।
ও মা, দিয়েছ, দিতেছ কতই যন্ত্রণা।
বারে বারে ডাকি 'মা'—'মা'—বলিয়ে
মা বুঝি আছ গো অচৈতন্য হ'য়ে?
মাতা বর্ত্তমানে এ দুঃখ সন্তানে,—
মা বেঁচে, তার কি ফল বল না?

ছিলাম গৃহবাসী, করিলি সন্ন্যাসী,
আরো কি ক্ষমতা রাখিস সর্ব্বনাশি!
না হয়, দ্বারে দ্বারে যাব,
ভিক্ষা মেগে খাব,
মা ম'লে কি ছেলে বাঁচে না?
ভণে রামপ্রসাদ মায়ের কি এ সূত্র,
'মা' হ'য়ে হলি, মা ছেলেবি শত্রু!
তাই, দিবানিশি ভাবি, আর কি করিবি—
না হয়, বারে বারে দিবি জঠর-যন্ত্রণা।"

এই জ্বলন্ত অভিমানের গীতটি পড়িলেই আমাদের সেই ছেলেবেলার অভিমান-ভরে ভাত না খাওয়ার কথাটি মনে আসিয়া পড়ে। সেই দুর্ব্বল, নিঃসহায় অবস্থা, সেই অনাদরের সুতীব্র অভিমান, সেই মর্ম্ম-বিশ্বাসকে ঢাকিয়া মনের বিশ্বাসের প্রাধান্য, সেই আশা, সেই ভরসা—সেই "মা"-সর্ব্বস্ব ভাব!

এরূপ মোহ-মুগ্ধকর ভাব বা ভাবের আভাসও আধুনিক কবিতাতে কোথায়?

[ভারতী, ১২৮৯]

দশমহাবিদ্যা

সর্ব্বাগ্রে দশমহাবিদ্যার আখ্যায়িকাটির বর্ণনা করা যাউক। একদা মহাদেব সতীশোকে বিলাপ ও রোদন করিতেছেন, এমত সময়ে মহর্ষি নারদ বীণাবাদন করিতে করিতে শিব-সকাশে সমুপস্থিত হইলেন। মহাদেব সতী-বিরহে আত্মবিস্মৃত হইয়া প্রাকৃতজনের ন্যায় বিলাপ করিতেছিলেন, নারদের সুধাসিক্ত সঙ্গীতে তাঁহার চৈতন্য হইল। তিনি আপনাকে ধিক্কার দিতে দিতে বলিলেন,—"বৎস নারদ! আমার বুদ্ধি-বিভ্রম উপস্থিত হইয়াছিল, এজন্য সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-রূপা জগন্ময়ী সতীকে দেখিতে পাই নাই। কিন্তু তোমার সঙ্গীত-শ্রবণে আমি প্রকৃতিস্থ হইয়াছি এবং পুনরায় সতীকে আমার সম্মুখে বিরাজমানা দেখিতেছি।" নারদ এই সংবাদে অত্যন্ত পুলকিত হইয়া বলিল—"প্রভো! আমিও মাতৃরূপা স্নেহময়ী সতীকে দর্শন করিব।" নারদ সতী-দর্শনাশায় হৃষ্টচিত্ত হইয়া বলিলেন,—

"কহ ত্রিপুরারি কোথা গেলে তাঁরি
দরশন পুনঃ লভিব।
সে রাঙা চরণ মনের মতন
সাধনে আবার পূজিব।"

তখন ভক্তবৎসল মহাদেব সতী-প্রদর্শন-দ্বারা নারদের মনস্তুষ্টি-সম্পাদনার্থে স্থষ্টির আচ্ছাদন অপসারিত করিলেন।

অমনি

"মহাদেব মহাবেশ ক্ষণকালে ধরিল।
ভীমরূপ ব্যোমকেশ পরকাশ করিল॥
বিদারিত রসাতল পদযুগে ঠেকিল।
ঘোর ঘটা ভীমজটা আকাশেতে উঠিল॥"

দেখিতে দেখিতে বিশ্বস্থ যাবতীয় বস্তু একে একে মহাদেবের শরীরে প্রবেশ করিল। দেখিতে দেখিতে গিরি, নদী, বৃক্ষ, লতা, সমস্তই একে একে অদৃশ্য হইল। গ্রহ, নক্ষত্র প্রভৃতি সমস্তই তিরোহিত হইল। বিশ্বস্থ সমস্ত বস্তু এইরূপে শিব-দেহে প্রবিষ্ট হইলে, মহাদেব মায়াবলে সম্মুখে এক মহাকাশ স্থজন করিলেন। এই নীলবর্ণ মহাকাশের উপর দেখিতে দেখিতে এক রাশিচক্র স্থাপিত হইল। দেখিতে দেখিতে ঐ রাশিচক্র দশ কক্ষে বিভক্ত হইল। এবং তখন দেখা গেল যে, ঐ রাশিচক্রের কক্ষে কক্ষে সতী ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তিতে বিরাজ করিতেছেন।

নারদ দূর হইতে দেবীর দশমূর্ত্তি দেখিতে লাগিলেন। কিন্তু দূর হইতে দেখাতে তাঁহার তৃপ্তিবোধ হইল না। তিনি বলিলেন,—"দেব! যদি অনুমতি হয়, তাহা হইলে, নিকটে গিয়া এই দশ মূর্ত্তি নিরীক্ষণ করি।" নারদ বলিলেন,—

"কুতূহলে বিকলিত পরাণ উতলা।
দেখিব নিকটে গিয়া অনাদ্যা মঙ্গলা॥"

তখন ভক্তবৎসল মহাদেব কৈলাস পর্ব্বত সহিত নারদকে পূর্ব্বোক্ত রাশিচক্রের কেন্দ্রস্থলে উপস্থিত করাইলেন। বালকস্বভাব নারদ ইহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া বলিলেন,—"আমি আরও নিকটে যাইয়া দেখিব।"—মহাদেব এবার নারদের কুতূহল চরিতার্থ করিলেন না। তিনি বলিলেন,—"আমি তোমাকে দিব্য চক্ষু দিতেছি, তুমি এখান হইতেই সমস্ত দেখিতে পাইবে।" তখন নারদ রাশিচক্রের কেন্দ্রস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া, দশ কক্ষে দশ মহাবিদ্যার লীলা প্রত্যক্ষ করিতে লাগিলেন। কালী, তারা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, ধূমাবতী, বগলা, ছিন্নমস্তা, মাতঙ্গী, ভৈরবী, কমলা প্রভৃতি দশ প্রকার দশ মহাবিদ্যার দশ লীলা দেখিয়া নারদ আনন্দে বিভোর হইয়া পুনরায় বীণাবাদন আরম্ভ করিলেন। মহাদেবও সেই গীত শ্রবণ করিয়া আনন্দে বিমোহিত হইলেন। দেখিতে দেখিতে তাঁহার শরীর পুনরপি বৃহদাকার ধারণ করিল। দেখিতে দেখিতে তাঁহার শরীর হইতে বিশ্বস্থ যাবতীয় বস্তু পুনরায় বিশ্বে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। দেখিতে দেখিতে বিশ্বচক্রস্থ দেবীর দশটি মূর্ত্তি একত্র হইয়া গৌরী-রূপ ধারণ করিল। তখন হরগৌরী একাঙ্গ হইয়া, কৈলাসে প্রত্যাবর্ত্তন করতঃ পরম সুখে বাস করিতে লাগিলেন।—৫৪ পৃষ্ঠার একখানি ক্ষুদ্র পুস্তকে এতগুলি বর্ণনাবহুল ঘটনার সমাবেশ হেমবাবুর অসাধারণ লিপিকুশলতার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

কিন্তু পূর্ব্বোক্ত আখ্যায়িকা পাঠ করিয়া আমরা কি শিক্ষা লাভ করিব? এই উপাখ্যান-দ্বারা আমাদের জ্ঞান, নীতি, বা সুখ কিছুমাত্র উন্নত হইবে কিনা? কেহ হয়ত বলিবেন, কবিতা হইতে এরূপ লাভের প্রত্যাশা করা বিড়ম্বনা। কবিতা কবি-হৃদয়ের ভাবোদ্‌গার, ইহাতে লাভালাভ-বিবেচনা করা অবিধেয়। বৃক্ষে পুষ্প প্রস্ফুটিত হয়, আকাশে চন্দ্র উদিত হয়, দেখিয়া সুখী হই, এই পর্য্যন্ত; ইহাতে আবার লাভালাভ-বিবেচনা করিব কি? কিন্তু লাভালাভ বিবেচনা করি বা না করি, লাভালাভ সর্ব্বদাই সর্ব্ব কার্য্যে সঙ্ঘটিত হইতেছে। যিনি বিবেচক, তিনি কতটুকু লাভ, কতটুকু অলাভ, পরিমাণ করিয়া নির্দ্ধারিত করেন। আর যিনি স্থূলদর্শী, তিনি লাভালাভের পরিমাণ-নির্দ্ধারণে অক্ষম। ফলতঃ অন্য অন্য বিষয়ে লাভালাভের প্রশ্ন উত্থাপন করা যেমন যুক্তিসঙ্গত, কবিতাতেও সেইরূপ প্রশ্ন উত্থাপিত করা তেমনই বিজ্ঞান-সম্মত। লাভা-লাভ-বিবেচনায় কবিতাকে প্রধানতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে; যথা—অধম, মধ্যম ও উত্তম। যে কবিতায় মনুষ্য-সমাজের জ্ঞান, নীতি বা সুখ ব্যাহত হয়, তাহাকে অধম কবিতা বলা যাইতে পারে; যে কবিতায় মনুষ্যের জ্ঞান, নীতি বা সুখ, এ তিনের একটিরও কিছুমাত্র হ্রাস-বৃদ্ধি না হয়, তাহাকে মধ্যম কবিতা বলা যাইতে পারে। আর যে কবিতায় মনুষ্যের জ্ঞান, নীতি বা সুখ পরিপুষ্ট, পরিমার্জ্জিত বা পরিবর্দ্ধিত হয়, তাহাকে উত্তম কবিতা এই আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। যদি কবিতার এইরূপ শ্রেণী-বিভাগ করা যায়, তাহা হইলে হেমবাবুর কবিতা কোন্ শ্রেণীভুক্ত হইতে পারে?

হেমবাবু একস্থলে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছেন,—

"সুখ কি জীবিতমানে? কিবা অর্থ নির্ব্বাণে?
কা হ'তে জনমিল জগতের যাতনা?
অশুভ সৃজন কার? নিরমিল বিধাতার
মানস হ'তে কি এ মলিনতা রচনা?"

এই প্রশ্নই অন্য এক স্থলে স্বতন্ত্র ভাষায় জিজ্ঞাসিত হইতেছে,—

"উৎকট ইহ লীলা, তাঁহারে কি সম্ভবে?
সতী কি অশিব, শিব! আছিলেন এ ভবে?
জীব-দুঃখ তবে কি গো অনাদ্যাবি বচনা?
অদম্য তবে কি, দেব, পরাধীব যাতনা?
জগৎ-সৃজন-লীলা দুঃখ দিতে প্রাণীনে?
না জানি কি ধর্ম্ম তবে ধর দেবশরীরে!"

"অশুভ-সৃজন কার?" তুমি আমি সকলেই, কেহ বা ক্রুদ্ধ ও বিরক্ত হইয়া, কেহ বা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে, আপনাকে আপনি মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছি। উদ্যমশীল সাহসী যুবক সংসারের কুটিলস্রোতে এক একটি

সৎপ্রবৃত্তি, এক একটি সদাশা বিসর্জন দেয়, আর কাঁদিতে কাঁদিতে জিজ্ঞাসা করে,—"অশুভ সৃজন কার ?" সদনুষ্ঠায়ী সদনুষ্ঠানের চারিদিকে সহস্র সহস্র বিঘ্ন-বিপত্তি দেখিয়া হতাশ্বাস হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে জিজ্ঞাসা করে,—"অশুভ সৃজন কার ?" ধার্ম্মিক সহস্র সহস্র চেষ্টাতেও ইন্দ্রিয় দমন করিতে না পারিয়া উর্দ্ধে হস্তোত্তোলন করতঃ কাঁদিয়া কাঁদিয়া জিজ্ঞাসা করে,—"অশুভ সৃজন কার ?" বিধবা মাতা প্রাণপ্রিয় পুত্রের মৃত্যুতে অধীরা হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে জিজ্ঞাসা করে,—"অশুভ সৃজন কার ?" আর যিনি জ্ঞানী, তিনিও পর-দুঃখে বিগলিত-চিত্ত হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে জিজ্ঞাসা করেন,—"অশুভ সৃজন কার ?"

আমরা সকলে যে শুদ্ধ আপনাকে আপনি এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছি, তাহা নহে। আমরা সকলেই এই প্রশ্নের একরূপ না একরূপ উত্তরও দিতেছি। কেহ বলিতেছি,—"অশুভ সংসার-নিয়ম।" কেহ বলিতেছি,—"অশুভ ঈশ্বর-লীলা।" কেহ বলিতেছি,—"অশুভ শয়তানের বা আহ্রিমানের দুষ্টতার ফল।" কেহ বলিতেছি,—"অশুভ গ্রহবৈগুণ্য হইতে উৎপন্ন হয়।" দেখা যাউক, "দশমহাবিদ্যা" এ প্রশ্নের কি উত্তর দেয়।

কবি বলিতেছেন,—

"না হও নিরাশ, অবে ভক্তিমান,
ভূতেশ কহেন নারদে।
দুঃখেরি কারণ, নহে জীবলীলা
মোচন আছে রে আপদে।
* * * *
পূর্ণ সুখ ইহ জগত-ভাণ্ডারে
দেখিতে পাবিবে পশ্চাতে ॥
অচেচ্ছদ্য বন্ধনে বাঁধা দশপুরী,
ক্রমে জীব পূর্ণ কামনা।
শোক দুঃখ তাপ, সকলি দমন,
এমনি বিধানে যোজনা ॥
পর পব পর এ দশ জগতে
জীবেব উন্নতি কেবলি।
অনন্ত অসীম কাল আছে আগে,
অনন্ত জীবিতমণ্ডলী ॥"

অর্থাৎ—"এই দুঃখরাশি অনন্ত সমুদ্রের ন্যায় চারিদিকে বিস্তারিত রহিয়াছে, দেখিতেছ ; এ অশুভ চিরদিন থাকিবে না। এক একটি করিয়া বিবর্ত্তের (Evolution) স্বাভাবিক নিয়মে এই অশুভমালার নিরাকরণ হইতে থাকিবে। শোক, দুঃখ, তাপ প্রভৃতি নানাবিধ মনঃপীড়া এক একটি করিয়া সংসার হইতে বিদায়

লইবে। এবং সর্ব্বশেষে এই দুঃখময় জগতেই মনুষ্য 'পূর্ণ সুখ' দেখিতে পারিবে।" যে কবি আশার এই মোহনস্বরে পাঠকদিগকে বিমোহিত করেন, তিনি আমাদের বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র। আর আমাদের মধ্যে যাঁহারা শোক-পীড়িত, দুঃখাহত বা তাপদিগ্ধ, তাঁহারাও এই সান্ত্বনাময় কাব্যের গ্রন্থকারকে একান্তচিত্তে আদর করিবেন, সন্দেহ নাই।

কবি যে শুদ্ধ আমাদিগকে সান্ত্বনা দিয়াছেন, তাহা নহে। তিনি আমাদের গন্তব্য পথেরও নির্দ্ধারণ করিয়াছেন।

কবি বলিতেছেন,—

"লক্ষ্য করি তারি
(চরম শুভের) পথ, চালা নিজ মনোরথ,
জীব-জন্মে ভয় কিরে ? জগদম্বা জননী।"

অর্থাৎ "মা ভৈঃ! মা ভৈঃ! আকাশে বিদ্যুৎ ক্রূর হাস্য করিতেছে; করুক, ভীত হইও না। শরীরে অগণিত বৃষ্টিধারা নিপতিত হইতেছে; হউক, তাহাতেও বিচলিত হইও না। যাহাদিগকে লইয়া তোমার সংসার-বিপণি সাজাইয়াছিলে— তাহারা কোথায় গেল, আর ফিরিল না; হউক, তাহাতেও বিষণ্ণ হইও না। সেই চরম শুভের পথ লক্ষ্য করিয়া অগ্রসর হও! জগদম্বা এক্ষণে তোমাকে বিবিধ তাড়না দিতেছেন; দিউন, তাহার জন্য বিলাপ করিও না। কারণ, ইহা নিশ্চিত জানিও —জগন্ময়ী জগন্মাতা অনতিবিলম্বে তোমাকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইয়া তোমার সর্ব্ব দুঃখ-হরণ করিবেন।" যে ব্যক্তি সর্ব্বপ্রকার দুঃখে শোকে এই জপমালা স্মরণ করিতে পারিবে, দুঃখ-শোকে তাহার কিছুই কষ্ট হইবে না। কবিও একস্থলে ইহার আভাস দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন,—

"হেন দশ রূপ দশরূপা দশমহাবিদ্যা
ভবার্ণবে পাবে কূল।"

আমাদের কর্ত্তব্য-সম্বন্ধে কবি আরও একস্থলে বলিয়াছেন,—

"ধরম ধরম পুর, আপন ক্রিয়া কর,
সংযত করি মন তাঁহাদেরি নিয়মে।"

অর্থাৎ "যে যে-কর্ম্মে প্রবৃত্ত আছ, সে সেই কর্ম্ম-অনুসারে আপনার কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ কর। তুমি তোমার কার্য্য কর। জগতের দুঃখরাশি দেখিয়া হতাশ বা নিরাশ্বাস হইও না। সদা 'সত্য পথে রাখি মন' নিজ নিজ কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন কর।"

পূর্ব্বোক্ত সকল কথা একত্র করিলে, হেমবাবুর 'দশমহাবিদ্যা'য় কি শিক্ষা করা যায়? হেমবাবু বলেন,—"মনুষ্য! দুঃখে শোকে অভিভূত হইও না। বর্ত্তমান অশুভ চিরস্থায়ী নহে। ঈশ্বর-কৃপায় এ অশুভ নিরাকৃত হইয়া, ইহারই স্থলে শুভ আসিবে। যাহাতে চরম শুভ জগতে আসিতে পারে, তাহার চেষ্টা কর। বর্ত্তমান সময়ে, সত্য-পথে থাকিয়া আপন আপন কর্ত্তব্য-অনুসারে আপন আপন জীবে নিয়মিত

কর।” ভগবদ্‌গীতা হইতেও এই শিক্ষা লাভ করা যাইতে পারে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন,—

“ সুখদুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ।
ততো যুদ্ধায় যুজ্যস্ব নৈবং পাপমবাপ্স্যসি ॥”

“অর্থাৎ সুখ, দুঃখ, লাভ, অলাভ, জয়, পরাজয় প্রভৃতির বিচার এক্ষণে করিও না। যুদ্ধ এক্ষণে তোমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম। অতএব যুদ্ধ কর। যুদ্ধ করিলে তোমায় প্রত্যবায়গ্রস্ত হইতে হইবে না।” হেমবাবুর শিক্ষা বর্ত্তমান বঙ্গবাসী ও ভারত-বাসীদের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। পরাধীন দেশে মনুষ্যের মন স্বভাবতঃই নৈরাশ্যের অন্ধকূপে ধীরে ধীরে ডুবিতে থাকে। রুদ্ধবেগা নদীর ন্যায় পরাধীন ব্যক্তির হৃদ্‌গত যাবতীয় আশা, হৃদয়েই পর্য্যবসিত হয়। নৈরাশ্যপ্রবণ পরাধীন দেশে যিনি হেমবাবুর ন্যায় আশার সঞ্জীবন-সঙ্গীত শ্রবণ করান, তিনি নীতি ও সুখ উভয়েরই পথ পরিষ্কৃত করেন। এ স্থলে আরও বলা যাইতে পারে যে, যে কবি ভারত-বিলাপ ও ভারত-সঙ্গীত লিখিয়া আমাদের নিরাশ-হৃদয়ে আশার উদ্দীপনা করিয়াছিলেন, সেই কবিই ‘দশমহাবিদ্যা’ লিখিয়া আমাদের নৈরাশ্যের দমন করিতেছেন। সংক্ষেপতঃ লাভালাভ-বিবেচনায় আমরা হেমবাবুর ‘দশমহাবিদ্যা’কে উত্তম শ্রেণীভুক্ত করিতে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত নহি। আমাদের বিশ্বাস যে, ‘দশমহাবিদ্যা’-পাঠে ভারত-বাসীর নীতি ও সুখ উভয়ই পরিপুষ্ট ও পরিবর্দ্ধিত হইবে।

কবি বলিতেছেন,—অশুভ ক্রমে ক্রমে নিরাকৃত হইয়া অশুভস্থলে শুভ আসিবে। কিন্তু এ কথার প্রমাণ কি? প্রমাণ—ইতিহাস। পৃথিবীতে কিরূপে অল্পে অল্পে সভ্যতার বিকাশ হইতেছে, তাহা কবি বিশেষ দক্ষতার সহিত আমাদিগকে দেখাইয়াছেন। কবির বর্ণনা হইতেই স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়, কিরূপে অল্পে অল্পে অশুভ-স্থলে শুভ আনীত হইতেছে। কবি বলিতেছেন, যে সংসার-পটের প্রথম অঙ্কে দেখিতে পাইবে, মনুষ্য মনুষ্যকে আত্মরক্ষার্থ বিনাশ করিতেছে। সে অঙ্কের মূলমন্ত্র—‘সংহার’। সেখানে প্রকৃতিরূপা দেবী নরমুণ্ডমালে বিভূষিত হইয়া অহরহঃ নর-বিনাশ করিতেছেন। সেখানে যাহা কিছু শিব, যাহা কিছু শান্ত, তাহাই পদদলিত হইতেছে। সেখানে প্রকৃতিরূপা দেবী বিভীষণা, রক্তাক্তবদনা, উলঙ্গা, লোহিতনয়না, কৃষ্ণবরণা।

আবার সংসার-পটের দ্বিতীয় অঙ্কে দৃষ্টিপাত কর, দেখিবে, তথায় অশুভ কিঞ্চিৎ নিরাকৃত হইয়াছে। দেখিবে, তথায় সভ্যতার এই প্রথম উন্মেষ হইতেছে। প্রকৃতি-রূপা দেবী সেখানেও ভীমা, নৃমুণ্ডমালিনী, লোলরসনা, অট্টহাসিনী। কিন্তু এ অঙ্কে দেবী উলঙ্গিনী নহেন। তিনি ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরিধান করিয়াছেন। পূর্ব্বের ন্যায় সংসারের চতুর্দ্দিকে এখনও চিতা জ্বলিতেছে। কিন্তু ঐ চিতার মধ্যেই প্রস্ফুটিত পদ্মও দেখা যাইতেছে। দেবী অসভ্য মনুষ্যের মনে এই প্রথম জ্ঞানের অঙ্কুর প্ররোপিত করিতেছেন। অসভ্য মনুষ্য পূর্ব্বে পর্ব্বত-গহ্বরে, বৃক্ষ-কোটরে বা ভূগর্ভে বাস

করিত। এক্ষণে তাহারা জ্ঞানবলে খড়্গ, কর্ত্তরী লইয়া স্বীয় স্বীয় আবাসভূমি প্রস্তুত করিতেছে।

সংসার-পটের তৃতীয় অঙ্কে দেবী মনুষ্যকে সভ্যতার পথে আরও অগ্রসর করাইয়াছেন। সেখানে দেবী নর-নারীর মধ্যে দাম্পত্যপ্রেম সঞ্চারিত করিতেছেন। অসভ্য মনুষ্যের মধ্যে পরিণয়-প্রথা প্রথম প্রবর্ত্তিত হইতেছে।

কবি দেখাইতেছেন, সংসার-পটের চতুর্থ অঙ্কে দেবীর আর সে ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি নাই। তিনি সেখানে মনুষ্যের মনে অপত্যস্নেহ সঞ্চারিত করিতেছেন। যতদিন পরিণয়-প্রথা প্রচলিত ছিল না, ততদিন অপত্যস্নেহের প্রাবল্য অনুভূত হইত না। কিন্তু এখন নর-নারী সন্তান-সন্ততির প্রতি প্রচুর স্নেহ প্রকাশ করিতেছে।

সংসার-পটের পঞ্চম অঙ্কে মনুষ্যের মনে প্রথম ভক্তি, কৃতজ্ঞতা প্রভৃতি উদিত হইতেছে। সংসার-পটের ষষ্ঠ অঙ্কে মনুষ্য মনুষ্যকে প্রীতি করিতে শিখিতেছে। অর্থাৎ পূর্ব্ব অঙ্কে মনুষ্য প্রত্যুপকার-স্বরূপ পিতামাতাকে ভক্তি করিতে শিখিয়াছিল। কিন্তু এক্ষণে মনুষ্য মনুষ্যমাত্রকেই প্রীতি করিতে শিখিতেছে। সংসার-পটের সপ্তম অঙ্কে মনুষ্য পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করিয়া পরস্পর পরস্পরের শ্রম-লাঘব করিতেছে। সংসার-পটের অষ্টম অঙ্কে মনুষ্য দারিদ্র্য-অসুরকে নিহত করিতেছে। অসভ্য অবস্থায় মনুষ্য দারিদ্র্যের সহিত যুদ্ধ করিতে সক্ষম হয় না। কিন্তু যতই সভ্যতার বিকাশ হয়, ততই মনুষ্য দারিদ্র্যকে পরাভূত করিতে শিক্ষা করে। সকলেই জানেন যে, সভ্য দেশে দুর্ভিক্ষ হয় না।

সংসার-পটের নবম অঙ্কে মনুষ্য পাপকে পাপ বলিয়া ঘৃণা করিতে শিখিয়াছে এবং পাপের জন্য অনুতাপ করিতে আরম্ভ করিয়াছে।

সর্ব্বশেষে কবি দেখাইতেছেন যে, সংসার-পটের দশম অঙ্কে মনুষ্য দুঃখ, শোক, তাপ প্রভৃতি সমস্ত পরাভব করিয়া সর্ব্বমঙ্গলার মধুর শাসনে পরস্পর দয়ার অমৃত-সিঞ্চনে সর্ব্বপ্রকার সুখভোগ করিতেছে।

কবি যে সভ্যতার এই দশ মূর্ত্তির বর্ণনা করিয়াছেন, ইহা কি কেবল কবি-কল্পনা? সভ্যতার এই চিত্র যে কল্পনাবহুল, তাহা আমরা অস্বীকার করিতেছি না। আমরা কেবল ইহাই বলিতে চাই যে, কল্পনা-বাহুল্য-সত্ত্বেও এই বর্ণনার মূল ভিত্তি ঐতিহাসিক সত্য ও ঐতিহাসিক ঘটনা। যিনি বিজ্ঞানের চক্ষে ইতিহাস আলোচনা করেন, তিনি জানেন যে, সভ্যতার পূর্ব্বোক্ত অধিকাংশ মূর্ত্তিই ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন রূপে আজিও বিরাজ করিতেছে। ফিজি দ্বীপের নর-খাদক অধিবাসী যে সভ্যতার সংহারময়ী মূর্ত্তির অধীনে বাস করে, ইহা কে অস্বীকার করিবে? আর ব্রাইট, গ্লাডষ্টোন, কনগ্রীভ প্রভৃতি রাজনৈতিকগণ যে সভ্যতার কমলাত্মিকা মূর্ত্তির অধীনে বাস করেন, ইহাই বা কে না স্বীকার করিবে? হেমবাবু দেবীর দশ মূর্ত্তির সহিত সভ্যতার দশ অবস্থার সংযোজনা করিয়া কল্পনার সহিত বৈজ্ঞানিক সত্যের সুন্দর বিমিশ্রণ সম্পাদন করিয়াছেন।

কিন্তু হেমবাবু দেবীর দশ মূর্ত্তির সহিত সভ্যতার দশ অবস্থার সংযোজনা-বিষয়ে কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছেন, এক্ষণে তাহারও আলোচনা করা কর্ত্তব্য বোধ হইতেছে। মহামেঘবরণা, দন্তুরা, নৃমুণ্ডমালিনী কালীর সহিত সভ্যতার সংহারময়ী মূর্ত্তির সংযোজন আমাদের বিবেচনায় বড়ই পরিপাটী হইয়াছে। দেবীর তারামূর্ত্তির সহিত সভ্যতার জ্ঞানময়ী অবস্থার সংযোজনা মন্দ হয় নাই। কারণ, জ্ঞানই মনুষ্যের প্রধান ত্রাণোপায়। দেবীর ষোড়শী মূর্ত্তির সহিত সভ্যতার প্রেমময়ী মূর্ত্তির অবস্থার সংযোজনা বড়ই মধুর হইয়াছে। কারণ, বয়সের প্রথম উন্মেষেই প্রীতির প্রথম উচ্ছ্বাস। ভুবনেশ্বরীর সহিত স্নেহের সংযোগ মন্দ হয় নাই। কারণ, ভুবনেশ্বরী জগন্মাতারূপিণী। কিন্তু ভৈরবীকে কেন ভক্তিবিধায়িনী বলিয়া বর্ণনা করা হইল? ধূমাবতী কেন শ্রমহারিণী? মাতঙ্গী কেন প্রীতিদায়িনী? বগলা কেন দারিদ্র্যদলনী? ছিন্নমস্তাতে পাপহারিণী মূর্ত্তির কল্পনা সুন্দর হইয়াছে। পাপী পাপাঙ্কুশতাড়নায় আপনার মস্তক আপনি বলি দিতে পারে। দয়াময়ীর সহিত মহালক্ষ্মীর সংযোজনা সুন্দর হইয়াছে। কারণ, ধন-সূর্য্য হইতে উত্তাপ না প্রাপ্ত হইলে দয়া-লতা অঙ্কুরিত হয় না। ইহা দ্বারা দেখা গেল, দুই তিনটি মূর্ত্তি ভিন্ন প্রায় আর সকলগুলিতেই দেবীর ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তির সহিত সভ্যতার ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার সংযোজনা সুন্দর হইয়াছে।

দশমহাবিদ্যার রূপ-বর্ণনা-সম্বন্ধে হেমবাবুর সহিত আমাদের একটু বিবাদ আছে। তিনি কয়েকটি মূর্ত্তি পুরাণোক্ত প্রণালীতে বর্ণনা করিয়াছেন। আবার আর কয়েকটি মূর্ত্তি নিজ-কল্পনা হইতে আঁকিয়া লইয়াছেন। এতদ্ভিন্ন তিনি আর কয়েকটি মূর্ত্তিতে পুরাণ ও স্বকপোল-কল্পনা উভয়ই বিমিশ্রিত করিয়া দিয়াছেন। 'ছিন্নমস্তা'র রূপ পুরাণানুমোদিতরূপে বর্ণিত হইয়াছে। ইহাতে পুরাণের পরিত্যাজ্য অংশও পরিত্যক্ত হয় নাই। কিন্তু 'বগলা' ও 'ষোড়শী' কবি নিজ-কল্পনানুসারে সজ্জিত করিয়াছেন। 'মাতঙ্গী' 'ভৈরবী' মূর্ত্তিতে কল্পনা ও পুরাণ উভয়ই সম্মিলিত আছে। এক্ষণে আমাদের বক্তব্য এই যে, যখন কবি এইরূপ স্বাধীনতা প্রয়োগ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই, তখন মূর্ত্তিগুলির রূপের সহিত তাহাদের সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য থাকা উচিত ছিল। কয়েক স্থলে মূর্ত্তিগুলির রূপের সহিত তাহাদের চরিত্রগত সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য আছে। 'ধূমাবতী'কে শ্রমাতুরা, ক্ষুৎপিপাসাপীড়িতা বৃদ্ধা বিধবার রূপে বর্ণনা করা বড় সুন্দর হইয়াছে। এইরূপে 'ছিন্নমস্তা'তে মদনোন্মাদের বর্ণনা বড় উপযোগী হইয়াছে। কিন্তু জ্ঞানময়ী 'তারা'কে লম্বোদরা বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। জ্ঞানের সহিত লম্বোদরতার কি সম্পর্ক? কিংবা জ্ঞানের সহিত পিঙ্গলবর্ণের কি সম্বন্ধ? যিনি স্নেহময়ী, তাঁহার হস্তে অঙ্কুশ কেন? অভয়, বর প্রভৃতি কেন? ভক্তিবিধায়িনী 'ভৈরবী'র মস্তকে মাল্য বড় সুন্দর দেখাইতে পারে। কিন্তু তাঁহার স্তন রক্ত-লেপিত কেন? যদি হেমবাবু পৌরাণিকী বর্ণনা অক্ষুণ্ণ রাখিতেন, তাহা হইলে তাঁহার সহিত বিবাদ করিতাম না। কিন্তু যখন তিনি মধ্যে মধ্যে কবিসুলভ-স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন

করিয়াছেন, তখন সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিয়া মূর্ত্তিগুলির রূপে ও চরিত্রে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য রক্ষা করিলে ভাল হইত।

আমরা 'দশমহাবিদ্যা'র প্রতিপাদ্য বিষয়-সম্বন্ধে অনেক কথা বলিলাম। এক্ষণে ইহার কল্পনা, ভাষা, চরিত্র-বিন্যাস প্রভৃতি সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলিয়া আমরা হেম-বাবুর নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিব।

১ম—কল্পনা।

পুরাণ, তন্ত্র প্রভৃতিতে দশমহাবিদ্যার রূপ প্রথমে কল্পিত হয়। মার্কণ্ডেয় পুরাণে দেবীর দশ রূপের বর্ণনা আছে, কিন্তু ঐ দশ রূপের "দশমহাবিদ্যা" অভিধান তখনও দেওয়া হয় নাই। তদ্ভিন্ন মার্কণ্ডেয় পুরাণোক্ত দেবীর দশ মূর্ত্তির নামগুলির সহিত দশমহাবিদ্যার নামগুলির ঐক্য হয় না। মার্কণ্ডেয় পুরাণে দেবীর দশ নাম এই—দুর্গা, দশভুজা, সিংহবাহিনী, মহিষমর্দ্দিনী, জগদ্ধাত্রী, কালী, মুক্তকেশী, তারা, ছিন্নমস্তকা, জগদ্গৌরী। শুম্ভ-নিশুম্ভ-বধ-কালে দেবী পূর্ব্বোক্ত দশ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া ভিন্ন ভিন্ন অসুর বধ করিয়াছিলেন। ইহার পর কালীকৈবল্যদায়িনী নামক পুস্তকে দেবীর এই দশ মূর্ত্তিকে দশমহাবিদ্যা নামে আখ্যাত করা হইয়াছে। কালী-কৈবল্যদায়িনী বোধ হয় তন্ত্রের পথ অনুসরণ করিয়াছেন। কালীকৈবল্যদায়িনী দেবীর দশ মূর্ত্তির ভিন্ন আখ্যা দিয়াছেন ; যথা—"কালী, তারা, রাজরাজেশ্বরী, ভৈরবী, ধূমাবতী, ভুবনেশ্বরী, ছিন্নমস্তা, বগলা, মাতঙ্গী, কমলা।" কালীকৈবল্যদায়িনী-অনুসারেও দেবী অসুর-বধার্থ এই মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিলেন। কিন্তু এখানেও আবার কালীকৈবল্যদায়িনীতে যে সমস্ত অসুরের নাম বর্ণিত হইয়াছে, মার্কণ্ডেয় পুরাণে তাহা হয় নাই। মার্কণ্ডেয় পুরাণে ছিন্নমস্তা নিশুম্ভ বধ করিয়াছেন। কালীকৈবল্য-দায়িনীতে ছিন্নমস্তা অঘোর নামক অসুর বধ করিয়াছেন। মার্কণ্ডেয় পুরাণে তারা শুম্ভ বধ করিয়াছেন, কালীকৈবল্যদায়িনীতে তারা ঊর্দ্ধশিখ অসুর বধ করিতেছেন। কিন্তু কালীকৈবল্যদায়িনী দশমহাবিদ্যার পূজার যে ক্রম লিখিয়াছেন, আজিও বঙ্গদেশে সেই ক্রম অবলম্বিত হইয়া থাকে। কালীকৈবল্যদায়িনী বলেন,—

"কার্ত্তিকেয় অমাবস্যা স্বাতিঋক্ষ তায়।
মহানিশা মধ্যেতে পূজিবে কালিকায়॥

*　　*　　*　　*

তারা পূজা ফাল্গুন মাসেতে নিরূপিত।

*　　*　　*　　*

আশ্বিনীতে কোজাগর পৌর্ণমাসী তিথি।
মহালক্ষ্মী আরাধেয় নক্ষত্র রেবতী॥"

ইহা দেখিয়া এইরূপ বোধ হয় যে, যদিও কালীকৈবল্যদায়িনী পৌরাণিক মতের অবজ্ঞা করিয়াছিলেন, তথাপি তাঁহারই মত অনুসারে বঙ্গদেশ পরিচালিত হইত।* কালীকৈবল্যদায়িনীর গ্রন্থকর্ত্তা ভিন্ন অন্য কবিরাও এই দশমহাবিদ্যার উল্লেখ, আরাধনা, স্তব, স্তুতি প্রভৃতি করিয়াছিলেন। মুকুন্দরাম মধ্যে মধ্যে দুই এক মূর্ত্তির উল্লেখ করিয়াছেন। ভারতচন্দ্র দশমহাবিদ্যার ভিন্ন ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বর্ত্তমান সময়ের লেখকেরাও দশমহাবিদ্যার কল্পনায় মোহিত হইয়া উহাদের রূপ-বর্ণনা, ব্যাখ্যা প্রভৃতি করিয়াছেন। এই সমস্ত বিবেচনা করিলে স্পষ্টই প্রতীত হয় যে, আমাদের জাতি-মধ্যে দশমহাবিদ্যার প্রতি প্রীতি ও ভক্তি বহুকাল হইতেই বিদ্যমান আছে।

ইংলণ্ডের আদিম অধিবাসী কেল্টদিগের ন্যায় ও নরওয়ে-সুইডেনবাসী স্কাণ্ডি-নাবিয়ানদিগের ন্যায় ভারতীয় হিন্দুরাও অদ্ভুতরসের পক্ষপাতী। এজন্য হিন্দু কবিরাও অনেক সময়ে অদ্ভুতরসের অবতারণা করিয়া থাকেন। শকুন্তলার জন্ম, শকুন্তলার শকুন্ত-সাহায্যে প্রাণ-রক্ষা, শকুন্তলার অপ্সরা-কর্ত্তৃক অপহরণ, মহাদেবের কপাল-নিঃসৃতজ্যোতিঃ দ্বারা কামদেবের বিনাশ, মন্দার-কুসুমাঘাতে ইন্দুমতীর প্রাণ-ত্যাগ, সমুদ্র-মন্থনে ঐরাবত উচ্চৈঃশ্রবা প্রভৃতির সমুত্থান, কিশোরবয়স্ক রামচন্দ্র-কর্ত্তৃক তাড়কা-রাক্ষসী-বধ ও হরধনুর্ভঙ্গ, কৃষ্ণের পুতনা-বধ, কৃষ্ণের গোবর্দ্ধন-ধারণ প্রভৃতি অদ্ভুতরস-বহুল নানা চিত্র আমাদের কাব্যে ও পুরাণে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। দশমহা-বিদ্যার আদ্যোপান্ত অদ্ভুত ভাব-বহুল। এবং বোধ হয় এই জন্যই দশমহাবিদ্যা আমাদের দেশে প্রাচীন ও নবীন উভয় দল দ্বারাই এত সমাদৃত হইয়া থাকে। হেমবাবু হিন্দু শাস্ত্রোক্ত দশমহাবিদ্যাগণের অদ্ভুতত্ব প্রায়শঃ অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। দুই একটি দৃষ্টান্ত দিলেই ইহা বিলক্ষণ অনুভূত হইতে পারিবে।

কালীকৈবল্যদায়িনীতে ধূমাবতীর বর্ণনা এইরূপ,—

"ধূমারূপে কাত্যায়নী হইল প্রকাশ।
অতি বৃদ্ধা বিধবার পক্ক কেশপাশ॥
বৃদ্ধ কলেবর অতি ক্ষুধায় কাতর।
ধূম্রবর্ণা, বাতাসে দুলিছে পয়োধর॥
কাকধ্বজ রথেতে করিয়া আরোহণ।
ভ্রূকুটি, বিস্তারিত মলিন বদন॥
বাম হাতে কুলা, ডানি হাত কম্পবান।
কাত্যায়নী নিকটে হৈল বিদ্যমান॥"

* অথবা ইহাও বলা যাইতে পারে যে, বঙ্গদেশের পূজার ক্রম দেখিয়া কালীকৈবল্যদা নিজ-পুস্তকে সন্নিবিষ্ট করিয়া লইয়াছেন।

ভারতচন্দ্র ধূমাবতীর বর্ণনা করিতেছেন,—

"দেখি ভয়ে ত্রিলোচন মুদিলা লোচন।
ধূমাবতী হয়ে সতী দিলা দরশন॥
অতি বৃদ্ধা, বিধবা বাতাসে দোলে স্তন।
কাকধ্বজ-রথারূঢ়া ধূমের বরণ॥
বিস্তারবদনা কৃশা ক্ষুধায় আকুলা।
এক হস্ত কম্পবান, আর হস্তে কুলা॥"

হেমবাবু ধূমাবতীর বর্ণনা করিতেছেন,—

"কাছে তার দলমল যে ভুবন উজ্জ্বল
আরও সুনির্ম্মল জিনি অন্য ভুবনে।
দীর্ঘা বিরল-রদ, শুভ্র বরণচ্ছদ,
কুটিল-নয়না বামা ধূমাবতী ধরণে॥
লম্বিত-পয়োধরা ক্ষুৎপিপাসাতুরা,
বিমুক্তকেশী বামা জীবদুঃখ-বিনাশে।
শ্রমক্লান্ত-প্রাণিক্লেশ, ঘুচাইতে রুক্ষ বেশ
বিধবার রূপে নিত্য সতী হোথা বিকাশে।
বিবর্ণা, অতি চঞ্চলা, হস্তে স্থাপিত কুলা,
রথধ্বজোপরি কাকচিহ্ন প্রকাশে॥"

কোন কোন স্থলে হেমবাবু পুরাণ অক্ষুণ্ণ রাখিয়াও পূর্ব্ববর্ত্তী কবিগণকে বর্ণনা-মাধুর্য্যে পরাজিত করিয়াছেন।

ভারতচন্দ্র মাতঙ্গীর রূপ বর্ণনা করিতেছেন,—

"রক্তপদ্মাসনা শ্যামা রক্তবস্ত্র পরি।
চতুর্ভুজা খড়্গ-চর্ম্ম-পাশাঙ্কুশ ধরি॥
ত্রিলোচনা অর্দ্ধচন্দ্র কপাল-ফলকে।
চমকিত বিশ্ব বিশ্বনাথের চমকে॥"

কালীকৈবল্যদায়িনী মাতঙ্গীর রূপ বর্ণনা করিতেছেন,—

"পদ্মাসনা শ্যামা রক্তবসনা মাতঙ্গী॥
চতুর্ভুজ খড়্গ-চর্ম্ম-পাশাঙ্কুশ-ধরা।
ত্রিলোচনী মুক্তকেশী মৃগাঙ্ক-শেখরা॥"

হেমবাবু মাতঙ্গীর এইরূপ বর্ণনা করিতেছেন,—

"সুচারু মনোহর, হের নিকটে তার
অন্য ভুবন কিবা দোদুল্য গগনে।
বীণা বাজিছে করে, বাদনে থরে থরে,
কুন্তল দলমল সুন্দর বদনে॥
কলহংস-শোভা-সম, শ্বেতমাল্য নিরুপম,
শ্যামাঙ্গী শঙ্খের মালা দুই করে পরেছে।

প্রীতি তুলি ভবতলে, সর্ব্ব জীব দুঃখ দলে,
মাতঙ্গীর রূপে সতী পদ্মদলে বসেছে ॥"

সত্যের অনুরোধে ইহাও বলিতে হইতেছে যে, কোন কোন স্থলে হেমবাবুও পূর্ব্ববর্ত্তী কবি কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছেন।

হেমবাবু ছিন্নমস্তার রূপ বর্ণনা করিতেছেন,—

"হের আর উর্দ্ধ দেশে, মদনোন্মত্তার বেশে,
ছিন্নমস্তা ভয়ঙ্করী স্নাত নিজ রুধিরে ॥
বিকট উৎকট স্ফূর্ত্তি— * * * *
জগতের সর্ব্বপাপ নিজ অঙ্গে ধরিয়া।"

কালীকৈবল্যদায়িনী ছিন্নমস্তার রূপ এইরূপে বর্ণনা করিয়াছেন.—

"স্তবে তুষ্টা হয়ে দেবী করিলা অভয়।
চিন্তা নাই সুস্থ হও ক্ষুধা শান্তি* হয় ॥
এত বলি নিজ মুণ্ড করিয়া ছেদন।
আপনার বাম করে করিলা ধারণ ॥
কণ্ঠ হইতে তিন ধারা তিন দিকে ধায়।
এক ধারা ছিন্নমস্তা অতি সুখে খায় ॥
দুই ধারা দুই সখী সুখে করে পান।
নিজ-রক্তে ক্ষুধানল করিল নির্ব্বাণ ॥"

এইরূপে হেমবাবু কখনও বা পূর্ব্ববর্ত্তী কবিগণকে পরাজিত করিয়াছেন, কখনও বা তাঁহাদের কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছেন। কিন্তু তিনি শুদ্ধ পুরাণের মধ্যে নিজ-কল্পনা কারাবদ্ধ করিয়া রাখেন নাই। তিনি নিজে কয়েকটি অদ্ভুত রস-বহুল চিত্রের সৃষ্টি করিয়াছেন। আমরা নিম্নে এইরূপ দুই তিনটি চিত্রের উল্লেখ করিতেছি।

(ক) যেখানে মহাদেব সৃষ্টির আচ্ছাদন অপসারিত করিতেছেন এবং বিশ্বস্থ যাবতীয় বস্তু একে একে শিব-দেহে প্রবিষ্ট হইতেছে, সেখানে কবির কল্পনা এক সুন্দর ও অদ্ভুত চিত্রের সৃষ্টি করিয়াছে।

"শ্বাসরোধ করি ভীম শুষিলেন অচিরে।
বিশ্ব-অঙ্গ লুকাইল মহাকাল-শরীরে ॥
একে একে জগতের আভরণ খসিল।
চন্দ্রতারা রশ্মি মেঘ অভ্র-সনে ডুবিল ॥
* * * *
স্বর্গপুরী রসাতল হিমালয় ছুটিল।
ধারাহারা বসুন্ধরা শিব-অঙ্গে মিশিল ॥
ঘুরে ঘুরে শূন্য পথে বিশ্বকায়া ধায় রে।
ঝরে যেন অরণ্যেরে পল্লবেতে ছায় রে ॥"

* দেবী ছিন্নমস্তারূপে ক্ষুধায় অস্থির হইয়াছিলেন। কিছুতেই তাঁহার ক্ষুধার নিবৃত্তি হয় নাই।

(খ) কবি আর এক স্থলে সৃষ্টির ও সভ্যতার আদিম অবস্থা বর্ণনা করিতেছেন,—

"হেন বেগে বিশ্ব ঘুরে নাহি ধরে কল্পনা।
ধূমকেতু ভীমগতি নহে অর তুলনা॥
আপনার বেগে স্থির মেরুদণ্ড উপরি।
স্রোতরূপে খেলে তাহে বেগধারা লহরী॥
সচেতন অচেতন যত আছে নিখিলে।
কৃমি-কীট প্রাণিকায়া জনমে সে কল্লোলে॥
বিশ্বরূপ প্রাণী জড় জন্মে যত সেখানে।
ঘোররূপা মহাকালী গ্রাসে মুখব্যাদানে॥
অঙ্গ হ'তে বেগে পুনঃ বেগধারা বিহারে।
করালবদনা কালী নৃত্য করে হুঙ্কারে॥"

(গ) কবি আর এক স্থলে সভ্যতার প্রথম অবস্থা বর্ণনা করিতেছেন,—

"কেহ নিজ মুণ্ড কাটে, জীয়ে পুনঃ রক্ত চাটে,
শাঁকিনীরূপিণী ঘোরা কালিকারে ঘেরিয়া।

*   *   *   *

কালীর সঙ্গিনী রঙ্গে, ছুটিছে তাদের সঙ্গে
খিলি খিলি হাসি মুখে, কি বিকট ভঙ্গিমা:
মুখে মুণ্ড চিবাইয়া, করে করতালি দিয়া
ডাকিনী ধাইছে কত—স্বক্কণী রক্তিমা!

*   *   *   *

জড় প্রকৃতির ছলে, শিবদেহ পদতলে—
নৃমুণ্ডমালিনী কালী হুহুঙ্কারি নাচিছে।
সংহার-নিরূপণ, বদনেতে বিদারণ
শিশু-কর কড়মড়ি চর্ব্বণে গিলিছে।

(ঘ) বিশ্বস্থ যাবতীয় বস্তু বিশ্বে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছে,—

"ধীরে মলয় বায়ু প্রবাহিল স্বননে।
ধরণী ধরিল শোভা সহাস্য বদনে॥
কুঞ্জে ফুটিল লতা তরুকুল হরষে।
ছুটিতে লাগিল পুনঃ স্রোতধারা তরসে॥
পতঙ্গ, কীট, পশু, পুনঃ পেয়ে চেতনে।
গুঞ্জিল চিতসুখে প্রকটিত জীবনে॥
মিলাইল দশ রূপ উমা-রূপ ধরিল।
হরগৌরী-রূপে সতী হিমালয়ে উদিল॥"

আমরা এক্ষণে হেমবাবুর ভাষার সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিব। যে ভাষাতে ভাবের ছায়া স্পষ্টতঃ লক্ষিত হয়, তাহাকে উৎকৃষ্ট ভাষা বলা যাইতে পারে। এইরূপ ভাষাকে ইংরাজীতে ভাবের পতিধ্বনি কহে। নর্ত্তকীর নৃত্য কখন দ্রুত, কখন বা

ধীর হইয়া থাকে। গ্রের নৃত্য-বর্ণনা পাঠ করিলে ঐ বর্ণনার মধ্যেও যেন দ্রুতত্ব ও ধীরত্ব অনুভূত হয়। দ্রুত নৃত্য গ্রে এইরূপে বর্ণনা করিয়াছেন,—

'Now pursuing, now retreating
Now in circling troops they meet.'

আবার ধীর নৃত্য বর্ণনা-কালে কবি বর্ণনা করিতেছেন,—

"Slow melting strains their queen's approach declare."

এইরূপ ভাষা বাস্তবিকই ভাবের প্রতিধ্বনি। হেমবাবুর ভাষা অনেক স্থলে ভাবের প্রতিধ্বনি বলিয়া অনুভূত হয়। নারদ বীণা বাদন করিতেছেন, বীণা কখনও বা পঞ্চমে নামিতেছে, কখনও বা সপ্তমে উঠিতেছে। যখন নারদ বীণা পঞ্চমে নামাইতেছেন, তখন কবির ভাষাও সঙ্গে সঙ্গে পঞ্চমে নামিতেছে। যথা,—

"মৃদু মৃদু গুঞ্জন অঙ্গুলি স্ফুরণে।
সরিৎ প্রবাহিল সুন্দর বাদনে॥
রুণু রুণু নিক্বণ কোমলে মিলিয়া।"

আবার নারদের বীণা যখন সপ্তমে উঠিতেছে, তখন কবির ভাষাও সেই সপ্তম তানের অনুকরণ করিতেছে,—

"ক্রমে গুরু গর্জন সপ্তমে ছুটিয়া।"

যখন আনন্দের কথা বলা হইতেছে, তখন কবির ভাষাতেও যেন সেই আনন্দের প্রতিধ্বনি হইতেছে,—

"আনন্দে তরুকুল মঞ্জরি হাসিল।
আনন্দে তরু-ডাল বিহঙ্গে সাজিল॥"

যখন কোথাও ধীর গতির বর্ণনা করা হইতেছে,—

"মৃদু হাসি রঞ্জিল মহাদেব-বদনে।
বিচলিত কৈলাস মৃদু মৃদু চলনে॥
ধীর মৃদুল গতি কৈলাস চলিল।
মধ্য গগন-ভাগে শিবপুরী বসিল॥"

এই কয় পঙ্‌ক্তি পড়িলে মনে হয়, যেন কৈলাস পর্ব্বত ধীরে ধীরে তোমার সম্মুখ দিয়া যাইতেছে।

আবার যখন ভয়ানক বা বীভৎস রসের অবতারণা করা হইয়াছে, তখন হেমবাবুর ভাষার মধ্যেও সেই ভয়ানক ও বীভৎসত্বের ছায়া পড়িয়াছে,—

"শক্তি শম্বুক শাঁখ, মুখব্যাদান ফাঁক
রক্ত জলধিদেহ লেহি লেহি চলিছে।
পন্নগ সুভীষণ ফণা-প্রসারণ
উৎকট গর্জন তরঙ্গে দুলিছে॥
কূর্ম্মকমঠি কুট ঊর্ম্মিতে লটপট
লোহিত তৃষ্ণাতুর সংপুট খুলিছে॥"

এইরূপে আরও বহুতর স্থলে ভাষার উৎকর্ষ দেখা যাইতে পারিবে। এক্ষণে চরিত্র-বিন্যাস-সম্বন্ধে দু-একটি কথা বলিয়া আমরা সমালোচনার উপসংহার করিব। আমাদের বিবেচনায় দশমহাবিদ্যার প্রথম কয়েকটি পরিচ্ছেদে শিবের শিবত্ব সংরক্ষিত হয় নাই। যিনি দেবাদিদেব জগদ্‌গুরু, তিনি স্ত্রী-শোকে অধীর হইয়া—

" ছুড়ে ফেলি হাড়মাল, করে দলি ভস্মজাল,
বিভূতিবিহীন কৈলা কায়া।"

এখানে মহাদেবকে নিতান্ত প্রাকৃতজনের ন্যায় বর্ণনা করা হইয়াছে।

কাব্যাংশে দ্বিতীয় পরিচ্ছেদটি দশমহাবিদ্যার সর্ব্বোৎকৃষ্ট অংশ। বঙ্গভাষায় এরূপ হৃদয়বিদারক সুমধুর বিলাপ আর কোথাও আছে বলিয়া আমাদের মনে হয় না।—

হরষ সুধাসম, হৃদয় উচাটিত,
দম্পতী পুরিণয় বাসে।
কত সুখে যাপন, অহরহ বৎসর,
দক্ষ-দুহিতা ছিল পাশে॥
কতবিধ খেলন, যুবতি প্রকটন,
ভুলাইতে শঙ্কর ভোলা।
থাকিবে চিরদিন, হৃদিপটে অঙ্কন,
সে সব বিলসিত লীলা॥

* * * *

সেই যোগ-সাধন, কি হেতু ঘুচাইলি,
ভিক্ষুকে বসাইলি ঘরে।
কি হেতু তেয়াগিলি, কেনই সমাপিলি,
সে সাধ এতদিন পরে॥"

এই সমস্ত কবিতার এক একটি পদ বঙ্গসাহিত্যরূপ নূতন কাননে এক একটি প্রস্ফুটিত পুষ্প, কিন্তু আমাদের মনে হয়, যেন দেবাদিদেব জগৎস্রষ্টা মহাদেবের মুখে এ কথাগুলি তাদৃশ শোভা পাইতেছে না। আমরা স্বীকার করি, মুকুন্দরাম, ভারতচন্দ্র শিবের যে অবমাননা করিয়াছেন, হেমবাবু তাহা হইতে শিবকে অনেক উচ্চে রাখিয়াছেন; কিন্তু শিবকে আরও উচ্চে রাখিলে শিবের সম্মান রক্ষা করা হইত। দেখুন, ঐরূপ অবস্থায় কালিদাস শিবকে কিরূপ চিত্রিত করিয়াছেন। কালিদাসের শিব সতী-শোকে ক্রন্দন করিতেছেন না। তিনি হৃদয়ের শোক হৃদয়ে নিরুদ্ধ করিয়া তপোমগ্ন আছেন। দেবদারু-তলে, ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরিধান করিয়া মহাদেব তপস্যায় নিমগ্ন আছেন। তিনি আজি বীরাসনে উপবিষ্ট। তাঁহার দেহে, বদনমণ্ডলে শোকের, বিষাদের বা বিলাপের চিহ্নমাত্র নাই। তিনি ধীর, স্থির ও নিশ্চল।

" অবৃষ্টিসংরম্ভমিবাম্বুবাহম্
অপামিবাধারমনুত্তরঙ্গম্।
অন্তশ্চরাণাং মরুতাং নিরোধান
নিবাতনিষ্কম্পমিব প্রদীপম্॥"

মহাদেব অবৃষ্টিসংরম্ভ মেঘের ন্যায়, তরঙ্গবিহীন সমুদ্রের ন্যায়, নিবাতনিষ্কম্প প্রদীপের ন্যায়। কালিদাস এখানে শোকের বর্ণনা করিয়াও শিবের শিবত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। যদি হেমবাবু পুরাণোক্ত শিব-বিলাপ বর্ণনা না করিয়া কালিদাসের শিব-চিত্র আমাদের সম্মুখে তাঁহার অনুপম ভাষায় বর্ণনা করিতেন, তাহা হইলে 'দশমহাবিদ্যা' আরও মহামূল্য ও নিরবদ্য হইত।

আমরা নিরপেক্ষভাবে যথাশক্তি হেমবাবুর কাব্যের দোষগুণ বিচার করিলাম। যদি কেহ আমাদের সমালোচনা এতদূর পাঠ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি অবশ্যই আমাদের সহিত স্বীকার করিবেন যে, 'দশমহাবিদ্যা' বঙ্গভাষায় এক অতি উজ্জ্বল রত্ন।

[বান্ধব, ১২৮৯]

সমালোচনা ও সমালোচক

ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়

কোনও দ্রব্যের স্বরূপ নির্ণয় করিতে হইলে তাহার সমালোচনা করা প্রয়োজন। সভ্যজগতে দ্রব্যমাত্রেরই যথাসম্ভব স্বরূপ নির্ণীত হওয়া আবশ্যক ; সুতরাং সমালোচনা অবশ্যম্ভাবী। মনুষ্যের চিন্তা-শক্তি তাহার জ্ঞানমাত্রের মৌলিক কারণ। সমালোচনা চিন্তা-শক্তি-পরিচালনের নামান্তর মাত্র। জ্ঞান-মাত্রেরই মূলে সমালোচনা স্বতঃ-নিহিত। সমালোচনা-রূপ সোপান-দ্বারাই মনুষ্য জ্ঞান-রূপ উচ্চ শৈলে আরোহণ করিতে সমর্থ হয়। সমালোচনা ব্যতিরেকে জ্ঞান অসম্ভব। বস্তু হইতে অবস্তু বা অবস্তু হইতে বস্তু-জ্ঞান জন্মে। বস্তু কি জানিতে হইলে অবস্তু কি, ইহা জানাও একরূপ অপরিহার্য্য ; অর্থাৎ, উভয়ের স্বরূপ ও পারস্পরিক সম্বন্ধ কি, ইহা স্থির করার প্রয়োজন। এই স্বরূপ ও সম্বন্ধ-স্থিরীকরণ-প্রক্রিয়াকেই সাধারণতঃ সমালোচনা বলি। সমালোচনা-প্রক্রিয়া প্রধানতঃ কিরূপে সম্পাদিত হয় ও তাহার মৌলিক প্রকৃতি কি, প্রথমতঃ তাহারই আলোচনা করিব।

পদার্থ-তত্ত্ববিৎ স্থির করিলেন যে, পদার্থ (Matter) * আর কিছুই নয় —কতকগুলি স্বরূপ বা ধর্ম্মের (Properties) সমবায়মাত্র। এই স্বরূপ

* বলা বাহুল্য যে, এ স্থলে পদার্থের সাধারণ ও স্থূল অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। পদার্থের সূক্ষ্ম তত্ত্ব-ঘটিত 'ন্যায়দর্শনে'র তর্কে প্রবৃত্ত হই নাই।

বা ধর্ম্ম দ্বিবিধ—স্থির ও অস্থির। স্থির ধর্ম্ম,—যথা, ভার, বিস্তার, স্থানরোধকত্ব, বিভাজ্যতা, স্থিতিস্থাপকত্ব ইত্যাদি। অস্থির ধর্ম্ম,—যথা, আকুঞ্চনীয়তা, প্রসারণীয়তা, ঘনতা, তরলতা, শীতলতা, উষ্ণতা, কাঠিন্য, কোমলতা ইত্যাদি।

এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, পদার্থের এই সকল স্বরূপ বা ধর্ম্ম মূলতঃ কিরূপে স্থিরীকৃত হইল। ভারত্ব বা স্থানরোধকত্ব, বিভাজ্যতা বা স্থিতিস্থাপকত্ব, তরলতা বা কাঠিন্য —এবংবিধ এক-একটি স্বরূপের যে অস্তিত্ব আছে, বৈজ্ঞানিক কিরূপে এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইলেন? উত্তর,—পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষার দ্বারা। কিন্তু সেই পর্য্যবেক্ষণ বা পরীক্ষার প্রকৃতি ও প্রকরণ কিরূপ? সূক্ষ্মরূপ বিবেচনা করিলে অনুভূত হইবে যে, কোন একটি স্বরূপের ভাব উপলব্ধি বা নির্ণয় করার পূর্ব্বে বা অন্ততঃ সঙ্গে সঙ্গেই তাহার বিপরীত ভাবের কল্পনা করা অপরিহার্য্য। ভারত্ব কি জানিতে হইলে যুগপৎ ভারশূন্যত্বের কল্পনা করিয়া উভয়ের পার্থক্য অনুভব করি, নতুবা ভারত্বের ভাব কিরূপে বুঝিব? কোমলতার সহিত কঠিনতার বা কঠিনতার সহিত কোমলতার পার্থক্যানুভূতিই কোমলতা বা কঠিনতার ভাব হৃদয়ঙ্গম ও স্থিরীকরণের একমাত্র উপায়। এইরূপে, পদার্থের স্বরূপ বা ধর্ম্মের নিরূপণ করিতে তদ্বিপরীত স্বরূপের সহিত তাহার তুলনা করিয়া সম্বন্ধ স্থির করার প্রয়োজন হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, স্বরূপ-নির্ণয়ের সঙ্গে সঙ্গেই সম্বন্ধ-নির্ণয়-প্রক্রিয়ার আরম্ভ; অথবা স্বরূপ-নিরূপণ ও সম্বন্ধ-নির্ণয় উভয়ই পরস্পরের অনুগামী। একটির সহিত অপরটির স্বাভাবিক সম্বন্ধ। এই সম্বন্ধ বা বিমিশ্র-প্রক্রিয়াই মূলতঃ সমালোচনা। কথাটা পরিষ্কার হইল না, গুটিকতক উদাহরণ দেওয়া আবশ্যক।

১। বৈজ্ঞানিক 'গতি'র লক্ষণ স্থির করিতেছেন,—

"এক স্থান হইতে অপর স্থানে যাওয়ার নাম গতি (Motion)। মনে কর, যেন আমি কোনও গৃহে বসিয়া আছি, তখন তোমরা আমাকে স্থির বা গতিবিহীন বলিতে পার; কিন্তু তাহার পর যখন আমি ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে আরম্ভ করি, তখন আমার অবস্থার নাম 'গতি'। আর, এক স্থানে স্থির হইয়া বসিয়া থাকার নাম 'স্থিতি'। এই গতি ও স্থিতি নিরপেক্ষ ও সাপেক্ষ বা প্রত্যক্ষ উভয়ই হইতে পারে। গতি বা স্থিতি নিরপেক্ষ আমরা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি না। সচরাচর সাপেক্ষ গতি বা সাপেক্ষ স্থিতিই প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি, সেই জন্য ইহাদিগকে প্রত্যক্ষও বলে। যখন কোন একটি বস্তু চলিতেছে, আর একটি স্থির রহিয়াছে দেখিতেছি, তখন তুলনায় বলি—এ চল, ও স্থির; সুতরাং একের গতি ও অপরের স্থিতি পরস্পরের সাপেক্ষ।"*

২। পরন্তু সাহিত্য-সমালোচক গীতিকাব্যের স্বরূপ ব্যাখ্যা করিতেছেন,—

"যখন হৃদয় কোন বিশেষ ভাবে আচ্ছন্ন হয়—স্নেহ, কি শোক, কি ভয়, কি যাহাই হউক—তাহার সমুদয়াংশ কখনও ব্যক্ত হয় না। কতকটা ব্যক্ত হয়, কতকটা ব্যক্ত হয় না। যাহা ব্যক্ত হয়, তাহা ক্রিয়ার দ্বারা বা কথার দ্বারা। সেই ক্রিয়া এবং কথা নাটককারের সামগ্রী। যেটুকু অব্যক্ত থাকে,

* পদার্থ-বিজ্ঞান, প্রথম ভাগ; শ্রীকানাইলাল দে, রায় বাহাদুর প্রণীত। ১৮৭৪।

সেটুকু গীতিকাব্য-প্রণেতার সামগ্রী। যেটুকু সচরাচর অদৃষ্ট, অদর্শনীয় এবং অন্যের অননুমেয় অথচ ভাবাপন্ন ব্যক্তির রুদ্ধ হৃদয়-মধ্যে উচ্ছ্বসিত, তাহা তাঁহাকে ব্যক্ত করিতে হইবে। মহাকাব্যের বিশেষ গুণ এই যে, কবির উভয়বিধ অধিকার থাকে, ব্যক্তব্য এবং অব্যক্তব্য উভয়ই তাঁহার আয়ত্ত। মহাকাব্য, নাটক ও গীতিকাব্যে এই একটি প্রধান প্রভেদ বলিয়া বোধ হয়। * * সত্য বটে যে, গীতিকাব্য-লেখককেও বাক্যের দ্বারাই রসোদ্ভাবন করিতে হইবে, নাটককারেরও সেই বাক্য সহায়। কিন্তু যে বাক্য ব্যক্তব্য, নাটককার কেবল তাহাই বলাইতে পারেন। যাহা অব্যক্তব্য, তাহাতে গীতিকাব্যকারের অধিকার।"*

৩। পক্ষান্তরে রাজনীতিবেত্তা উৎকৃষ্ট শাসন-প্রণালীর লক্ষণ-স্থিরীকরণ-প্রসঙ্গে 'উন্নতি কি' বুঝাইতেছেন,—

"স্থায়িত্ব ও তদ্ভিন্ন আরও কিছু উন্নতির অন্তর্ভূত। * * কোন বিষয়ের উন্নতির সহিত তদ্বিষযে স্থায়িত্ব স্বভাবতঃ সংশ্লিষ্ট। কোন বিষয়-বিশেষের উন্নতির জন্য স্থায়িত্ব ধ্বংসীকৃত হইলে তৎসহিত অন্যান্য বিষয়ের উন্নতিরও ধ্বংস সংসাধিত হয়। এই ধ্বংসজনিত ক্ষতিব তুলনায় প্রাগুক্ত উন্নতি যদি মূল্যহীন হয়, তাহা হইলে এরূপ বুঝিতে হইবে যে, কেবলমাত্র স্থায়িত্ব উপেক্ষিত হয় নাই, তাহার সঙ্গে সাধারণতঃ উন্নতির সম্বন্ধেও ভ্রম উপস্থিত হইয়াছিল। * * *

অপিচ, শৃঙ্খলা উন্নতির অন্তর্গত। কিন্তু উন্নতি শৃঙ্খলার অন্তর্গত নহে। শৃঙ্খলা (Order) যাহা অতি অল্প পরিমাণে সম্পাদন করে, উন্নতির দ্বারা তাহা অধিক পরিমাণে সম্পাদিত হয়। * * * উন্নতি-সাধনার্থে শৃঙ্খলা অন্যতম উপায়মাত্র; কেন-না, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের বৃদ্ধি করিতে হইলে যে পরিমাণে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বর্ত্তমান আছে, তাহার রক্ষা করা একান্ত আবশ্যক। ধনবৃদ্ধি করিতে হইলে যাহাতে সঞ্চিত ধনের অপচয় না হয়, তাহাই করা সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। অতএব শৃঙ্খলা উন্নতির অংশ ও উপায়মাত্র, উন্নতির অনুরূপ উদ্দিষ্ট বিষয় নহে।"†

৪। দার্শনিক অতঃপর তুলনা-দ্বারা 'দর্শন' ও 'বিজ্ঞান'এর প্রভেদ দেখাইতেছেন,—

"দর্শন বিজ্ঞানের অন্তর্গত নহে, এবং বিজ্ঞানও দর্শনের শাখা নহে। দর্শন ও বিজ্ঞান উভযের মধ্যে নিগূঢ় ঘনিষ্ঠতা সত্ত্বেও তাহারা স্বতন্ত্র। নীতি-বিজ্ঞান মনুষ্যের নৈতিক বা ধর্ম্মপ্রকৃতিগত ভাব-সমূহের 'দৈর্ঘ্যপ্রস্থ' পরিমাপ করে; কিন্তু নীতি-দর্শন উক্ত ভাবনিচয়ের উচ্চতম ও গভীরতম স্থল-নিহিত আভ্যন্তরিক সত্তার পর্য্যালোচনায় নিযুক্ত। প্রকৃতিগত ভাব-পরম্পরার একত্র অস্তিত্ব ও পারম্পরিক আবির্ভাব এবং এতদুভয় হইতে যে সকল সাধারণ নিয়ম নিষ্কাসিত হয়, তাহারই আলোচনা করা বিজ্ঞানের অধিকার। বিজ্ঞান ভাব-পরম্পরার সংযোজন-শৃঙ্খল ও তাহাদিগের অন্তস্তলনিহিত সার-সত্তার আলোচনায় প্রবৃত্ত হয় না; কিন্তু দর্শন এতদুভয়েরই অনুসরণ-দ্বারা সমগ্র নৈতিকপ্রকৃতির চরম উদ্দেশ্য-নির্ণয়ের চেষ্টা করে। বিজ্ঞান এরূপ চেষ্টাকে বৃথা ও নিষ্ফল বলা সত্ত্বেও দর্শন উহা হইতে বিরত হয় না।"‡

* বিবিধ সমালোচনা; শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। ১৮৭৬।

† Considerations on Representative Government, by J. S. Mill.

‡ Ethical Philosophy and Evolution, by Professor W. Knight. *Vide* "The Nineteenth Century," No. 19, Sept., 1878.

আমরা উপরে চারিখানি ভিন্ন ভিন্ন পুস্তক হইতে চারিটি ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের সমালোচনা যথাক্রমে উদ্ধৃত ও অনূদিত করিয়া দিয়াছি। প্রথমতঃ, স্থিতির সহিত গতির তুলনা-দ্বারা বৈজ্ঞানিক গতির সাধারণ লক্ষণ ও ধর্ম্ম বুঝাইলেন। স্থিতির 'স্থিতিত্ব'-হেতুই গতির গতিত্ব; অতএব গতি কি বুঝিতে হইলে স্থিতির প্রকৃতি-অনুধাবনও আবশ্যক; সুতরাং উভয়ের সম্বন্ধ পর্য্যালোচনা করা অপরিহার্য্য।

দ্বিতীয় সমালোচনা গীতিকাব্যের। সমালোচক গীতিকাব্য কি স্থির করিতে নাটক ও মহাকাব্যের আংশিক স্বরূপ-নির্ণয় করিলেন; যে হেতু নাটক ও মহাকাব্য কি পদার্থ, ইহা কিয়ৎ পরিমাণে না বুঝিলে গীতিকাব্যের প্রকৃতি উৎকৃষ্টরূপে অনুভূত হয় না। গীতিকাব্য, মহাকাব্য ও নাটক—তিনই কাব্য। ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি-অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীভুক্ত হইয়াছে। কিন্তু তিনেরই পারস্পরিক অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে, অতএব একটির লক্ষণ-নিরূপণার্থ অবশিষ্ট দুইটির সহিত তাহার সম্বন্ধ কি উদ্ঘাটন করা আবশ্যক।

তৃতীয় উদাহরণ—উন্নতি কাহাকে বলে? শুভ বা মঙ্গলের দিকে অগ্রসর হওয়ার নাম উন্নতি এবং তাহা হইতে বিচ্যুতির নাম অবনতি। উন্নতি-সাধনার্থ অবনতি-নিবারণ করা প্রথমেই আবশ্যক। অগ্রসর হওয়ার পূর্ব্বে যদ্দ্বারা পশ্চাৎপদ হওয়ার কারণ বিদূরিত হয়, এমন ব্যবস্থা করার প্রয়োজন। নতুবা প্রকৃত-প্রস্তাবে অগ্রসর হওয়া অসম্ভব। অগ্রসরণই উন্নতি, পশ্চাৎপতনই অবনতি। সুতরাং অবনতির কারণ বিদ্যমানে উন্নতি অসম্ভব। অস্থায়িত্ব ও বিশৃঙ্খলা অবনতির কারণ; সুতরাং উন্নতির অন্তরায়। অতএব দেখা যাইতেছে যে, স্থায়িত্ব ও শৃঙ্খলা ভিন্ন অস্থায়িত্ব ও বিশৃঙ্খলা অর্থাৎ অবনতি নিবারিত হওয়া অসম্ভব; সুতরাং উন্নতির সহিত স্থায়িত্ব ও শৃঙ্খলার অপরিহার্য্য ঘনিষ্ঠতা বর্ত্তমান। অতএব উন্নতি কি, ব্যাখ্যা করিতে স্থায়িত্ব ও শৃঙ্খলার সহিত তাহার যে সম্বন্ধ, তাহা আলোচিত হইয়াছে।

আর, চতুর্থ বা শেষোক্ত উদাহরণটিতে বিজ্ঞানের সহিত দর্শনের তুলনা। উভয়ের প্রকৃতিগত সাদৃশ্য ও পার্থক্য-নির্ণয়। এই উদাহরণটি পূর্ব্বোক্ত উদাহরণ-ত্রয়ের সম্পূর্ণ অনুরূপ; কেবল এই মাত্র বিভিন্নতা যে, ইহাতে সম্বন্ধ-নিরূপণার্থ স্বরূপ নির্ণীত হইয়াছে।

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, স্বরূপ-নির্ণয় ও সম্বন্ধ-নিরূপণের প্রক্রিয়া পরস্পরে সম্বদ্ধ,—একটি অপরটির অনুগামী, অথবা একের সম্পাদনার্থ অপরের সাহায্য প্রয়োজন। উপরি-উক্ত প্রথম তিনটি উদাহরণে, স্বরূপ-নির্ণয়ার্থ সম্বন্ধ আলোচিত হইয়াছে; আর চতুর্থ উদাহরণে সম্বন্ধ-স্থিরীকরণ-উদ্দেশ্যে স্বরূপের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। ফলতঃ উভয় দিকেই প্রক্রিয়া প্রায় একই প্রকার। স্বরূপ-নিরূপণার্থ যেমন সম্বন্ধের আলোচনা করার প্রয়োজন, সম্বন্ধ-নির্ণয়-হেতু তেমনি স্বরূপের তত্ত্বানুসন্ধান আবশ্যক। স্বভাবতঃই [illegible] কর্ত্তৃক অপরটি আকৃষ্ট হয়।

পারস্পরিক সম্বন্ধ হইতেই যাবতীয় পদার্থের বৈজ্ঞানিক শ্রেণীবিভাগ হইয়াছে। অতএব সেই 'সম্বন্ধ'এর পর্য্যালোচনা-দ্বারা সমালোচনার মৌলিক প্রকৃতির আরও কিঞ্চিৎ ব্যাখ্যা করিতে এবং তদ্দ্বারা সমালোচন-প্রক্রিয়া সাধারণতঃ যেরূপে সম্পাদিত হয়, তাহা আরও কিয়ৎপরিমাণে দেখাইতে চেষ্টা করা যাইতেছে।

পার্থক্য ও সাদৃশ্য সম্বন্ধেরই অন্তর্গত, এবং বৈজ্ঞানিক শ্রেণীবিভাগের ও জাতি-নির্ব্বাচনের মূল ভিত্তি। অপিচ, পার্থক্য ও সাদৃশ্যানুভূতি হইতেই মনুষ্য-জ্ঞানের প্রাথমিক বিকাশ। অতএব পদার্থগত অন্যান্য সম্বন্ধের উল্লেখ করিবার পূর্ব্বে পার্থক্য ও সাদৃশ্যের কিঞ্চিৎ আলোচনা করা আবশ্যক।

পার্থক্য। সংসারে যত প্রকার দ্রব্য আছে, অর্থাৎ যত প্রকার দ্রব্য এ পর্যান্ত মনুষ্যের জ্ঞানাধীনে আসিয়াছে, তাহাদিগের সকলেরই এক একটি স্বতন্ত্র নাম আছে। দ্রব্যমাত্রই এক একটি স্বতন্ত্র নামে অভিহিত হওয়ার কারণ কি ? কারণ—তাহাদিগের পারস্পরিক পার্থক্য বা বিভিন্নতা। আলোক ও অন্ধকার বিভিন্ন পদার্থ, এই কারণেই এতদুভয়ের স্বতন্ত্র নাম। আলোককে আলোক বলা যায়, কারণ উহা অন্ধকারের প্রতিদ্বন্দ্বী। আলোক ও অন্ধকার একই পদার্থ হইলে, উহাদিগের স্বতন্ত্র নাম দিবার কিছুমাত্র আবশ্যকতা হইত না। আলোক অন্ধকার হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন, এই কারণেই অন্ধকার ও আলোকের স্বতন্ত্র বস্তুত্ব। রাম শ্যাম হইতে বিভিন্ন, এই কারণেই শ্যামের ন্যায় রামেরও স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব। ক্ষুধা তৃষ্ণা হইতে বিভিন্ন, এই কারণেই ক্ষুধা তৃষ্ণা দুইটি স্বতন্ত্র নাম। এইরূপে দেখা যাইতেছে যে, পার্থক্য বা বিভিন্নতা-দ্বারাই পদার্থমাত্রের স্বতন্ত্র বস্তুত্ব বা ব্যক্তিত্ব স্থিরীকৃত হয়। ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি-অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের ভিন্ন ভিন্ন নাম দেওয়া হয়।

অনেক বস্তু আছে, যাহাদিগের পরস্পরের মধ্যে বিভিন্নতা সুস্পষ্ট ও প্রবল; আবার অনেক বস্তু আছে, যাহাদিগের বিভিন্নতা অতি অল্প ও ক্ষীণ। অল্প বা অধিক পরিমাণে হউক, বস্তুমাত্রেরই কোনও না কোনরূপ পারস্পরিক বিভিন্নতা আছে; তজ্জন্যই তাহাদিগের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ও বস্তুত্ব।

দ্রব্যমাত্রের পারস্পরিক বিভিন্নতার আধিক্য ও অল্পতানুসারে তাহাদিগকে তুলনা-করণোপযোগী পর্য্যবেক্ষণের তারতম্য হয়। সূর্য্য কিংবা চন্দ্রের সহিত নক্ষত্রগুলির বাহ্যতঃ যে বিভিন্নতা, তাহা উপলব্ধি করা অপেক্ষাকৃত সহজ ও অল্পায়াস-সাধ্য; কিন্তু নক্ষত্রগুলির পারস্পরিক পার্থক্যানুভব করিতে হইলে কিঞ্চিদধিক পর্য্যবেক্ষণ ও চিন্তা-শক্তি পরিচালন করা আবশ্যক। একটি হস্তীর সহিত একটি পিপীলিকার সাধারণতঃ যে যে অংশে বিভিন্নতা; তাহার নির্ণয় করা যেরূপ সহজ, দুইটি পিপীলিকার আকৃতিগত পারস্পরিক পার্থক্য স্থির করা অবশ্য সেরূপ সহজ নহে। তিক্তে ও মধুরে যে আস্বাদগত পার্থক্য, তাহা অতি অল্প আয়াসেই স্থিরীকৃত হইতে পারে; কিন্তু দুইটি 'মধুর'এর কোন্‌টি কতটুকু মধুর, ইহা প্রভেদ করিতে অপেক্ষাকৃত অধিক বিচক্ষণতা আবশ্যক হয়। অতএব দেখা যাইতেছে যে, যে সকল স্থলে পার্থ[illegible]ল্পতা, সেই

সকল স্থলে উক্ত পার্থক্য-নিরূপণ করিতে পর্য্যবেক্ষণের সূক্ষ্মতা ও চিন্তা-শক্তির নিপুণতার প্রয়োজন হয়।

বস্তুসমূহের নিকট-সমাবেশ-দ্বারা তাহাদিগের পারস্পরিক পার্থক্যের অধিকতর স্পষ্টরূপে অনুভব করা যায়। দুইটী গোলাপ পুষ্প পাশাপাশি রাখিয়া একটু সূক্ষ্মরূপে তুলনা কর, দেখিবে, উভয়ের আকার, বর্ণ ও সৌরভগত একতাধিক্য সত্ত্বেও গোলাপ দুইটীর মধ্যে কোন-না-কোন অংশে কিছু-না-কিছু বিভিন্নতা আছে। সম্মুখে ঐ স্ফাটিকাধার ভেদ করিয়া বর্ত্তিকালোক সমগ্র-গৃহে প্রতিফলিত হইয়াছে। আলোকটি সম্যক্ উজ্জ্বল ও দীপ্তিমান্। কিন্তু গৃহ-মধ্যে এক্ষণে যদি একটি বাষ্পীয়ালোক আনীত হয়, তাহা হইলে বর্ত্তিকালোকের ঔজ্জ্বল্য ও দীপ্তির হ্রাস হইবে। তাহাকে আর আলোকের পূর্ণ আদর্শ বলিয়া বোধ হইবার সম্ভাবনা থাকিবে না। পক্ষান্তরে, বাষ্পীয়ালোকের সন্নিকটে একটি তাড়িতালোক সংস্থাপিত হউক, বর্ত্তিকালোকের ন্যায় বাষ্পীয়ালোকও দুর্ব্বল হইয়া পড়িবে, এবং তাড়িতালোকের ঔজ্জ্বল্যই তখন প্রবল ও পূর্ণ বলিয়া বোধ হইবে। এক্ষণে বর্ত্তিকালোক, বাষ্পীয়ালোক ও তাড়িতা-লোক—এই তিনের মধ্যে যে পারস্পরিক বিভিন্নতা, তাহা তাহাদিগের একত্র সমাবেশ-দ্বারাই অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্টরূপে বুঝিতে পারি। প্রত্যুত, আলোকত্রয়ের একত্র সংস্থাপন কখন প্রত্যক্ষ না করিলে তাহাদিগের পারস্পরিক বিভিন্নতা কদাপি বিশদরূপে অনুভব করিতে পারিতাম না।

শকুন্তলা ও সাবিত্রী দুইটি স্বতন্ত্র চিত্র। চিত্রদ্বয়ের সমাবেশ-দ্বারা উভয়ের সৌন্দর্য্যগত পার্থক্য উপলব্ধি করিতে পারি। শকুন্তলা ও সাবিত্রী উভয়েই প্রণয়ের জীবন্ত প্রতিকৃতি,—পবিত্রতা ও কমনীয়তার অনন্ত আবাসস্থল,—উভয়েই আত্মোৎ-সর্গের জীবন-সঞ্জীবনী প্রতিমা,—কবি-কল্পনা-প্রসূত মনোমোহিনী সৃষ্টি। শকুন্তলা সুন্দরী, সাবিত্রীও সুন্দরী। শকুন্তলার পার্শ্বে সাবিত্রী দাঁড়াইলেন। সৌন্দর্য্যের সহিত সৌন্দর্য্য মিলিল।

তাড়িতালোকের মিলনে বাষ্পীয় ও বর্ত্তিকালোক যেরূপ ক্ষীণপ্রভ হয়, এ স্থলের মিলন সেরূপ নহে। সাবিত্রীর সৌন্দর্য্য-দ্বারা যেমন শকুন্তলার সৌন্দর্য্যের হ্রাস হয় না, শকুন্তলার সৌন্দর্য্যে তেমনি সাবিত্রীর সৌন্দর্য্য অক্ষুণ্ণ থাকে; অথচ উভয়েরই সৌন্দর্য্যের প্রকৃতিগত পার্থক্য আছে।—পার্থক্য আছে বলিয়াই উভয় চিত্রের সমাবেশ অধিকতর সুন্দর। আর সেই পার্থক্য নিরূপণ করিবার জন্যই উভয়ের সমাবেশ ও সমালোচন আবশ্যক।

সাদৃশ্য। একটি বস্তুর সহিত অপর একটি বস্তুর পার্থক্যানুভূতিই তত্তৎ-বস্তু-সম্বন্ধীয় জ্ঞানের প্রারম্ভ। পক্ষান্তরে, বস্তুসমূহের পার্থক্যানুভূতির সঙ্গে সঙ্গেই তাহা-দিগের মধ্যে সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। রামের ব্যক্তিত্ব শ্যামের ব্যক্তিত্ব হইতে পৃথক্ হওয়া সত্ত্বেও রাম ও শ্যাম অনেক অংশে সদৃশ; কেন-না, উভয়েই মনুষ্য; উভয়েরই চক্ষু-কর্ণ [illegible] ইন্দ্রিয় আছে; উভয়েই চিন্তাশক্তিবিশিষ্ট ইত্যাদি। একটি বৃক্ষ

অপর একটি বৃক্ষের সদৃশ। এক দিন অপর এক দিনের তুল্য। বঙ্কিমবাবুর দুর্গেশ-নন্দিনী ও স্কটের আইভ্যান্‌হো সমশ্রেণীর কাব্য।

উপরে যে কয়েকটি পদার্থের নাম উল্লেখ করা হইল, তাহাদিগের সাদৃশ্য অবশ্য পার্থক্যের সহিত বিজড়িত; যেহেতু পার্থক্য ব্যতিরেকে স্বতন্ত্র বস্তুত্ব অসম্ভব।

রামের সহিত শ্যামের অনেক অংশে সাদৃশ্য থাকিলেও অনেক অংশে পার্থক্য আছে। একটি বৃক্ষ অপর একটি বৃক্ষের অনুরূপ হইলেও প্রথমটি হয়ত অধিক পল্লব-পত্রবিশিষ্ট এবং দ্বিতীয়টি অধিক ফল-পুষ্পযুক্ত। আজ ও কাল দুই দিনই একরূপ; কিন্তু অদ্যকার উত্তাপ, কল্যকার অপেক্ষা অধিক; তদ্ভিন্ন আরও গুরুতর বিভিন্নতা আছে। বঙ্কিমবাবুর দুর্গেশনন্দিনী ও স্কটের আইভ্যান্‌হো সমশ্রেণীর গ্রন্থ হইলেও ভাষা, ভাব ও কাব্যোল্লিখিত চরিত্রে বহুবিধ পার্থক্য আছে।

পরন্তু কোনও কোনও দ্রব্যে সম্পূর্ণ সাদৃশ্য আছে—কেবল অবস্থিতির স্থানভেদে তাহাদিগের মধ্যে পার্থক্য লক্ষিত হয়। যেমন দক্ষিণ ও বাম হস্ত, উভয়ই সম্পূর্ণ অনুরূপ; কিন্তু স্বতন্ত্র স্থানে অবস্থিত, এ জন্য একখানি দক্ষিণ হস্ত ও অপরখানি বাম হস্ত।

এইরূপ কোনও কোনও দ্রব্যের মধ্যে পারস্পরিক সাদৃশ্য ও পার্থক্য অল্প, এবং কোনও কোনও দ্রব্যের মধ্যে ঠিক ইহার বিপরীত; অর্থাৎ, পার্থক্যের আধিক্য ও সাদৃশ্যের অল্পতা পরিলক্ষিত হয়।

দুইটি বালকের মধ্যে আকৃতিগত ও প্রকৃতিগত সাদৃশ্যের আধিক্য, কিন্তু একটি বালকে ও একটি বৃদ্ধে পার্থক্যই অধিক। পক্ষান্তরে, একটি মনুষ্যে ও একটি পশুতে যে পার্থক্য, তাহা আরও অধিক। কিন্তু ইহারা সকলেই জীবনবিশিষ্ট; অর্থাৎ জীবনী-শক্তি ইহাদিগের মধ্যে সাধারণ; সুতরাং সেই অংশে ইহাদিগের সকলেরই পারস্পরিক সাদৃশ্য আছে; মূলে একতা আছে।

একই ভাষায় লিখিত দুইখানি সমশ্রেণীর কাব্য-গ্রন্থের মধ্যে কোনও কোনও বিষয়ে যেরূপ সাদৃশ্য থাকিতে পারে, কিন্তু সেই ভাষায় লিখিত একখানি বিজ্ঞান-সম্বন্ধীয় গ্রন্থের সহিত উহাদিগের কাব্য-গ্রন্থদ্বয়ের সেরূপ সাদৃশ্য থাকিতে পারে না। প্রত্যুত, বিলক্ষণ পার্থক্যই লক্ষিত হয়। পরন্তু অপর ভাষায় লিখিত একখানি বিজ্ঞান বা কাব্যের সহিত যখন ঐ একই ভাষায় লিখিত তিনখানি গ্রন্থের কাহারও তুলনা করি, তখন পারস্পরিক পার্থক্যের পরিমাণ অধিকতর হয়। কিন্তু গ্রন্থগুলি ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় লিখিত ও ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির হইলেও সেগুলি সকলই মনুষ্যের চিন্তা-শক্তি-প্রসূত ও মনুষ্য-ভাষায় লিখিত। অপিচ, উহাদিগের সকলেরই উদ্দেশ্য মনুষ্যের জ্ঞানবৃদ্ধি বা চিত্তস্ফূর্তি সাধন করা। এ কারণ, সাধারণতঃ উহাদিগের পারস্পরিক সাদৃশ্য বিদ্যমান। মূলতঃ উহারা সকলেই এক।

এইরূপে দেখা যায় যে একতার মধ্যে বিভিন্নতা ও বিভিন্নতার মধ্যে একতা প্রকৃতির সর্বত্রই বিদ্যমান। একতা হইতে বিভিন্নতা ও বিভি[illegible] একতা

সমালোচনার দুইটি ভিন্ন ভিন্ন প্রণালী-দ্বারা নির্ণীত হইয়া থাকে। এই দুই প্রণালীর একটিকে বিশ্লেষণ (Analysis) ও অপরটিকে সংশ্লেষণ (Synthesis) বলা হয়।

আপাততঃ পার্থক্য- ও সাদৃশ্য-সম্বন্ধে আমরা মোটের উপর যে কয়েকটি কথার আলোচনা করিয়াছি, এ স্থলে তাহার সার-সংগ্রহ করা আবশ্যক :—

(১) পার্থক্য-হেতুই ব্যক্তি বা বস্তুমাত্রের স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব বা বস্তুত্ব এবং এই পার্থক্যানুভূতিই মনুষ্য-জ্ঞানের প্রারম্ভ। (২) পদার্থমাত্রের পারস্পরিক পার্থক্যের ন্যায় পারস্পরিক সাদৃশ্য আছে। (৩) পার্থক্য ও সাদৃশ্যের স্থূলতা ও সূক্ষ্মতা বা ন্যূনাধিক্যানুসারে তাহার নিরূপণোপযোগী পর্য্যবেক্ষণ ও সমালোচনের তারতম্য হয়। (৪) তুলনীয় দ্রব্যসকলের সমাবেশ ও সংস্থিতির নৈকট্য তুলনার বিশেষ উপযোগী। (৫) পার্থক্য- ও সাদৃশ্য-হেতু বিভিন্নতার মধ্যে একতা ও একতার মধ্যে বিভিন্নতা।

পার্থক্য ও সাদৃশ্যের কথঞ্চিৎ ব্যাখ্যা করা হইল ও তাহার সহিত সাধারণ উদাহরণ-দ্বারা সমালোচন-প্রক্রিয়ার একটি অতি স্থূল অংশ কিয়ৎপরিমাণে দেখান গেল। এক্ষণে আমরা পার্থক্য ও সাদৃশ্য ব্যতীত সম্বন্ধের আর কয়েকটি অংশের সামান্যতঃ উল্লেখ করিব।

সম্বন্ধ। দুইটি ভিন্ন সত্তার অস্তিত্বকে পার্থক্য বলি। আর পার্থক্য সত্ত্বেও এক বস্তুর অন্য বস্তুগত যে ধর্ম্মবত্তা, তাহাকে সাদৃশ্য বলি। কিন্তু সম্বন্ধ কি? একটি বস্তুর সহিত অপর একটি বস্তুর সাদৃশ্য ও পার্থক্য বলিলে উক্ত বস্তুদ্বয়ের পারস্পরিক সম্বন্ধ অনুসূচিত হয় সত্য, কিন্তু একের সহিত অপরের সম্বন্ধ বলিলে তাহাদিগের উভয়ের পারস্পরিক পার্থক্য ও সাদৃশ্য ভিন্ন আরও কিছু বুঝায়। অতএব, এক দিকে সাদৃশ্য ও পার্থক্য যেমন সম্বন্ধের অন্তর্গত, অপরদিকে তেমনি আরও কিছু আছে, যাহা সম্বন্ধের অধিকারভুক্ত। সাদৃশ্য ও পার্থক্য বলিলে তুলনীয় বস্তুসমূহের স্বরূপমাত্রেরই সাদৃশ্য ও পার্থক্য বুঝাইতে পারে; আমরাও ঠিক সেই অর্থে উক্ত দুই শব্দ ব্যবহার করিয়াছি। কিন্তু একটি বস্তুর সহিত অপর একটি বস্তুর সংযোগে উভয়ের পরিবর্ত্তন-দ্বারা বিভিন্ন বা বিমিশ্র প্রকৃতির তৃতীয় আর একটি বস্তুর যে অভ্যুত্থান হয়, এবংবিধ সম্বন্ধসমূহ সাদৃশ্য ও পার্থক্য-সম্বন্ধের অন্তর্ভূত কদাচিৎ হইতে পারে; আর হইলেও তদ্দ্বারা আমাদের উপস্থিত আলোচ্য বিষয়ের পরিষ্কার ব্যাখ্যা হয় না। এই কারণেই আমরা সম্বন্ধ-শব্দটি স্বতন্ত্ররূপে ও সম্যক্ প্রশস্ত অর্থে ব্যবহার করিয়াছি।

অনন্ত বিশ্ব-সংসার অসংখ্য সম্বন্ধ-পরম্পরার সমবায়মাত্র। এই সম্বন্ধসমষ্টি-উদ্ঘাটন-প্রয়াস হইতেই বিজ্ঞান, দর্শন প্রভৃতি মনুষ্যের যাবতীয় শাস্ত্রের সৃষ্টি। মনুষ্য যে পরিমাণে সম্বন্ধ-পরম্পরার অর্থ বুঝিতে পারিয়াছে, ঠিক সেই পরিমাণে প্রকৃতি তাহার নিকট উদ্ঘাটিত হইয়াছে। অসীম সম্বন্ধ-শৃঙ্খলের ভিন্ন ভিন্ন অংশে ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্রের অধি[illegible] সমগ্র শৃঙ্খল পরিমাপ করিয়া তাহার প্রকৃতি ও শক্তি নির্দ্ধারণ

করা মনুষ্য-ক্ষমতার অতীত। বহিঃপ্রকৃতিগত ও অন্তঃপ্রকৃতিগত যে সকল সম্বন্ধ দর্শন-বিজ্ঞানাদি শাস্ত্রকর্ত্তৃক আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাও বহুবিধ; অতএব সে সমুদায়ের আলোচনা বা উল্লেখ করা এই প্রস্তাবের উদ্দেশ্য নহে। কেবল সমালোচনার প্রকৃতি কিরূপ, আর একটু বিশদ করিবার জন্য সম্বন্ধ-ঘটিত কয়েকটি মূল বিষয়ের উল্লেখ করিব।

সম্বন্ধ মোটের উপর দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে, যথা,—নিত্য ও পরিবর্ত্তনশীল। অগ্নির সহিত উত্তাপের নিত্য-সম্বন্ধ; কেন-না, অগ্নির সহিত উত্তাপ থাকিবেই থাকিবে; উত্তাপবিহীন অগ্নির অস্তিত্ব অসম্ভব। কিন্তু অগ্নির সহিত তাহার বর্ণের সম্বন্ধ পরিবর্ত্তনশীল; যে হেতু অবস্থা-ভেদে অগ্নির বর্ণ ভিন্ন ভিন্ন প্রকার হইতে পারে। আমরা 'নিত্যসম্বন্ধ'-বিষয়ে একটু আলোচনা করিব। কেহ কেহ বলেন, নিত্যসম্বন্ধ-জ্ঞান মনুষ্যের স্বভাবসিদ্ধ, কিন্তু বস্তুতঃ তাহা কতদূর সম্ভব বলা যায় না। জ্ঞানমাত্রই মনুষ্যের স্বভাবসিদ্ধ, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু কেবল 'স্বভাবসিদ্ধি বা আত্মপ্রত্যয়' জ্ঞানের কারণ হইতে পারে না। অগ্নিতে ও উত্তাপে নিত্যসম্বন্ধ,—ইহা প্রথমতঃ পরীক্ষা ভিন্ন মাত্র 'আত্মপ্রত্যয়'-দ্বারা স্থিরীকৃত হওয়া কিরূপে সম্ভব হইতে পারে?

একটু সূক্ষ্মরূপে বিবেচনা করিলে বুঝা যায় যে, নিত্যসম্বন্ধজ্ঞান একমাত্র স্বতঃ-সিদ্ধ-প্রত্যয়-জনিত নহে,—পরীক্ষা ও অভিজ্ঞতা তাহার অন্যতম কারণদ্বয়। প্রথমতঃ পরীক্ষা-দ্বারা অগ্নিতে তাপানুভূতি হইল এবং সকল সময়ে, সকল অবস্থায় ও সর্ব্বত্র অগ্নি হইতে উত্তাপের বিচ্ছিন্নতা কখনই লক্ষিত হইল না। পুনঃপুনঃ পরীক্ষা-দ্বারা অভিজ্ঞতা জন্মিল যে, অগ্নি ও উত্তাপে নিত্যসম্বন্ধ। এইরূপ পৌনঃপুনিক পরীক্ষা-দ্বারাই ধর্ম্ম-পরম্পরার সমবায়ে নিত্যসম্বন্ধ-বিষয়ক প্রত্যয় জন্মে। সোডা ও ক্লোরিনের সংমিশ্রণে লবণ প্রস্তুত হয়। ইহাদিগের প্রকৃতিগত এই সম্বন্ধ কখনই বিধ্বস্ত হয় না। যত বার সোডা ও ক্লোরিন একত্র করিলাম, সর্ব্বত্র, সকল সময়ে ও সকল অবস্থাতেই লবণ প্রস্তুত হইল; সুতরাং সোডা ও ক্লোরিন একত্র হইলেই লবণ প্রস্তুত হইবে, ইহা স্বভাবতঃই প্রত্যয় জন্মিল। অপিচ, ইহাও প্রতীত হইল যে, লবণের পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থা সোডা ও ক্লোরিন, এবং উহাদিগের সংমিশ্রণের পরবর্ত্তী ফল লবণ। এইরূপে আমরা বুঝিতে পারি যে, বিশেষ বিশেষ পদার্থ বা ঘটনা-পরম্পরার সমবায়-দ্বারা অন্যবিধ কতকগুলি পদার্থ বা ঘটনার উৎপত্তি হয়। বলা বাহুল্য যে, পূর্ব্ববর্ত্তী পদার্থ বা ঘটনাগুলি কারণ, আর পরবর্ত্তী পদার্থ- বা ঘটনা-পরম্পরা কার্য্য। এইরূপ কার্য্য-কারণ-নিহিত সম্বন্ধানুসন্ধান হইতেই মনুষ্যের সর্ব্বপ্রকার জ্ঞান-বিজ্ঞান। কারণমাত্রই কার্য্যোৎপাদন-শক্তিসম্পন্ন এবং কার্য্যমাত্রেরই কারণ থাকা একান্ত আবশ্যক। মনুষ্যের এই সংস্কার পৌনঃপুনিক পরীক্ষা, পর্য্যবেক্ষণ বা সংক্ষেপতঃ সমালোচনা-দ্বারা লব্ধ। আর কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধ-পরম্পরার প্রকার-ভেদমাত্র।

দার্শনিকেরা চারি প্রকার কারণ নির্দ্দেশ করেন। এতৎ-সম্বন্ধে একটি দৃষ্টান্ত আছে। দৃষ্টান্তটি অতি পুরাতন হইলেও কারণ-চতুষ্টয়ের বিশেষ ব্যাখ্যোপযোগী; এ কারণ, নিম্নে তাহার উল্লেখ করা যাইতেছে।—

কার্য্য—মৃণ্ময় কলস।

১ম কারণ—মৃত্তিকা, অর্থাৎ যে উপাদানে কলসটি গঠিত।

২য় কারণ—চক্র, দণ্ড প্রভৃতি, অর্থাৎ যে সকল যন্ত্রের দ্বারা কলসটি স্বকীয় আকার প্রাপ্ত হইয়াছে।

৩য় কারণ—কুম্ভকার, অর্থাৎ যে ব্যক্তি কলস নির্ম্মাণ করিয়াছে।

৪র্থ কারণ—কলসের উদ্দেশ্য, অর্থাৎ জলাদি রক্ষা করা।

একটু অনুধাবন করিলে প্রতীত হইবে যে, এই চারি প্রকার কারণ কলসের চারিটি সম্বন্ধমাত্র।

যে কোনও বস্তু বা বিষয় সমালোচিত হউক না কেন, তাহার আকৃতি, প্রকৃতি, উৎপত্তি-মূল ও উদ্দেশ্য—এই চারিটি বিষয় সাধারণতঃ নির্ণেতব্য।

[পাক্ষিক সমালোচক, ১২৯০]

সুকুমার সাহিত্যের প্রকৃতি

ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়

মনুষ্য স্বভাবের সহিত সংগ্রাম করে, অথচ স্বভাবেরই অনুকরণ করে। স্বভাবের সহিত সংগ্রাম করিতে করিতে স্বভাবের অনুকরণ করে। প্রকৃতির উপকরণ লইয়া, প্রকৃতির উপর আধিপত্য করে, বা প্রকৃতির আজ্ঞা পালন করে, অথবা প্রকৃতির প্রয়োজন সাধন, সম্পাদন বা পূরণ করে। প্রকৃতির সহিত সংগ্রাম করা অর্থে প্রকৃতির আজ্ঞা পালন করা, প্রকৃতির উপর আধিপত্য করা অর্থে প্রকৃতির অনুকরণ করা; অনুকরণ করিয়া প্রাকৃতিক প্রয়োজন সাধন বা পূরণ করা। প্রকৃতির উপকরণ লইয়াই প্রকৃতির প্রয়োজন পূরণ করা যায়। বাহ্য এবং আন্তর প্রকৃতি ভিন্ন মানুষ আর কোথায় কি পাইবে? অতি-প্রকৃতি তাহার আয়ত্ত নয়। একটু অনুধাবন করিলেই কথাটা পরিষ্কার হইবে।

জ্ঞান-বিজ্ঞান—প্রকৃতি-পর্য্যালোচনা; শিল্প-সাহিত্য সেই পর্য্যালোচনার সংক্ষিপ্তসা[illegible] অর্থে গ্রন্থি, চিত্র অর্থেও তাই। প্রকৃতি-পর্য্যালোচনার ফল, অনধা[illegible] বহু দর্শনের ফল, শিক্ষা-দীক্ষা-পরীক্ষার ফল, গন্থে 'গেরো'

দিয়া গেঁথে রাখা হয়—বর্ত্তমানের স্মরণার্থ, অতীতের গৌরবার্থ, ভবিষ্যতের মঙ্গলার্থ, সভ্যতার উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি-নিমিত্ত। পরন্তু জ্ঞান-বিজ্ঞান শিল্প-সাহিত্য গ্রন্থিত বা গ্রন্থিযুক্ত করা হয়,—জ্ঞান-বিজ্ঞান শিল্প-সাহিত্যেরই ক্রমবিকাশের সাহায্যার্থ এবং ভিত্তি-স্বরূপে। স্তরের উপর স্তর, তার উপর স্তর। এক স্তরের ফল আর এক স্তর, অথবা এক স্তরে বসিয়া আর এক স্তর নির্ম্মাণ করা হয়। এ সব সহজ কথা, সকলেই বুঝি। তবে সময়ে সময়ে স্মরণ করাইয়া দিতে হয় এই মাত্র।

শিল্প এবং সাহিত্য স্বভাবেরই অনুধাবন বা অনুকরণ। সাহিত্য, না হয় শিল্পেরই অন্তর্গত হইল, না হয় এক প্রকার শিল্পই হইল, সে কথা হইতেছে না। কথাটা এই হইতেছে যে, উহা স্বভাবের অনুকৃতি বটে। সাহিত্যই এস্থলে প্রধান বিচার্য্য। অতএব সাহিত্য কথাই এখান হইতে ব্যবহার করা ভাল। সাহিত্য—স্বভাবের অনুকৃতি। অনুকৃতি বটে, কিন্তু অতিরিক্তও ত বটে। সাহিত্য,—স্বভাবের একটু অতিরিক্ত নয় কি? অতিরিক্ত হইলেই যে বহির্ভূত হয়, অন্তর্ভূত হয় না,—তা নয়। স্বভাবের অন্তর্ভূত অথচ অতিরিক্ত। কথাটা হঠাৎ শুনিতে কতকটা আত্ম-বিরোধী বটে, তথাচ কথাটা ঠিক। শিল্প-সম্বন্ধেও ঠিক, সাহিত্য-সম্বন্ধেও ঠিক। শিল্প এবং সাহিত্য উভয়ই স্বভাবের অনুকৃত বা অন্তর্ভূত, অথচ অল্পাধিক পরিমাণে স্বভাবাতিরিক্ত। স্বভাবাতিরিক্ত অর্থে একেবারেই "দুনিয়া ছাড়া"—তা নয়। স্বভাবের মাল-মসলা লইয়াই স্বভাবাতিরিক্তের সৃষ্টি হয়। যাহা স্বভাবের বহু স্থানে, বহু খণ্ডে বিন্যস্ত, তাহার একত্রীকরণ, সারাংশ সামঞ্জস্য ও সমষ্টিকে এক অর্থে স্বভাবা-তিরিক্ত বলা যায়। তাৎপর্য্য এই যে, বাহ্য বা আন্তর-প্রকৃতিতে যাহা সচরাচর বা কখনও একাধারে একত্রে দেখিতে পাওয়া যায় না, তাহাই স্বভাবাতিরিক্ত বলিয়া অভিহিত হয়। স্বভাবাতিরিক্ত অর্থে অস্বাভাবিক নয়, সৃষ্টির বহির্ভূতও নয়। ষোল আনা স্বাভাবিক এবং সম্যক্‌প্রকারে সৃষ্টি-সম্ভূত। সৃষ্টি-সম্ভূত ও স্বাভাবিক, অথচ সৃষ্টি ও স্বভাবের কিছু অতিরিক্ত। অতিরিক্তটুকু কোথায়? তাহা স্বভাবের সামগ্রীকে মানুষের সাজাইবার কৌশলে,—সংগ্রহ করিবার মুন্সিআনায়। মোটের উপর ধরিলে, মোটামুটি হিসাব করিলে, এই কৌশল বা মুন্সিআনাই—শিল্প-সাহিত্য। রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ, দোষ, গুণ, দৃশ্য,—সুন্দর মনোহর, ভয়ঙ্কর কুৎসিত কদর্য্য,—মহতের মহৎ, নীচের নীচ,—সংসারে বা স্বভাবে সবই আছে। শিল্প বা সাহিত্য সেই 'সব' হইতে 'রকমারি' বাছিয়া, ঘসিয়া মাজিয়া, ঝালিয়া কাটিয়া ছাটিয়া, চোস্ত দোরস্ত করিয়া, যার পর যেটি বসিলে মানুষের চোখে মানায়, মনের মত হয় ও মনের পরিসর বৃদ্ধি করে, সেইরূপ শ্রেণীবদ্ধ করিয়া, অথচ স্বভাবের সহিত ষোল আনা সামঞ্জস্য রাখিয়া, স্বভাবের সামগ্রীগুলি নিজের বক্ষে ধারণ করে। সাহিত্যের কাট-ছাট এমনতর হওয়া চাই যে, একদিকে তাহা মানুষের মনে 'মানাইবে'—আর একদিকে স্বভাবের সহিত খাপিবে। উভয়ের কোনটির ব্যতিক্রম হইলে চলিবে না। [illegible] 'মানানসই' না হইলে সাহিত্যের উদ্দেশ্য উত্তমরূপে সাধিত হইবে না, স্ব[illegible] আপন্ত

হইলেও সেইরূপ ব্যর্থ হইবে; যাহা স্বভাবের সহিত অখাপন্ত—তাহা অস্বাভাবিক। যাহা অস্বাভাবিক বা নেহাৎ অতি-স্বাভাবিক, তাহা মানুষের মনে ভাল ধরে না। মানুষের মনে ধরে, যাহা স্ব ভাবাতিরিক্ত অথচ স্বাভাবিক; শিল্প এবং সাহিত্য মানুষের কৃত, এবং মানুষেরই জন্য। যাহা মানুষের মনে ধরার উপযোগী, শিল্প এবং সাহিত্যকে তাহাই সংগ্রহ বা সৃষ্টি করিতে হয়। শিল্প এবং সাহিত্য স্বভাব হইতে সামগ্রী লইয়া স্বভাবাতিরিক্ত আর এক সংসার সৃষ্টি করেন। শিল্প-সাহিত্য-সংসারে আমাদের এই 'ঘর-সংসারেরই' অতিরিক্ত সব থাকে, অথচ তাহা এ সংসারের অতিরিক্ত আর এক সংসার। এ সংসারের উদ্দেশ্য কি? আবশ্যকতা কি? উদ্দেশ্য অনেক। আবশ্যকতাও অনেক। মানুষের 'মানুষ' হইতে, তাহার পর মানুষ হইয়া দেবতা হইতে, কত কি না আবশ্যক! মানুষের মার্জিত এবং উন্নত হইতে অনেক সামগ্রীর প্রয়োজন হয়; কাজেই সাহিত্যের উদ্দেশ্যও অনেক। আবশ্যকতার অনুপাতেই উদ্দেশ্য। ঐ সাহিত্য-সম্ভূত সংস্কারের উদ্দেশ্য, অবশ্য সাধারণতঃ বলিতে গেলে, মানুষের মনে তুষ্টি ও তৃপ্তি-সম্পাদন এবং সেই সঙ্গে যুগপৎ মহদাদর্শ-সংস্থাপন, উচ্চ উপদেশ-বিজ্ঞাপন, এক কথায়, মানুষের প্রকৃত মনুষ্যত্ব-সংগঠন। কিন্তু উদ্দেশ্য বা আবশ্যকতা-সম্বন্ধে আমাদের আপাতত বেশী কথা নাই। কথা হইতেছে, সাহিত্য-সম্ভূত সংসার লইয়া। বলিয়াছি যে, সে সংসার স্বাভাবিক; অথচ অল্প-বিস্তর স্বভাবাতিরিক্ত। স্বভাবাতিরিক্ত না বলিয়া সংসারাতিরিক্ত বলিলে আমাদের কথাটি আরও বিশদ হয়। এইরূপ স্বাভাবিক ও সেই সঙ্গে স্বভাবাতিরিক্ত বা সংসারাতিরিক্ত সৃষ্টির অবতারণা করার প্রথাটি সাহিত্যে বহুকালাবধি চলিয়া আসিতেছে।

কথাটা আর এক দিক্ দিয়া দেখা যাউক। মানুষে যাহা কিছু নির্ম্মাণ করে, চিত্র করে, লেখে, বলে, বর্ণনা করে, রচনা করে, সকলেতেই স্বভাবের অনুলিপি লয়। অনুলিপি লয়, কিন্তু তাহা অবিকল লয় না। লইলে চলে না, লইতে পারে না, লওয়া উপযোগী নয়, সম্ভবও নয়। চিত্রে এক 'পোঁচ' বেশীও হয়, এক পোঁচ কমও পড়ে। লেখা বা বলায় এক-আখর কমও হয়, দু-আখর বেশীও হয়। প্রকৃত প্রতিলেখ্য বা অবিকল অনুলিপি সম্ভবেও না—ভাষা ও সাহিত্যে তাহা খাপেও না। ভাষা-বদ্ধ বা সাহিত্যভুক্ত করিতে হইলে, লম্বা বিষয় খাট করিয়া লইতে হয়, আবার সংকীর্ণকেও একটু প্রশস্ত করিতে হয়। আবৃতকে অনাবৃত ও অনাবৃতকে আবৃত করিতে হয়। অফুটন্তকে ফুটন্ত, ফুটন্তকে আরও ফুটন্ত করিতে হয়; আবার জ্বলন্তকেও নিবাইতে হয়। উলঙ্গ অনাচ্ছাদিতের উপর আচ্ছাদন দিতে হয়। পরন্তু এই আবৃত ও অনাবৃতকরণ-প্রণালীকেও সীমাবদ্ধ করিতে হয়। এ সব না করিলে চলে না। করাতেই ভাষার ভাষাত্ব রক্ষা হয়, সাহিত্যের সৌন্দর্য্য-বৃদ্ধি এবং উদ্দেশ্য সাধিত হয়।

প্র[illegible] পূণ প্রতিলেখ্য লওয়া অসম্ভব, কারণ লিপিকর অপূর্ণ। লওয়া উপরে [illegible]হারও ঐ কারণ। সাহিত্যে প্রকৃতির প্রকাণ্ড স্থূল শরীর ধরে না,

স্বভাবের বিরাট দেহের স্থান সাহিত্যে হইতে পারে না। তবে কি সাহিত্য স্বভাবকে সম্যক্‌রূপে প্রতিফলিত করে না? করে, কিন্তু সূক্ষ্মভাবে। **সাহিত্য স্বভাবের 'সূক্ষ্মশরীর'।** প্রকৃতির প্রকাণ্ডতাও সাহিত্য প্রতিফলিত করে,—যেমন মানুষের সূক্ষ্ম শরীরে তাহার স্থূল শরীরের সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থাকার বিষয় কথিত আছে। পরন্তু সূক্ষ্ম শরীর যেমন স্থূল শরীরের অন্তর্ভূত অথচ অতিরিক্ত, সেইরূপ সাহিত্য স্বভাবের অন্তর্ভূত অথচ স্বভাবাতিরিক্ত।

যাহা প্রতিনিয়ত প্রত্যক্ষ, যাহা প্রাত্যহিক, তাহা মনুষ্য-চক্ষে পুরাতন, সাধারণতঃ আকর্ষণ-শক্তি-বর্জিত; কাজেই অল্লাধিক পরিমাণে অগ্রাহ্য। তাহাতে নবীনত্ব নাই, বিশেষত্বও নাই; কাজেই মনোরঞ্জন বা চিত্ত-আকর্ষণ করে না। এই জন্য সাহিত্য প্রতিনিয়ত প্রত্যক্ষ প্রাত্যহিক, নবীনত্ব ও বিশেষত্ব-বিবর্জিত সাধারণ প্রকৃতির সংক্ষিপ্ত-সার মাত্র সংকলন করিয়া লয়েন এবং তৎসহযোগে বিশেষত্ব-নবীনত্ব-সমন্বিত, চিত্ত-আকর্ষণ ও মনোমোহন-ক্ষম আদর্শ প্রকৃতির সৃষ্টি করেন। প্রকৃতির প্রত্যেক পদক্ষেপের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইয়া, তাহার উনকোটী 'খুঁটিনাটি' সাহিত্য গণনা করেন না; তাহা করেন—বিজ্ঞান; তাও বিশেষ বিশেষ স্থলে। প্রকৃতির প্রত্যেক ঘটনা, ইঞ্চি ফুট, বট বুরুল মাপিয়া মাপিয়া তাহার হিসাব-নিকাশ করা, সাহিত্যের কাজ নয়। অন্তত সে কাজ সাহিত্য এত কাল করেন নাই। করিবার আবশ্যকতা বুঝেন নাই। আদর্শ চিত্র বা চরিত্র আঁকিয়াই সাহিত্য নিশ্চিন্ত; সে চিত্র বা চরিত্রকে স্বাভাবিক অথচ স্বভাবাতিরিক্ত করিতে সচেষ্টিত। মধুমক্ষিকার মত সৌন্দর্য্য-মধু আহরণ করতঃ, ভাব-বৈভব সংগ্রহ করতঃ, নিজ-বক্ষে ধারণ করিয়া সাহিত্য গৌরবান্বিত। শব্দাড়ম্বর-বিরহিত, শব্দ-সম্পদ্‌-সুসজ্জিত, একটি উপমা বা দুইটি অলঙ্কার-দ্বারা, সাহিত্য অসংখ্য শব্দ, ভূরি ভূরি ভাব, প্রকৃতির অনেকটা অংশ-প্রকাশে সুপটু ও যত্নবান্‌। সাহিত্য এই নিয়মে এতকাল চলিয়া আসিয়াছেন ও এখনও আসিতেছেন। কাব্য কবিতা, সংগীত বক্তৃতা, নাটক নবেল, কাহিনী উপন্যাস-আদি সূক্ষ্ম সুকুমার সাহিত্য, সমগ্র রসময় শাস্ত্র, এদেশ সেদেশ সকল দেশেই, উক্ত নিয়মে চলিয়াছে। এখনও যে না চলিতেছে, তা নয়। এখনও চলিতেছে এবং পরেও বোধ করি চলিবে। তবে নিয়মটা সম্বন্ধে ইদানীং একটা কথা উঠিয়াছে; প্রতিকূল সমালোচনাও একটা চলিতেছে। বহু কালের এই পুরাতন নিয়মের পরিবর্ত্তে আর একটা নূতন নিয়ম, অভিনব প্রণালী—অবলম্বন করিয়া সাহিত্য-ক্ষেত্রে কিছু কিছু কার্য্যও আরম্ভ হইয়াছে। পুরাতন স্তরের উপর বসিয়া একটা নূতন স্তর-প্রস্তুতের অল্প-বিস্তর উদ্যোগ হইতেছে। উদ্যোগটা অবশ্য হইতেছে, ইয়ুরোপে। তবে ইয়ুরোপই নাকি আজিকাল সকল পৃথিবীর পৃথিবী; সকল দিক্‌-দেশের অধিনেত্রী; আর ইয়ুরোপীয় সাহিত্যের "আঁচ" নাকি আমাদের এখানকার সাহিত্যের গায়ে বিশেষ রূপে লাগিয়াছে, লাগিতেছে, লাগিবে,—আর সে "আঁচ" নাকি [illegible] এড়াইতে পারি না, এড়াইতে চাই না, তাই অদ্যকার এই আলোচনা। [illegible] পীয়

সাহিত্যে কোথায় কি হইল, কোন্ স্তরের পর কোন্ স্তর উঠিল বা উঠিবার উপক্রম হইল, তাহার অন্বেষণ বা আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবার আমাদের প্রয়োজন কি?

[নবজীবন, ১২৯৩]

রাজসিংহ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

•

রাজসিংহ প্রথম হইতে উল্টাইয়া গেলে এই কথাটি বারম্বার মনে হয় যে, কোনো ঘটনা কোনো পরিচেছদ কোথাও বসিয়া কালক্ষেপ করিতেছে না। সকলেই অবিশ্রাম চলিয়াছে। এবং সেই অগ্রসর-গতিতে পাঠকের মন সবলে আকৃষ্ট হইয়া গ্রন্থের পরিণামের দিকে বিনা আয়াসে ছুটিয়া চলিয়াছে।

এই অনিবার্য্য অগ্রসর-গতি সঞ্চার কবিবার জন্য বঙ্কিম বাবু তাঁহার প্রত্যেক পরিচেছদ হইতে সমস্ত অনাবশ্যক ভার দূরে ফেলিয়া দিয়াছেন। অনাবশ্যক কেন, অনেক আবশ্যক ভারও বর্জন করিয়াছেন—কেবল অত্যাবশ্যকটুকু রাখিয়াছেন মাত্র।

কোনো ভীরু লেখকের হাতে পড়িলে ইহার মধ্যে অনেকগুলি পরিচেছদে বড়ো বড়ো কৈফিয়ৎ বসিত। জবাবদিহির ভয়ে তাহাকে অনেক কথা বাড়াইয়া লিখিতে হইত। সম্রাটের অন্তঃপুরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া বাদসাহজাদীর সহিত মোবারকের প্রণয়ব্যাপার, তাহা লইয়া দুঃসাহসিকা আতরওয়ালী দরিয়ার প্রগল্‌ভতা, চঞ্চলকুমারীর নিকট আপন পরামর্শ ও পাঞ্জাসমেত যোধপুরী বেগমের দূতীপ্রেরণ, সেনাপতির নিকট নৃত্যকৌশল দেখাইয়া দরিয়ার পুরুষবেশী অশ্বারোহী সৈনিক সাজিবার সম্মতি-গ্রহণ —এ-সমস্ত যে একেবারেই সম্ভবাতীত তাহা না হইতে পারে—কিন্তু ইহাদের সত্যতার বিশিষ্ট প্রমাণ আবশ্যক। বঙ্কিমবাবু এক একটি ছোটো ছোটো পরিচেছদে ইহাদিগকে এমন অবলীলাক্রমে অসঙ্কোচে ব্যক্ত করিয়া গেছেন যে কেহ তাঁহাকে সন্দেহ করিতে সাহস করে না। ভীতু লেখকের কলম এই সকল জায়গায় ইতস্ততঃ করিত, অনেক কথা বলিত এবং অনেক কথা বলিতে গিয়াই পাঠকের সন্দেহ আরো বেশি করিয়া আকর্ষণ করিত।

বঙ্কিমবাবু একে তো কোথাও কোনোরূপ জবাবদিহি করেন নাই, তাহার উপরে আবার মাঝে [illegible] নির্দ্দোষ পাঠকদিগকেও ধমক দিতে ছাড়েন নাই। মাণিকলাল যখন প[illegible] অপরিচিতা নির্ম্মলকুমারীকে তাহার সহিত এক ঘোড়ায় উঠিয়া সিদ্[illegible] খন তাহার নিকট বিবাহের প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করিয়া অবিলম্বে

মাণিকলালের অনুরোধ রক্ষা করিল, তখন লেখক কোথায় তাঁহার স্বরচিত পাত্রগুলির এইরূপ অপূর্ব্ব ব্যবহারে কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইবেন তাহা না হইয়া উলটিয়া তিনি বিস্মিত পাঠকবর্গের প্রতি কটাক্ষপাত করিয়া বলিয়াছেন—

"বোধ হয় কোর্টশিপটা পাঠকের বড়ো ভাল লাগিল না। আমি কি করিব? ভালোবাসা-বাসি কথা একটাও নাই—বহুকাল-সঞ্চিত-প্রণয়ের কথা কিছু নাই—'হে প্রাণ!' 'হে প্রাণাধিকা!' সে-সব কিছুই নাই—ধিক্!"

এই গ্রন্থবর্ণিত পাত্রগণের চরিত্রের বিশেষতঃ স্ত্রীচরিত্রের মধ্যে বড়ো একটা দ্রুততা আছে। তাহারা বড়ো বড়ো সাহসের এবং নৈপুণ্যের কাজ করে অথচ তৎপূর্ব্বে যথেষ্ট ইতস্ততঃ অথবা চিন্তা করে না। সুন্দরী বিদ্যুৎরেখার মতো এক নিমেষে মেঘাবরোধ ছিন্ন করিয়া লক্ষ্যের উপর গিয়া পড়ে, কোনো প্রস্তরভিত্তি সেই প্রলয়গতিকে বাধা দিতে পারে না।

স্ত্রীলোক যখন কাজ করে তখন এমনি করিয়াই কাজ করে। তাহার সমগ্র মনপ্রাণ লইয়া বিবেচনা-চিন্তা বিসর্জন দিয়া একেবারে অব্যবহিত ভাবে উদ্দেশ্যসাধনে প্রবৃত্ত হয়। কিন্তু যে হৃদয়বৃত্তি প্রবল হইয়া তাহার প্রাত্যহিক গৃহকর্ম্মসীমার বাহিরে তাহাকে অনিবার্য্য বেগে আকর্ষণ করিয়া আনে, পাঠককে পূর্ব্ব হইতে তাহার একটা পরিচয় একটু সংবাদ দেওয়া আবশ্যক। বঙ্কিমবাবু তাহা পূরাপূরি দেন নাই।

সেইজন্য রাজসিংহ প্রথম পড়িতে পড়িতে মনে হয় সহসা এই উপন্যাস-জগৎ হইতে মাধ্যাকর্ষণ-শক্তির প্রভাব যেন অনেকটা হ্রাস হইয়া গিয়াছে। আমাদিগকে যেখানে কষ্টে চলিতে হয় এই উপন্যাসের লোকেরা সেখানে লাফাইয়া চলিতে পারে। সংসারে আমরা চিন্তা-শঙ্কা-সংশয়ভারে ভারাক্রান্ত, কার্য্যক্ষেত্রে সর্ব্বদাই দ্বিধাপরায়ণ মনের বোঝাটা বহিয়া বেড়াইতে হয়—কিন্তু রাজসিংহ-জগতে অধিকাংশ লোকের যেন আপনার ভার নাই।

যাহারা আজকালকার ইংরাজি নভেল বেশি পড়ে তাহাদের কাছে এই লঘুতা বড়ো বিস্ময়জনক। আধুনিক ইংরাজি নভেলে পদে পদে বিশ্লেষণ—একটা সামান্যতম কার্য্যের সহিত তাহার দূরতম কারণপরম্পরা গাঁথিয়া দিয়া সেটাকে বৃহদাকার করিয়া তোলা হয়—ব্যাপারটা হয় তো ছোটো কিন্তু তাহার নথীটা বড়ো বিপর্য্যয়। আজ-কালকার নভেলিষ্টরা কিছুই বাদ দিতে চান না, তাঁহাদের কাছে সকলই গুরুতর। এই জন্য উপন্যাসে সংসারের ওজন ভয়ঙ্কর বাড়িয়া উঠিয়াছে। ইংরাজের কথা জানি না, কিন্তু আমাদের মতো পাঠককে তাহাতে অত্যন্ত ক্লিষ্ট করে।

এই জন্য আধুনিক উপন্যাস আরম্ভ করিতে ভয় হয়। মনে হয় কর্ম্মক্লান্ত মানব-হৃদয়ের পক্ষে বাস্তব-জগতের চিন্তাভার অনেক সময়ে যথেষ্টর অপেক্ষা বেশী হইয়া পড়ে, আবার যদি সাহিত্যও নির্দ্দয় হয় তবে আর পলায়নের পথ [illegible] সাহিত্যে আমরা জগতের সত্য চাই, কিন্তু জগতের ভার চাহি না।

কিন্তু সত্যকে সম্যক্ প্রতীয়মান করিয়া তুলিবার জন্য কিয়ৎ পরিমাণে ভারের আবশ্যক, সেটুকু ভারে কেবল সত্য ভালোরূপ অনুভবগম্য হইয়া হৃদয়ে আনন্দ উৎপাদন করে ; কল্পনা-জগৎ প্রত্যক্ষবৎ দৃঢ় স্পর্শযোগ্য ও চিরস্থায়ী-রূপে প্রতিষ্ঠিত বোধ হয়।

বঙ্কিমবাবু রাজসিংহে সেই আবশ্যক ভারেরও কিয়দংশ যেন বাদ দিয়াছেন বোধ হয়। ভারে যেটুকু কম পড়িয়াছে গতির দ্বারায় তাহা পূরণ করিয়াছেন। উপন্যাসের প্রত্যেক অংশ অসন্দিগ্ধরূপে সম্ভবপর ও প্রশ্নসহ করিয়া তুলেন নাই, কিন্তু সমস্তটার উপর দিয়া এমন দ্রুত অবলীলা-ভঙ্গীতে চলিয়া গিয়াছেন যে প্রশ্ন করিবার আবশ্যক হয় নাই। যেন রেলপথের মাঝে মাঝে এমন এক আধটা ব্রিজ আছে যাহা পূরা মজবুত বলিয়া বোধ হয় না—কিন্তু চালক তাহার উপর দিয়া এমন দ্রুত গাড়ি লইয়া চলে যে, ব্রিজ ভাঙিয়া পড়িবার অবসর পায় না।

এমন হইবার কারণও স্পষ্ট পড়িয়া রহিয়াছে। যখন বৃহৎ সৈন্যদল যুদ্ধ করিতে চলে তখন তাহারা সমস্ত ঘরকন্না কাঁধে করিয়া লইয়া চলিতে পারে না। বিস্তর আবশ্যক দ্রব্যের মায়াও তাহাদিগকে ত্যাগ করিতে হয়। চলৎ-শক্তির বাধা তাহাদের পক্ষে মারাত্মক। গৃহস্থ মানুষের পক্ষে উপকরণের প্রাচুর্য্য এবং ভার-বাহুল্য শোভা পায়।

রাজসিংহের গল্পটা সৈন্যদলের চলার মতো—ঘটনাগুলা বিচিত্র ব্যূহরচনা করিয়া বৃহৎ আকারে চলিয়াছে। এই সৈন্যদলের নায়ক যাঁহারা তাঁহারাও সমান বেগে চলিয়াছেন, নিজের সুখদুঃখের খাতিরে কোথাও বেশিক্ষণ থামিতে পারিতেছেন না।

একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক্। রাজসিংহের সহিত চঞ্চলকুমারীর প্রণয়ব্যাপারটা তেমন ঘনাইয়া উঠে নাই বলিয়া কোনো কোনো পাঠক এবং সম্ভবত বহুসংখ্যক পাঠিকা আক্ষেপ করিয়া থাকেন। বঙ্কিমবাবু বড়ো একটি দুর্লভ অবসর পাইয়াছিলেন—এই সুযোগে কন্দর্পের পঞ্চশরে এবং করুণরসের বরুণবাণে দিগ্বিদিক্ সমাকুল করিয়া তুলিতে পারিতেন।

কিন্তু তাহার সময় ছিল না। ইতিহাসের সমস্ত প্রবাহ তখন একটি সঙ্কীর্ণ সন্ধিপথে বজ্রস্তনিতরবে ফেনাইয়া চলিতেছে—তাহারই উপর দিয়া সামাল্ সামাল্ তরী। তখন রহিয়া-বসিয়া ইনিয়া-বিনিয়া প্রেমাভিনয় করিবার সময় নহে।

তখনকার যে প্রেম, সে অত্যন্ত বাহুল্যবর্জিত সংক্ষিপ্ত সংহত। সে তো বাসর-রাত্রের সুখশয্যার বাসন্তী প্রেম নহে—ঘন বর্ষার কালরাত্রে মৃত্যু হঠাৎ পশ্চাৎ হইতে আসিয়া দোলা দিয়াছে—মান-অভিমানে লাজ-লজ্জা বিসর্জন দিয়া ত্রস্ত নায়িকা চকিত বাহুপাশে নায়ককে বাঁধিয়া ফেলিয়াছে। এখন সুদীর্ঘ সুমধুর ভূমিকার সময় নহে।

এই [illegible]ঘাৎ মৃত্যুর দোলায় সকলেই সজাগ হইয়া উঠিয়াছে এবং আপনার—অন্তরব[illegible]র আলিঙ্গন অনুভব করিতেছে। কোথায় ছিল ক্ষুদ্র রূপনগরের অন্তঃ[illegible]লিকা,—কালক্রমে সে কোন্ ক্ষুদ্র রাজপুত নৃপতির শত রাজ্ঞীর

মধ্যে অন্যতম হইয়া অসম্ভব-চিত্রিত লতার উপরে অসম্ভব-চিত্রিত পক্ষী-খচিত শ্বেত-প্রস্তররচিত কক্ষপ্রাচীর-মধ্যে পুরু গালিচায় বসিয়া রঙ্গসঙ্গিনীগণের হাসিটিট্‌কারী-পরিবৃত হইয়া আলবোলায় তামাকু টানিত, সেই পুষ্পপ্রতিমা সুকুমার সুন্দর বালিকাটুকুর মধ্যে কি এক দুর্ব্বার দুর্দ্ধর্ষ প্রাণশক্তি জাগ্রত হইয়া উঠিল—সে আজ বাঁধমুক্ত বন্যার একটি গর্ব্বোদ্ধত প্রবল তরঙ্গের ন্যায় দিল্লির সিংহাসনে গিয়া আঘাত করিল। কোথায় ছিল মোগল রাজপ্রাসাদের রত্নখচিত রঙমহলে সুন্দরী জেব্‌উন্নিসা—সে সুখের উপর সুখ, বিলাসের উপর বিলাস বিকীর্ণ করিয়া আপনার অন্তরাত্মাকে আরামের পুষ্পরাশির মধ্যে আচ্ছন্ন অচেতন করিয়া রাখিয়াছিল, সে-দিনের সেই মৃত্যুদোলায় হঠাৎ তাহার অন্তরশয্যা হইতে জাগ্রত হইয়া তাহাকে কোন্ মহাপ্রাণী এমন নিষ্ঠুর কঠিন বাহুবেষ্টনে পীড়ন করিয়া ধরিল, সম্রাট্‌দুহিতাকে কে সেই সর্ব্বত্রগামী দুঃখের হস্তে সমর্পণ করিল, যে-দুঃখ প্রাসাদের রাজরাজেশ্বরীকেও কুটীরবাসিনী কৃষককন্যার সহিত এক বেদনাশয্যায় শয়ন করাইয়া দেয়। দস্যু মাণিকলাল হইল বীর, রূপমুগ্ধ মোবারক মৃত্যু-সাগরে আত্মবিসর্জন করিল, গৃহপিঞ্জরের নির্ম্মলকুমারী বিপ্লবের বহিরাকাশে উড়িয়া আসিল এবং নৃত্যকুশলা পতঙ্গচপলা দরিয়া সহসা অট্টহাস্যে মুক্তকেশে কালনৃত্যে আসিয়া যোগ দিল!

অর্দ্ধরাত্রির এই বিশ্বব্যাপী ভয়ঙ্কর জাগরণের মধ্যে কি মধ্যাহ্নকুলায়বাসী প্রণয়ের করুণ কপোতকূজন প্রত্যাশা করা যায়?

রাজসিংহ দ্বিতীয় বিষবৃক্ষ হয় নাই বলিয়া আক্ষেপ করা সাজে না। বিষবৃক্ষের সুতীব্র সুখদুঃখের পাকগুলা প্রথম হইতেই পাঠকের মনে কাটিয়া-কাটিয়া বসিতেছিল। অবশেষে শেষ কয়টা পাকে হতভাগ্য পাঠকের একেবারে কণ্ঠরুদ্ধ হইয়া আসে। রাজসিংহের প্রথম দিকের পরিচ্ছেদগুলি মনের উপর সেরূপ রক্তবর্ণ সুগভীর চিহ্ন দিয়া যায় না তাহার কারণ রাজসিংহ স্বতন্ত্র জাতীয় উপন্যাস।

প্রবন্ধ লিখিতে বসিয়াছি বলিয়াই মিথ্যা কথা বলিবার আবশ্যক দেখি না। কাল্পনিক পাঠক খাড়া করিয়া তাহাদের প্রতি দোষারোপ করা আমার উচিত হয় না। আসল কথা এই যে, রাজসিংহ পড়া আরম্ভ করিয়া আমারই মনে প্রথম প্রথম খট্‌কা লাগিতেছিল। আমি ভাবিতেছিলাম, বড়ই বেশী তাড়াতাড়ি দেখিতেছি—কাহারো যেন মিষ্ট মুখে দুটো ভদ্রতার কথা বলিয়া যাইবারও অবসর নাই। মনের ভিতর এমন আঁচড় দিয়া না গিয়া আর একটু গভীরতররূপে কর্ষণ করিয়া গেলে ভালো হইত। —যখন এই সকল কথা ভাবিতেছিলাম তখন রাজসিংহের ভিতরে গিয়া প্রবেশ করি নাই।

পর্ব্বত হইতে প্রথম বাহির হইয়া যখন নির্ঝরগুলা পাগলের মতো ছুটিতে আরম্ভ করে, তখন মনে হয় তাহারা খেলা করিতে বাহির হইয়াছে—মনে হয় না তাহারা কোনো কাজের। পৃথিবীতেও তাহারা গভীর চিহ্ন অঙ্কিত করিতে পারে না। কিছুদূর তাহাদের পশ্চাতে অনুসরণ করিলে দেখা যায় নির্ঝরগুলা

গভীরতর হইয়া ক্রমেই প্রশস্ততর হইয়া পর্ব্বত ভাঙিয়া পথ কাটিয়া জয়ধ্বনি করিয়া মহাবলে অগ্রসর হইতেছে—সমুদ্রের মধ্যে মহাপরিণাম প্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বে তাহার আর বিশ্রাম নাই।

রাজসিংহেও তাই। তাহার এক একটি খণ্ড এক একটি নির্ঝরের মতো দ্রুত ছুটিয়া চলিয়াছে। প্রথম প্রথম তাহাতে কেবল আলোকের ঝিকিঝিকি এবং চঞ্চল লহরীর তরল কলধ্বনি —তাহার পর ষষ্ঠখণ্ডে দেখি ধ্বনি গম্ভীর, স্রোতের পথ গভীর এবং জলের বর্ণ ঘনকৃষ্ণ হইয়া আসিতেছে, তাহার সপ্তম খণ্ডে দেখি কতক বা নদীর স্রোত কতক বা সমুদ্রের তরঙ্গ, কতক বা অমোঘ পরিণামের মেঘগম্ভীর গর্জন, কতক বা তীব্র লবণাশ্রুনিমগ্ন হৃদয়ের সুগভীর ক্রন্দনোচ্ছ্বাস, কতক বা ব্যক্তিবিশেষের মজ্জমান তরণীর প্রাণপণ হাহাধ্বনি। সেখানে নৃত্য অতিশয় রুদ্র, ক্রন্দন অতিশয় তীব্র এবং ঘটনাবলী ভারত-ইতিহাসের একটি যুগাবসান হইতে যুগান্তরের দিকে ব্যাপ্ত হইয়া গিয়াছে।

রাজসিংহ ঐতিহাসিক উপন্যাস। ইহার নায়ক কে কে? ঐতিহাসিক অংশের নায়ক ঔরংজেব, রাজসিংহ এবং বিধাতাপুরুষ—উপন্যাস-অংশের নায়ক আছে কি না জানি না, নায়িকা জেব্‌উন্নিসা।

রাজসিংহ, চঞ্চলকুমারী, নির্ম্মলকুমারী, মাণিকলাল প্রভৃতি ছোটো বড়ো অনেকে মিলিয়া সেই মেঘদুর্দ্দিন রথযাত্রার দিনে ভারত-ইতিহাসের রথ-রজ্জু আকর্ষণ করিয়া দুর্গম বন্ধুর পথে চলিয়াছিল। তাহাদের মধ্যে অনেকে লেখকের কল্পনাপ্রসূত হইতে পারে, তথাপি তাহারা এই ঐতিহাসিক অংশেরই অন্তর্গত। তাহাদের জীবন-ইতিহাসের, তাহাদের সুখদুঃখের স্বতন্ত্র মূল্য নাই—অর্থাৎ এ-গ্রন্থে প্রকাশ পায় নাই।

জেব্‌উন্নিসার সহিত ইতিহাসের যোগ আছে বটে কিন্তু সে যোগ গৌণভাবে। সে যোগটুকু না থাকিলে এ-গ্রন্থের মধ্যে তাহার কোনো অধিকার থাকিত না। যোগ আছে কিন্তু বিপুল ইতিহাস তাহাকে গ্রাস করিয়া আপনার অংশীভূত করিয়া লয় নাই, সে আপনার জীবন-কাহিনী লইয়া স্বতন্ত্রভাবে দীপ্যমান হইয়া উঠিয়াছে।

সাধারণ ইতিহাসের একটা গৌরব আছে। কিন্তু স্বতন্ত্র মানবজীবনের মহিমাও তদপেক্ষা ন্যূন নহে। ইতিহাসের উচচচূড় রথ চলিয়াছে, বিস্মিত হইয়া দেখ, সমবেত হইয়া মাতিয়া উঠ, কিন্তু সেই রথচক্রতলে যদি একটি মানবহৃদয় পিষ্ট হইয়া ক্রন্দন করিয়া মরিয়া যায় তবে তাহার সেই মর্ম্মান্তিক আর্ত্তধ্বনিও—রথের চূড়া যে গগনতল স্পর্শ করিতে স্পর্দ্ধা করিতেছে—সেই গগনপথে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে, হয় তো সেই রথচূড়া ছাড়াইয়া চলিয়া যায়।

বঙ্কিমবাবু সেই ইতিহাস এবং মানব উভয়কেই একত্র করিয়া এই ঐতিহাসিক উপন্যাস [illegible]রিয়াছেন।

[illegible]তীয় ইতিহাসের এবং তীব্র মানব-ইতিহাসের পরস্পরের মধ্যে [illegible] যোগ রাখিয়াছেন।

মোগল সাম্রাজ্য যখন সম্পদে এবং ক্ষমতায় স্ফীত হইয়া একান্ত স্বার্থপর হইয়া উঠিল, যখন সে, সম্রাটের পক্ষে ন্যায়পরতা অনাবশ্যক বোধ করিয়া, প্রজার সুখদুঃখে একেবারে অন্ধ হইয়া পড়িল, তখন তাহার জাগরণের দিন উপস্থিত হইল।

বিলাসিনী জেব্‌উন্নিসাও মনে করিয়াছিল সম্রাট্‌দুহিতার পক্ষে প্রেমের আবশ্যক নাই, সুখই একমাত্র শরণ্য। সেই সুখে অন্ধ হইয়া যখন সে দয়াধর্ম্মের মস্তকে আপন জরি-জহরৎজড়িত পাদুকাখচিত সুন্দর বামচরণখানি দিয়া পদাঘাত করিল তখন কোন্ অজ্ঞাত গুহাতল হইতে কুপিত প্রেম জাগ্রত হইয়া তাহার মর্ম্মস্থলে দংশন করিল, শিরায় শিরায় সুখমন্থরগামী রক্তস্রোতের মধ্যে একেবারে আগুন বহিতে লাগিল, আরামের পুষ্পশয্যা চিতাশয্যার মতো তাহাকে দগ্ধ করিল—তখন সে ছুটিয়া বাহির হইয়া উপেক্ষিত প্রেমের কণ্ঠে বিনীত দীনভাবে সমস্ত সুখসম্পদের বরমাল্য সমর্পণ করিল—দুঃখকে স্বেচ্ছায় বরণ করিয়া হৃদয়াসনে অভিষেক করিল। তাহার পরে আর সুখ পাইল না কিন্তু আপন সচেতন অন্তরাত্মাকে ফিরিয়া পাইল। জেব্‌উন্নিসা সম্রাট্‌-প্রাসাদের অবরুদ্ধ অচেতন আরামগর্ভ হইতে তীব্র যন্ত্রণার পর ধূলায় ভূমিষ্ঠ হইয়া উদার জগতীতলে জন্মগ্রহণ করিল। এখন হইতে সে অনন্ত জগৎ-বাসিনী রমণী।

ইতিহাসের মহাকোলাহলের মধ্যে এই নবজাগ্রত হতভাগিনী নারীর বিদীর্ণপ্রায় হৃদয় মাঝে মাঝে ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া উঠিয়া রাজসিংহের পরিণাম অংশে বড়ো একটা রোমাঞ্চকর সুবিশাল করুণা ও ব্যাকুলতা বিস্তার করিয়া দিয়াছে। দুর্য্যোগের রাত্রে একদিকে মোগলের অভ্রভেদী পাষাণপ্রাসাদ ভাঙিয়া ভাঙিয়া পড়িতেছে, আর এক দিকে সর্ব্বত্যাগিনী রমণীর অব্যক্ত ক্রন্দন ফাটিয়া ফাটিয়া উঠিতেছে; সেই বৃহৎ ব্যাপারের মধ্যে কে তাহার প্রতি দৃক্‌পাত করিবে—কেবল যিনি অন্ধকার রাত্রে অতন্দ্র থাকিয়া সমস্ত ইতিহাস-পর্য্যায়কে নীরবে নিয়মিত করিতেছেন, তিনি এই ধূলি-লুণ্ঠ্যমান ক্ষুদ্র মানবীকেও অনিমেষ লোচনে নিরীক্ষণ করিতেছিলেন।

এই ইতিহাস এবং উপন্যাসকে এক সঙ্গে চালাইতে গিয়া উভয়কেই এক রাশের দ্বারা বাঁধিয়া সংযত করিতে হইয়াছে। ইতিহাসের ঘটনাবহুলতা এবং উপন্যাসের হৃদয়বিশ্লেষণ উভয়কেই কিছু খর্ব্ব করিতে হইয়াছে—কেহ কাহারও অগ্রবর্ত্তী না হয় এ-বিষয়ে গ্রন্থকারের বিশেষ লক্ষ্য ছিল দেখা যায়। লেখক যদি উপন্যাসের পাত্রগণের সুখদুঃখ এবং হৃদয়ের লীলা বিস্তার করিয়া দেখাইতে বসিতেন তবে ইতিহাসের গতি অচল হইয়া পড়িত। তিনি একটি প্রবল স্রোতস্বিনীর মধ্যে দুটি একটি নৌকা ভাসাইয়া দিয়া নদীর স্রোত এবং নৌকা উভয়কেই একসঙ্গে দেখাইতে চাহিয়াছেন। এই জন্য চিত্রে নৌকার আয়তন অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র হইয়াছে, তাহার প্রত্যেক সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম অংশ দৃষ্টিগোচর হইতেছে না। চিত্রকর যদি নৌকার ভিতরের ব্যাপারটাই বেশী করিয়া দেখাইতে চাহিতেন তবে নদীর অধিকাং[illegible] চিত্রপট হইতে বাদ পড়িত। হইতে পারে কোনো কোনো অতিকৌত[illegible] [illegible]ৌকার [illegible]ভ্যন্তরভাগ দেখিবার জন্য অতিমাত্র ব্যগ্র, এবং সেই জন্য মন[illegible]

নিন্দা করিবেন। কিন্তু সেরূপ বৃথা চপলতা পরিহার করিয়া দেখা কর্ত্তব্য লেখক গ্রন্থবিশেষে কি করিতে চাহিয়াছেন এবং তাহাতে কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছেন। পূর্ব্ব হইতে একটি অমূলক প্রত্যাশা ফাঁদিয়া বসিয়া তাহা পূর্ণ হইল না বলিয়া লেখকের প্রতি দোষারোপ করা বিবেচনাসঙ্গত নহে। গ্রন্থ-পাঠারম্ভে আমি নিজে এই অপরাধ করিবার উপক্রম করিয়াছিলাম বলিয়াই এ কথাটা বলিতে হইল।

[১৩০০]

মানসী

প্রিয়নাথ সেন

সৌন্দর্য্য-উপভোগে আমরা যে আনন্দ লাভ করি, তাহা এক দিকে যেমন বিশুদ্ধ, অপর দিকে তেমনি প্রখর। প্রখরতা-নিবন্ধন সে আনন্দ আমরা নিজের ভিতর বদ্ধ রাখিতে না পারিয়া জগৎ-সংসারকে তাহার ভাগ লইতে আহ্বান করি; এবং বিশুদ্ধ বলিয়া পরের সহিত উপভোগে সে আনন্দ কমিয়া না গিয়া বরং বাড়িতেই থাকে। ইংরেজ কবি Shelley লিখিয়াছেন, প্রেমের বিভাগ অর্থে এমন বুঝায় না যে, কাহারও প্রাপ্ত অংশ হইতে তাহাকে কিঞ্চিন্মাত্র বঞ্চিত করা। এ কথায় অনেকেরই আপত্তি থাকিতে পারে—কিন্তু সুন্দর বস্তুর সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া সকলে মিলিয়া আনন্দ ভাগ করিয়া লইলে, আনন্দ যে বাড়ে বই কমে না, তাহা আমরা প্রতিদিন দেখিতেছি। সৌন্দর্য্য-উপভোগ-প্রবৃত্তির মূলে যে পরার্থপরতা আছে, ইহা তাহার একটি সুস্পষ্ট প্রমাণ। এবং তাহা হইলেই আমরা বলিতে পারি যে, এই বৃত্তি মঙ্গলময়ী এবং ইহার পরিচালনা শুভোদ্দিষ্টা।

আমাদের সৌন্দর্য্যস্পৃহা নানা উপায়ে চরিতার্থ হয়। কিন্তু বোধ হয়, সুন্দর কাব্য হইতে আমরা যে আনন্দ পাই, তাহা সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। চিত্র-বিদ্যা, সঙ্গীত-বিদ্যা প্রভৃতি অপরাপর কলা-বিদ্যারও উদ্দেশ্য সৌন্দর্য্যের অভিব্যক্তি, কিন্তু কাব্যে যেমন বাহ্য এবং অন্তর্জগতের সৌন্দর্য্য স্থায়ী, এবং সর্ব্বাঙ্গীণ বিকাশ প্রাপ্ত হয়, এমন আর কিছুতেই হয় না। কাব্যামোদী পাঠক, তাই কোনও সুন্দর কাব্যের সন্ধান পাইলে সুখে অধীর হইয়া অপরকে তাহার রসাস্বাদনে সুখী করিতে উৎসুক হন। সু[illegible] সমালোচনার জন্ম ইহা হইতেই।

[illegible] মানসী"-পাঠে যে তীব্র এবং নিরবচ্ছিন্ন আমোদ পাইয়াছি, সচরাচর [illegible]-পাঠে তাহা ঘটিয়া উঠে না। সেই আনন্দ-উদ্বেগে প্র[illegible]

হইয়া মানসী-প্রকাশের কিছু দিন পরেই আমরা উহার একটি বিস্তৃত সমালোচনা লিখি—কিন্তু কতিপয় কারণবশতঃ উহা সাধারণ্যে প্রকাশিত হয় নাই। সম্প্রতি মানসীর দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির হইয়াছে—আমরাও তদুপলক্ষে আমাদের পূর্ব্ব-রচিত প্রবন্ধ পাঠকবর্গের সম্মুখে উপস্থিত করিলাম।

আমাদের বিবেচনায় মানসী একখানি অতি উৎকৃষ্ট, অপূর্ব্ব গ্রন্থ। অপর কোনও ভাষাতে এরূপ একখানি গ্রন্থের ভিতর এত উচচ দরের অথচ বিভিন্ন প্রকৃতির এতগুলি কবিতা সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না। কুড়ি বৎসরের ভিতর ইংরেজী বা ফরাসী ভাষায় এমন কোনও কবিতা-পুস্তক দেখিয়াছি কি?

মানসীর ভাষা এবং ভাব—যেন একই ছাঁচে একেবারে প্রকৃতির হাত হইতে বাহির হইয়াছে। বাস্তবিক ইহার কোথাও কৃত্রিমতার গন্ধ নাই। এই সকল কবিতার অসাধারণ উৎকর্ষের মূলীভূত কারণ,—তাহাদের মর্ম্মগত সত্য। কবি মানব-হৃদয়ের অকৃত্রিম ভাবসমূহের অতলস্পর্শ গভীরতা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিয়াছেন বলিয়াই, সেই চির সত্যের ভিতর কবিত্বের অমর সৌন্দর্য্যের সন্ধান পাইয়াছেন। সেইজন্য তাহার অন্বেষণে তাঁহাকে মিথ্যার দ্বারে গিয়া দাঁড়াইতে হয় নাই। প্রকৃতির চির-সৌন্দর্য্যের প্রাণ পর্য্যন্ত দেখিবার চক্ষু তাঁহার আছে বলিয়াই, তাঁহাকে বসিয়া বসিয়া চিরদিন রং ঘুঁটিতে হয় নাই। তিনি বাহ্য এবং অন্তর্জগতের এতদূর পর্য্যন্ত দেখিতে জানেন বলিয়াই, এত সৌন্দর্য্য দেখিতে পাইয়াছেন। এই গেল মানসীর ভাব বা প্রাণের কথা। ইহার বাহ্য বিকাশ অর্থাৎ ভাষা এবং ছন্দ-সম্বন্ধে ঠিক সেই কথাই খাটে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এই কবির ভাব ও ভাষা যেন এক সঙ্গে তাঁহার হৃদয়ে আবির্ভূত হইয়াছিল। অর্থাৎ স্বষ্টির হৃদয় হইতে তাঁহার হৃদয়-মধ্যে যে সৌন্দর্য্যের বার্ত্তা আসিয়াছে, তাহা একেবারে কবিত্বের আকার ধরিয়াই আসিয়াছে। সেই জন্য তাঁহাকে দ্বিতীয় বা তৃতীয় শ্রেণীর কবিদিগের ন্যায় ঘুরিয়া ঘুরিয়া শব্দ আহরণ করিতে হয় নাই—ভাব-প্রকাশের জন্য ইতস্ততঃ করিতে হয় নাই। এ দিকে আবার জোর করিয়া একটা মস্ত কথা বলিবার কোথাও প্রয়াস বা চেষ্টা দেখিলাম না। পূর্ণ প্রাণ হইতে, সুন্দর এবং পরিণত ভাষা ও ছন্দে, উচ্ছ্বাসোন্মুখ কবিতার মুক্তস্রোত হিল্লোলময়ী ধারায় নিঃসৃত হইয়াছে। সংক্ষেপে এই কবির বলিবার কথা আছে—কথা বলিবার আড়ম্বর নাই। তাই তাঁহার ভাষা সারগর্ভ, সুন্দর, পরিষ্কার, পরিস্ফুট এবং ভাবের পর্দার সঙ্গে সুমিলিত। শব্দ-বিন্যাসে তাঁহার অসাধারণ, বিস্ময়কর ক্ষমতা। আমি কেবল শব্দের লালিত্য বা মাধুর্য্যের কথা বলিতেছি না—কাব্যাংশে তাহাদের সার্থকতার কথা বলিতেছি। এ ক্ষমতা কেবল রবীন্দ্রবাবুর মানসীতেই প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা নহে: তাঁহার শৈশব-কবিতার ভিতরও ইহার ভূরি ভূরি নিদর্শন পাওয়া যায়। তাঁহার নির্ব্বাচিত শব্দগুলির ভিতর যেন স্বভাবের চিরসৌন্দর্য্য জাগিয়া রহিয়াছে- [illegible]ত্রির পূর্ণ-মোহ তাহাদের ভিতর বিদ্যমান। নিকৃষ্ট কবিদিগের বর্ণনার

[illegible]র্গের কেবলমাত্র প্রাণহীন photograph বা অন্ধ ছবি

সমস্ত জীবন তাহাদের অভ্যন্তরে প্রদীপ্ত। পাঠকালে এই শব্দমন্ত্রে আহূত হইয়া পাঠকের হৃদয়ে আবির্ভূত হয়—কখন বা স্বভাবের উদার, কখনও বা রুক্ষ, কখনও বা বিস্ময়কর দিব্য মূর্ত্তি। কেবল তাহাই নহে; প্রকৃতির সৌন্দর্য্যরাশি দেখিলে হৃদয় যে অব্যক্ত অধীরভাবে চঞ্চল হইয়া উঠে, তাহাদের ভিতর সেই অব্যক্ত অধীরতাটুকুও ব্যক্ত হইয়াছে। তাহারা কেবল বাহ্যজগতে সৌন্দর্য্যরাশি আনিয়া পাঠককে উপহার দিয়া ক্ষান্ত হয় না—কবির অন্তর্জগতের আরও মুগ্ধকর বার্ত্তা আনিয়া দেয়—আনন্দ-উন্মুখ পাঠকের প্রাণে কবির উপভোগ-গলিত তপ্তপ্রাণ ঢালিয়া দেয়। এক কথায়, তাহাদের ভিতর যেমন নিসর্গের চিরপ্রফুল্ল সৌন্দর্য্যরাশি বর্ত্তমান, তেমনই তাহারই সঙ্গে সঙ্গে কবি-হৃদয়ের মুগ্ধ উপভোগও বর্ত্তমান।

নিকৃষ্ট কবিদের নিকট ছন্দ ভাব-প্রকাশের নিগড় বা ব্যাঘাত হইতে পারে, এবং হইয়াও থাকে। কিন্তু প্রকৃত কবির হাতে ছন্দ ভাষা অপেক্ষা রস-বিকাশের শ্রেষ্ঠতর, যোগ্যতর অবলম্বন। ভাষা যাহা করিতে পারে না, ছন্দ তাহা অনায়াসে করিয়া থাকে। ভাষা যেখানে যাইতে পারে না, ছন্দের স্বর্গীয় রাগিণী সেখানে ভাব-প্রকাশের পথ অতি সুগম করিয়া দেয়। পদ্য যদি ছন্দোময়ী রচনা হয়, এবং গীতিকাব্য যদি প্রাণের উচ্ছ্বাস হয়, তবে সে উচ্ছ্বাস আর কিছুতেই তেমন প্রকাশ পায় না, যেমন ছন্দের আকুল হিল্লোলে। প্রথম শ্রেণীর কবিমাত্রেরই ছন্দের উপর আশ্চর্য্য ক্ষমতা। ছন্দের উপর ক্ষমতা অর্থে আমি বুঝিতেছি না—মাত্রা, মিল বা যতি-সংস্থাপন-সম্বন্ধে শাস্ত্রের শাসন মানিয়া চলা। এমন অনেক পদ্য আছে, যেখানে সকল নিয়মই সুন্দর রক্ষিত হইয়াছে—পড়িতে শুনিতেও যাহা বেশ সুমধুর, অথচ ছন্দের যে সৌন্দর্য্যের কথা আমি বলিতেছি, তাহাতে তাহার কিছুই নাই। সে সৌন্দর্য্য নিয়মের অধীন নয়, শিক্ষারও আয়ত্ত নয়। গায়কের কণ্ঠের ন্যায় তাহা নিতান্ত স্বভাবের সামগ্রী। বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসকে লইয়া যে পুরাতন বিবাদ আছে, এখানে তাহার মীমাংসা হইতে পারে। বিদ্যাপতির ছন্দের উপর এই আশ্চর্য্য ক্ষমতা আছে—বিদ্যাপতির গলা আছে। চণ্ডীদাসের নাই। চণ্ডীদাসের ছন্দ বেশ সুন্দর এবং মধুর, বেশ তাল-লয়-বিশিষ্ট, কিন্তু তাহাতে বিদ্যাপতির অপূর্ব্ব মোহ নাই। মলয়-সমীরণের ন্যায় তাহা হঠাৎ হৃদয়কে উৎফুল্ল করে না, প্রাণকে ভাসাইয়া দেয় না। বিদ্যাপতির বংশীর রবে প্রাণ শিহরিয়া উঠে, চিত্ত চমকিত হয়, বর্ত্তমান ভুলিয়া গিয়া কোথায় কোন্ দিকে ভাসিয়া যাই।

"কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ।"

চণ্ডীদাসের এই কয়টি কথায় বিদ্যাপতির সুন্দর কণ্ঠধ্বনি অতি সুন্দররূপেই বণি[illegible] এবং ইহাতে বিদ্যাপতির ছন্দের ঘোরও একটু আসিয়া পড়িয়াছে, [illegible]; ইহাতেও কেমন একটু আকুলতা আছে, কিন্তু দেখ, সে আকুলতা

এই কয়েক কাতর পদের দীর্ণ-বিদীর্ণ মর্ম্মোচ্ছ্বাসে ভাসিয়া ধুইয়া মগ্ন হইয়া গেল।—

" এ ভরা বাদর মাহ ভাদর
শূন্য মন্দির মোর।"

বিদ্যাপতি সুরে মুগ্ধ করেন, চণ্ডীদাস কথায় মুগ্ধ করেন। কিন্তু সুর লইয়াই ছন্দ এবং ছন্দ লইয়াই কবির কার্য্য। তাই বলিয়া এমন বুঝিও না, চণ্ডীদাসের সুর নাই বা বিদ্যাপতির কথা নাই।

ছন্দের উপর রবিবাবুর ক্ষমতা বিদ্যাপতি প্রভৃতি প্রথম শ্রেণীর কবিদিগের ন্যায়। তাঁহারও ছন্দের সুরে প্রাণ কাঁদিয়া উঠে, সুদূর নিকট হয়, নিকট সুদূর হয়। দুই চারিটি পদ্যে চক্ষে জল আসিয়া পড়ে এবং ছন্দের উচ্ছ্বাসের সঙ্গে মর্ম্ম কাঁপিতে থাকে। এই মানসীতে তাঁহার ছন্দ-রচনা-ক্ষমতার চরম উৎকর্ষ প্রদর্শিত হইয়াছে। তিনি নূতন মিল, নূতন মাত্রা, নূতন পদ-বিভাগ, যতি-সংস্থাপন আবিষ্কার করিয়াছেন। তিনি নূতন ছন্দ প্রণয়ন করিয়াছেন। বাঙ্গালা ভাষার সুপ্ত অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য্যকে উদ্বোধিত করিয়াছেন, এবং আরও বিস্ময়কর ব্যাপার—পুরাতনকে নূতন করিয়া গড়িয়াছেন। যুক্তাক্ষর-সম্বন্ধে তাঁহার অভিনব ব্যবস্থা সকল স্থানে না খাটিলেও, তিনি আমাদের পুরাতন 'আটপৌরে' পয়ার ছন্দের জরাজীর্ণতার ভিতর অনেকটা জীবনী সঞ্চারিত করিয়াছেন। তাহার সেই অলস নিদ্রাতুর "একঘেয়ে" ভাব বিদূরিত করিয়া, তাহার স্থানে জাগ্রত জীবনের সচল ভাব আনিয়া দিয়াছেন। অথচ এই অভিনব বিধানের ভিতর উৎকট কিছুই নাই—ইহা বাঙ্গালা ভাষা ও ছন্দের আভ্যন্তরিক ধাতুগত স্বাভাবিক গতির সঙ্গে বেশ খাপ খাইয়া মিশিয়া গিয়াছে। নিম্নে উদ্ধৃত এই কয়টি চরণের যতি-বিভাগে এবং বিভিন্ন স্বরের উত্থান-পতনে—অথবা জানি না কোন্ নিগূঢ় কারণে,—হৃদয়ের কি ঘোর ব্যাকুলতাই প্রকাশ পাইয়াছে, যেন আবেগভরা প্রাণের গভীর 'দুরু দুরু' এই ছন্দের তালে তালে স্পন্দিত হইতেছে।—

" তোমারেই যেন ভালবাসিয়াছি
শত রূপে শতবার
জনমে জনমে, যুগে যুগে অনিবার।
চিরকাল ধ'রে মুগ্ধ হৃদয়
গাঁথিয়াছে গীতহার,
কত রূপ ধ'রে পরেছ গলায়
নিয়েছ সে উপহার,
জনমে জনমে, যুগে যুগে অনিবার।
যত শুনি সেই অতীত কাহিনী,
প্রাচীন প্রেমের ব্যথা,
অতি পুরাতন বিরহ-মিলন-কথা,

অসীম অতীতে চাহিতে চাহিতে
দেখা দেয় অবশেষে
কালের তিমির-রজনী ভেদিয়া
তোমারি মূরতি এসে,
চির স্মৃতিময়ী ধ্রুবতারকার বেশে।"

হাজার কথা দিয়া কেহ যাহা বলিতে পারিত না, তাহা এই কতিপয় অলঙ্কারশূন্য, সাধাসিধা, অতি সরল, অতি সহজ, অতি সামান্য পদে কি চমৎকার, কি প্রাণভরা উক্তি পাইয়াছে। জানি না, শেষচরণ-পাঠে চক্ষের উপর কত জন্ম কত যুগ ঘুরিয়া যায়। কত সুদূর বৎসরের বিশাল মেঘরাশি ঠেলিয়া প্রাণ কোথায় ভাসিতে থাকে। অতীতের অনন্ত বিস্তৃতি চক্ষের সম্মুখে খুলিয়া যায়। কত অন্ধকার কত আলো আসিয়া প্রাণে পড়ে। ইহা অপেক্ষাও আরও মুগ্ধ সুন্দর সুরবিশিষ্ট পদ ও চরণ মানসীতে অনেক আছে। এ স্থলে তাহাদের উল্লেখ করিতে গেলে প্রবন্ধের শেষ হইবে না। সে যাহা হউক, আমি বলিতে চাহি যে, কবির এই মোহমন্ত্রময় শব্দ-বিন্যাস এবং অপূর্ব্ব ছন্দঃসৌন্দর্য্য রস-বিকাশে এবং ভাব-প্রকাশে তাঁহাকে অতুল ক্ষমতা দিয়াছে। ইহা-দ্বারা সকল ভাব সকল রসই বেশ পূর্ণ পরিণত অভিব্যক্তি পাইয়াছে। বিশাল সমুচচ বা সুগভীর ভাব—মানব-ভাষা যেখানে পেঁাছিতে পারে না, অতি সূক্ষ্ম কোমল মৃদুভাব —কথায় যাহাকে ধরিতে পারা যায় না, হৃদয়ান্তঃপুরচারিণী কল্পনার সেই লাজময়ী কুসুমসুকুমার মূর্ত্তি—ভাষার রূঢ় স্পর্শে যাহা মলিন হইয়া ভাঙ্গিয়া পড়ে, এ সকলই কি চমৎকার, কি অনির্ব্বচনীয় সুন্দররূপেই ব্যক্ত হইয়াছে! কখন কখন তাঁহার একটি সমগ্র কবিতা এইরূপ একটি ভাবেই পরিপূর্ণ। অথচ তিনি উচচ প্রতিভাবলে তাহাদিগকে এমনি কবিত্বময় অথচ পরিচিত ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন যে, একদিকে যেমন ভাবের নৈসর্গিক গৌরব এবং সুষমা রক্ষিত হইয়াছে, অপর দিকে পাঠকের হৃদয়ে তাহারা শৈশব সুহৃদের ন্যায় অতি সহজে প্রবেশ লাভ করে। তাহাতে অপ্রাঞ্জল কিছুই নাই—জটিলতার নামগন্ধ নাই। মানসীতে এমন অনেক কবিতা আছে। উদাহরণস্বরূপ প্রথম এবং শেষ কবিতা দুইটির উল্লেখ করিলাম। "উপহারে" যদিও ছন্দের মোহ বা অপূর্ব্বতা কিছুই নাই, তবু কি সুন্দর সরল ভাব ও ভাষায় কবির সমস্ত জীবন-কাহিনী ইহাতে চিত্রিত হইয়াছে। সে চিত্র যেমন সুন্দর, তেমনি সত্য। কবির প্রাণের সেই দুর্দ্দমনীয় সৌন্দর্য্য-পিপাসা, সৌন্দর্য্যকে ধরিবার নিমিত্ত সেই জন্মান্তরীণ আকুলতা, কি অনির্ব্বচনীয় মধুরভাবেই ব্যক্ত হইয়াছে। সৌন্দর্য্যকে কে কবে আয়ত্ত করিয়াছে, আয়ত্ত করিয়াই বা কে তাহাতে তৃপ্তি লাভ করিয়াছে? মনে করি এই বুঝি পাইলাম, পলক না ফেলিতে কই কোথায় আবার উবিয়া গেল— 'আখি পালটিতে নাহি পরতীতে যেন দরিদ্রের হেম'—এক যায়, আবার শত শত আ[illegible]ক উদ্বিগ্ন করিয়া তুলে—প্রাণের ভিতর চির-চঞ্চলতা, সুচির অশান্তি [illegible]ইটি কথায় ইহার কি সুন্দর ছবিই অঙ্কিত হইয়াছে—"রচি শুধু

অসীমের সীমা" এই কয়টি কথায় কবি-জীবনের সমস্ত উন্মত্ত আশা, প্রাণ-ভরা স্বপ্ন, হৃদয়-ভরা আবেগ এবং পৃথিবী-ভরা ব্যথা কি উক্ত হয় নাই?

গ্রন্থের শেষ কবিতাটিতে প্রেমিকের জীবন-রহস্য তেমনি সুস্পষ্ট এবং সুন্দর বর্ণিত হইয়াছে। প্রেমের সর্ব্বস্ব ধর্ম্ম ইহার ভিতর উক্ত হইয়াছে। প্রেমিকের সকল কার্য্য এবং সকল চিন্তার, সকল আশা এবং সকল কল্পনার ভিতর যে প্রিয়জনের মধুর মূর্ত্তি বিরাজ করিতেছে, তাহার অনন্ত বিশাল হৃদয়াকাশ যে প্রিয়জনের সেই ক্ষুদ্র সুন্দর মুখচন্দ্রমার অসীম জ্যোৎস্নায় চির আলোকিত, তিনি তাহার কি সুন্দর বর্ণনাই করিয়াছেন,—

"নাহি সীমা আগে পাছে, যত যাও তত আছে,
যতই আসিবে কাছে তত পাবে মোরে।
আমারেও দিয়ে তুমি এ বিপুল বিশ্বভূমি
এ আকাশ এ বাতাস দিতে পার ভরে।"

নিম্নলিখিত কয়টি ছত্রে পুরুষের কল্পনাময় (idealising) প্রেমের অনির্ব্বচনীয় মধুর চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে,—

"আমি যা পেয়েছি, তাই নিয়ে ভেসে যাই,
কোন খানে সীমা নাই ও মধু মুখের।
শুধু স্বপ্ন শুধু স্মৃতি তাই নিয়ে থাকি নিতি,
আর আশা নাহি রাখি সুখের দুখের।"

এই সকলের উপর আবার কি মধুর সুমিষ্ট ছন্দ। সাদাসিধা সহজ কথা, সরল অথচ মধুময় গাঢ় প্রাণ-ভাসান সুর। কোনও কল-কৌশল নাই, ভাষা বা ছন্দের কোনও কৃত্রিমতা বা জটিলতা নাই, আমাদের ঘরের বাঙ্গালা, অথচ কি স্বর্গীয় রাগিণী! যেন শারদ জ্যোৎস্নার শুভ্র সরল আকুল হৃদয়ে শেফালিকা তাহার শুভ্র সরল আকুল প্রাণখানি নীরবে খুলিয়া দিয়াছে।

কিন্তু বিষয় ও ভাবের অভিনব ও প্রগাঢ় মাধুর্য্যে, এবং ছন্দেরও অভিনব অপার্থিব সুষমায়, 'বর্ষার দিনে' নামক কবিতাটি রবিবাবুর অসাধারণ শক্তির অপূর্ব্ব দৃষ্টান্ত। তাঁহার অপর সকল কবিতা হইতে, এবং তাহা হইলেই বঙ্গ-সাহিত্যের অপর সকল কবিতা হইতে ইহা পৃথক্, এবং বিশেষ আসন পাইবার উপযুক্ত। ইহার মত দ্বিতীয় কবিতা তিনি বা অপর কোন্ বঙ্গ-কবি লিখিয়াছেন? বাঙ্গালা ভাষায় বা ছন্দে যে এমন মোহিনী আছে বা থাকিতে পারে, তাহা আমি কখনও স্বপ্নেও ভাবি নাই, তিনি কেবল তাঁহার সুন্দর প্রতিভা-বলে আমাদের এই 'একঘেয়ে' ভাষায় অভিনব শক্তি দিয়াছেন, বা তাহার প্রচ্ছন্ন সৌন্দর্য্য উদ্ভাবন করিয়াছেন। শুধু তাহাই নহে, এই কবিতাটি বহুবার পাঠে আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে, অপর কোন
সুন্দর ছন্দ রচিত হইতে পারে না, অপর কোনও ভাষায় ইহার উপ

আমাদের এই বাঙ্গালা ভাষাতেই কেবল ইহা সম্ভবপর। জানি না, অপর কোন্ ভাষাতে এমন কোন্ কবিতা আছে, যাহাতে সমগ্র বর্ষার ঘনঘোর জীবনের সমস্ত বুকভরা ব্যথা এমন অনির্ব্বচনীয় মনোহরভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। বর্ষার মেঘ-রুদ্ধ হৃদয় যেন এই কবিতার কাতর ছন্দে বিদীর্ণ হইয়াও হইতেছে না। ইহার প্রত্যেক কথার অন্তরালে প্রাবৃটের চির-সন্ধ্যা প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, এবং মানব-জীবনের অনিবার্য্য বিষাদ, সেই সন্ধ্যার ম্লান অন্ধকারে জড়িত রহিয়াছে। এ দিকে কি সুন্দর অথচ সহজ ভাব ইহার প্রাণের ভিতর নিহিত রহিয়াছে! যে সকল কবি বা কল্পনা-ব্যবসায়ী মানব--জীবনের উন্মুক্ত সাধারণ রাজপথ ছাড়িয়া দিয়া তাহার প্রচ্ছন্ন প্রান্তভাগ বা অস্পষ্ট অনির্দ্দিষ্ট প্রদেশের অপরূপ শোভা-বর্ণনে পটু--Poe, Bandilary বা Hawthorne--তাঁহাদেরও কবিতা বা রচনার ভিতর এমন কোন অপার রহস্যময় গোধূলির ছায়া দেখি নাই, এমন পবিত্র অপার্থিব বিষাদ দেখি নাই। ইহার সুন্দর ছন্দের কাতর মন্থর গতিতে সন্ধ্যার হৃদয়-ধ্বনি অনুভূত হয়, এবং তাহার আলুলায়িত কেশের শিথিল অন্ধকার উহার প্রচ্ছন্ন বিষণ্ণতার ভিতর ব্যাপ্ত হইয়া আছে।

মানসীর উত্তরার্দ্ধে মিত্রাক্ষর পয়ারে যে সকল কবিতা আছে (মেঘদূত, অহল্যা-বিদায়), তাহাদেরও ঠিক এইরূপই প্রশংসা করা যাইতে পারে। বাস্তবিক এই সকল কবিতায় রবীন্দ্রবাবু বাঙ্গালা পয়ারকে নূতন করিয়া গড়িয়াছেন, তিনি তাহাকে অভিনব জীবন প্রদান করিয়াছেন। ইহা নিতান্ত তাঁহার নিজের সামগ্রী। তাঁহার পূর্ব্বে কোন বঙ্গীয় কবি এইরূপে পয়ার রচনা করেন নাই। তাঁহার হস্তে ইহা এক অপূর্ব্ব জীবন্ত দর্পিত গতি লাভ করিয়াছে। কবিতার তীব্র স্রোতে একটি চরণ কেমন আর একটির উপর তরঙ্গায়িত হইয়া উছলিয়া পড়িয়াছে! চরণের উপর চরণের এইরূপ উচ্ছ্বাসকে ফরাসী ভাষায় enjambement বলে। বাঙ্গালায় যেমন এই চতুর্দ্দশ-মাত্রাত্মক পয়ার, ইংরাজীতে সেইরূপ Iambic Pentametre এবং ফরাসী ভাষায় Alexandrine। এই তিন ভাষাতে এই তিন অতি প্রাচীন এবং সাধারণ ছন্দ, এবং তিন ভাষাতেই এই তিন ছন্দের প্রতিচরণের অন্তে যতি স্থাপিত হইয়া থাকে। ইহাই সাধারণ নিয়ম। আধুনিক কালে Victor Hugo Alexandrine-এর এই নিয়মের নিগড় খুলিয়া দিয়া সাহিত্য-সমাজে মহা বিপ্লব ঘটাইয়াছিলেন। কিন্তু তাহার ফল এই দাঁড়াইয়াছে যে, ফরাসী ভাষায় অমিত্রাক্ষর ছন্দ না থাকিলেও এই শৃঙ্খলমুক্ত Alexandrine সর্ব্বতোভাবে ইংরাজী অমিত্রাক্ষর ছন্দের স্বাধীনতা, সৌন্দর্য্য এবং বাক্‌পটুতা লাভ করিয়াছে। কিন্তু ইহাও বক্তব্য যে, Victor Hugo-র বহু পূর্ব্বে এই enjambement কখন কখন ব্যবহৃত হইত। রবীন্দ্রবাবুই কিন্তু এই প্রথমে বাঙ্গালা মিত্র পয়ারের পায়ের বেড়ী খুলিয়া দিলেন, এবং তাহাতে যে বাঙ্গালা সাহিত্যের বল এবং সৌন্দর্য্য কতদ[illegible] তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। ইহাকেই বলে প্রতিভার বি[illegible] মিত্রাক্ষর পয়ার পড়িয়া ইংরাজী Pentametre-এর

শীর্ষস্থানীয়. Shelley-র Epipsychidion মনে পড়ে। ইংরাজী সাহিত্যেও উচ্চ শ্রেণীর কবি ভিন্ন মধ্য বা নিকৃষ্ট কবিদিগের লেখায় এরূপ পয়ার দেখিতে পাইবে না। Pope বা Dryden-এ ইহা নাই, কিন্তু Shelley এবং Keats-এ ইহা বহুলপরিমাণে দেখিবে। যাহা হউক, এই এক ছন্দের কথা বলিতে গিয়া, আমি অন্যান্য নানা কথা ভুলিয়া যাইতেছি। উপরি-উক্ত অহল্যা-নামক কবিতা এমন বিশাল ভাবে পরিপূর্ণ—ইহার ভিতর জড়-জগতের সহিত এমন একটি অসীম ধাতুগত সহানুভূতি রহিয়াছে যে, বোধ হয় যেন Walt Whitman-এর স্বষ্টি বিশাল-প্রাণ Shelley-র অমর বীণা লইয়া ঝঙ্কার করিতেছে। যে সকল অন্ধ এবং বধির পাঠক রবিবাবুকে তাঁহার সেই অপোগণ্ড-কালের কবিতা-সমূহের মধ্যেই চিনিয়া রাখিয়াছেন, তাঁহাদিগকে এই অহল্যার প্রকাণ্ড কল্পনার পরিচয় লইতে বলি। তাঁহাদের সঙ্কীর্ণ হৃদয়ে অহল্যার সেই "নেত্রহীন মূঢ় রূঢ় অর্দ্ধ জাগরণের" বিশাল চিত্র কি স্থান পাইবে?

'মানসীর বিদায়' নামক কবিতার পূর্ব্বার্দ্ধে বিদায়গামী দিবসের বিষণ্ণ আলোক জড়িত রহিয়াছে, অপরার্দ্ধে সন্ধ্যার শিথিল হৃদয়ের আকুলতা এলাইয়া পড়িয়াছে। শেষ কয়েকটি চরণে আকাশ, সাগর এবং সাগর-তীরের উল্লেখে বোধ হয়, যেন কোন সুদূর অপরিচিত দেশে কোন সীমা-হীন শূন্য প্রান্তরের ভিতর সন্ধ্যার বিশাল বিজনতার মধ্যে আত্মহারা হইয়া ভাসিতেছি,—মাথার উপর সন্ধ্যাতারা কেবল তাহার শুভ্র বিমল দীপ্তি বর্ষণ করিতেছে। জীবনের একটি ক্ষণিক বিদায় অবলম্বনে জীবনের দোসর মহা-বিদায়ের বিদায়। বাস্তবিক প্রকৃতির হৃদয়ের সঙ্গে এক সুরে সুমিলিত এমন কবিতা আমি খুব কমই দেখিয়াছি; ইহাতে যেন জড়-জগতের ইহজীবনের একটি ক্ষণিক বিদায়ের বিরহ-বিষাদে থাকিয়া, কবি প্রিয়তম বা প্রিয়তমাকে মহাবিদায়ের সম্ভাষণ করিয়াছেন। এ বিরহ প্রেমিকের বিরহ এবং কবির বিরহ। ইহারই অধীনে প্রেমিক কবি দেখিয়াছিলেন, "ত্রিভুবনমপি তন্ময়ং বিরহে।" তাই সুদূর প্রবাসে থাকিয়া কবি বলিতেছেন,—

> অকূল সাগর-মাঝে চলেছে ভাসিয়া
> জীবন-তরণী। ধীরে লাগিছে আসিয়া
> তোমার বাতাস, বহি' আনি' কোন্ দূর
> পরিচিত তীর হ'তে কত সুমধুর
> পুষ্পগন্ধ, কত সুখস্মৃতি, কত ব্যথা,
> আশাহীন কত সাধ, ভাষাহীন কথা।
> সম্মুখেতে তোমারি নয়ন জেগে আছে
> আসন্ন আঁধার মাঝে অস্তাচল কাছে
> স্থির ধ্রুবতারাসম; সেই অনিমেষ
> আকর্ষণে চলেছি কোথায়, কোন্ দেশ
> কোন্ নিরুদ্দেশ মাঝে।"

এবং বিশ্বচরাচরের সুন্দর উদার বিষণ্ন পদার্থের সহিত আপনার স্মৃতি বিজড়িত রাখিয়া প্রেমাস্পদের নিকট ভবিষ্যৎ চিরবিদায়-গ্রহণের কথা উত্থাপন করিতেছেন। প্রকৃতির হৃদয়ের সহিত এক সূত্রে গ্রথিত এমন কবিতা খুবই বিরল। ইহাতে যেন জড়-জগতের অব্যক্ত মায়া পড়িয়া রহিয়াছে। পড়িলে বোধ হয়, যেন প্রকৃতির কোন মহান্ বিশাল রাজ্যের ভিতর দিয়া চলিতেছি, যেন উদার বিস্তৃত সাগর-বক্ষে ক্ষুদ্র দৈনিক জীবনের অবসাদ বিদূরিত্ করিতেছি,—যেন সংসারচক্রে ঘূর্ণ্যমান ক্লান্ত ম্লান হৃদয় প্রসারিত নিরবচ্ছিন্ন বিজনতার মধ্যে কি এক পবিত্র অথচ বিষাদপূর্ণ শান্তি উপভোগ করিতেছি, যেন হৃদয়ের সম্মুখে অনন্তের মহারাজ্য খুলিয়া গিয়া, কোথা হইতে এক মহান্ অথচ নিরুদ্দেশ উদ্দেশ্য আসিয়া প্রাণকে ব্যস্ত করিয়া তুলিতেছে।

এইবার দেখিতেছি, আমার কাজ কঠিন হইয়া উঠিল, এইবার আমি মানসীর প্রেম-কবিতাগুলির উল্লেখ করিব। সকল দেশেরই সাহিত্যে প্রেম-কবিতার দৌরাত্ম্য একটু বাড়াবাড়ি। আমাদের দেশের ত কথাই নাই। এখানে বাগ্দেবীর বন্দনা শেষ না হইতেই, পঞ্চবাণের ষোড়শোপচারে পূজা। কিন্তু সুস্থ সুন্দর সরল কৃত্রিমতাহীন অথচ প্রেমের মধুর উন্মাদনায় পরিপূর্ণ, এমন কবিতা কয়টি আছে? বৈষ্ণব কবিদিগের মধ্যে প্রকৃত প্রেমের আকুলতা ও গভীরতা পূর্ণমাত্রায় থাকিলেও, তাহাদের ভিতর অসীম বিস্তৃতির ভাব নাই। তাঁহাদের গান প্রায় একই কথায় পরিপূর্ণ, কিন্তু এক কথা হইলেও তাহা হৃদয়ের কথা এবং প্রগাঢ় অনুভব-শক্তির পরিচায়ক। তাহা ছাড়া, তাহাদের ভিতর অপ্রাকৃত কিছুই নাই, সেইজন্য 'একঘেয়ে' হইলেও তাহারা চিরজীবনে জীবিত। কিন্তু মানসীর প্রেম-কবিতাগুলি কতই বিচিত্রভাবে পরিপূর্ণ, কত দিক্ হইতে কত বিভিন্ন অবস্থায় কবি প্রেমকে ব্যক্ত করিয়াছেন। তাহারা না কেবলমাত্র শরীরের মরুময় নিকৃষ্ট লালসায় জর্জরিত বা পীড়িত, না অপ্রেমিকের মিথ্যা আধ্যাত্মিকতার আড়ম্বরময় অহংভাবে স্ফীত বা বর্দ্ধিত-দেহ। তাহাদের ভিতর 'ছিব্লেমি' চটুলতা কিছুই নাই, কিন্তু অতল মানব-হৃদয়ের মর্ম্মোচ্ছ্বাস আছে। মানব-জীবনের পূর্ণ প্রদীপ্ত আকাঙ্ক্ষায় তাহারা জীবিত, উন্মত্ত, আকুল। বাস্তবিক, মানুষের সমুদয় হৃদয়-বৃত্তির মধ্যে প্রেমের যেমন শ্রেষ্ঠতা, তেমনই সকল কবিতা বা গানের মধ্যে প্রেম-কবিতার শ্রেষ্ঠতা। সর্ব্বতোভাবে সুন্দর প্রেম-গীতি বড়ই বিরল। আমাদের বাঙ্গালা সাহিত্যে বৈষ্ণব কবিরাই ইহার চরম সৌন্দর্য্য দেখাইয়াছেন, এবং তাহাদের পরিসর ক্ষুদ্র হইলেও তাঁহারা তাহারই মধ্যে কবিত্বের যথেষ্ট উৎকর্ষ প্রদর্শিত করিয়াছেন। ইংরেজ কবিদিগের মধ্যে বর্ত্তমান শতাব্দীর পূর্ব্বে একা Shakespeare-ই যেমন অপরাপর সকল বিষয়ে, সেইরূপ এ বিষয়েও তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন। তারপর এই বর্ত্তমান শতাব্দীতেই আমরা যাহা কিছু উচ্চদরের প্রেম-কবিতা দেখিতে পাই। রবীন্দ্রবাবুর কিন্তু শৈশব হইতেই প্রে[illegible] ত অসাধারণ ক্ষমতা। তাঁহার রচিত প্রায় সকল প্রেম-কবিতাই [illegible] সেই ছেলেবেলার "বলি ও আমার গোলাপ-বালা" হইতে

আজিকার এই মানসীর "আমার সুখ" পর্য্যন্ত, তাহাদের কোথাও ভাব, ভাষা বা ছন্দে একটুও খুঁত নাই। আবার তাহাদের মধ্যে দু-একটির তুলনা নাই। একটির উল্লেখ করি,—"আজু সখি মুহু মুহু"।* বাঙ্গালা, ইংরেজী বা ফরাসী সাহিত্যে মিলন এবং উপভোগের এমন স্বর্গীয় সঙ্গীত কেহ কখন শুনে নাই। ইহাতে সমস্ত বসন্তের কুসুম-সুষমা, শারদ-জ্যোৎস্নার সমস্ত মোহ, এবং মলয়-সমীরণের সমস্ত উন্মাদনা বর্ত্তমান।

মানসীর গোড়ার দিকের প্রেম-কবিতাগুলির ভিতর নবীন প্রেমের প্রথম বিরাগ ও বিরহের সুন্দর মোহ এবং জ্বালা-উপভোগ এবং অধীরতা—হর্ষ এবং বিষাদ, কি মধুর ছন্দেই বর্ণিত হইয়াছে! "বিরহানন্দ," "ক্ষণিক মিলন" প্রভৃতির ছন্দ, দ্বিজেন্দ্রবাবুর নিকট কবি ধার করিয়াছেন বটে—কিন্তু প্রথম দুইটি কবিতার অমৃত-মধুর ছন্দ তাঁহার নিজের রচিত। তাহাদের কি সুমিষ্ট ঝঙ্কার—কি সুন্দর গুঞ্জন—প্রতি শ্লোকের শেষ ভাগে মাত্রা এবং মিলনের কি অপূর্ব্ব ছটা। কিন্তু এ সকল কবিতার ও মধ্যে মিথ্যা কিছুই নাই, চটুল ছিব্‌লেমি বা ন্যাকামি নাই—প্রেমহীন বিরহের হা-হুতাশ নাই, "আন্ ছুরি," "কই বিষ" নাই। এখানে কোকিল অভিসম্পাত বা নির্ব্বাসনের ভয় না রাখিয়া তাহার আনন্দ-বিকশিত কণ্ঠস্বরে ডাকিতেছে, এবং জ্যোৎস্নাও দাহিকা-শক্তি অর্জন করিতে শিখে নাই। এখানেও কবির নিজ-হৃদয় সত্য এবং স্বভাবের চির-সুস্থতার ভিতর আছে বলিয়াই আর সকলই প্রকৃতিস্থ। আমাদের দেশের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র Byronদিগের বোধ হয় ইহা ভাল লাগিবে না।

গ্রন্থের শেষের দিকের কবিতাসমূহে যে প্রেম ব্যক্ত হইয়াছে, তাহা পূর্ণ, উন্নত এবং গভীর। সে প্রেম পরিণত মানব-জীবনের প্রেম। ইহাতে মানুষকে পরিপূর্ণ এবং পবিত্র করে। জীবনের সম্যক্ স্ফূর্ত্তি এবং বিকাশ আনিয়া দেয়। এ প্রেম জীবনের একটি ক্ষুদ্র অংশ বা পরিচেছদ নয়—সমস্ত মানব-জীবনই এই প্রেমের। যেখানে এ প্রেম নাই, সেখানে মানব-জীবনের পূর্ণতাও নাই। সূর্য্যালোকে যেমন দিবসের শূন্য হৃদয়কে পরিপূর্ণ করিয়া রাখে, এ প্রেমও সেইরূপ মানব-হৃদয়কে পরিপূর্ণ করে। ইহাতে সঙ্কীর্ণ হৃদয় বিস্তীর্ণ হয়, ক্ষুদ্র হৃদয় উন্নত হয়, অলস হৃদয় উদ্যমে জাগ্রত হয়। এক কথায়, ইহা প্রেমিক এবং প্রেমাস্পদ, উভয়েরই মুক্তি সাধন করে।

গ্রন্থের দুই দিকের প্রেম-কবিতাগুলির ভিতর যেমন ভাবগত বৈষম্য লক্ষিত হয়, তেমনই আবার তাহাদের ছন্দ ও গঠনের বিভিন্নতা আছে। পূর্ব্বদিকের কবিতা-গুলির ছন্দের বেশ চটক আছে। তাহাদের মাধুর্য্য মদিরতামিশ্রিত, তাই পাঠককে ক্রমশঃ ক্লান্ত করিয়া আনে। অপরার্দ্ধের কবিতাগুলির মধুরতার ভিতর নিসর্গের মহৎ বস্তুর উদারতা ব্যাপ্ত রহিয়াছে। ইহাদের সৌন্দর্য্য-উপভোগে প্রাণ উত্তরোত্তর

* ভানুসিংহের কবিতা দেখ।

বিকশিত হয়। প্রথমার্দ্ধ বসন্তের উৎফুল্ল কোলাহলে ব্যস্ত, অপরার্দ্ধ সাগরোর্ম্মির মধুর, উদার নির্ঘোষে ধ্বনিত হইতেছে।

এই সকল কবিতা আবার কল-কৌশলে ইউরোপীয় প্রধান কবিদিগের রচনা অপেক্ষা কোন অংশে হীন নহে, কিন্তু ভাবের ঔদার্য্যে এবং রসের গভীরতায় তাহাদিগের অপেক্ষা অনেক গুণে উচচ। শ্রেষ্ঠ ইউরোপীয় হৃদয়েও প্রেমের এতদূর মৌলিকতা এবং গভীরতা নাই, স্থতরাং ইউরোপে এরূপ কবিতা এখনও জন্মে নাই। কই, আমি ত ইংরেজী বা ফরাসী কবিদিগের গ্রন্থাবলীর ভিতর "পূর্ব্বকালে" বা "অনন্ত প্রেম" প্রভৃতির ন্যায় কবিতা দেখি নাই। এই দুইটি কবিতারই মর্ম্ম-কথা—যাহাকে ভাল বাসিয়াছি, তাহাকে কি সবে এই মাত্র এই জন্মে ভাল বাসিলাম? আমার হৃদয়ে এই যে প্রেমের প্রগাঢ়, দুরন্ত নিবিড় অনুভব, ইহা কি আজিকার? এই বিশ্ববিলোপী প্রেমের স্রোত কি একদিনে জন্মিয়াছে, না অনাদিকালের হৃদয়-উৎস হইতে ভাসিয়া আসিয়াছে? আমরা যে আজ উভয়ের প্রেমে আত্মহারা, ইহার কি পূর্ব্বাপর নাই? সুদূর অতীতে আমাদের মত যাহারা ভালবাসিয়াছিল, তাহাদের সেই মহান্ অনুভবের ভিতর কি আমরা ছিলাম না? এবং ভবিষ্যতে কি এই মহান্ অনুভব নিবিয়া যাইবে? সকল প্রেমিকের মাঝে আমরা ছিলাম, আছি, এবং থাকিব। বর্ত্তমানে নিখিল জগতের সমস্ত প্রেম আমাদের দুই জনের মধ্যে পুঞ্জীভূত হইয়া রহিয়াছে। Walt Whitman-এ এই ধরণের কথা মাঝে মাঝে দেখা যায় বটে, কিন্তু Walt Whitman মার্কিনদেশীয়, এবং অনেকটা প্রাচ্যভাবে দীক্ষিত। "ধ্যান" নামক কবিতাটির সুন্দর ভাব কেবলমাত্র আমাদেরই দেশের ভিতর বদ্ধ না থাকিলেও, অনুভবের গভীরতায় Hugo বা Shelley-র শ্রেষ্ঠতম রচনার সমান ("তোমার পাইনে কূল তুমি আমি একাকার" প্রভৃতি—মানসী)। Hugo বা Shelley-র ভিতর এমন সুন্দর পরিপূর্ণ কবিত্বের আকুল উচ্ছ্বাস দেখি নাই। মানসীতে এখনও নানাবিষয়ক কত কবিতা আছে, যাহাদের এ পর্য্যন্ত নাম উল্লেখ করিতে পারি নাই। তাহাদের ভিতর অনেকগুলিই উপরে সমালোচিত কবিতা-সমূহের ন্যায় সুন্দর। যে-সকল পাঠক মানসীর অপর কোন অংশ বুঝিতে বা তাহার সৌন্দর্য্য অনুভব করিতে পারেন নাই, তাঁহারাও "নব বঙ্গদম্পতির প্রেমালাপে"র রহস্যে মুগ্ধ হইয়াছেন। "নিষ্ফল উপহারে"র বাঁধাবাঁধি ছন্দ, নিয়ন্ত্রিত রচনা, এবং ভাবের শাসন, বঙ্গ-সাহিত্যে অদ্বিতীয়। "দুরন্ত আশা"র তীব্র দুরন্ত কশাঘাতে সকল জাতির মনে লজ্জা ও ঘৃণার উদ্রেক হইতে পারে। তাহাতে যে বেদুইনের বর্ণনা আছে, তাহা কোন্ শ্রেষ্ঠ কবির না উপযুক্ত? "শূন্য ব্যোম অপরিমাণ মদ্যসম করিতে পান"—ওমর খায়্যমের যোগ্য—সহসা শুনিলে তাঁহারই কথা বলিয়া ভ্রম হয়। "সুরদাসে"র প্রার্থনায় সৌন্দর্য্য-[illegible] প্রেমবিহ্বল কবি-হৃদয়ের কি সুন্দর কাতর চিত্রই প্রদর্শিত হইয়াছে। [illegible] আবার [illegible]সের সঙ্গে এমন হৃদয় বিশ্লেষণ করিয়াছেন যে, যেন Brow-[illegible]তে [illegible] একত্র মিলিত হইয়াছে। ইহার উপান্ত Stanza-র

সুন্দর কবিত্বময় বর্ণনা একবারমাত্র পাঠে মনে চিরকাল রহিয়া যায়। কেমন অল্প কথায়, উজ্জ্বল উপমার গুণে, "ভীষণ মধুরে"র প্রদীপ্ত চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে,—

"উজ্জ্বল যেন দেব রোষানল"
"উদ্যত যেন বাজ"

দুইটি বন্ধুকে লিখিত দুখানি পত্রের ভিতর বন্ধু-হৃদয়ের অকৃত্রিম স্নেহশীলতা কবিতার স্রোতের সঙ্গে কেমন সুন্দর মিলিয়া মিশিয়া গিয়াছে। ইহাদেরও ভিতর স্বভাব-বর্ণনে কবির স্বাভাবিক মোহমন্ত্র পরিস্ফুট,—

"যেন রে সরম টুটে কুমুদ আর না ফুটে
কেতকী শিহরি উঠে করে না আকুল"।

এই কয়টি কথায় যেন ভরা শ্রাবণের মেঘ-স্নিগ্ধ হৃদয়ের আলোক ও ছায়া, সৌরভ এবং শ্যামকান্তি, প্রাণে আসিয়া পড়ে।

"নারীর উক্তি" এবং "পুরুষের উক্তি" ভাল হইলেও আদর্শের উৎকর্ষতা লাভ করিতে পারে নাই। প্রথমটির আরম্ভ অবিকল Browning-এর মতন হইলেও পরে তাঁহার অসাধারণ বিশ্লেষণ-শক্তির কিছুই দেখিলাম না। Browning-এর কথার ধারই ইহাতে নাই, এবং ইহার ভিতর মানব-জীবনের কোন রহস্যও উদ্ভাবিত হয় নাই। "পুরুষের উক্তি"তে কিন্তু একটি বেশ গভীর সত্য প্রকাশিত হইয়াছে।—

"কেন তুমি মূর্ত্তি হয়ে এলে,
রহিলে না ধ্যান-ধারণার।
. . . .
সেই মায়া উপবন, কোথা হল অদর্শন,
কেন হায় ঝাঁপ দিতে শুকাল পাথার।"

তাই পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুন্দর গদ্য কাব্যের নায়কের সহিত কেবলমাত্র এক রাত্রি প্রেম-সম্ভোগের পর চিরকালের জন্য অদৃশ্য হইয়া নায়িকা বলিয়াছেন,—"তোমার অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা আমার নিকট আসিবার জন্য নিয়তই তাহার পক্ষ সঞ্চালন করিবে। আমি তোমার চির-বাঞ্ছিত হইয়া রহিব। তোমার লুব্ধ কল্পনা আমাকে পাইবার জন্য অনুদিন উৎসুক থাকিবে।"—(Mademoiselle de Maupin). "শূন্য গৃহে" এবং "জীবন-মধ্যাহ্ন" দুইটিই আমার বড় ভাল লাগিয়াছে। তাহাদের ভাষা ও ছন্দের পারিপাট্য এবং ভাবের গাম্ভীর্য্য বড়ই হৃদয়গ্রাহী। নিম্নলিখিত শ্লোকের করুণ রস কি সরল সুন্দর ভাষাতেই ব্যক্ত হইয়াছে!— "কাল ছিল প্রাণ যুড়ে * * * * হেন বজ্রপাত" (৭৬ পৃঃ) "তারায় তারায় তার ব্যথা গিয়ে লাগে"—সৌন্দর্য্যে Tennyson-এর "Star to star vibrates light"-এর অপেক্ষা ইহা কোন অংশে ন্যূন নহে। "জীবন-মধ্য ... দ্বিতী... কবিতা বাঙ্গালা ভাষায় দেখি নাই। ইহা সুন্দর ধর্ম্মভা...

প্রাণের উক্তি। ইহাতে কোনরূপ ভান বা আড়ম্বর, কোনরূপ ভঙ্গী বা ভেঙ্গান নাই। হৃদয়ের যথার্থ ভাবই যথাযথ চিত্রিত হইয়াছে। ইহার এক একটি উপমা অতি মনোহর :—

" লজ্জা বস্ত্র জীর্ণ শতঠাঁই "
" ——————শস্যশীর্ষরাশি
ধরার অঞ্চলতল ভরি "

আর দুইটি কবিতার উল্লেখ করিয়াই এই দীর্ঘ প্রবন্ধের শেষ করিব।

" নিষ্ফল কামনা " একটি নিতান্ত অভিনব পদার্থ। আমাদের ধারণা ছিল যে, বাঙ্গালা ভাষায় অমিত্র ছন্দে এমন কবিতা রচিত হইতে পারে না। মিলের অভাবে তাহা নিতান্ত শোভাহীন ও শুনিতে নিতান্ত শ্রুতিকঠোর বোধ হইবে। কিন্তু রবিবাবু দেখাইলেন যে, এইরূপ মাত্রাবিভাগে বেশ সুন্দর অমিত্র ছন্দ রচিত হইতে পারে।

" উচ্ছৃঙ্খল " নামক কবিতাটির কি চমৎকার, কি সুন্দর, কি কারুণ্যপূর্ণ ভাব ব্যক্ত হইয়াছে! উচ্ছৃঙ্খলের কি নূতন, কি পরিপূর্ণ চিত্রই অঙ্কিত হইয়াছে! ইহার ভাবে কি গভীরতা! ছন্দে কি আকুলতা! ভাষায় কি তরঙ্গ! ইহার ভাষা ও ছন্দ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গীতিকবিদিগের ভাষা ও ছন্দের ন্যায় উন্মুক্ত এবং উদার। Shelley বা Swinburne-এর ইংরাজী, Hugo বা Leconte de Lish-এর ফরাসী, ভবভূতি বা জয়দেবের সংস্কৃত, ইহা অপেক্ষা কোন অংশে বেশী গৌরবান্বিত নহে।

উপসংহারে কি বলিতে হইবে যে, মানসীর কবিতাগুলি ভাবপ্রধান না বস্তুপ্রধান? তাহারা কোন্ বিশেষ সম্প্রদায়ের অন্তর্গত, এবং তাহাদের ভিতর কবি কি গুপ্ত তত্ত্ব নিহিত করিয়াছেন? অতি আহ্লাদের সহিত বলিতেছি, আমরা এ সকল বিষয়ে কিছুই জানি না, এবং জানিতেও চাহি না। কেবল এই মাত্র জানি যে, সৌন্দর্য্য-অনুভবে তাহাদের জন্ম, সুন্দর অভিব্যক্তিতে তাহাদের বিকাশ। যেখানে এই দুইটি আছে, সেখানে অপর সকলই আছে বা আর কিছুরই প্রয়োজন নাই। কাব্য-সম্বন্ধে —আর কেবলই কাব্য-সম্বন্ধে কেন?—সমস্ত কলাবিদ্যা-সম্বন্ধে প্রথম এবং শেষ কথা এই যে, সমালোচ্য বিষয়টি সৌন্দর্য্যব্যঞ্জক কিনা? যদি তাহাতে সৌন্দর্য্যের পূর্ণ বিকাশ থাকে, তবে তাহার অপর হাজার কেন অভাব থাকুক না, তাহাতে কিছুমাত্র আসিয়া যায় না—তাহাতে তাহার নিজ উদ্দেশ্য সাধিত হইয়াছে, কিন্তু হাজার অপর গুণের আধার হইয়াও যদি তাহাতে সৌন্দর্য্যের স্ফূর্ত্তি বা বিকাশ না হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহা একেবারে অপদাথ। তাহার নিজ উদ্দেশ্য তাহাতে সাধিত হয় নাই। পৃথিবীতে তাহার স্থান বা প্রয়োজন নাই। আমার যতটুকু রসাস্বাদন-শক্তি আছে, তাহাতে আমি নিঃসংশয়ে নির্দ্দেশ করিতে পারি যে, মানসীতে সৌন্দর্য্যের [illegible] হইয়াছে। সুতরাং ইহার জাতি বা সম্পদায়-নির্ব্বাচনের প্রয়োজন [illegible] প্রথম শ্রেণীর কাব্য। প্রথম শ্রেণীর কাব্যের এই এক অসাধারণ

গুণ যে, তাহার সহিত কাহার কোন বিবাদ-বিসংবাদ থাকিতে পারে না, সকল শ্রেণীর লোক তথায় স্থান পাইতে পারে। তাহাতে কোন সাম্প্রদায়িকতা নাই বলিয়া, সকল সম্প্রদায় তাহার উদার সৌন্দর্য্যের অসীমতার ভিতর মিলিত হইতে পারে। সে কবিতা বিষয়-অনুসারে বস্তুগত বা ভাবগত। তাহার সৌন্দর্য্য যেমন অনুভবে, তেমনি অভিব্যক্তিতে,—যেমন কল্পনায়, তেমনি রচনায়,—যেমন অন্তর্দৃষ্টিতে, তেমনি বহির্দৃষ্টিতে। তাহা যেমন জপিবার, তেমনি মাতিবার এবই মাতাইবার। মানসীর ভিতর এমন অনেক কথা আছে, যাহা পাঠে হৃদয় তাহার অন্ধ রুদ্ধ গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া বিশ্ব-চরাচরে ছড়াইয়া পড়ে—সমস্ত সৃষ্টির ভিতর ব্যাপ্ত হইয়া যায়—ব্যাকুল প্রাণ জগতের মাঝখানে আসিয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচে। আপনাতে আপনি থাকিতে না পারিয়া জগৎ-সংসারের মাঝে সংসার রচনা করে, এবং সমস্ত মানব-হৃদয়ের সহিত মিলিত হয়। আবার এমনও কথা আছে যে, হৃদয় নিজের প্রচ্ছন্নতর অন্তঃপুর-মধ্যে সেই একই কথার ধ্যানে নিমগ্ন হয়। বিশ্ব তখন বিলুপ্ত—জগৎ শূন্য। প্রাণ—প্রাণেরই ভিতর প্রবিষ্ট ও আপনাতে আপনই বিভোর। এইরূপে মানসীতে পূর্ণতম সৌন্দর্য্য, উচ্চতম কবিত্ব, এবং শ্রেষ্ঠতম আদর্শ রক্ষিত হইয়াছে। সত্যই ইহা "শ্রেষ্ঠতম প্রাণের বিকাশ," বাঙ্গালা সাহিত্যের অমূল্য রত্ন, এবং কাব্যামোদী ব্যক্তিমাত্রেরই আদরের বস্তু।

[সাহিত্য, ১৩০০]

প্রাচীন সাহিত্যালোচনা

হীরেন্দ্রনাথ দত্ত

ভাষার প্রবাহ নদীর গতির সহিত তুলনীয়। কোন্ অজ্ঞাত অধিত্যকায়, কোন্ অজ্ঞাত শৈলোৎস হইতে নদীর উৎপত্তি। কত ক্ষুদ্র-বৃহৎ, স্বচ্ছ-পঙ্কিল, ক্ষার-স্বাদু জলস্রোতে নদীর অঙ্গপুষ্টি। সমবেত সলিল-সমষ্টির কেমন উচ্ছলিত বক্র খর ভঙ্গীময় গতি। শেষে, সাগরসঙ্গমে নদীর কেমন মন্থর আয়ত শতমুখ ধারা। ভাষা-প্রবাহও নদী-গতির তুল্য।

কোন্ আর্ত্তের দীর্ঘশ্বাসে, কোন্ প্রণয়ীর প্রেমোচ্ছ্বাসে, কোন্ বীরের উদ্দীপনায়, কোন্ ভক্তের ভক্তি-সাধনায় ভাষার উদ্ভব, কে স্থির করিবে? কত কবি, গায়ক, লেখক, ভাবুকের কাব্য-স্রোত, গীত-স্রোত, রচনা-স্রোত, চিন্তা-স্রোতে ভাষার কলেবর-পুষ্টি সাধিত হয়। জাতির মধ্যজীবনে সুপুষ্ট ভাষার নাটক-কাব্য-উপন্যাসময় নব রস-রুচির অভিরাম প্রবাহ লক্ষি-

ভাষার চরম উন্নতির কালে জাতীয় সাহিত্যের কেমন প্রশান্ত, গম্ভীর সর্ব্বতোমুখ প্রসার। তাই বলিতেছিলাম, ভাষার প্রবাহ নদীর গতির সহিত তুলনীয়।

সকল নদীই জলস্রোত; কিন্তু নদীতে নদীতে কত প্রভেদ! এই প্রভেদ বুঝিতে হইলে, নদীর এই বিশেষত্ব বুঝিতে হইলে, নদীর উৎপত্তি ও অঙ্গপুষ্টি বুঝা চাই। (সিন্ধু-নদে বর্ষায় বন্যা না হইয়া শীতকালে কেন বন্যা হয়, আর গঙ্গানদীতে শীতে বন্যা না হইয়া বর্ষাকালে কেন বন্যা হয়—এ প্রভেদ, নদনদীর এই বিশেষত্ব, তাহাদিগের উৎপত্তি ও অঙ্গপুষ্টি না বুঝিলে বুঝা যায় না। ভাষারও এইরূপ। সকল ভাষাই বাক্যস্রোত। কিন্তু ভাষাতে ভাষাতে কত প্রভেদ! এই প্রভেদ বুঝিতে হইলে, ভাষাগত এই বিশেষত্ব বুঝিতে হইলে, ভাষার উদ্ভব ও কলেবর-পুষ্টি বুঝা চাই। গ্রীসে হোমর কেন, ইতালীতে দান্তে কেন, ভারতে কালিদাস কেন, ইংলণ্ডে সেক্সপীয়র কেন—এ প্রভেদ, গ্রীক ইতালীয় সংস্কৃত ও ইংরাজি ভাষার এই বিশেষত্ব, তাহাদিগের উদ্ভব ও কলেবর-পুষ্টি না বুঝিলে বুঝা যায় না।)

নানা কারণে কয়েক শতাব্দী ধরিয়া নদীর উৎপত্তি ও অঙ্গপুষ্টি বুঝিবার জন্য সভ্য জগৎ সচেষ্ট হইয়াছেন। ব্রহ্মপুত্রনদ কি মানসসরোবরজাত, ইহার অঙ্গ কি সাম্পুর জলে পুষ্ট; নীলনদী কি নায়েন্‌জা হ্রদ হইতে উদ্ভূত, ইহার অঙ্গ কি অট্‌বরার সলিলে প্রবৃদ্ধ,—এই সকল কথার সুমীমাংসার জন্য কত ভূগোলবিদ্ কত নৌ-যাত্রার শ্রম, ব্যয়, বিপদ্ ও অধ্যবসায় স্বীকার করিয়াছেন। বোধ হয়, সভ্য জগতের এই শ্রম, ব্যয়, বিপদ্, অধ্যবসায়ের মূলে জাতীয় স্বার্থানুেষণ নিহিত আছে। বোধ হয়, তাঁহারা বুঝিয়াছেন, জাতীয় স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য নদীর গতি বুঝা আবশ্যক। আর নদীর গতি বুঝিবার জন্য তাহার উৎপত্তি ও অঙ্গপুষ্টি বুঝা আবশ্যক। তাই তাঁহাদিগের নৌ-যাত্রার এত শ্রম, ব্যয়, বিপদ্ ও অধ্যবসায়-স্বীকার। ভাষার উদ্ভব ও কলেবর-পুষ্টি বুঝিবার জন্যও ভাষা-স্রোতে নৌ-যাত্রা আবশ্যক। এই নৌ-যাত্রার জন্য প্রয়োজন-মত শ্রম, ব্যয়, বিপদ্ ও অধ্যবসায় স্বীকার করা আবশ্যক। অন্যথা ভাষার প্রভেদ, ভাষার বিশেষত্ব—ভাষা-প্রবাহের স্বরূপ বুঝা যাইবে না।

নদীর স্রোতের মত ভাষার স্রোতেও কয়েক বৎসর হইতে সভ্য জগৎ নৌ-যাত্রা আরম্ভ করিয়াছেন। জননী লাটিন ভাষার কোন্ 'প্রাকৃত' প্রত্যঙ্গ হইতে ফরাসীর উৎপত্তি, বর্ত্তমান যুগের ইংরাজি আদি কবি চশরের সহিত ফরাসী রোমান্‌স্-লেখকদিগের কি সম্বন্ধ, লুথরের বাইবেলের অনুবাদ কি পরিমাণে জর্ম্মন ভাষার শিশু-অঙ্গ পরিপুষ্ট করিয়াছিল,—এই সকল কথার মীমাংসার জন্য কত ভাষাতত্ত্ববিদ্ কত শ্রম, ব্যয়, আয়াস, অধ্যবসায় স্বীকার করিয়াছেন। অবশ্য সভ্য-জগতের এই শ্রম, ব্যয়, আয়াস, অধ্যবসায়ের মূলেও জাতীয় স্বার্থানুেষণ নিহিত আছে। তাঁহারা অবশ্য বুঝিয়াছেন যে, [illegible]ত জাতীয় স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য ভাষার প্রবাহ বুঝা আবশ্যক। আর ভাষার [illegible]ঝিবার জন্য তাহার উদ্ভব ও কলেবর-পুষ্টি বুঝা আবশ্যক। তাই তাঁহাদিগের [illegible]তে নৌ-যাত্রার এত শ্রম, ব্যয়, আয়াস ও অধ্যবসায়।

ভাষার এই উদ্ভব কোথায়? ভাষার এই কলেবর-পুষ্টি কোথা হইতে? দেশ কাল ও অবস্থাভেদে ভাষার উদ্ভব কোথায়ও আর্ত্তের দীর্ঘশ্বাসে, কোথায়ও প্রণয়ীর প্রেমোচ্ছ্বাসে, কোথায়ও বীরের উদ্দীপনায়, কোথায়ও ভক্তের ভক্তি-সাধনায়। ভাষা-প্রবাহের যে অংশ আমাদিগের নয়নের সম্মুখে প্রবাহিত হইতেছে, সে অংশ উদ্ভব-স্থান হইতে এত যোজন দূরে, যে বহু আয়াসেও ভাষাতত্ত্ববিদের গবেষণা-নৌকা তত দূর পঁহুছিতে পারে না। সুতরাং অনেক ভাষার উদ্ভব-স্থান আজিও স্থির হয় নাই; কখনও হইবে কি না, বিশেষ সন্দেহ।

কবি, গায়ক, লেখক ও ভাবুকের কাব্য-স্রোত, গীত-স্রোত, রচনা-স্রোত এবং চিন্তা-স্রোত মিলিয়া ভাষার কলেবর-পুষ্টি সাধিত হইয়াছে। ভাষাতত্ত্ববিদের গবেষণার লক্ষ্য এই প্রাচীন কবি, গায়ক, লেখক, ভাবুকের কাব্য-গীত-রচনা-চিন্তার সংগ্রহ। তাঁহার আলোচনার বস্তু এই প্রাচীন কাব্য-গীত-রচনা-চিন্তার প্রকৃতি, গতি, স্থিতি, বিকাশ ও বিরাম। ভাষাতত্ত্ববিদ্ বুঝেন যে, এ সকল না বুঝিলে ভাষার কলেবর-পুষ্টি বুঝা যাইবে না। আর ভাষার কলেবর-পুষ্টি না বুঝিলে ভাষার প্রবাহ বুঝা যাইবে না। সেই জন্যই প্রাচীন কাব্য-গীত-রচনা-চিন্তা বুঝিবার জন্য ভাষাতত্ত্ববিদের এত শ্রম, ব্যয়, আয়াস ও অধ্যবসায়-স্বীকার।

প্রয়োজন-সিদ্ধির উদ্দেশ্যেই কার্য্যে প্রবৃত্তি হয়, অন্যথা হয় না। অবশ্যই কোন প্রয়োজন-সিদ্ধির জন্য, কোন উচ্চ জাতীয় স্বার্থ সাধনের জন্য ভাষাতত্ত্ববিদ্ এই শ্রম, ব্যয়, আয়াস, অধ্যবসায় স্বীকার করিতেছেন। এই প্রয়োজন কি? প্রাচীন কাব্য-গীত-রচনা-চিন্তার আলোচনার প্রয়োজন কি? প্রয়োজন বিশেষই আছে। আর প্রয়োজন এক নহে, অনেক। কথাটার একটু অনুধাবন করা আবশ্যক।

প্রথমতঃ, নবীন সাহিত্যের আলোচনায় যে ফল, প্রাচীন সাহিত্যের আলোচনায়ও সেই ফল অনেক পরিমাণে সাধিত হয়। এ ফল কি, কাব্যামোদী মাত্রেরই বিদিত আছে। এ ফল হৃদয়ের একটা প্রসার, জ্ঞানের একটা বিস্তৃতি, চিত্তের একটা গভীরতা, সুখের একটা পরাকাষ্ঠা, একটা ভূমানন্দ-লাভ। অধিকন্তু প্রাচীন সাহিত্যে প্রথম উচ্ছ্বাসের একটা আবেগ, একটা প্রথম উদ্দীপনার নব-ভাব, একটা সারল্য, স্বাভাবিকতা, অকপট-ভাব আছে, যাহা নবীন সাহিত্যে প্রায়ই দৃষ্ট হয় না। প্রাচীন সাহিত্যের আলোচনায় এইটুকু অধিক ফল।

দ্বিতীয় কথা, নবীন সাহিত্য সম্যক্‌রূপে বুঝিতে হইলে তাহাকে প্রাচীন সাহিত্যের বিবর্ত্তনরূপে বুঝা চাই; অর্থাৎ প্রাচীন সাহিত্যের কোন্ বীজ কিরূপে কত দিনে ক্রম-বিকশিত হইয়া নবীন সাহিত্যের শাখা-কাণ্ডে পরিণত হইল, তাহা বুঝা চাই। অর্থাৎ এ সকল বিষয় ঐতিহাসিকের চক্ষে, ইতিহাসের আলোকে দেখা চাই। যেমন বাষ্পীয় যানের স্বরূপ বুঝিতে আমরা চারি সহস্র বৎসর পূর্ব্বে আবিষ্কৃত বাষ্প-ক্রীড়াযন্ত্রের ক্রমোন্নতি ধারাবাহিকরূপে আলোচনা করি, যেমন শঙ্করের বেদান্ত-মত বুঝিতে ছয় সহস্র বৎসর পূর্ব্বে প্রচলিত অদ্বৈতবাদের ক্রমবিকাশ ধারাবাহিকরূপে অ,

করি, এইরূপ নবীন সাহিত্য সম্যক্ বুঝিবার জন্য প্রাচীন সাহিত্যের ধারাবাহিকরূপে আলোচনা করা চাই। এইরূপে আমরা নবীন সাহিত্যের স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিব; অন্যরূপে নহে। এ বিষয়ে একজন বিজ্ঞ ফরাসী সমালোচক কতকগুলি সারগর্ভ কথা বলিয়াছেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল। সমালোচক ঐতিহাসিকের চক্ষে মহাকাব্যাদি না পড়িয়া স্তাবক বা উপাসকের চক্ষে ঐ সকল গ্রন্থ-পাঠের নিন্দা করিতেছেন।—"এরূপ পাঠে আলোচনা হয় না. ইহাতে অযথা উপাসনারই প্রশ্রয় দেওয়া হয়। ইহাতে আমাদের সম্মুখে একটা আদর্শ স্থাপিত হয়, কিন্তু আদর্শের উদ্ভব কিরূপে, তাহা আমরা জানিতে পাই না। বিশেষতঃ, ঐতিহাসিকের পক্ষে মহাকবির কাব্যাদির এরূপভাবে আলোচনা বড় অসঙ্গত। এরূপে আমরা কবিকে কালের সম্বন্ধ হইতে অপসৃত করিয়া লই, কবির প্রকৃত জীবন, কবির ঐতিহাসিক সম্বন্ধ হইতে বিযুক্ত করিয়া লই। এরূপে সমালোচনা প্রচলিত অযথা আদরের অনুবর্ত্তী হয়; এবং সাহিত্যের বিকাশক্রমের আলোচনা-বিষয়ে অযত্ন ঘটে।"*

ফরাসী সমালোচক মহাকবির কাব্য-সম্বন্ধে যে সকল কথা বলিলেন, নবীন সাহিত্য-সম্বন্ধেও ঐ সকল কথা বলা যায়। নবীন সাহিত্যও ঐতিহাসিক সম্বন্ধবিহীন করিয়া, সাহিত্যের বিকাশক্রমের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া রীতিমত আলোচিত হইতে পারে না। নবীন সাহিত্যের ভাব, ভাষা, ছন্দোবন্ধ, শব্দ-বিন্যাস, রচনা-প্রণালী বুঝিতে হইলে প্রাচীন সাহিত্যের ভাব, ভাষা, ছন্দোবন্ধ, শব্দ-বিন্যাস, রচনা-প্রণালীর পরিজ্ঞান থাকা আবশ্যক। অতএব প্রাচীন কাব্য-গীত-রচনা-চিন্তার আলোচনার বিশেষ প্রয়োজন আছে। আর এই প্রয়োজন এক নহে, অনেক।

তৃতীয় কথা, ব্যষ্টি মানুষের যেমন জীবনের একটা ইতিহাস আছে, সমষ্টি মানুষ-সমাজের তেমনি জীবনের একটা ইতিহাস আছে। আর সমাজের যে প্রধান বন্ধনী—ভাষা, যাহাতে বায়ু-তাড়িত বালুকণার মত ব্যষ্টি মানুষ দশ দিকে বিক্ষিপ্ত না হইয়া সমাজে দলবদ্ধ থাকে, সেই ভাষারও একটা ইতিহাস আছে। সজীব মানুষের ভাষাও সজীব। ভাষাও অব্যাকৃত হইতে ব্যাকৃত, অবিশেষ হইতে বিশেষ, অব্যক্ত হইতে ব্যক্ত, অবিকাশ হইতে বিকাশ প্রাপ্ত হয়। ব্যাকৃত বিশিষ্ট ব্যক্ত বিকশিত ভাষারও অঙ্কুর হইতে পল্লব, পল্লব হইতে শাখা, শাখা হইতে কাণ্ড, কাণ্ড হইতে মহামহীরুহের প্রকাশ লক্ষিত হয়। এই প্রকাশের ক্রমই ভাষার ইতিহাস। ইংরাজি ভাষার ইতিহাসজ্ঞ পাঠক জানেন যে, গথিক হইতে স্যাকসন, স্যাকসন হইতে অর্দ্ধস্যাকসন, অর্দ্ধস্যাকসন

* "It (a classic) claims not study but veneration; it does not show us how the thing is done, it imposes upon us a model. Above all for the historian, this creation of classic personages is inadmissible; for it withdraws the poet from his time [illegible]m his proper life, it breaks historical relationships, it blinds criticism by c[illegible]tional admiration and renders the investigation of literary origins un[illegible]ble."

—M. Charles, d'Hericault quoted in M. Arnold's *Essays in Criticism*

হইতে আদ্য ইংরাজি, আদ্য ইংরাজি হইতে মধ্য ইংরাজি, মধ্য ইংরাজি হইতে পুরাতন ইংরাজি, পুরাতন ইংরাজি হইতে আধুনিক ইংরাজির প্রকাশ হইয়াছে। এই প্রকাশের ক্রমই ইংরাজি ভাষার ইতিহাস।* এইরূপ বাঙ্গালা ভাষার।

(বাঙ্গালা ভাষার ইতিহাসজ্ঞ পাঠক জানেন যে, বৈদিক সংস্কৃত হইতে ভাষা-সংস্কৃত, ভাষা-সংস্কৃত হইতে গাথা, গাথা হইতে পালী, পালী হইতে প্রাকৃত মাগধী, মাগধী হইতে আদ্য বাঙ্গালা, আদ্য বাঙ্গালা হইতে মধ্য বাঙ্গালা, মধ্য বাঙ্গালা হইতে আধুনিক বাঙ্গালার প্রকাশ হইয়াছে। এই প্রকাশের ক্রমই বাঙ্গালা ভাষার ইতিহাস। এই ভাষার ইতিহাস-জ্ঞান প্রাচীন সাহিত্যের জ্ঞানসাপেক্ষ। অতএব ভাষার ইতিহাস-জ্ঞানের জন্য প্রাচীন কাব্য-গীত-রচনা-চিন্তার আলোচনার প্রয়োজন।)

আর এক কথা। কোন ভাষার ব্যাকরণ সংকলন করিতে হইলে সেই ভাষার প্রাচীন সাহিত্যের জ্ঞান থাকা চাই। ব্যাকরণ ভাষার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিশ্লেষণ, অস্থি মজ্জা মেদ মাংস শিরা স্নায়ু প্রভৃতির পরীক্ষা। এই পরীক্ষার সুসিদ্ধির নিমিত্ত প্রাচীন সাহিত্যের পরিজ্ঞান আবশ্যক। এ বিষয়ে পাণিনির দৃষ্টান্ত গ্রহণ করুন। এ সম্বন্ধে পণ্ডিত মোক্ষমূলরের মত এই,—"ব্রাহ্মণজাতির প্রাচীনতম কাব্য বেদ অধ্যয়নের ফলে সংস্কৃত ব্যাকরণের সৃষ্টি। বেদ-মন্ত্রের ভাষা এবং পরবর্ত্তী কালের রচনার ভাষা এই উভয়ের প্রভেদ সযত্নে লিখিত ও রক্ষিত হইত। ব্যাকরণশাস্ত্রে প্রথম উদ্যমের নিদর্শন প্রাতিশাখ্য। ঐ সকল গ্রন্থের উপর দৃঢ় ভিত্তি করিয়া বৈয়াকরণের পর বৈয়াকরণ যে অদ্ভুত অট্টালিকা নির্ম্মাণ করেন, তাহা পাণিনির ব্যাকরণে সম্পূর্ণতা লাভ করে।"†

এইরূপে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে রচিত যে কোন ভাষার ব্যাকরণ অধ্যয়ন করুন, দেখিবেন, পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় সেই ভাষার প্রাচীন সাহিত্য-পাঠের লক্ষণ সুস্পষ্ট রহিয়াছে; কারণ কোন ভাষার প্রাচীন কাব্য-গীত-রচনা-চিন্তার পরিজ্ঞান না থাকিলে সে ভাষার ব্যাকরণ-সংকলন সর্ব্বদা অসম্ভব।

আর যাহাকে ভাষা-বিজ্ঞান বলে, সে বিজ্ঞানের অস্তিত্ব প্রাচীন সাহিত্যের আলোচনার সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধযুক্ত। যে একই আর্য্য ভাষা সংস্কৃত, গ্রীক, লাটিন, গথিক, কেলটিক ও শ্লাভনিক, এ সকল ভাষার জননী, ইহারা যে পরস্পর ভগিনী-স্থানীয়া, এ তত্ত্বের উদ্ভাবন ও মীমাংসা কেবল ঐ সকল ভাষার প্রাচীন সাহিত্যের আলোচনা-দ্বারা সম্ভাবিত হয়। এইরূপ যদি আমরা সংস্কৃতের দুহিতৃভূতা বাঙ্গালা,

* "The grammar of modern English is not the same as the grammar of Wycliffe. Wycliffe's English, again may be traced back to what we may call Middle English from 1500 to 1330; Middle English to Early English from 1330 to 1230; Early English to Semi-Saxon from 1230 to 110 and Semi-Saxon to Anglo-Sax...
—Max Müller, *Science of Language*, First Series,

† Max Müller, *Science of Language*, First Series, p. 126.

হিন্দী, গুরুমুখী, মহারাষ্ট্রী, উড়িয়া, আসামী প্রভৃতি প্রচলিত ভাষার ভগিনী-সম্বন্ধ বুঝিতে ইচ্ছা করি, যদি একটা ভারতীয় ভাষা-বিজ্ঞান রচনা করিবার প্রয়াস করি, তবে আমাদিগকে ঐ সকল ভাষার প্রাচীন কাব্য-গীত-রচনা-চিন্তার বহুল আলোচনা করিতে হইবে।

চতুর্থ কথা, কোন ভাষার প্রণালী-বিশুদ্ধ অভিধান সংকলন করিতে হইলে সেই ভাষার প্রাচীন সাহিত্যের পরিজ্ঞান থাকা চাই। অভিধান বলিলে শুধু প্রচলিত শব্দ-সকলের প্রচলিত অর্থ-সংগ্রহ বুঝিতে হইবে না। প্রণালী-বিশুদ্ধ অভিধানে অধুনা-প্রচলিত বা ইতঃপূর্ব্বে প্রচলিত সকল শব্দের অর্থ, উৎপত্তি এবং ইতিহাসের বিশিষ্ট বিবরণ থাকা চাই। এ বিষয়ে মারের নূতন ইংরাজি অভিধানের দৃষ্টান্ত গ্রহণ করা যাইতে পারে। এই অভিধান ভাষা-বিজ্ঞান-বিষয়ে ইংরাজজাতির আয়াস ও অধ্যবসায়ের চরম উদাহরণ। এই অভিধান-সংকলন-বিষয়ে সহস্র সহস্র মনীষী পরিশ্রম করিতেছেন, লক্ষ লক্ষ মুদ্রা ব্যয়িত হইতেছে। অভিধান-সংকলনের উদ্দেশ্য-বিষয়ে সম্পাদক মারে সাহেব এইরূপ* লিখিয়াছেন,—"এই অভিধানে প্রত্যেক শব্দ-সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি দেখাইবার চেষ্টা হইয়াছে:—কবে কিরূপে কি আকারে কি অর্থে ঐ শব্দের প্রথম প্রয়োগ হয়; কালে কালে উহার আকার ও অর্থের কি বিকাশ হইয়াছে; ঐ আকার ও অর্থের কোন্‌গুলি প্রচলিত, কোন্‌গুলি অপ্রচলিত। কি প্রণালীতে, কত দিন হইল, কি নূতন প্রয়োগ আরম্ভ হইয়াছে। ঐ বিষয়গুলি আবার দৃষ্টান্তসহ দেখাইবার জন্য সেই শব্দের প্রথম প্রয়োগ হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ প্রয়োগ বা আজ-কালকার প্রয়োগ পর্য্যন্ত উদাহরণ উদ্ধৃত করা হইয়াছে। এইরূপে সেই শব্দের ইতিহাস ও অর্থক্রম প্রকটিত হইয়াছে; এবং ঐতিহাসিক নিয়মে, আধুনিক শব্দ-বিজ্ঞানের প্রণালী-অনুসারে সেই শব্দের ব্যুৎপত্তি সিদ্ধ করা হইয়াছে।" বলা বাহুল্য, এই রীতি-অনুসারে অভিধান-সংকলন হওয়া উচিত; আর এইরূপে অভিধান সংকলিত করিতে হইলে প্রাচীন সাহিত্যের প্রভূত আলোচনা আবশ্যক। মারের অভিধান-গত একটা শব্দের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে এ কথা বেশ হৃদয়ঙ্গম হইবে। বিড শব্দের প্রতি লক্ষ্য করুন। ঐ শব্দের অর্থ বুঝাইতে প্রাচীন ও নবীন সাহিত্য হইতে অন্ততঃ দেড়শত প্রয়োগ উদ্ধৃত হইয়াছে। প্রাচীন কাব্যাদি হইতে উদ্ধারের

* "It endeavours (1) to shew with regard to each individual word when how in what shape and with what signification it became English; what development of form and meaning it has since received; which of its uses have in the course of time become obsolete and which still survive; what uses have since arisen by what processes and when: (2) to illustrate these facts by a series of quotations ranging from the first known occurrence of the word to the latest or down to the present day; the word being thus made to exhibit its own history and meaning: (3) to treat the etymology of each word strictly on the basis of historical fact in accordance with the methods and result of modern philological science."—Murray's *New English Dictionary*, Preface.

সংখ্যা অধিক। প্রায় নয় শত বৎসর পূর্ব্বে রচিত গ্রন্থাদি হইতে উদ্ধারেরও অভাব দৃষ্ট হয় না। অতএব এই একটি শব্দের অর্থ পরিস্ফুট করিবার জন্য নয় শত বৎসরের প্রাচীন সাহিত্য আলোচনা করিতে হইয়াছে। বোধ হয়, এখন সকলেই স্বীকার করিবেন যে, অভিধান-সংকলনের জন্য প্রাচীন কাব্য-গীত-রচনা-চিন্তার প্রভূত আলোচনা আবশ্যক।

পঞ্চম কথা, পাশ্চাত্তোরা যাহাকে তন্তু-বিচ্ছেদ* বলেন, ভাষার উদ্দাম যৌবনে প্রায়ই তাহা ঘটিবার সম্ভাবনা। শিক্ষাবিস্তারের সহিত ভাব ও ভাষার একটা আন্তর্জাতিক আদান-প্রদানের আরম্ভ হয়। তাহার ফলে জাতীয় সাহিত্য বিজাতীয় আদর্শের অনুগামী হইয়া বিকৃত হইয়া পড়ে। অবশ্য বিদেশীয় সাহিত্যের অনুকরণে জাতীয় সাহিত্যের অনেক বিষয়ে উন্নতি সাধিত হয়; কিন্তু প্রাচীন ও নবীন সাহিত্যের যে সংযোগ-তন্তু, যে ধারাবাহিক ক্রম, তাহার বিচ্ছেদ ঘটে। এ বিষয়ে বাঙ্গালা ভাষার দৃষ্টান্ত গ্রহণ করা যাইতে পারে। বহুদিন হইতে ইংরাজি সাহিত্যের ভাব ও ভাষার অনুকরণে বাঙ্গালা সাহিত্য জাতীয় বিশেষত্ব হারাইতে আরম্ভ করিয়াছে। তাই সূক্ষ্মদর্শী চন্দ্রনাথবাবু এক স্থলে লিখিয়াছেন, "এখনকার বাঙ্গালা কবিতা (সাহিত্য বলিলে হয় না?) প্রায়ই চিনিতে পারি না; সে জন্য আমি বড় কাতর।" মনীষী বঙ্কিমচন্দ্র এ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—"এখনকার বাঙ্গালা কবিতার ভাষা কিছু বিকৃত রকম হইয়াছে; ইংরাজি যে না জানে, সে বোধ হয়, সকল সময়ে বুঝিতে পারে না।" এই বিকৃতি দূর করিবার জন্য, প্রাচীন ও নবীন সাহিত্যের সংযোগ-তন্তু অবিচ্ছিন্ন রাখিবার জন্য প্রাচীন সাহিত্যের আলোচনা আবশ্যক। বিজাতীয় আদর্শের পার্শ্বে প্রাচীন জাতীয় আদর্শ সাহিত্যসেবীর নয়নের সম্মুখে রাখা আবশ্যক। অতএব প্রাচীন কাব্য-গীত-রচনা-চিন্তার আলোচনার এই আর এক প্রয়োজন।

শেষ কথা, জাতীয় সাহিত্য জাতীয় জীবনের প্রতিরূপ। কবির হৃদয় প্রশস্ত দর্পণ-তুল্য; যে কালে জাতীয় জীবনের যে ভাব, জাতির যাহা রীতি-নীতি, প্রণালী-পদ্ধতি,—সেই কালের কবির কাব্যে তাহার ছায়াপাত দৃষ্ট হয়। সেক্সপীয়র যে, নাটকে স্বভাবের প্রতিবিম্ব-গ্রহণের উল্লেখ করিয়াছেন, সে এই মর্ম্মের কথা। এ হিসাবে কবি সমসাময়িক কালের নিপুণ ঐতিহাসিক। কত সহস্র বৎসর বৈদিক যুগ অতীত হইয়াছে; সে বৈদিক ঋষি, বৈদিক যাগ, বৈদিক জীবন, বৈদিক আচার-ব্যবহারের চিহ্নমাত্র নাই; কিন্তু বেদের সূক্তে তৎসমুদয়ের কেমন সুস্পষ্ট ইতিহাস অঙ্কিত রহিয়াছে। এইরূপ ইলিয়াদে† অতীত গ্রীক-জীবনের এবং এদায় ‡ অতীত স্ক্যান্‌ডিনেভীয়-জীবনের চিত্র উজ্জ্বলবর্ণে চিত্রিত আছে। বাস্তবিক, জাতীয় ইতিহাস-লেখকের জাতীয় সাময়িক সাহিত্য উৎকৃষ্ট অবলম্বন। সেকালে সাহেব

* Solution of continuity,

† Homer's *Iliad.*

‡ *The two Eddas.*

সপ্তদশ শতাব্দীর ইংলণ্ডের ইতিহাস লিখিতে তাৎকালিক নাটকাদি হইতে বিশেষ সাহায্য পাইয়াছেন। (অতএব অতীত যুগের জাতীয় জীবন, সেই কালের সামাজিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক অবস্থা বুঝিবার জন্য তখনকার রীতি-নীতি, আচার-বিচার, প্রণালী-পদ্ধতি জানিবার জন্য প্রাচীন সাহিত্যের অনুশীলন—কাব্য-গীত-রচনা-চিন্তার বহুল আলোচনার প্রয়োজন।)

(সেই জন্য বলিতেছিলাম, প্রয়োজন যথেষ্টই আছে; আর প্রয়োজন এক নহে, অনেক। প্রথম, প্রাচীন কাব্যাদির অকপট ভাব ও স্বাভাবিকতার আস্বাদ; দ্বিতীয়, নবীন সাহিত্যে প্রাচীন সাহিত্যের বিকাশের ঐতিহাসিক ক্রমনির্ণয়; তৃতীয়, ভাষার ইতিহাস ও ব্যাকরণ-সংকলন এবং ভাষা-বিজ্ঞান-রচনা; চতুর্থ, প্রণালী-বিশুদ্ধ অভিধান-প্রণয়ন; পঞ্চম, প্রাচীন ও নবীন সাহিত্যের অবিচ্ছিন্ন সংযোগ; শেষ, জাতীয় অতীত জীবনের ইতিবৃত্ত-জ্ঞান। এই সকল প্রয়োজন-সিদ্ধির জন্য প্রাচীন কাব্য-গীত-রচনা-চিন্তার আলোচনা অপরিহার্য্য। বলা বাহুল্য, এই সকল অতি উচ্চ প্রয়োজন, এবং ইহাদিগের সম্যক্ সাধনেই জাতীয় সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি এবং উর্দ্ধগতি।)

[বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩০১]

মহাকাব্যের লক্ষণ

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

ইংরাজি এপিক্-শব্দের অনুবাদে মহাকাব্য-শব্দের প্রয়োগ চলিয়া কিন্তু এপিকের সমস্ত লক্ষণের সহিত মহাকাব্যের সমস্ত লক্ষণ মিলে কি না, তাহা বলিতে পারি না। সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রে আমার কিছুমাত্র জ্ঞান নাই, কিন্তু শুনিয়াছি যে, আলঙ্কারিকেরা মহাকাব্যের লক্ষণ যেরূপ সূক্ষ্মভাবে বাঁধিয়া দিয়াছেন, তাহাতে মহা-কবিগণের চিন্তার কারণ কিছুই রাখেন নাই। কালিদাস, ভারবি, মাঘ প্রভৃতি কবিগণের রচিত মহাকাব্য এ দেশে চলিত আছে, এবং ঐ সকল মহাকাব্য সম্ভবত অলঙ্কারশাস্ত্রসম্মত মহাকাব্য। রামায়ণ ও মহাভারত, এই দুই গ্রন্থকে মহাকাব্য বলা চলে কি না, তাহা লইয়া একটা তুমুল সমস্যা গোড়াতেই দাঁড়ায়। ইংরাজি পুস্তকে রামায়ণ ও মহাভারত ...িক্ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়, কিন্তু আমাদের পণ্ডিতেরা উহাদিগকে মহাকাব্য বলিতে ...র্বদা সম্মত হন না। প্রথমত, এ দুই গ্রন্থ অলঙ্কারশাস্ত্রের নিয়মাবলি অত্যন্ত উৎকটরূপে

লঙ্ঘন করিয়াছে। দ্বিতীয়ত, মহাকাব্য বলিলে উহাদের গৌরবহানির সম্ভাবনা জন্মে। ইতিহাস, পুরাণ, ধর্ম্মশাস্ত্র ইত্যাদি আখ্যা দিলে বোধ করি এই দুই গ্রন্থের মর্য্যাদা রক্ষা হইতে পারে। কিন্তু মহাকাব্য বলিলে উহাদের মাহাত্ম্য খর্ব্ব করা হয়।

বস্তুতই মাহাত্ম্য খর্ব্ব করা হয়। কুমারসম্ভব ও কিরাতার্জ্জুনীয় যে অর্থে মহাকাব্য, রামায়ণ-মহাভারত কখনই সে অর্থে মহাকাব্য নহে। কুমারসম্ভব, কিরাতার্জ্জুনীয় যে শ্রেণীর—যে পর্য্যায়ের গ্রন্থ, রামায়ণ-মহাভারত কখনই সে শ্রেণীর—সে পর্য্যায়ের গ্রন্থ নহে। একের নাম মহাকাব্য দিলে, অন্যকে মহাকাব্য বলা কিছুতেই সঙ্গত হয় না।

রামায়ণ-মহাভারতের ঐতিহাসিকত্বে ও ধর্ম্মশাস্ত্রত্বে সম্পূর্ণ আস্থাবান্ থাকিয়াও আমরা স্বীকার করিতে বাধ্য যে, উহাতে কাব্যরসও যথেষ্ট পরিমাণে বিদ্যমান। মহর্ষি বাল্মীকি ও কৃষ্ণদ্বৈপায়নের মুখ্য উদ্দেশ্য যাহাই থাকুক, উঁহারা যাহা লিখিয়া ফেলিয়াছেন, তাহাতে প্রচুর পরিমাণে কবিত্ব রহিয়া গিয়াছে,—হয় ত উঁহাদের সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে রহিয়া গিয়াছে; কিন্তু কবিত্ব যে আছে, সে বিষয়ে কাহারও সন্দেহ করিবার উপায় নাই।

রামায়ণ-মহাভারতে কবিত্বের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে গেলেই, মহর্ষিদ্বয়কে মহাকবি ও তাঁহাদের কাব্যদ্বয়কে মহাকাব্য না বলিলে চলে না। কেন না, ভাষাতে আর কোন শব্দ নাই, যদ্দ্বারা এই কাব্যদ্বয়ের সঙ্গত নামকরণ চলিতে পারে। কুমার-সম্ভব-কিরাতার্জ্জুনীয়কে আপাতত মহাকাব্যের শ্রেণী হইতে খারিজ করিয়া দিয়া আমরা রামায়ণ-মহাভারতকেই মহাকাব্য বলিয়া গ্রহণ করিলাম।

মনে হইতেছে মেকলে কোথায় বলিয়াছেন, সভ্যতাব সহিত কবিত্বের কতকটা খাদ্য-খাদক বা অহি-নকুল সম্বন্ধ রহিয়াছে। সভ্যতা কবিত্বকে গ্রাস করে; অথবা সভ্যতার আওতায় কবিতার লতা বাড়িতে পায় না। বলা বাহুল্য, মেকলের অনেক উক্তির মত এই উক্তিটিকেও সুধীজনে উপহাস করিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন। বিগত ঊনবিংশ শতাব্দীতে সভ্যতার আস্ফালন সত্ত্বেও ইউরোপখণ্ডে কবিত্বের যেরূপ স্ফূর্ত্তি দেখা গিয়াছে, তাহাই তাহার প্রমাণ। অন্য প্রমাণের প্রয়োজন নাই।

কিন্তু আমার বোধ হয় মেকলের ঐ উক্তির ভিতর একটু প্রচ্ছন্ন সত্য আছে। সভ্যতা কবিত্বের মস্তক চর্ব্বণ না করিতে পারে, কিন্তু মহাকাব্যকে বোধ করি সশরীরে গ্রাস করিয়া ফেলে। আবার বলা আবশ্যক, মহাকাব্য-শব্দ আমি আলঙ্কারিক-সম্মত অর্থে ব্যবহার করিতেছি না। রঘুবংশ, কুমারসম্ভব ও প্যারাডাইস্ লষ্টকে আমি এস্থলে মহাকাব্যের মধ্যে ফেলিতেছি না। রামায়ণ-মহাভারত যে পর্য্যায়ের কাব্য, সেই পর্য্যায়ের কাব্যকেই আমি মহাকাব্য বলিতেছি। পৃথিবীতে কত কবি কত কাব্য লিখিয়া যশস্বী হইয়াছেন, কিন্তু মহাকাব্য সে-ই কোন-কালে রচিত হইয়া গিয়াছে, তাহার পর আর একখানাও রচিত হইল না। পাশ্চাত্ত্য কাব্যসাহি লেখকের কিছুমাত্র ব্যুৎপত্তি নাই; কিন্তু সন্দেহ হয়, কেবল হোমারের নামে প্রচ

গ্রন্থ দুইখানি ব্যতীত আর কোন কাব্যকে রামায়ণ-মহাভারতের সমান পর্য্যায়ে স্থান দেওয়া যাইতে পারে না। পাশ্চাত্ত্যদেশে সভ্যতাবৃদ্ধির সহিত কবিত্বের অবনতি হইয়াছে, এ কথা কেহই বলিতে পারিবেন না ; কিন্তু শেক্স্পীয়ারের নাম মনে রাখিয়াও অকুতোভয়ে বলা যাইতে পারে, ইউরোপ-মহাদেশেও একবারের বেশী হোমারের জন্ম হয় নাই।

বস্তুতই পৃথিবীর সাহিত্যের ইতিহাসে ও সভ্যতার ইতিহাসে কোন্ প্রাচীনকালে বাল্মীকি, ব্যাস ও হোমারের উদ্ভব হইয়াছিল ; তাহার পর কত-হাজার বৎসর অতীত হইয়া গেল, কিন্তু মহাকাব্যের আর উৎপত্তি হইল না। কেন এরূপ হইল, তাহার কারণ চিন্তনীয় ; কিন্তু সেই কারণ আবিষ্কারে লেখকের ক্ষমতা নাই। তবে এক-একবার মনে হয়, মনুষ্যসমাজের বর্ত্তমান অবস্থাই বোধ করি আর সেই-শ্রেণীর মহাকাব্য উৎপাদনের পক্ষে অনুকূল নহে।

রামায়ণ-মহাভারত ও হোমারের মহাকাব্যে আমরা মনুষ্যসমাজের যে চিত্র অঙ্কিত দেখি, তাহাতে সেই সমাজকে আধুনিক হিসাবে সভ্য বলিতে পারা যায় না। মনুষ্য-সমাজের সে অবস্থা আবার কখনও ফিরিয়া আসিবে কি না, তাহা জানি না ; কিন্তু তাৎকালিক সমাজে যে সকল ঘটনা প্রতিদিন সংঘটিত হইত, সমাজের বর্ত্তমান অবস্থায় তাহা ঘটিতে পারে না। আমরা এমন কল্পনায় আনিতে পারি না যে, আমেরিকার যুক্তরাজ্যের সভাপতি কোন ইউরোপের রাজসভায় আতিথ্যস্বীকার করিয়া অবশেষে রাজলক্ষ্মীকে ষ্টীমারে তুলিয়া প্রস্থান করিতেছেন, ও তাহার প্রতিশোধগ্রহণার্থ ইউরোপের নরপালবর্গ ওয়াশিংটন অবরুদ্ধ করিয়া দশ বৎসরকাল বসিয়া আছেন। ডিলারী বন্দীকৃত লর্ড মেথুয়েন্কে গাড়ির চাকায় বাঁধিয়া দক্ষিণ আফ্রিকার বন্ধুর উপত্যকায় ঘুরাইয়া লইয়া বেড়াইতেছেন, ইহা কোন দিনের টেলিগ্রামে দেখিবার কেহ আশা করেন নাই। সিডান্‌ক্ষেত্রে বিসমার্ক লুই নেপোলিয়ন্‌কে হস্তগত করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তাঁহার বুক চিরিয়া নেপোলিয়ন্-বংশের শোণিতের আস্বাদগ্রহণ আবশ্যক বোধ করেন নাই। ত্রেতাযুগ-অবসানের বহুদিন পরে বুয়রদেশে লঙ্কাকাণ্ডের অপেক্ষাও তুমুল ব্যাপার ঘটিয়া গিয়াছে সত্য, কিন্তু কোন বিজয়ী মহাবীরকে তজ্জন্য লাঙ্গুলের ব্যবহার করিতে হয় নাই।

সেকালের এই অসভ্যতা আমাদের চোখে বড়ই বীভৎস ঠেকে, সন্দেহ নাই ; কিন্তু সেকালের সামাজিকতার আর একটা দিক্ আছে, একালে সে দিক্‌টাও তেমন দেখিতে পাই না। বার্ক একসময় আপনার মহাপ্রাণতার ঝোঁকে বলিয়াছিলেন, শিভাল্‌রির দিন গত হইয়াছে। শিভাল্‌রি-নামক অনির্ব্বাচ্য বস্তু নগ্ন বর্ব্বরতার সহিত নিরাবরণ মনুষ্যত্বের অপূর্ব্ব মিশ্রণে সমুৎপন্ন। একালে মানুষ মানুষের রক্তপান করিয়া জিঘাংসার তৃপ্তি করিতে চাহে না বটে ; কিন্তু আবার জ্যেষ্ঠভ্রাতার কটাক্ষমাত্র-শা[illegible] পত্নীর অপমান স্বচক্ষে দেখিয়াও, আত্মসংযমে সমর্থ হয় কি না, বলা যায় না। [illegible]র রাজারা মালকোঁচা মারিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে গদাহস্তে অবতীর্ণ হন না সত্য বটে,

কিন্তু ভীমরতিগ্রস্ত পিতার একটা কথা রাখিবার জন্য ফিজি-দ্বীপে নির্ব্বাসন গ্রহণ করিতে প্রস্তুত থাকেন কি না, বলিতে পারি না। অশ্বত্থামা ঘোর নিশাকালে সুখসুপ্ত বালক-বৃদ্ধের হত্যাসাধন করিয়া ভীষণ ক্রূরতা দেখাইয়াছিলেন, সন্দেহ নাই; কিন্তু সভা ডাকিয়া ও খবরের কাগজে প্রবন্ধ লিখিয়া সেই ক্রূরতার সমর্থন তাঁহার নিতান্তই আবশ্যক হয় নাই। শ্রীকৃষ্ণসহায় পাণ্ডবগণ যখন জয়বিষয়ে নিতান্ত হতাশ হইয়া নিশাকালে শত্রুশিবিরে ভীষ্মের নিকট দীনভাবে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তখন তাঁহারা ভীষ্মকে তাঁহার জীবনটুকু দান করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তাঁহাদের লৌহবর্ম্মের অন্তরালে কারেন্সি নোটের গোছা লইয়া যাওয়া আবশ্যক বোধ করেন নাই।

গত চারি-হাজার বৎসরের মধ্যে মনুষ্যসমাজের বাহিরের মূর্ত্তিটা অনেকটা পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে সত্য কথা, কিন্তু তাহার আভ্যন্তরিক প্রকৃতির কতটা পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তাহা বলা দুষ্কর। মনুষ্যের বাহিরের পরিচ্ছদটা সম্পূর্ণ বদ্‌লাইয়াছে, কিন্তু মনুষ্যের ভিতরের গঠন অনেকটা একরূপই আছে। সেকালের রাজারাজড়াও বোধ করি সময়মত কৌপীনধারী হইয়া সভামধ্যে বাহির হইতে লজ্জিত হইতেন না; কিন্তু এখনকার অন্নহীন শ্রমজীবীরাও সমস্ত অঙ্গের মালিন্য ও বিরূপতা পোষাকের আচ্ছাদনে আবৃত রাখিতে বাধ্য হয়। সেকালে ক্রূরতা ছিল, বর্ব্বরতা ছিল, পাশবিকতা ছিল, এবং তাহা নিতান্ত নগ্ন, নিরাবরণ অবস্থাতেই ছিল। তাহার উপর কোনরূপ আচ্ছাদন, কোনরূপ পালিশ্, কোনরূপ রঙ্-ফলান ছিল না। একালেও ক্রূরতা, বর্ব্বরতা ও পাশবিকতা হয় ত ঠিক তেমনি বর্ত্তমান আছে; তবে তাহার উপর একটা কৃত্রিম ভণ্ডামির আবরণ স্থাপিত হইয়া তাহার বীভৎস ভাবকে আচ্ছন্ন রাখিয়াছে। সম্প্রতি চীনদেশে সভ্য ইউরোপের সম্মিলিত সেনা যে পরাক্রম প্রদর্শন করিয়া আসিয়াছে, তাহাতে আটিলা ও জঙ্গিস্‌খাঁর প্রেতাত্মার আর লজ্জিত হইবার কোন কারণই নাই।

বস্তুতই চারি-হাজার বৎসরের ইতিহাস সূক্ষ্মভাবে তলাইয়া দেখিলে বুঝা যায়, মনুষ্যচরিত্র অধিক বদ্‌লায় নাই; তবে সমাজের মূর্ত্তিটা সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। এবং মনুষ্যসমাজের অবস্থা যে কাব্যগ্রন্থে প্রতিফলিত হইয়া থাকে, সেই কাব্যের মূর্ত্তিও যে তদনুসারে পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইবে, তাহাতে বিস্ময়ের কারণ নাই। বিস্ময়ের কারণ থাক্ আর নাই থাক্, আধুনিক কালের সাহিত্যে বাল্মীকি, ব্যাস ও হোমারের আর আবির্ভাব হয় নাই, এবং আর যে কখনও হইবে, তাহা আশা করাও দুষ্কর। সাহিত্যে মহাকাব্যের যুগ বোধ হয় অতীত হইয়া গিয়াছে। কালের যখন অবধি নাই ও পৃথ্বী যখন বিপুলা, তখন বড় কবির ও বড় কাব্যের অসম্ভাব কখন হইবে না, কিন্তু মনুষ্যসমাজের সেই প্রাচীন অবস্থা ফিরিয়া আসিবার যদি সম্ভাবনা না থাকে, তাহা হইলে মহাকবির ও মহাকাব্যের বোধ করি আবির্ভাব আর হইবে না।

বস্তুতই আর আবির্ভাবের আশা নাই। মহাকাব্যের মধ্যে একটা উন্মুক্ত অকৃত্রিম স্বাভাবিকতা আছে, তাহা বোধ করি আর কখনও ফিরিয়া আসিবে না। সুনিপুণ শিল্পী একালে তাজমহল গড়িতে পারেন, কিন্তু পিরামিডের দিন বুঝি একবারে চলিয়া গিয়াছে। মহাকাব্যগুলিকে আমরা মহাকায় অদ্ভুত পিরামিডের সঙ্গে তুলনা করিতে পারি। এক-একবার মনে হয়, উহাদিগকে কোন মানবহস্তনির্ম্মিত কৃত্রিম কারু-কার্য্যের সহিত তুলনা না করিয়া প্রকৃতির হস্তনির্ম্মিত নৈসর্গিক পদার্থের সহিত উপমিত করা উচিত।

(আমাদের ভারতবর্ষের মহাভারতকে এক-একবার ভারতবর্ষের হিমাচলের সঙ্গে তুলনা করিতে ইচ্ছা হয়।) (হিমাচল যেমন তাহার বিপুল পাষাণ-কলেবরের অঙ্কদেশে ভারতবর্ষকে রক্ষা করিতেছে, মহাভারতের বিপুল কলেবর তেমনি ভারতীয় সাহিত্যকে কত-সহস্র-বৎসর কাল অঙ্কে রাখিয়া লালনপালন ও পোষণ করিয়া আসিতেছে) ১ হিমাচলের বিশাল বক্ষোদেশ হইতে বিনিঃসৃত সহস্র উৎস হইতে সহস্র স্রোতস্বিনী অমৃতরসপ্রবাহে ভারতভূমিকে আর্দ্র ও সিক্ত করিয়া 'সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা' পুণ্যভূমিতে পরিণত করিয়াছে,—সেইরূপ মহাভারতের মধ্য হইতে সহস্র উপাখ্যান, সহস্র কাহিনী, সহস্র কথা সমগ্র জাতীয় সাহিত্যের মধ্যে সহস্র ধারা প্রবাহিত করিয়া পুণ্যতর ভাবপ্রবাহে জাতীয় সাহিত্যকে চিরহরিৎ রাখিয়া বহুকোটি লোকের জাতীয় জীবনে পুষ্টি ও কান্তি প্রদান করিয়া আসিতেছে। ভূতত্ত্ববিৎ যেমন হিমাচলের ক্রম-বিন্যস্ত স্তর-পরম্পরা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তাহার মধ্য হইতে কত বিস্ময়কর জীবের অস্থি-কঙ্কাল উদ্ধার করিয়া অতীতের লুপ্তস্মৃতি কালের কুক্ষি হইতে উদ্‌ঘাটন করেন, সেইরূপ প্রত্নতত্ত্ববিৎ এই বিশাল গ্রন্থের স্তর-পরম্পরা হইতে ভারতীয় জনসমাজের অতীত ইতিহাসের বিস্মৃত নিদর্শনের চিহ্ন ধরিয়া ইতিহাসের অতীত অধ্যায় আবিষ্কার করেন।

ভূতত্ত্ববিৎ তাঁহার মানসচক্ষু অতীতকালের পরপারে প্রসারিত করিয়া দেখিতে পান, বসুন্ধরার ইতিহাসে এমন একদিন আসিয়াছিল, যখন মহাকাল স্বয়ং আপনার ভীমবাহু প্রসারণ করিয়া উত্তপ্ত ধরাগর্ভে বিপুল শক্তিরাশি কেন্দ্রীভূত করিতেছিলেন, দেখিতে দেখিতে সেই পুঞ্জীকৃত শক্তিসমষ্টি আপনাকে প্রসারিত করিয়া ভূবক্ষ বিদারণ করিয়া বহির্গত হইল। ভীষণ ভূকম্পে ধরাপৃষ্ঠ মুহুর্মুহু আলোড়িত হইল। সাগর-বক্ষ উচ্ছ্বসিত হইয়া পুনরায় ভীতিভরে অপসরণ করিল। পূর্ব্বসাগরের বেলাভূমি হইতে পশ্চিমসাগরের বেলাভূমি পর্য্যন্ত ভূগর্ভ বিদারণ করিয়া মহাকায় পাষাণকলেবর হিমাচল গাত্রোত্থান করিল। তাহার তুহিনমণ্ডিত সূর্য্যকিরণোজ্জ্বল শৃঙ্গসমূহ বেষ্টিত করিয়া ঝঞ্ঝাবায়ু ঘোররাবে প্রদক্ষিণ করিতে লাগিল। ধূম্রবর্ণা কাদম্বিনীর বক্ষোদেশে [illegible]নী স্ফুরিত হইতে লাগিল। শৃঙ্গের উপর শৃঙ্গ আসিয়া ভাঙিয়া পড়িল; [illegible]শ অধিত্যকায় উত্থিত হইল ও অধিত্যকা দ্রোণিদেশে নামিয়া গেল; অরণ্যানী

জ্বলিয়া উঠিল, জীবকুল নীরব হইল, মহাকালের তাণ্ডবনর্ত্তনের সহকারে অট্টহাস্যে দিগন্ত নিনাদিত হইতে লাগিল।*

কেন এমন হয় জানি না, কিন্তু নিসর্গের ইতিবৃত্তে যেমন মহাকাল মাঝে মাঝে এইরূপ তাণ্ডবনর্ত্তনের উন্মত্ত ক্রীড়া প্রদর্শন করেন, মানবসমাজের ইতিবৃত্তেও সেইরূপ সময়ে সময়ে তাঁহার অট্টহাস্যের নির্ঘোষধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়। মহাভারতের ঘটনা প্রাচীন ভারতসমাজের একদেশে সংঘটিত হইলেও, ইহাকে আমরা সমগ্র মনুষ্য-সমাজের একটা মহাবিপ্লবের চিত্র বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি। মনুষ্যহৃদয়ের ঈর্ষ্যা, দ্বেষ, জিগীষা ও জিঘাংসা প্রভৃতি উৎকট দুর্দ্দম প্রবৃত্তিসমূহ কালে কালে কেন্দ্রাকৃষ্ট ও পুঞ্জীকৃত, ঘনীভূত ও স্তূপীকৃত হইয়া যখন আপনার শক্তিতে আপনি বাহির হইতে চাহে, তখন উহা লেলিহান অগ্নিজিহ্বা ব্যাদান করিয়া সমাজমধ্যে আপনার জ্যোতির্ম্ময়ী জ্বালা প্রসারণ করে; ভক্তিশ্রদ্ধা, প্রীতিপ্রেমের উৎস পর্য্যন্ত সেই ভীষণ উত্তাপে শুকাইয়া যায়; সমগ্র সমাজের পৃষ্ঠদেশ বিপ্লবের ভূমিকম্পে মুহুর্মুহু আন্দোলিত হইয়া উঠে। অন্তর্নিহিত শক্তিরাশি সমাজের কলেবরকে বিদীর্ণ করিয়া, সহস্র খণ্ডে চূর্ণ করিয়া, ইতস্তত বিক্ষিপ্ত করে; লক্ষ বৎসরের সঞ্চিত সৌন্দর্য্যরাশি ও রূপরাশি সেই তরল অনলপ্রবাহে ভস্মীভূত হইয়া যায়। মহাভারতের বর্ণিত ঘটনার মধ্যে আমরা মহাকালের অট্টহাস্যের প্রতিধ্বনি দূর হইতে শুনিতে পাইয়া স্তব্ধ হই ও মুহ্যমান হই। এ সেই মানবসমাজের চিরন্তন বিপ্লবের ইতিহাস—যাহা যুগযুগান্তরে ঘুরিয়া-ফিরিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করে; যাহা সাগরগর্ভকে মালক্ষেত্রে উত্তোলিত করিয়া মালক্ষেত্রকে সাগরগর্ভে নিমগ্ন করে; যাহা পর্ব্বতচূড়ার সহিত পর্ব্বতচূড়ার সংঘর্ষ উপস্থিত করিয়া প্রলয়াগ্নির স্থষ্টি করে। সেই অগ্নিশিখায় অরণ্যানী মরুভূমিতে পরিণত হয়, জীবকুল ধরাপৃষ্ঠে অস্থি-কঙ্কাল রাখিয়া কালের কুক্ষিতে অন্তর্হিত হয়। ইহা সেই সনাতন অধর্ম্মের অভ্যুত্থান, যাহা দলিত, পীড়িত ও সঙ্কুচিত করিয়া ধর্ম্মের পুনঃস্থাপনের জন্য মহেশ্বরের মহৈশ্বর্য্যের অবতারণা আবশ্যক হয়—ভীত, বিস্মিত মানবচিত্ত যখন সেই ঐশ্বর্য্যের মহিমায় মোহ-প্রাপ্ত হইয়া তাহার চরণোপান্তে আপনাকে লুণ্ঠিত করে।

মহাভারতের বর্ণিত ইতিহাস মানবসমাজের বিপ্লবের ইতিহাস। ভারতবাসীর জাতীয় ইতিহাসে বাস্তবিকই কোনদিন এইরূপ মহাবিপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল কি না, তাহা ঐতিহাসিক ও প্রত্নতত্ত্ববিৎ অনুসন্ধান করিবেন। হয় ত কোন ক্ষুদ্র প্রাদেশিক ঘটনার স্মৃতিমাত্র অবলম্বন করিয়া মহাকবি আপনার চিত্তবৃত্তির সমাধিকালে মানব-সমাজের মহাবিপ্লবের স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন; এবং সেই স্বপ্নদৃষ্ট ধ্যানলব্ধ মহাবিপ্লবের—ধর্ম্মের সহিত অধর্ম্মের মহাসমরের—চিত্র ভবিষ্যৎ যুগের লোকশিক্ষার জন্য অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন। ভূগর্ভে সঞ্চিত যে শক্তির বলে হিমাচল ভূগর্ভ ভিন্ন করিয়া

* ভূতত্ত্ববিদের মধ্যে যাঁহারা লায়ালের শিষ্য, তাঁহাদের হিমালয়োৎপত্তির এই কাল্পনি শঙ্কিত হইবার কারণ নাই। প্রাদেশিক catastrophe লায়ালের মতের বিরোধী

গাত্রোত্থান করিয়াছিল, সে শক্তি এখন সাম্যাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া উপশান্ত হইয়াছে; এখন হিমাচলের সানুদেশ নিবিড় বনস্থলীতে শ্যামায়মান হইয়াছে; তাহার আয়ত বক্ষে এখন নিবিড় জলদমালা বারিবর্ষণ করিয়া সেই শ্যামভূমির হরিৎকান্তি অব্যাহত রাখিয়াছে; আর সেই জলদমালার বহু ঊর্দ্ধে ধবলগিরি ও গৌরীশঙ্করের শুভ্রোজ্জ্বল দেহ দূর হইতে দর্শকের বিস্ময় উৎপাদন করিতেছে।)

যে সামাজিক বিপ্লবে, যে অধর্ম্মের অভ্যুত্থানে প্রাচীন ভারতসমাজে অশান্তির ঝটিকা বহিয়াছিল, ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠার পর সেই ব্যাপারের স্মৃতি পর্য্যন্ত প্রায় বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে; ঝটিকা শান্ত হইয়াছে; মহাসিন্ধুর কল্লোল স্তব্ধ হইয়াছে, বনানীর দাবাগ্নি-গর্জন নীরব হইয়াছে; এখন সেই মহাভারত হইতে সহস্র সাহিত্যধারা প্রবাহিত হইয়া আমাদের জাতীয় সাহিত্যে ও জাতীয় জীবনে শাখাপল্লবের ও পত্রপুষ্পের উদ্‌গম করিয়া তাহাকে বিকশিত ও প্রফুল্ল রাখিয়াছে; আর আমরা দূর হইতে ভীমার্জুন, কর্ণ-দুর্য্যোধন, ভীষ্ম-দ্রোণ, অশ্বত্থামা-কৃতবর্ম্মার দৃঢ়গঠিত, উন্নতশীর্ষ, জ্যোতির্দীপ্ত কলেবরকে ধবলমুকুটধারী কিরণোজ্জ্বল ধবলগিরির ন্যায় ভারত-সমাজক্ষেত্রের দূরস্থিত দিগ্বলয়ে দণ্ডায়মান দেখিয়া বিস্মিত ও পুলকিত হইতেছি।

এই হিমালয়ঘটিত উপমাটা এতক্ষণ অনুগ্রহপরায়ণ পাঠকবর্গের নিতান্তই কর্ণ-শূল হইয়া পড়িয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু এই সম্পর্কে আর একটা কথা না বলিয়া নিরস্ত হইতে পারিতেছি না। মহাভারতকে আদর্শ মহাকাব্য বলিয়া গ্রহণ করিয়া এবং হিমগিরির সহিত তাহার তুলনা করিতে গিয়া লেখক মহাকাব্যের একটা লক্ষণ নির্দ্ধারণ করিয়া ফেলিয়াছেন। বলা বাহুল্য, এই আবিষ্কার জগতের যাবতীয় অলঙ্কারশাস্ত্রের রোমহর্ষ উৎপাদন করিবে! তাহা জানিয়াও সেই আবিষ্কারটি পাঠকগণের সম্মুখে উপস্থিত করিবার দুঃসাহস আশ্রয় করিলাম; আশা করি, তাঁহাদের শুভ্রোজ্জ্বল দর্শনচছটা লেখককে যথারম্ভেই পৃষ্ঠপ্রদর্শনে বাধ্য করিবে না।

লেখকের মতে যে কাব্য পড়িতে হয় না, তাহারই নাম মহাকাব্য। না পড়িয়াই আমরা মহাকাব্যের কাব্যরসাস্বাদনে অনেকটা অধিকারী হইতে পারি। রামায়ণের চতুর্বিংশতিসহস্র শ্লোকের ও মহাভারতের লক্ষশ্লোকের অধিকাংশই অপঠিত রহিয়াছে, ইহা স্বীকার করিলে বোধ করি পাঠকসমাজের অধিকাংশই লজ্জিত হইবেন না। তথাপি এই পাঠকসমাজ উভয় মহাকাব্যের কাব্যরসের আস্বাদন জানেন না, ইহা স্বীকার করিতে তাঁহারা কখনই সম্মত হইবেন না। রামচরিত্র ও কৃষ্ণচরিত্র, লক্ষ্মণ-চরিত্র ও কর্ণচরিত্র, দশাননচরিত্র ও দুর্য্যোধনচরিত্র, ভরতচরিত্র ও ভীষ্মচরিত্র, মহা-কাব্যের গহনবন ভেদ করিয়া এই সকল মহামানব-চরিত্রের স্পর্শলাভ আমাদের অধিকাংশের ভাগ্যেই ঘটে নাই। আমরা দূর হইতে উহা নিরীক্ষণ করিয়াছি মাত্র; তথাপি দূর হইতেই তাহার মাহাত্ম্যে আমরা বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়া রহিয়াছি।

করা যাইতে পারে, ভারতবর্ষে আর্য্যসমাজে জন্মগ্রহণ করিয়া যে ব্যক্তি মাতৃস্তন্য করিয়া বর্দ্ধিত হইয়াছে, অথচ রামচরিত ও সীতাচরিতের পুণ্যধারা সেই

মাতৃস্তন্যের প্রবাহের মত তাহার আধ্যাত্মিক জীবনের শিরায় শিরায় সঞ্চারিত হয় নাই, স্নায়ুতন্ত্রীতে তাড়িতস্রোতের সঞ্চালন করে নাই, তাহার অস্থিতে, তাহার মজ্জায়, তাহার পেশীতে বল বিধান করে নাই, সেই হতভোগ্যের—সেই পিণ্ডীভূতজড়ের—ভারতসমাজে স্থান কোথায়? পঞ্চবিংশতি-কোটি হিন্দুসন্তানের অধিকাংশ, অন্য কারণ না থাকিলেও, শুদ্ধ ভাষাজ্ঞানের অভাবে, সেই পুণ্য স্রোতস্বিনীর মূল প্রস্রবণে গিয়া তৃষ্ণানিবারণে অশক্ত আছে, সন্দেহ নাই; কিন্তু লক্ষ্মণের মত ভাই, হনুমানের মত দাস, ভীষ্মের ন্যায় পিতামহ ও কর্ণের ন্যায় বৈরীর জাগ্রত-জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তি কয়জনের মানসচক্ষুর সম্মুখে দণ্ডায়মান নাই? আমাদের বঙ্গদেশেরই অসংখ্য নরনারী মাতৃমুখে লঙ্কাদহনের ও লক্ষ্মণভোজনের কথা শুনিয়াছে; কথকের মুখে, গায়কের মুখে মন্থরার লাঞ্ছনা ও অঙ্গদ-রাবণ-সংবাদের অতিরঞ্জনে আমোদিত হইয়াছে; যাত্রায়, গানে ভরতমিলন ও সীতানির্ব্বাসন অভিনীত হইতে দেখিয়া অশ্রুবিসর্জন করিয়াছে; কৃত্তিবাসী রামায়ণ-হস্তে অবকাশরঞ্জন করিয়াছে; এবং শেষের সেদিন রামনাম শুনিতে শুনিতে জগৎসংসারের নিকট হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিয়াছে; কিন্তু সেই আদিকবির অমৃতলেখনীর সহিত সাক্ষাৎ পরিচয় তাহাদের ভাগ্যে ঘটে নাই। কিন্তু আপনি জ্ঞানী, আপনি পণ্ডিত, আপনি কলাবিৎ, আপনি সমালোচক, আপনি সমজ্‌দার, আপনি সন্তরণ দিয়া সংস্কৃতসাহিত্য-সমুদ্রের পার দেখিয়াছেন, আপনার সপ্তকাণ্ড রামায়ণ আদ্যন্ত কণ্ঠস্থ রহিয়াছে, আপনার যদি বিশ্বাস থাকে যে, ঐ পল্লীবাসিনী মূর্খ বৃদ্ধার অপেক্ষা আপনি নিঃসংশয়ে রামরসায়নে অধিকতর রসগ্রাহী হইয়াছেন, তাহা হইলে আপনাকে ভ্রান্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করিব।

বস্তুতই আমার বিশ্বাস, মহাকাব্যের লক্ষণ এই যে, উহার আগাগোড়া অক্ষরে-অক্ষরে পড়িবার প্রয়োজন নাই। মূল হোমার পৃথিবীতে কয়জন লোক পড়িয়াছে? পণ্ডিতসমাজের মধ্যে কয়জন লোক হোমারের তর্জমা পর্য্যন্ত পাঠ করিয়াছেন? অধিকাংশের পক্ষে কেবল হোমারের গল্প শুনা আছে মাত্র। অথচ ট্রয়-নগরের প্রাকার-সম্মুখে সমুদ্রবেলা পূর্ণ করিয়া আমরা আগামেম্নন্-পরিচালিত গ্রীক্ অক্ষৌহিণীর সন্নিবেশ বর্ত্তমান মুহূর্ত্তে চক্ষের সম্মুখে স্পষ্ট তুলিকায় চিত্রিত দেখিতেছি। সেই বিস্তীর্ণ স্তব্ধ সেনাকুলিত রণাঙ্গনের উপর দিয়া একিলীস্, আজাক্স্ ও দায়োমীদের বিশালবক্ষা পরিণদ্ধকন্ধর শালপ্রাংশু জীবন্ত মূর্ত্তি বিচরণ করিতেছে; বৎসরের পর বৎসর অতিক্রান্ত হইতেছে, কিন্তু ট্রয়-নগরের দুর্ভেদ্য প্রাকার ভগ্ন হইল না; গ্রীক্ বীরগণের শিবিরমধ্যে মানবহৃদয়ের সনাতন ঈর্ষ্যাবিদ্বেষ ধূমায়মান হইতে লাগিল। সেই ধূম হইতে অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল, গ্রীক্ বীরগণ ক্ষণেকের জন্য উদ্দেশ্য-ভ্রান্ত ও লক্ষ্য-ভ্রষ্ট হইয়া পরস্পর আত্মকলহে প্রবৃত্ত হইলেন; তার পর-অঙ্কের যবনিকা তুলিবামাত্র অকস্মাৎ পাত্রোক্লসের চিতাধূম প্রশমিত হইতে না হইতে একিলীসের রোষাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল; রোষাগ্নিদীপ্ত রুদ্রমূর্ত্তি হুঙ্কার করিয়া গর্জ্জন করিল; পর দেখিতে পাই, মহাবীর হেক্টরের শবদেহ সেই ভীমকর্ম্মার রথচক্রে নিষ্পেষিত

রুধিরধারায় রণক্ষেত্র শোণিতাক্ত করিতেছে ও মর্ত্ত্যে নরগণের ও আকাশে দেবগণের মুগ্ধনেত্র বিস্ফারিত হইয়া সেই ক্রূর কর্ম্মের প্রতি নীরবে নিক্ষিপ্ত রহিয়াছে।

পাঠকবর্গ যদি এতক্ষণ বুঝিয়া থাকেন, কৃত্তিবাস পড়িলেই বাল্মীকি পড়ার কাজ হইবে, এবং যে সকল পাঁচালী-পয়ার শুনিয়া কাশীদাস ভারতকথা বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, সেই পাঁচালী পড়িলেই আর দ্বৈপায়ন-ঋষির শরণ লইতে হইবে না, তাহা হইলে লেখকের নিতান্ত দুর্ভাগ্য। বদরিকাশ্রমযাত্রী যাঁহারা হিমালয়ের চড়াই-উত্‌রাই অতিক্রম করিয়া আসিয়াছেন, কৈলাসযাত্রী যিনি ষোলহাজার ফুট উপরে উঠিয়া 'নীতি-পাস্' অতিক্রম করিয়া আসিয়াছেন, এমন কি দার্জিলিঙে কিংবা সিমলা-শৈলের আলোকমণ্ডিত রাজপথে যাঁহারা বিহার করিয়া আসিয়াছেন, তাঁহারা হিমালয়ের যে সৌন্দর্য্য দেখিয়াছেন, হিমালয়ের পাদদেশের সমতলবাসীর পক্ষে তাহা ইন্দ্রিয়মনের অগোচর, সন্দেহ নাই। কিন্তু আশঙ্কা হয়, হিমালয়ের এক এক দেশে, এক এক অঙ্গে, তাহার কিন্নরীসেবিত গুহামধ্যে, তাহার সরলদ্রুমাচ্ছন্ন সানুদেশে, তাহার গৈরিকখচিত উপত্যকায়, তাহার মারুতপূর্ণরন্ধ্র আপাদিতবেণুকৃত্য কীচকবনে, তাহার হিমশীকরবাহি-পবন-সেবিত গিরিনির্ঝরপ্রান্তে চিত্তবিভ্রমকর অতুল্য শোভা আছে সত্য; কিন্তু সেই একদেশব্যাপী শোভা, সেই প্রাদেশিক মূর্ত্তি, সমগ্র হিমাচলের প্রতি নিরীক্ষণের বড় অবকাশ দেয় না। হিমাচলের বিরাট্ মূর্ত্তির শোভা হৃদ্গত করিতে হইলে যেন দূরে থাকিয়া তাহার তুঙ্গ শিখররাজির দিকে অবলোকন আবশ্যক। সেইরূপ রামায়ণ-মহাভারতের বিশাল মহাকাব্যের মধ্যে অসংখ্য খণ্ডকাব্য নিবিষ্ট রহিয়াছে; অনেক বনজঙ্গল ভেদ করিয়া, অনেক প্রস্তরকঙ্কর অতিক্রম করিয়া, অনেক চড়াই-উত্‌রাই পার হইয়া, ক্লান্তশরীরে সেই সকল খণ্ডকাব্যের সৌন্দর্য্য-দর্শনে অধিকারী হইতে পারিলে, দর্শকের মন আনন্দরসে অভিপ্লুত হয়, সন্দেহ নাই; সেই সকল খণ্ডকবিতার উপমাও অন্যত্র দুর্লভ, সন্দেহ নাই; কিন্তু সমগ্র মহাকাব্যের মাহাত্ম্য-উপলব্ধির বিষয়ে সেই খণ্ডকাব্যের আলোচনা বিশেষ সাহায্য করে না। সমগ্র মহা-কাব্যের মহিমা উপলব্ধি করিতে হইলে, যেন মহাকাব্য হইতে কতকটা দূরে থাকাই সঙ্গত। সেই সকল খণ্ডকাব্যের খণ্ড সৌন্দর্য্যকে চক্ষুর সম্মুখ হইতে সরাইয়া মহা-কাব্যের বিশালায়তনের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করাই সঙ্গত।

আমাদের মধ্যে অনেকেই মূল মহাকাব্য পড়েন নাই, কিন্তু সকলেই দূর হইতে সেই মহাকাব্য দেখিয়াছেন; ভীষ্ম-দ্রোণ-কর্ণ-অশ্বত্থামার উন্নত চরিত্র হিমগিরির উন্নত শৃঙ্গের ন্যায় দূর হইতে সকলেরই নেত্রগত হইয়াছে। তথাপি আমরা মহা-কাব্যের মাহাত্ম্য বুঝিতে পারি। ইউরোপীয় সমালোচকদের অবস্থা অন্যরূপ। রামায়ণ-মহাভারতের ইউরোপীয়গণের লিখিত সমালোচনা পড়িয়া আমাদিগকে নিরাশ হইতে হয়। তাঁহারা আমাদের মত দূর হইতে নয়ন ভরিয়া মহাকাব্যের কাব্য-[illegible]র্য্য দেখিতে পান নাই; নিকটে গিয়াও সমগ্র মহাকাব্য অধ্যয়নের অবকাশ তাঁহাদের ঘটে না। বিশেষত পর্ব্বতে উঠিবার সময়ে তাহার বনজঙ্গল, তাহার প্রস্তরকঙ্কর,

তাঁহাদিগকে ক্লান্ত ও অবসন্ন করিয়া দেয়; তাঁহাদের ধৈর্য্য ও অধ্যবসায় পরাস্ত হইয়া যায়। তবে যিনি সৌভাগ্যক্রমে কোন একটা প্রদেশের, কোন একটা অঙ্গের, শোভা-দর্শনে সফল হন, তিনি সেই শোভা বর্ণনা করিয়াই আপনার কাজ শেষ হইল, মনে করেন। মহাভারতের অন্তর্গত শকুন্তলার উপাখ্যান, নলোপাখ্যান, সাবিত্রীর উপাখ্যান প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডকাব্য সৌন্দর্য্য-গৌরবে গরিষ্ঠ, সন্দেহ নাই; ইউরোপীয় সমালোচকেরা ঐ সকল উপাখ্যানের প্রশংসা করেন। কিন্তু আমরা জানি, ঐ সকল খণ্ডকাব্যের যতই সৌন্দর্য্য থাক্‌, মহাকাব্যের বিশাল সৌন্দর্য্যের নিকট তাহা স্থান পায় না। কিন্তু ইউরোপীয় সমালোচকের লেখনী এই সকল খণ্ডকাব্যের সমালোচনায় যেমন উদার হইয়া পড়ে, মূল মহাকাব্যের প্রশংসায় তেমন উদারভাব দেখাইতে পারে না।

যাহা পড়িতে হয় না, তাহাই মহাকাব্য; মহাকাব্যের এই লক্ষণ-নির্দ্দেশের অর্থ বোধ করি এতক্ষণে অনেকটা স্পষ্ট হইয়া থাকিবে।' মহাকাব্য না পড়িলে চলিতেও পারে; কিন্তু যাহা মহাকাব্য নহে, তাহা না পড়িলে একেবারেই চলে না। কালিদাস খুব বড় কবি, হয় ত ব্যাস-বাল্মীকি হইতেও বড় কবি; কিন্তু তিনি মহাকাব্য লেখেন নাই। কুমারসম্ভব বুঝিতে হইলে তাহার গল্প শুনিলে চলিবে না, তাহার অনুবাদ পড়িলে চলিবে না; তাহা হইলে মূল কুমারসম্ভব তন্নতন্ন করিয়া স্কুলের ছাত্রের মত টীকাটিপ্পনীসহ পড়িতে হইবে। নহিলে কুমারসম্ভব পড়াই হইবে না। কালিদাসের ভাষা, কালিদাসের ছন্দ, কালিদাসের ধ্বনি, কালিদাসের নিকটে না গেলে শুনিতে পাইবে না; দূর হইতে তাহার কিছুই বুঝিবে না। কালিদাস শিল্পী; তিনি পাতরের উপর পাতর বসাইয়া সৌধনির্ম্মাণ করিয়াছেন, শাদা ধপ্‌ধপে মার্বেলের ইটের উপর ইট বসাইয়া দেয়াল তুলিয়াছেন, সেই দেয়ালের গায়ে মণিমাণিক্য-বজ্র-প্রবালের লতাপাতা কাটিয়া তাহাকে বিচিত্র শোভায় অলঙ্কৃত করিয়াছেন। তিনি তাজমহল গাঁথিয়াছেন, আল্‌হাম্‌ব্রা গাঁথিয়াছেন; সেই সকল কারুশিল্পের শোভা দেখিতে হইলে নিকটে যাইতে হইবে; সকলেও সে শোভা দেখিবে না; সমজ্‌দারের চোখ লইয়া ও সমালোচকের রুচি লইয়া সেখানে যাইতে হইবে। নতুবা দেখিতে পাইবে না ও বুঝিতে পারিবে না।

শেক্‌স্‌পীয়র হয় ত আরও বড় কবি, তাঁহার স্থান হয় ত হোমারেরও অনেক উচ্চে, কিন্তু তিনিও মহাকাব্য লেখেন নাই। গ্রীক্‌ কবির হেলেনকে আমরা চোখে দেখি নাই, তাঁহার গল্প শুনিয়াছি মাত্র; কিন্তু যে রূপের আগুনে ট্রয়-নগর ভস্মীভূত হইয়াছিল, তাহা আমাদের কল্পনার নেত্রকেও অদ্যাপি ঝলসিয়া দিতেছে। কিন্তু শেক্‌স্‌পীয়রের নায়িকাগণের সৌন্দর্য্য বুঝিতে হইলে কেবল গল্প শুনিলে বা অনুবাদ পড়িলে চলিবে না। তাহাদিগকে নিকটে গিয়া স্বচক্ষে দেখিতে হইবে; সমজ্‌দারের চোখ লইয়া দেখিতে হইবে। শেক্‌স্‌পীয়রের ভাষা, তাঁহার ছন্দ, তাঁহার ধ্বনি হইতে দূরে থা[illegible] শেক্‌স্‌পীয়রকে চিনিবার আশা করা যায় না। এক-একবার মনে হয় বটে, শেক্‌স্‌পী

এক-একখানা খণ্ডকাব্যের ভিতর হইতে যেন সাগর-কল্লোলের অথবা ভূগর্ভ-তরঙ্গের মত শব্দ বাহির হইয়া আসিতেছে, যেন দাবদাহের গম্ভীর শব্দ দূর হইতে কাণে বাজিতেছে, কিন্তু নিকটে না গেলে সে শব্দের প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যায় না। শেক্স্‌পীয়র হয় ত একালের মহাকবি, কিন্তু তিনি মহাকাব্য রচনা করেন নাই।

কৃত্রিম পদার্থের সৌন্দর্য্যের সহিত স্বাভাবিক পদার্থের সৌন্দর্য্যের ঠিক তুলনা হয় না। কোন্ সৌন্দর্য্য বড়, তাহার তুলাদণ্ডে পরিমাপ চলে না। মনুষ্য-প্রতিভা সময়ে সময়ে যেন বিধাতার সৃষ্টিকেও পরাস্ত করে। সেইজন্য কৃত্রিমের পার্শ্বে স্বাভাবিককে দাঁড় করাইয়া কে ছোট কে বড় নির্দ্দেশ করিতে যাওয়া সমীচীন নহে। কৃত্রিমে যাহা আছে, তাহা স্বাভাবিকে থাকে না; আবার স্বাভাবিকে যাহা থাকে, তাহা কৃত্রিমে থাকে না। উভয় বস্তু ভিন্ন পর্য্যায়ের। মহাকাব্য চতুরাননের বদন হইতে বিনির্গত হয় নাই, উহা মনুষ্যেরই রচনা, সন্দেহ নাই; কিন্তু উহাতে একটা স্বাভাবিকত্ব আছে, তাহা সেই মনুষ্যের রচিত অন্য উৎকৃষ্ট বা উৎকৃষ্টতর কাব্যে নাই। তাহাতে বনজঙ্গল, প্রস্তরকঙ্কর থাকিলেও তাহার একটা গৌরব আছে, তাহাকে দূর হইতে দেখিলেই চেনা যায়; তাহার গল্প শুনিলে মন অভিভূত হয়; তাহাকে বুঝিতে হইলে সমজ্‌দার হইতে হয় না, শিক্ষানবিশী করিতে হয় না; চশ্‌মা পরিতে হয় না, স্বভাবদত্ত চক্ষু লইয়াই তাহাকে চিনিতে ও বুঝিতে পারা যায়। এই অলঙ্কারহীন, পরিচ্ছদহীন মুক্ত স্বাভাবিকতাই মহাকাব্যের বিশিষ্ট লক্ষণ। মনুষ্যের সভ্যতা, অন্তত বর্ত্তমানকালের সভ্যতা অত্যন্ত কৃত্রিম বস্তু। এই কৃত্রিমতার আমি নিন্দা করিতেছি না; হয় ত কৃত্রিমতাই মনুষ্যত্বের প্রধান লক্ষণ; হয় ত কৃত্রিমতা মনুষ্যত্ব হইতে অভিন্ন; অন্তত মানবিকতার সহিত পাশবিকতার যাহা পার্থক্য, তাহারই নাম কৃত্রিমতা। সুতরাং কৃত্রিমতার নিন্দা করিলে মনুষ্যের বিশিষ্ট ধর্ম্মকেই নিন্দা করা হয়। এইজন্য কৃত্রিমতার নিন্দা করিতে চাহি না। কৃত্রিমতাই মনুষ্যের গৌরব বলিলেও বিস্মিত হইব না। কৃত্রিমতাতেই মনুষ্যত্বের চরম স্ফূর্ত্তি, তাহাও বলা যাইতে পারে। কৃত্রিম সৌন্দর্য্যের সৃষ্টিতেই মানবপ্রতিভার পরাকাষ্ঠা, তাহাও স্বীকার করিতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু তথাপি কৃত্রিম শিল্প কৃত্রিম। উহাতে চাকচিক্য আছে, গাঁথনি আছে, ওস্তাদি আছে, ও সকলের উপরে উহার চেষ্টাকৃত নির্ম্মাণকল্পনায়—উহার ডিজাইনে—মনুষ্যের সৃষ্টি-কর্ত্তৃত্বের আভাস আছে; আর যাহা স্বাভাবিক তাহাতে চাকচিক্য নাই, গাঁথনি নাই, তাহা অযত্নকৃত অযথাবিন্যস্ত ঝটিকাভগ্ন বারিধারাবর্ষিত বৃহৎ দ্রব্যের সমাবেশে গঠিত। মানুষের বর্ত্তমানকালের সভ্যতা অত্যন্ত কৃত্রিম। সেইজন্য মহাকাব্যের প্রধান লক্ষণ যে স্বাভাবিকতা, সেই স্বাভাবিকতার অভাবে বোধ হয় বর্ত্তমান সভ্যতায় মহাকাব্যের উৎপত্তির প্রতিরোধ করে। আধুনিক সভ্যতা কবিত্বসৃষ্টির অন্তরায় নহে, কিন্তু মহাকাব্যসৃষ্টির বোধ হয় অন্তরায়। এখন কর্ম্মযন্ত্রে ভ্রমমাণ মনুষ্যকে তাহার [illegible]কাশ জীবনের কথঞ্চিৎ-লব্ধ অবসরের ক্ষুদ্র মুহূর্ত্তগুলিকে খণ্ডকাব্যের ও খণ্ড-[illegible]র্য্যের জ্বালা ও বৈচিত্র্য দ্বারা পূর্ণ করিতে হয়, বৃহৎ পদার্থে দৃষ্টি আবদ্ধ রাখিয়া

তাহার বিশাল সৌন্দর্য্যের উপভোগের অবকাশ থাকে না। সেইজন্যই বোধ হয়, সভ্যসমাজে শেক্স্‌পীয়র জন্মিয়াছেন, কালিদাস জন্মিয়াছেন, কিন্তু হোমার জন্মেন নাই বা বাল্মীকি জন্মেন নাই। ইহাতে মনুষ্যজাতির ক্ষতি কি লাভ, তাহা গণনার অবসর লেখকের নাই। আমরা যাহা পাইয়াছি, তাহাতেই আমাদিগকে তৃপ্ত থাকিতে হইবে। সংসারের স্রোত উল্টাইবার ক্ষমতা আমাদের নাই। আমরা সহস্র চেষ্টা করিলেও মহাকবির উৎপাদনে সমর্থ হইব না। তবে কাল নিরবধি ও পৃথ্বী বিপুলা; আবার যদি কালের স্রোতে মহাকবির উৎপত্তি ঘটে, তাহাতেও আমরা বিস্মিত হইব না।

[বঙ্গদর্শন (নবপর্য্যায়), ১৩০৯]

সাহিত্য-সমালোচনা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ঘরে বসিয়া আনন্দে যখন হাসি এবং দুঃখে যখন কাঁদি, তখন এ কথা কখনো মনে উদয় হয় না যে, আরও একটু বেশি করিয়া হাসা দরকার বা কান্নাটা ওজনে কিছু কম পড়িয়াছে। কিন্তু পরের কাছে যখন আনন্দ বা দুঃখ দেখানো আবশ্যক হইয়া পড়ে, তখন মনের ভাবটা সত্য হইলেও বাহিরের প্রকাশটা সম্পূর্ণ তাহার অনুযায়ী না হইতে পারে।

এমন কি, মা-ও যখন সশব্দ বিলাপে পল্লীর নিদ্রা-তন্দ্রা দূর করিয়া দেয়, তখন সে যে শুদ্ধমাত্র পুত্রশোক প্রকাশ করে, তাহা নয়,—পুত্রশোকের গৌরব প্রকাশ করিতেও চায়। নিজের কাছে দুঃখ-সুখ প্রমাণ করিবার কোন প্রয়োজন হয় না—পরের কাছে তাহা প্রমাণ করিতে হয়। সুতরাং শোক-প্রকাশের জন্য যেটুকু কান্না স্বাভাবিক, শোক-প্রমাণের জন্য তাহার চেয়ে স্বর চড়াইয়া না দিলে চলে না।

ইহাকে কৃত্রিমতা বলিয়া উড়াইয়া দিলে অন্যায় হইবে। শোক-প্রমাণ শোক-প্রকাশের একটা স্বাভাবিক অঙ্গ। (আমার ছেলের মূল্য যে কেবল আমারই কাছে বেশি, তাহার বিচ্ছেদ যে কতখানি মর্ম্মান্তিক ব্যাপার, তাহা পৃথিবীর আর কেহই যে বুঝিবে না, তাহার অভাব-সত্ত্বেও পৃথিবীর আর সকলেই যে অত্যন্ত স্বচ্ছ-চিত্তে আহার-নিদ্রা ও আপিস-যাতায়াতে প্রবৃত্ত থাকিবে,—শোকাতুর মাতাকে তাহার পুত্রের প্রতি জগতের এই অবজ্ঞা আঘাত করিতে থাকে। তখন সে নিজের শোকের প্রবলতার দ্বারা এই ক্ষতির প্রাচুর্য্যকে বিশ্বের কাছে ঘোষণা করিয়া তাহার পুত্রকে যেন গৌরব করিতে চায়।)

যে অংশে শোক নিজের, সে অংশে তাহার একটি স্বাভাবিক সংযম থাকে ; যে অংশে তাহা পরের কাছে ঘোষণা, তাহা অনেক সময়েই সঙ্গতির সীমা লঙ্ঘন করে। পরের অসাড় চিত্তকে নিজের শোকের দ্বারা বিচলিত করিবার স্বাভাবিক ইচ্ছায় তাহার চেষ্টা অস্বাভাবিক উদ্যম অবলম্বন করে।

কেবল শোক নহে, আমাদের অধিকাংশ হৃদয়-ভাবেরই এই দুইটা দিক্‌ই আছে,—একটা নিজের জন্য, একটা পরের জন্য। আমার হৃদয়-ভাবকে সাধারণের হৃদয়-ভাব করিতে পারিলে তাহার একটা সান্ত্বনা, একটা গৌরব আছে। আমি যাহাতে বিচলিত, তুমি তাহাতে উদাসীন,—ইহা আমাদের কাছে ভাল লাগে না ; কারণ, নানা লোকের কাছে প্রমাণিত না হইলে সত্যতার প্রতিষ্ঠা হয় না। আমিই যদি আকাশকে হলদে দেখি, আর দশ জনে না দেখে, তবে তাহাতে আমার ব্যাধিই সপ্রমাণ হয় ! সেটা আমারই দুর্ব্বলতা।

আমার হৃদয়-বেদনায় পৃথিবীর যত বেশি লোক সমবেদনা অনুভব করিবে, ততই তাহার সত্যতা প্রতিষ্ঠিত হইবে। আমি যাহা একান্তভাবে অনুভব করিতেছি, তাহা যে আমার দুর্ব্বলতা, আমার ব্যাধি, আমার পাগলামি নহে, তাহা যে সত্য, তাহা সর্ব্ব-সাধারণের হৃদয়ের মধ্যে প্রমাণিত করিয়া আমি বিশেষভাবে সান্ত্বনা ও সুখ পাই।

যাহা নীল, তাহা দশ জনের কাছে নীল বলিয়া প্রচার করা কঠিন নহে, কিন্তু যাহা আমার কাছে সুখ বা দুঃখ, প্রিয় বা অপ্রিয়, তাহা দশ জনের কাছে সুখ বা দুঃখ, প্রিয় বা অপ্রিয় বলিয়া প্রতীত করা দুরূহ। সে অবস্থায় নিজের ভাবকে কেবলমাত্র প্রকাশ করিয়াই খালাস পাওয়া যায় না ; নিজের ভাবকে এমন করিয়া প্রকাশ করিতে হয়, যাহাতে পরের কাছেও তাহা যথার্থ বলিয়া অনুভূত হইতে পারে।

সুতরাং এইখানেই বাড়াবাড়ি হইবার সম্ভাবনা। দূর হইতে যে জিনিষটা দেখাইতে হয়, তাহা কতকটা বড় করিয়াই দেখানো আবশ্যক। সেটুকু বড়, সত্যের অনুরোধেই করিতে হয় ; নহিলে জিনিষটা যে পরিমাণে ছোট দেখায়, সেই পরিমাণেই মিথ্যা দেখায়। বড় করিয়াই তাহাকে সত্য করিতে হয়।

আমার সুখ-দুঃখ আমার কাছে অব্যবহিত, তোমার কাছে তাহা অব্যবহিত নয়। আমি হইতে তুমি দূরে আছ। সেই দূরত্বটুকু হিসাব করিয়া আমার কথা তোমার কাছে কিছু বড় করিয়াই বলিতে হয়।

সত্যরক্ষাপূর্ব্বক এই বড় করিয়া তুলিবার ক্ষমতায় সাহিত্যকারের যথার্থ পরিচয় পাওয়া যায়। যেমনটি ঠিক, তেমনি লিপিবদ্ধ করা সাহিত্য নহে ; কারণ, প্রকৃতিতে যাহা দেখি, তাহা আমার কাছে প্রত্যক্ষ, আমার ইন্দ্রিয় তাহার সাক্ষ্য দেয়। সাহিত্যে যাহা দেখায়, তাহা প্রাকৃতিক হইলেও তাহা প্রত্যক্ষ নহে। সুতরাং সাহিত্যে সেই প্রত্যক্ষতার অভাব পূরণ করিতে হয়।

[illegible]কৃত-সত্যে এবং সাহিত্য-সত্যে এইখানেই তফাৎ আরম্ভ হয়। সাহিত্যের [illegible]ন করিয়া কাঁদে, প্রাকৃত-মা তেমন করিয়া কাঁদে না। তাই বলিয়া সাহিত্যের

মার কান্না মিথ্যা নহে। প্রথমত, প্রাকৃত-রোদন এমন প্রত্যক্ষ যে, তাহার বেদনা আকারে, ইঙ্গিতে, কণ্ঠস্বরে, চারিদিকের দৃশ্যে এবং শোক-ঘটনার নিশ্চয় প্রমাণে আমাদের প্রতীতি ও সমবেদনা উদ্রেক করিয়া দিতে বিলম্ব করে না। দ্বিতীয়ত, প্রাকৃত-মা আপনার শোক সম্পূর্ণ ব্যক্ত করিতে পারে না, সে ক্ষমতা তাহার নাই, সে অবস্থাও তাহার নয়।

এই জন্যই সাহিত্য ঠিক প্রকৃতির আরশি নহে। কেবল সাহিত্য কেন, কোনো কলাবিদ্যাই প্রকৃতির যথাযথ অনুকরণ নহে। প্রকৃতিতে প্রত্যক্ষকে আমরা প্রতীতি করি, সাহিত্যে এবং ললিতকলায় অপ্রত্যক্ষ আমাদের কাছে প্রতীয়মান। অতএব এ স্থলে একটি অপরটির আরশি হইয়া কোন কাজ করিতে পারে না।

এই প্রত্যক্ষতার অভাববশত সাহিত্যে ছন্দোবন্ধ-ভাষাভঙ্গীর নানাপ্রকার কল-বল আশ্রয় করিতে হয়। এইরূপে রচনার বিষয়টি বাহিরে কৃত্রিম হইয়া অন্তরে প্রাকৃত অপেক্ষা অধিকতর সত্য হইয়া উঠে।

এখানে 'অধিকতর সত্য' এই কথাটা ব্যবহার করিবার বিশেষ তাৎপর্য্য আছে। মানুষের ভাব-সম্বন্ধে প্রাকৃত-সত্য জড়িত-মিশ্রিত, ভগ্নখণ্ড, ক্ষণস্থায়ী। সংসারের ঢেউ ক্রমাগতই ওঠা-পড়া করিতেছে—দেখিতে দেখিতে একটার ঘাড়ে আর একটা আসিয়া পড়িতেছে, তাহার মধ্যে প্রধান-অপ্রধানের বিচার নাই—তুচ্ছ ও অসামান্য গায়ে-গায়ে ঠেলাঠেলি করিয়া বেড়াইতেছে। প্রকৃতির এই বিরাট্ রঙ্গ-শালায় যখন মানুষের ভাবাভিনয় আমরা দেখি, তখন আমরা স্বভাবতই অনেক বাদ-সাদ দিয়া বাছিয়া লইয়া, আন্দাজের দ্বারা অনেকটা ভর্ত্তি করিয়া, কল্পনার দ্বারা অনেকটা গড়িয়া তুলিয়া থাকি। আমাদের একজন পরমাত্মীয়ও তাঁহার সমস্তটা লইয়া আমাদের কাছে পরিচিত নহেন। আমাদের স্মৃতি নিপুণ সাহিত্য-রচয়িতার মত তাঁহার অধিকাংশই বাদ দিয়া ফেলে। তাঁহার ছোট-বড় সমস্ত অংশই যদি ঠিক সমান অপক্ষ-পাতের সহিত আমাদের স্মৃতি অধিকার করিয়া থাকে, তবে এই স্তূপের মধ্যে আসল চেহারাটি মারা পড়ে ও সবটা রক্ষা করিতে গেলে আমাদের পরমাত্মীয়কে আমরা যথার্থভাবে দেখিতে পাই না। পরিচয়ের অর্থই এই যে, যাহা বর্জ্জন করিবার তাহা বর্জ্জন করিয়া যাহা গ্রহণ করিবার তাহা গ্রহণ করা।

একটু বাড়াইতেও হয়। আমাদের পরমাত্মীয়কেও আমরা মোটের উপরে অল্পই দেখিয়া থাকি। তাঁহার জীবনের অধিকাংশ আমাদের অগোচর। আমরা তাঁহার ছায়া নহি, আমরা তাঁহার অন্তর্যামীও নহি। তাঁহার যে অনেকখানিই আমরা দেখিতে পাই না, সেই শূন্যতার উপরে আমাদের কল্পনা কাজ করে। ফাঁকগুলি পূরাইয়া লইয়া আমরা মনের মধ্যে একটা পূর্ণ ছবি আঁকিয়া তুলি। যে লোকের সম্বন্ধে আমাদের কল্পনা খেলে না, যাহার ফাঁক আমাদের কাছে ফাঁক থাকিয়া যায়, যাহার প্রত্যক্ষগোচর অংশই আমাদের কাছে বর্ত্তমান, অপ্রত্যক্ষ অংশ আমাদের কাছে অস্পষ্ট—অ[illegible] তাহাকে আমরা জানি না, অল্পই জানি। পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষই এইরূপ অ

কাছে ছায়া, আমাদের কাছে অসত্যপ্রায়। তাহাদের অনেককেই আমরা উকিল বলিয়া জানি, ডাক্তার বলিয়া জানি, দোকানদার বলিয়া জানি---মানুষ বলিয়া জানি না; অর্থাৎ আমাদের সঙ্গে যে বহির্বিষয়ে তাহাদের সংস্রব, সেইটাকেই সর্ব্বাপেক্ষা বড় করিয়া জানি---তাহাদের মধ্যে তদপেক্ষা বড় যাহা আছে, তাহা আমাদের কাছে কোন আমল পায় না।

সাহিত্য যাহা আমাদিগকে জানাইতে চায়, তাহা সম্পূর্ণভাবে জানায়: অর্থাৎ স্থায়ীকে রক্ষা করিয়া, অবান্তরকে বাদ দিয়া, ছোটকে ছোট করিয়া, বড়কে বড় করিয়া, ফাঁককে ভরাট করিয়া, আল্‌গাকে জমাট করিয়া দাঁড় করায়। প্রকৃতির অপক্ষপাত প্রাচুর্যের মধ্যে মন যাহা করিতে চায়, সাহিত্য তাহাই করিতে থাকে। মন প্রকৃতির আরশি নহে, সাহিত্যও প্রকৃতির আরশি নহে। মন প্রাকৃতিক জিনিষকে মানসিক করিয়া লয়---সাহিত্য সেই মানসিক জিনিষকে সাহিত্যিক করিয়া তোলে।

দু'য়ের কার্য্যপ্রণালী প্রায় একই রকম। কেবল দু'য়ের মধ্যে কয়েকটা বিশেষ কারণে তফাৎ ঘটিয়াছে। মন যাহা গড়িয়া তোলে, তাহা নিজের আবশ্যকের জন্য ---সাহিত্য যাহা গড়িয়া তোলে, তাহা সকলের আনন্দের জন্য। নিজের জন্য একটা মোটামুটি নোট করিয়া রাখিলেও চলে---সকলের জন্য আগাগোড়া সুসম্বন্ধ করিয়া তুলিতে হয়; এবং তাহাকে এমন জায়গায়, এমন আলোকে, এমন করিয়া ধরিতে হয়, যাহাতে সম্পূর্ণভাবে সকলের দৃষ্টিগোচর হয়। মন সাধারণত প্রকৃতির মধ্য হইতে সংগ্রহ করে---সাহিত্য মনের মধ্য হইতে সঞ্চয় করে। মনের জিনিষকে বাহিরে ফলাইয়া তুলিতে গেলে বিশেষভাবে সৃজনশক্তির আবশ্যক হয়। এইরূপে প্রকৃতি হইতে মনে ও মন হইতে সাহিত্যে যাহা প্রতিফলিত হইয়া উঠে, তাহা অনুকরণ হইতে বহুদূরবর্ত্তী।

প্রকৃত সাহিত্যে আমরা আমাদের কল্পনাকে, আমাদের সুখ-দুঃখকে, শুদ্ধ বর্ত্তমান কাল নহে,---চিরন্তন কালের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহি। সুতরাং সেই সুবিশাল প্রতিষ্ঠাক্ষেত্রের সহিত তাহার পরিমাণ-সামঞ্জস্য করিতে হয়। ক্ষণকালের মধ্য হইতে উপকরণ সংগ্রহ করিয়া তাহাকে যখন চিরকালের জন্য গড়িয়া তোলা যায়, তখন ক্ষণকালের মাপকাঠি লইয়া কাজ চলে না। এই কারণে প্রচলিত কালের সহিত, সঙ্কীর্ণ সংসারের সহিত উচ্চসাহিত্যের পরিমাণের প্রভেদ থাকিয়া যায়।

অন্তরের জিনিষকে বাহিরের, ভাবের জিনিষকে ভাষার, নিজের জিনিষকে বিশ্বমানবের এবং ক্ষণকালের জিনিষকে চিরকালের করিয়া তোলা সাহিত্যের কাজ।

জগতের সহিত মনের যে সম্বন্ধ, মনের সহিত সাহিত্যকারের প্রতিভার সেই সম্বন্ধ। এই প্রতিভাকে বিশ্বমানব-মন নাম দিলে ক্ষতি নাই। জগৎ হইতে মন নিজের জিনিষ সংগ্রহ করিতেছে, সেই মন হইতে বিশ্বমানব-মন পুনশ্চ নিজের জিনিষ করিয়া নিজের জন্য গড়িয়া লইতেছে।

বুঝিতেছি, কথাটা বেশ ঝাপ্সা হইয়া আসিয়াছে; আর একটু পরিস্ফুট করিতে চেষ্টা করিব। কৃতকার্য্য হইব কি না, জানি না।

আমরা আমাদের অন্তরের মধ্যে দুইটা অংশের অস্তিত্ব অনুভব করিতে পারি,—একটা অংশ আমার নিজত্ব, আর একটা অংশ আমার মানবত্ব। আমার ঘরটা যদি সচেতন হইত, তবে সে নিজের ভিতরকার খণ্ডাকাশ ও তাহারই সহিত পরিব্যাপ্ত মহাকাশ, এই দুইটাকে ধ্যানের দ্বারা উপলব্ধি করিতে পারিত। আমাদের ভিতরকার নিজত্ব ও মানবত্ব সেই প্রকার। যদি দু'য়ের মধ্যে দুর্ভেদ্য দেয়াল তোলা থাকে, তবে আত্মা অন্ধকূপের মধ্যে বাস করে।

প্রকৃত সাহিত্যকারের অন্তঃকরণে যদি তাহার নিজত্ব ও মানবত্বের মধ্যে কোন ব্যবধান থাকে, তবে তাহা কল্পনার কাচের সারশির স্বচ্ছ ব্যবধান। তাহার মধ্য দিয়া পরস্পরের চেনাপরিচয়ের ব্যাঘাত ঘটে না। এমন কি, এই কাচ দূরবীক্ষণ ও অণুবীক্ষণের কাচের কাজ করিয়া থাকে—ইহা অদৃশ্যকে দৃশ্য, দূরকে নিকট করে।

সাহিত্যকারের সেই মানবত্বই সৃজনকর্ত্তা। লেখকের নিজত্বকে সে আপনার করিয়া লয়, ক্ষণিককে সে অমর করিয়া তোলে, খণ্ডকে সে সম্পূর্ণতা দান করে।

জগতের উপরে মনের কারখানা বসিয়াছে এবং মনের উপরে বিশ্ব-মনের কারখানা—সেই উপরের তলা হইতে সাহিত্যের উৎপত্তি।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মনোরাজ্যের কথা আসিয়া পড়িলে সত্যতা বিচার করা কঠিন হইয়া পড়ে। কালোকে কালো প্রমাণ করা সহজ, কারণ অধিকাংশের কাছেই তাহা নিশ্চয় কালো; কিন্তু ভালকে ভাল প্রমাণ করা তেমন সহজ নহে, কারণ এখানে অধিকাংশের একমত সাক্ষ্য সংগ্রহ করা কঠিন।

এখানে অনেকগুলি মুস্কিলের কথা আসিয়া পড়ে। অধিকাংশের কাছেই যাহা ভাল, তাহাই কি সত্য ভাল,—না, বিশিষ্ট সম্প্রদায়ের কাছে যাহা ভাল, তাহাই সত্য ভাল?

যদি বিজ্ঞানের কথা ছাড়িয়া দেওয়া যায়, তবে প্রাকৃতবস্তুসম্বন্ধে এ কথা নিশ্চয় বলিতে হয় যে, অধিকাংশের কাছে যাহা কালো, তাহাই সত্য কালো। পরীক্ষার দ্বারা দেখা গেছে, এ সম্বন্ধে মতভেদের সম্ভাবনা এত অল্প যে, অধিক সাক্ষ্য সংগ্রহ করিবার কোন প্রয়োজন হয় না।

কিন্তু ভাল যে ভালই এবং কত ভাল, তাহা লইয়া মতের এত অনৈক্য ঘটিয়া থাকে যে, সে সম্বন্ধে কিরূপ সাক্ষ্য লওয়া উচিত, তাহা স্থির করা কঠিন।

বিশেষ কঠিন এই জন্য, সাহিত্যকারদের শ্রেষ্ঠ চেষ্টা কেবল বর্ত্তমান কালের জন্য নহে। চিরকালের মনুষ্য-সমাজই তাঁহাদের লক্ষ্য। যাহা বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ কালের জন্য লিখিত, তাহার অধিকাংশ সাক্ষী ও বিচারক বর্ত্তমান কাল হইতে করিয়া মিলিবে?

ইহা প্রায়ই দেখা যায় যে, যাহা তৎসাময়িক ও তৎস্থানিক তাহাই অধিকাংশ লোকের কাছে সর্ব্বপ্রধান আসন অধিকার করে। কোন একটি বিশেষ সময়ের সাক্ষি-সংখ্যা গণনা করিয়া সাহিত্যের বিচার করিতে গেলে অবিচার হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা আছে। এই জন্য বর্ত্তমান কালকে অতিক্রম করিয়া সর্ব্বকালের দিকেই সাহিত্যকে লক্ষ্যনিবেশ করিতে হয়।

কালে-কালে মানুষের বিচিত্র শিক্ষা, ভাব ও অবস্থার পরিবর্ত্তন-সত্ত্বেও যে সকল রচনা আপন মহিমা রক্ষা করিয়া চলিয়াছে, তাহাদেরই অগ্নি-পরীক্ষা হইয়া গেছে। মন আমাদের সহজগোচর নয় এবং অল্প সময়ের মধ্যে আবদ্ধ করিয়া দেখিলে অবিশ্রাম গতির মধ্যে তাহার নিত্যানিত্য সংগ্রহ করিয়া লওয়া আমাদের পক্ষে দুঃসাধ্য হয়। এই জন্য সুবিপুল কালের পরিদর্শনশালার মধ্যেই মানুষের মানসিক বস্তুর পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হয়। ইহা ছাড়া নিশ্চয় অবধারণের চূড়ান্ত উপায় নাই।

কিন্তু কাজ চলিবার মত উপায় না থাকিলে সাহিত্যে অরাজকতা উপস্থিত হইত। হাইকোর্টের আপিল-আদালতে যে জজ-আদালতের সমস্ত বিচারই পর্য্যস্ত হইয়া যায়, তাহা নহে। সাহিত্যেও সেইরূপ জজ-আদালতের কাজ বন্ধ থাকিতে পারে না। আপিলের শেষ-মীমাংসা অতিদীর্ঘকাল-সাপেক্ষ—ততক্ষণ মোটামুটি বিচার এক রকম পাওয়া যায় এবং অবিচার পাইলেও উপায় নাই।

যেমন সাহিত্যের স্বাধীন রচনায় এক-একজনের প্রতিভা সর্ব্বকালের প্রতিনিধিত্ব গ্রহণ করে,—সর্ব্বকালের আসন অধিকার করে, তেমনি সমালোচনার প্রতিভাও আছে। এক-একজনের পরখ করিবার শক্তিও স্বভাবতই অসামান্য হইয়া থাকে। যাহা ক্ষণিক, যাহা সঙ্কীর্ণ, তাহা তাঁহাদিগকে ফাঁকি দিতে পারে না ; যাহা ধ্রুব, যাহা চিরন্তন, এক মুহূর্ত্তেই তাহা তাঁহারা চিনিতে পারেন। সাহিত্যের নিত্যবস্তুর সহিত পরিচয়-লাভ করিয়া নিত্যত্বের লক্ষণগুলি তাঁহারা জ্ঞাতসারে এবং অলক্ষ্যে অন্তঃকরণের সহিত মিলাইয়া লইয়াছেন,—স্বভাবে এবং শিক্ষায় তাঁহারা সর্ব্বকালীন বিচারকের পদ গ্রহণ করিবার যোগ্য।

আবার ব্যবসাদার সমালোচকও আছে। তাহাদের পুঁথিগত বিদ্যা। তাহারা সারস্বত-প্রাসাদের দেউড়িতে বসিয়া হাঁকডাক, তর্জ্জনগর্জ্জন, ঘুষ ও ঘুষির কারবার করিয়া থাকে—অন্তঃপুরের সহিত তাহাদের পরিচয় নাই। তাহারা অনেক সময়েই গাড়িজুড়ি ও ঘড়ির চেন দেখিয়াই ভোলে। কিন্তু বীণাপাণির অনেক অন্তঃপুরচারী আত্মীয় বিরলবেশে দীনের মত মার কাছে যায় এবং তিনি তাহাদিগকে কোলে লইয়া মস্তকাঘ্রাণ করেন। তাহারা কখন-কখন তাঁহার শুভ্র অঞ্চলে কিছু-কিছু ধূলিক্ষেপও করে—তিনি তাহা হাসিয়া ঝাড়িয়া ফেলেন। এই সমস্ত ধূলা-মাটি-সত্ত্বেও দেবী যাহাদিগকে আপনার বলিয়া কোলে তুলিয়া লন—দেউড়ির দরোয়ানগুলা তাহাদিগকে ...র কোন্ লক্ষণ দেখিয়া ? তাহারা পোষাক চেনে, তাহারা মানুষ চেনে না। ...। উৎপাত করিতে পারে, কিন্তু বিচার করিবার ভার তাহাদের উপর নাই।

সারস্বতদিগকে অভ্যর্থনা করিয়া লইবার ভার যাঁহাদের উপরে আছে, তাঁহারাও নিজে সরস্বতীর সন্তান—তাঁহারা ঘরের লোক, ঘরের লোকের মর্য্যাদা বোঝেন।

[বঙ্গদর্শন (নবপর্য্যায়), ১৩১০]

কথা-সাহিত্য

দীনেশচন্দ্র সেন

এ দেশের লোকেরা সাধারণতঃ আপনাদের ভোগবিলাসে কুণ্ঠিত ছিলেন। নিজেরা খড়ো ঘরে থাকিয়া দেবমন্দির পাকা করিয়া গাঁথিতেন। তাঁহাদের যাহা কিছু উৎসব, তাহা ঠাকুর দেবতা লইয়া। দ্বিজ জনার্দ্দন, কাণা হরিদত্ত প্রভৃতি কয়েক জন প্রধান কবি অতি ছোট-খাট ব্রতকথার রচনা করিয়াছিলেন। চণ্ডী, মনসা প্রভৃতি দেবতা-দিগের পূজা দেখিতে বহু লোক সমবেত হইত। গৃহস্থ তাঁহাদের মনোরঞ্জন করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িতেন। এই উপলক্ষে ব্রত-কথা 'গানে' ও 'গান' 'কাব্যে' পরিণত হইল। ষষ্ঠী, শীতলা, ত্রিনাথ, সত্যনারায়ণ, শনি, মাণিকপীর, সত্যপীর প্রভৃতি হিন্দু ও অহিন্দু সমস্ত দেবতারই ছোট-খাটো ব্রতকথা আছে। এই সকল ব্রতকথার সকলগুলিই উত্তরকালে বিকাশ পায় নাই; অনেকগুলি কোরক-অবস্থাতেই লয় পাইয়াছে। বড় বড় দেবতার ব্রত-কথা শুনিতে আসর জমিয়া যাইত। সেগুলি ক্রমশঃ কবিগণের তূলিকায় সুরঞ্জিত ও সুচিত্রিত হইয়া বৃহদাকার ধারণ করিয়াছে। হিন্দুর প্রতিভা চিরকালই পূজামণ্ডপে বিকশিত হইয়াছে। যজ্ঞবেদীর আয়তন নির্ণয় করিতে রেখা-গণিতের সৃষ্টি হইয়াছে; যজ্ঞের কালশুদ্ধি-বিচারের জন্য জ্যোতিষ-শাস্ত্রের সূত্রপাত হইয়াছে। ঋক্ মন্ত্রে দেবতার যে আহ্বান ও প্রার্থনাবাণী শ্রুত হওয়া যায়, এই সকল ব্রত-কথার মুখবন্ধে অগ্নি, সূর্য্য প্রভৃতি দেবতার স্তবে অনেক স্থলে সেই আদি স্তোত্রের প্রতিধ্বনি বর্ত্তমান যুগে আমাদের শ্রুতিগোচর হয়।

উড়িষ্যার জগন্নাথ-মন্দিরের গাত্রে যেরূপ মনুষ্য-সমাজের বিচিত্র চিত্র উৎকীর্ণ হইয়াছে, তাহার সকলগুলি ঠাকুর-দালানে স্থান পাইবার যোগ্য নহে। অনেক চিত্র শ্লীলতাকে অতিমাত্রায় অতিক্রম করিয়াছে। সেইরূপ, পূর্ব্বোক্ত ব্রতকথাগুলির মধ্যে নিদয়ার গর্ভ ও তদবস্থায় তাহার রুচিকর খাদ্যের তালিকা হইতে বিদ্যা ও সুন্দরের নির্লজ্জ ইন্দ্রিয়-সেবা প্রভৃতি অনেক বিষয়ই অবতারিত হইয়াছে। এ ঠাকুরকে শুনাইবার জন্য গীত হইয়া থাকে। ইহা আশ্চর্য্যের বিষয়, সন্দেহ ন

কিন্তু আমাদের দেশে ঠাকুর গৃহস্থের অনেকটা অন্তরঙ্গ। তিনি প্রত্যেক হিন্দুর গৃহে একটি প্রকোষ্ঠ অধিকার করিয়া পারিবারিক সমস্ত সুখ-দুঃখের সূক্ষ্মতম অবস্থার সন্ধান রাখেন; গৃহস্থ তাঁহাকে লুকাইয়া কোনও আমোদ করিতে সাহস পান না।

ব্রত-কথাগুলি প্রধানতঃ চণ্ডী, মনসা, শীতলা, সত্যনারায়ণ, এই সকল দেবতা লইয়াই বিশেষ ভাবে জমিয়া গিয়াছিল। কিন্তু শিব-গীতিই বোধ হয় সর্ব্বাগ্রে বিরচিত হইয়া থাকিবে। "ধান ভান্‌তে শিবের গীত" প্রবাদ অতিপ্রাচীন। প্রাচীন "শিবায়ন" দুই একখানি পাওয়া যায়। সার্দ্ধ তিনি শত বৎসর পূর্ব্বে কবিচন্দ্র একখানি শিব-গীতিব রচনা করেন। কৃত্তিবাসের উত্তর-কাণ্ডে শিবধর্ম্ম-সম্বন্ধে অনেক প্রসঙ্গ দৃষ্ট হয়। উহা প্রায় পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্বে বিরচিত হইয়াছিল। কবি-কঙ্কণ স্বয়ং বাল্যকালে 'শিব-সঙ্গীত' রচনা করিয়াছিলেন, তাহা আত্ম-পরিচয়ে লিখিয়াছেন।

কিন্তু শিব-গীতি এ দেশে তেমন বিকাশ প্রাপ্ত হয় নাই। শঙ্কর-প্রণোদিত শৈব-ধর্ম্মের মূলে অদ্বৈতবাদ। অদ্বৈতবাদের মতে জীব স্বয়ং শিব। সাধারণ লোক বেদান্তমূলক এই উন্নত ধর্ম্মভাব-গ্রহণে সমর্থ নহে। তাহারা স্বয়ং সাহস করিয়া ঠাকুরের আসন গ্রহণ করিতে পারে না; যে দেবতা দুঃখের সময়ে তাহাদিগকে ধরিয়া তুলিবেন, বিপদে সহায় হইবেন, চণ্ডী, মনসা, সত্যনারায়ণ তাহাদের নিকট সেইরূপ প্রত্যক্ষ দেবতা। দ্বৈতবাদ স্বীকার না করিলে সাধারণ লোকের প্রাণ হাঁফাইয়া উঠে; এই জন্য বঙ্গদেশে চণ্ডী ও মনসা প্রভৃতি দেবতার গানের দল এইরূপ অসামান্য পুষ্টি লাভ করিয়াছিল। বৈষ্ণব ও শাক্তধর্ম্মোক্ত প্রত্যক্ষ-দেবতা-বাদ হিন্দুকে প্রত্যক্ষ-ঈশ্বরবাদী জ্বলন্ত-বিশ্বাসপরায়ণ ইসলামের আকর্ষণ হইতে রক্ষা করিয়াছিল; শৈবধর্ম্ম জন-সাধারণকে ইসলামধর্ম্ম-গ্রহণ হইতে রক্ষা করিতে পারিত কি না সন্দেহ।

চণ্ডী ও মনসা প্রভৃতি দেবতা-সম্বন্ধীয় কাব্যের আলোচনা করিলে দৃষ্ট হইবে, শিব স্বীয় ভক্তগণ-সম্বন্ধে একেবারে নিশ্চেষ্ট। চন্দ্রধর সদাগর শিবের পরমভক্ত; মনসা দেবীর কোপে পড়িয়া তিনি কতই না কষ্ট সহ্য করিলেন; যে হস্তে তিনি শূলপাণির পূজা করিয়া থাকেন, তাহার অঞ্জলি অন্য কোনও দেবতার পদে দেয় নহে, এই অকুণ্ঠিত বিশ্বাসের ফলে আজীবন কষ্ট সহিলেন। এমন ভক্ত-শ্রেষ্ঠের বিপদে শিব একবারও সহায় হইলেন না। ধনপতি সদাগর চণ্ডীর কোপে কারারুদ্ধ হইলেন; জগদ্দল প্রস্তর তাঁহার বক্ষের উপর স্থাপিত হইল। চণ্ডী তাঁহাকে এই বিপদ্ হইতে উদ্ধার করিতে উদ্যত হইলেন; কিন্তু তিনি সেই অযাচিত সাহায্য উপেক্ষা করিয়া চণ্ডীকে বলিলেন, "যদি বন্দীশালে মোর বাহিরায় প্রাণী। মহেশ ঠাকুর বিনে অন্য নাহি জানি।" অথচ শিব এহেন ভক্তকে রক্ষা করিবার কোন চেষ্টাই করিলেন না। চন্দ্রকেতু রাজা শীতলা দেবীর নিগ্রহে কত বিপদে পতিত হইলেন, তথাপি তিনি শিবের প্রতি বিশ্বাসে অটল রহিলেন; কিন্তু শিব তাঁহারও কোনও সহায়তা করেন

শৈব ধর্ম্মের সহিত শাক্ত ধর্ম্মের বিরোধের আভাস আমরা এই সকল উপাখ্যানে প্রাপ্ত হই। শিবের নিশ্চেষ্টতা ও অপরাপর দেবতাদের ভক্তকে রক্ষা ও অবিশ্বাসীকে দণ্ড দিবার আগ্রহের মূলসত্র আমরা এই স্থানে দেখিতে পাই। শৈব ধর্ম্ম অদ্বৈতবাদ-রূপ ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত; উহাতে সাহায্যকারী উপাস্য ও সাহায্যপ্রার্থী উপাসক,—কেহ নাই। জীব ও শিব অভিন্ন। কিন্তু শাক্ত ও বৈষ্ণব ধর্ম্মের মূলে দ্বৈতবাদ; সেখানে দেবতা ভক্তের জন্য সর্ব্বদা সচেষ্ট।

শৈবধর্ম্মাবলম্বী আপনাকেই যথাসাধ্য বড় করিয়া দেখিয়াছেন; নিজে বড় হইয়া জীব ব্রহ্মের আসন পর্য্যন্ত অধিকার করিতে সাহসী হইয়াছেন। বাঙ্গালা শিব-সঙ্গীতে শিবের মাহাত্ম্য চণ্ডী প্রভৃতি দেবতার মাহাত্ম্য অপেক্ষা স্বতন্ত্র। কৃত্তিবাসের রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে শিব-সম্বন্ধে একটি উপাখ্যান আছে:—গঙ্গাদেবী কোনও সময়ে সুমন্ত মুনির আশ্রমে ছিলেন। একদা দেবগৃহে রন্ধন ও পরিবেশনাদির জন্য দেবতারা মুনির নিকটে গঙ্গাদেবীকে প্রার্থনা করেন। সুমন্ত মুনি গঙ্গাদেবীকে যাইতে অনুমতি দান করেন; কিন্তু বলিয়া দেন, যেন তিনি সন্ধ্যার পূর্ব্বে আশ্রমে ফিরিয়া আসেন। কর্ম্মবাহুল্যবশতঃ গঙ্গাদেবীর ফিরিয়া আসিতে অনেক রাত্রি হয়। সুমন্ত মুনি গঙ্গাকে দেখিয়া ক্রুদ্ধ-ভাবে বলিলেন, "এত রাত্রে তুমি গৃহে ফিরিয়া আসিয়াছ; দেবতা-দিগকে পরিবেশন করিবার কালে তোমার অঙ্গপ্রত্যঙ্গে তাঁহাদের লোলুপ-দৃষ্টি পতিত হইয়াছে; তাঁহাদের দুষ্ট দৃষ্টির ভাজন হইয়া তুমি পতিতা হইয়াছ; আমি তোমাকে এই আশ্রমে আর স্থান দিতে পারি না।" অপবাদ-ভয়ে কোনও দেবতাই গঙ্গাকে স্থান দিতে সাহস করিলেন না। গঙ্গা অনাথিনীর বেশে ঘাটে ঘাটে কাঁদিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। অবশেষে পাগল ধূর্জ্জটি তাঁহাকে মস্তকে স্থান দিয়া কৈলাসে লইয়া আসিলেন। পরিত্যক্তাকে এরূপ আশ্রয় তিনি ভিন্ন দেব-সমাজে আর কে দিতে পারিত? সমুদ্র-মন্থনকালে যে সকল রত্ন উঠিয়াছিল, তাহা দেবতাদের ভাণ্ডার পূর্ণ করিল। তখন মহাদেব শ্মশানভস্ম দেহে মাখিয়া পাগলের ন্যায় হাসিতেছিলেন। কিন্তু যখন হলাহল উঠিয়া জগৎ ধ্বংস করিতে উদ্যত হইল, অমরাবতী ভস্মসাৎ হইবার সম্ভাবনা ঘটিল, তখন শ্মশানচারী মহাদেব আসিয়া সেই হলাহল পান করিলেন; ত্রিভুবন রক্ষা পাইল! কিন্তু সেই বিষ-ভক্ষণে তাঁহার যে উৎকট যন্ত্রণা হইয়াছিল, তাহার ফলে মহাদেবের কণ্ঠ নীলবর্ণ হইয়া গেল। বৈষ্ণব-পদাবলীতে দেব-গোষ্ঠ-বর্ণনায় লিখিত আছে,—গোপ-বালকবেশী হরি যখন গোষ্ঠে লীলা করিতেছিলেন, তখন ব্রহ্মা, ইন্দ্র, বরুণ প্রভৃতি সকল দেবতা আসিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া-ছিলেন; গোপ-বালকের অপাঙ্গদৃষ্টিতেই তাঁহারা কৃতকৃতার্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু যখন ভস্মভূষিতদেহ শ্মশানবাসী পাগলবেশী শিব উপস্থিত হইলেন, তখন হরি অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে গুরু বলিয়া হৃদয়ে ধারণ করিলেন, এবং বলিলেন, "আপনি আমার বৈষ্ণবী মায়া অতিক্রম করিয়াছেন, এই জন্য আমার প্রণম্য। আপনাকে আমি স্বর্ণময়ী কৈলাসপুরী দিয়াছিলাম, কুবেরকে আপনার ভাণ্ডারী করিয়া দিয়াছিলাম

কিন্তু আপনি সেই দিগম্বরই আছেন, এবং শ্মশানের ছাই অঙ্গে মাখিয়া থাকেন ; আমার সমস্ত শক্তি আপনার নিকট পরাজিত।"

এই দেব-মাহাত্ম্য, ত্যাগের এই উন্নত আদর্শ জনসাধারণ ততটা বুঝিতে পারে না ; কিন্তু তাহারা ভোগের দেবতাদের প্রভাব ও তাঁহাদের প্রদত্ত ঐশ্বর্য্যের মাহাত্ম্য অনুভব করিতে পারে। পরবর্ত্তী শিবায়নগুলিতেও শিব অপেক্ষা চণ্ডীর মাহাত্ম্য বিশেষরূপে পরিব্যক্ত হইয়াছে। সুতরাং তাহা খাঁটি শিব-সঙ্গীত নহে।

প্রাচীন সাহিত্যে বর্ণিত মনসা, চণ্ডী, শীতলা প্রভৃতি দেবতাদিগের কার্য্যকলাপ সর্ব্বত্র শোভনভাবে বর্ণিত হয় নাই। মনসা দেবী লক্ষ্মীন্দরের লৌহবাসরে সর্প-প্রবেশযোগ্য একটি ছিদ্র রাখিবার জন্য গৃহ-নির্ম্মাতা কাবিলাকে অনুরোধ করিতেছেন ; কখনও বা চাঁদ সদাগরের সংগৃহীত ভিক্ষার ঝুলির তণ্ডুল-কণা নষ্ট করিবার জন্য গণদেবের নিকট মূষিক ভিক্ষা করিতেছেন ; চাঁদ সদাগরকে বিপদে ফেলিবার জন্য কখনও বা হনুমানকে সমুদ্রে ঝড় উঠাইবার জন্য অনুরোধ করিতেছেন ! চণ্ডীদেবীও নানা সূত্রে ধনপতি ও শ্রীমন্তকে বিপন্ন করিতেছেন ; ভক্তের স্মরণমাত্র ইঁহারা যে সকল ক্রিয়া-কলাপে প্রবৃত্ত হইতেছেন, তাহা সর্ব্বত্র শোভন বা মর্য্যাদাযুক্ত হইয়াছে বলিয়া স্বীকার করা যায় না।

কিন্তু বিষয়টি অন্য ভাবেও আলোচনীয়। জনসাধারণের বিশ্বাস কতক পরিমাণে অমার্জিত থাকিবেই ; তাহাদের জন্যই এই সকল পুস্তক লিখিত হইয়াছিল। এই জন্য এই সকল রচনার সর্ব্বত্র সুরুচি ও সুভাব রক্ষিত হয় নাই। পাঠক প্রাচীন রচনায় সর্ব্বত্র খাঁটি সোনার প্রত্যাশা করিবেন না। আকরের স্বর্ণে যেরূপ অন্য ধাতুর মিশ্রণ থাকে, খাদ বর্জন করিয়া তবে খাঁটি সোনার উদ্ধার করিতে হয়, তেমনই এই দেব-উপাখ্যানের মধ্যেও একটা উজ্জ্বল সত্য আছে, তাহা লক্ষ্য করিতে হইবে। চণ্ডী, মনসা প্রভৃতি দেবতার পূর্ব্বোক্ত ক্রিয়াকলাপের মধ্যে একটা সামগ্রীর প্রাচুর্য্য আছে ;—তাহা সন্তানের জন্য মাতৃ-হৃদয়ের ব্যাকুলতা। উপায় ও কার্য্যপ্রণালীতে উচ্চ নীতির সঙ্গতি থাকুক আর না থাকুক, সন্তান কষ্টে পড়িলে মাতা যেরূপ নানা উপায়ে তাহাকে রক্ষা করিতে উদ্যত হন, এই সকল দেবতার বিচিত্র কার্য্য সেই প্রকার সচেষ্ট মাতৃ-ভাব-প্রণোদিত।

এক দিকে বেদান্ত-মূলক শৈবধর্ম্ম, নির্গুণ ঈশ্বর-তত্ত্ব। তাহা যতই উচ্চ হউক না কেন, সাধারণ লোকে তাহাতে প্রত্যক্ষ ও সগুণ দেবতার প্রতি অচলা ভক্তি, তৃপ্তি পায় নাই। অপর দিকে অশোভন প্রণালীতে পরিব্যক্ত হইলেও, বেদান্তের সূক্ষ্ম তত্ত্ব ও শৈবধর্ম্মের ত্যাগের মহিমা সকলের আয়ত্ত নহে। তাহার স্থলে ভক্ত দুর্ব্বল, অসহায় ও পাপী-তাপী হইলেও, শরণ লইবামাত্র তাহার জন্য দেবতার ক্রোড় প্রসারিত হয়, এই বিশ্বাস সাধারণের চিত্তে এক অভূতপূর্ব্ব শান্তির সৃষ্টি করিয়াছিল ; পদ্মাপুরাণ, [illegible]লা-মঙ্গল, হরিলীলা, চণ্ডী-মঙ্গল প্রভৃতি কাব্যোক্ত দেবতার উপাখ্যান এই ভাবে [illegible]লে অনেক বিসদৃশ প্রশ্নের মীমাংসা হইতে পারে।

7—1641 B.T.

এই কথা-সাহিত্যের আলোচনা করিলে আর একটি বিষয়েও দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। অতি-প্রাচীন সাহিত্যে বরং পুরুষ-চরিত্রগুলিতে কতকটা পৌরুষ দৃষ্ট হয়, কিন্তু ভাষার উন্নতির সহিত এই কথা-সাহিত্যের অন্তর্গত কাব্যগুলি যতই শ্রীবৃদ্ধি-সম্পন্ন হইতে লাগিল, ততই কাব্য-নায়কগণের চরিত্র খর্ব্ব ও হীনতার বর্ণে চিত্রিত হইতে লাগিল। বঙ্গদেশে পৌরুষ ও চরিত্র-বলের যে অধোগতি হইয়াছে, প্রাচীন-সাহিত্যের আলোচনা করিলেও তাহা সপ্রমাণ হয়।

কবিগণ যে সকল উপকরণ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তদ্দ্বারা কাব্যনায়কগণের চরিত্র অতি উজ্জ্বলবর্ণে চিত্রিত করিতে পারিতেন। কিন্তু কাব্যে তাহার বিপরীত হইয়াছে।

মনসার ভাসানে চাঁদ সদাগরের চরিত্রের যে আভাস আছে, তাহাতে ইঁহাকে পুরুষকারের জীবন্ত উদাহরণ বলিয়া মনে হয়। মনসাদেবীর ক্রোধে ইঁহার গুয়াবাড়ীর ধ্বংস হইল; একটি একটি করিয়া ছয়টি পুত্র সর্পদংশনে প্রাণত্যাগ করিল; সপ্ত ডিঙ্গা ও সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ 'মধুকর' জলযান দেবীর কোপে কালীদহে ডুবিয়া গেল;—চাঁদ সদাগর একটিবার বাম হস্তে মনসার পদে অঞ্জলি দিলেই এই সকল উৎপাতের অবসান হইত। তখনও যদি সদাগর সম্মত হইতেন, তাহা হইলে মনসার কৃপায় মৃত পুত্রগণের পুনর্জীবন ও নষ্ট বৈভবের পুনরুদ্ধার হইত। কিন্তু চাঁদ সদাগরের পণ বজ্র-কঠিন। কালীদহের আবর্ত্তে পড়িয়া চাঁদ মৃতকল্প, সুবিস্তৃত-পত্র-সঙ্কুল পদ্ম-লতা দেখিয়া আশ্রয়ের জন্য চাঁদ হস্ত প্রসারণ করিয়াছেন, কিন্তু মনসার এক নাম পদ্মা, ইহা স্মরণ হইবামাত্র নামের সংস্রব-হেতু চাঁদ ঘৃণায় হস্ত প্রত্যাবর্ত্তিত করিয়া মরিতে প্রস্তুত হইলেন! তিন দিন অনাহারের পর চাঁদ প্রিয়সুহৃৎ চন্দ্রকেতুর গৃহে আহার করিতে বসিয়াছেন, এমন সময়ে শুনিতে পাইলেন, চন্দ্রকেতুর গৃহে মনসাদেবীর ঘট স্থাপিত আছে; তখন কিছুমাত্র না খাইয়া সরোষে বন্ধুগৃহ হইতে প্রস্থান করিলেন। সর্ব্বাপেক্ষা কঠোর বিপদ্ উপস্থিত হইল। সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্র, শোকদগ্ধা সনকা-রাণীর বক্ষের ধন লক্ষ্মীন্দরের সর্পদংশনে মৃত্যু হইল। কিন্তু চাঁদ সদাগরের সঙ্কল্প অটুট রহিল! এরূপ বীরপুরুষের মর্য্যাদাও প্রাচীন কবিগণ কিছুমাত্র রক্ষা করিতে পারেন নাই; বরং নারায়ণ দেব ও বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরাণে চাঁদ সদাগরের চরিত্রবলের সম্মান কথঞ্চিৎ প্রদর্শিত হইয়াছে; কিন্তু ক্ষেতকাদাস, ক্ষেমানন্দ প্রভৃতি পরবর্ত্তী কবিগণ এই তেজস্বী চরিত্রকে উপহাসাস্পদ করিয়া তুলিয়াছেন।—যখন তিনি কালীদহে পতিত হইয়াছেন, তখন কবি বর্ণনা করিয়াছেন,—"ঢোকে ঢোকে জল খায় চাঁদ অধিকারী।" চন্দ্রকেতুর আলয় হইতে যখন তিনি সরোষে উঠিয়া আসেন, তখনকার বর্ণনা এইরূপ,—

"পাগল দেখিয়া তারে, কেহ ঢোকা চুকি মারে,
কেহ মারে মাথায় ঠোকর।"

বনের পাখীগুলি চাঁদ সদাগরের পাদক্ষেপে উড়িয়া গেল; ব্যাধগণ আসিয়া তাঁহাকে বলিল,—

"কেন তুই পক্ষী দিলি তেড়ে,
কোথা হোতে কাল তুই এলি ভেড়ের ভেড়ে।"

কাঠের বোঝা মাথায় রাখিতে না পারিয়া মনসাদেবী কর্ত্তৃক চাঁদ যখন বিড়ম্বিত হইতেছেন, তখন কবি লিখিয়াছেন,—

"কাষ্ঠ বোঝা ফেলে সাধু পড়ে ঘন পাকে।
ঘাড়ে হস্ত দিয়া সাধু বাপ বাপ ডাকে।"

এমন কি, স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াও অন্ধকারে তিনি স্বীয় ভৃত্য নেড়া কর্ত্তৃক চোর-ভ্রমে দণ্ডিত হইতেছেন,—

"কলাবনে চাঁদ বেণে খুসুর মুসুর নড়ে।
লম্ফ দিয়া নেড়া তার ঘাড়ে গিয়া পড়ে।
চোর চোর বলিয়া মারিল চড় লাথি।
বিনা পরিচয়ে তাহে অন্ধকার রাতি॥"

সুতরাং দেখা যাইতেছে, এই তেজস্বী বীর-চরিত্রের মহিমা কবিগণ কিছুমাত্র উপলব্ধি করিতে পারেন নাই; হীন উপহাস ও বিদ্রূপের খেলনা-স্বরূপ করিয়া তাঁহাকে আমাদিগের নিকট উপস্থিত করিয়াছেন।

কালকেতুর উপাখ্যানটি মুকুন্দরামের ন্যায় প্রতিভাবান্ কবির রচিত। কালকেতুর বীরত্ব অতি অপূর্ব্ব। পশু-জগতের সহিত যুদ্ধ-বিগ্রহে তাঁহার যে পরাক্রম দেখিতে পাই, তদপেক্ষা মহত্তর বিক্রম তাঁহার চরিত্রবলে বিদ্যমান। ব্যাধযোগ্য বর্ব্বরতার ত্রুটী নাই, কিন্তু তাঁহার নৈতিক সাবধানতা ঋষি-তুল্য। দেবী চণ্ডী রূপসী ললনা সাজিয়া তাহা পরীক্ষা করিয়াছিলেন, ব্যাধ-নায়ক তাঁহার কপট নীরবতায় ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে হত্যা করিতেও উদ্যত হইয়াছিল। এই অমার্জিত চরিত্র যেমন নৈতিক-বল-সম্পন্ন, তেমনই উদার ও সরল। মুরারি শীলের ন্যায় শঠ বণিকের সহিত তাঁহার ব্যবহারে আমরা সেই সারল্যের চিত্র সমুজ্জ্বলরূপে চিত্রিত দেখিতে পাই। এ পর্য্যন্ত মুকুন্দরাম পৌরুষের যে পট অঙ্কন করিয়াছেন, তাহা নিখুঁৎ। কিন্তু কলিঙ্গ-রাজের সহিত যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া কালকেতু যে ভীরুতা প্রদর্শন করিল, তাহাতে বাঙ্গালী-কবি পৌরুষের চিত্রাঙ্কনে স্বভাবতঃই কিরূপ অপটু, তাহাই প্রতিপন্ন হইতেছে। মুকুন্দরাম এত বড় কবি হইয়াও কালকেতুর চরিত্রে সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে পারেন নাই। ইহাতে তাঁহার বিশেষ অপরাধ নাই। যে সমাজে তিনি বাস করিতেছিলেন, সে সমাজে পুরুষের বীর্য্যবত্তা বিদায়োন্মুখ হইয়াছিল। শ্রেষ্ঠ কবিগণ সমাজের প্রতিলিপিই প্রদান করিয়া থাকেন। কালকেতু যুদ্ধে হারিয়া স্ত্রীর উপদেশে ভীরুতার একশেষ দেখাইল,—

"ফুল্লরার কথা শুনি, হিতাহিত মনে গুণি
লুকাইল বীর রাঁধন ঘরে।"

কিন্তু মাধবাচার্য্যের তুলিতে কালকেতুর চরিত্র এ ভাবে নষ্ট হয় নাই। মাধবাচার্য্য কবি-কঙ্কণের পূর্ব্ববর্ত্তী; তিনি পূর্ব্ব-বঙ্গের কবি। সে সমাজে প্রাচীন আদর্শ তখনও বিনষ্ট হয় নাই। মাধবাচার্য্য অন্য সর্ব্ববিষয়ে কবি-কঙ্কণ অপেক্ষা অল্প-শক্তিশালী হইয়াও কালকেতুর চরিত্র-বর্ণনে বীর্য্যবত্তার আদর্শ অধিকতর অক্ষুণ্ন রাখিয়াছেন। যখন কলিঙ্গরাজের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইবার পর ফুল্লরা কালকেতুকে পলায়ন করিয়া প্রাণ বাঁচাইবার উপদেশ দিল, তখন—

"শুনিয়া যে বীরবর, কোপে কাঁপে থর থর,
শুন রামা আমার উত্তর।
করে লয়ে শর গাণ্ডী, পূজিব মঙ্গলচণ্ডী,
বলি দিব কলিঙ্গ-ঈশ্বর॥
যতেক দেখহ অশ্ব, সকল করিব ভস্ম;
কুঞ্জর করিব লণ্ডভণ্ড।
বলি দিব কলিঙ্গ-রায়, তুষিব চণ্ডিকা মায়,
আপনি ধরিব ছত্রদণ্ড॥"

বন্দী অবস্থায় কালকেতু যখন রাজ-সভায় আনীত হইল, তখন, "রাজসভা দেখি বীর প্রণাম করে।"

ধনপতির চরিত্র-বর্ণনাতেও এই ভাবের অসঙ্গতি দৃষ্ট হয়। তাঁহাকে সিংহলরাজ বন্দী করিয়া অন্ধকূপে রাখিয়া দিলেন। বক্ষে গুরুভার পাষাণ। এই ভাবে বহুবৎসর যাপন করিয়াও তাঁহার অদম্য তেজ কিছুমাত্র ক্ষুণ্ন হইল না। চণ্ডীদেবী এই অবস্থায় তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন, "যদি আমার পূজা কর, তবে তোমার নষ্ট সৌভাগ্য উদ্ধার পাইবে।" পাষাণ-নিপীড়িত-বক্ষ, অসহ্য যন্ত্রণায় কাতর ধনপতি উত্তর করিলেন— "যদি বন্দীশালে মোর বাহিরায় প্রাণী। মহেশ ঠাকুর বিনে অন্য নাহি জানি।" এমন চরিত্রবান্ ব্যক্তি গৌড়ে যাইয়া গণিকা-প্রেমে মুগ্ধ হইয়া পড়িতেছেন, এবং খুল্লনা ও লহনা সপত্নীদ্বয়ের বিবাদে যে নিশ্চেষ্ট ভীরুতা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা লক্ষ্য করিলে আমাদের কষ্ট হয়।

ধর্ম্মমঙ্গল-কাব্যে লাউসেনের চরিত্রও প্রাচীন কবিগণ এই ভাবে শ্রীহীন করিয়াছেন। কাব্যে তাঁহার যে সকল বীরত্ব ও কীর্ত্তির কথা উল্লিখিত আছে, তাহা-দ্বারা একখানি মহাকাব্য রচিত হইতে পারিত। লাউসেন কাঙুরের কামবলকে অজেয় কাটারীর প্রভাবে পরাস্ত করিতেছেন; ঢেকুর দুর্গের ইছাই ঘোষ তাঁহার হস্তে নিহত হইল; গৌড়েশ্বর-প্রেরিত প্রবীণ মল্লগণ তাঁহার বলপ্রভাবে পরাজয় স্বীকার করিল; নয়ান-সুন্দরী, সুরিক্ষা প্রভৃতি গণিকাগণ তাঁহাকে প্রলুব্ধ করিতে আসিয়া হতগর্ব্ব হইল; চারি দিকের রাজন্যবর্গ তাঁহার অপূর্ব বীরত্ব ও চরিত্র-প্রভাব দেখিয়া বিস্মিত হইয়া লাউসেনকে আপনাদের রূপলাবণ্যবতী দুহিতাদিগকে পত্নীস্বরূপ উপহার দিয়া ধন্য হ[illegible] অবশেষে লাউসেন দুশ্চর তপস্যা দ্বারা সিদ্ধিলাভ করিলেন। তাঁহার [illegible]

প্রভাবের পূর্ণতার চিহ্নস্বরূপ সূর্য্যদেব পশ্চিম দিক্ হইতে উদিত হইলেন। এই সকল কথা কাব্য-ভাগে ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে; তদ্দ্বারা আমাদের চক্ষেও কোন উজ্জ্বল বীর-চরিত্র প্রতিফলিত হয় নাই। ধর্ম্মঠাকুর লাউসেনের বিপদ্-দর্শনমাত্র তাঁহার গাত্র হইতে মশকটি পর্য্যন্ত তাড়াইয়া দিতেছেন। সুতরাং লাউসেনের কোনও চরিত্র-গৌরব উপলব্ধি করিবার অবকাশ কবিগণ রাখেন নাই। তিনি বিপন্ন হইবামাত্র স্বয়ং ঠাকুর আসরে অবতীর্ণ হইবেন, দুই এক পালা পাঠ করিবার পরেই পাঠকের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হইয়া যায়; তখন লাউসেনের বিপদে পাঠকের কোনও ত্রাস উপস্থিত হয় না, এবং তাঁহার জয়েও তদীয় চরিত্রের প্রতি কোনও শ্রদ্ধার সঞ্চার হয় না।

এই সকল কাব্যে দেবমাহাত্ম্য-কীর্ত্তনই কবিগণের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল; মনুষ্য-চরিত্র কবির চক্ষে তত দূর শ্রদ্ধেয় হয় নাই। এই সকল চিত্রে বঙ্গসমাজে পুরুষ-চরিত্রের অধোগতিই সূচিত হইতেছে। ক্রমশঃ পুরুষগণ দুর্ব্বলতার চরমসীমায় উপনীত হইয়াছিলেন। খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে সুন্দর, কামিনীকুমার, চন্দ্রভাল ও চন্দ্রকান্ত কাব্য-নায়ক-রূপে বঙ্গ-সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন; ইঁহারা অন্তঃপুরের নায়কতায় যেরূপ পটুতা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা আমাদের জাতীয় লজ্জার বিষয়। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই সকল কবি রমণী-চরিত্র-অঙ্কনে অপূর্ব্ব কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন! এ দেশে সীতার পার্শ্বে বেহুলা অনায়াসে স্থান পাইতে পারেন। কোথায় বাল্মীকি, আর কোথায় কেতকাদাস; স্বর্ণ ও সীসে যে প্রভেদ, এই উভয় কবির প্রতিভায় তদপেক্ষাও অধিকতর তারতম্য; অথচ যদি আমরা অমার্জিত কথা মার্জনা করি, গ্রাম্যতা ও মূর্খতা সহ্য করিয়া পল্লীকবির কাব্য পাঠ করি, তাহা হইলে দীনহীনা বেহুলার চরিত্র পাঠ করিতে করিতে আমাদের হৃদয় বেদনাতুর হইবে। এই রমণীকে ব্যাসের সাবিত্রী বা বাল্মীকির সীতা অপেক্ষা কোনও অংশে হীন মনে হইবে না। কলার মান্দাসে অকূল নদীতরঙ্গে বেহুলা ভাসিয়া যাইতেছেন; স্বামীর শবে তিনি প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিবেন, এই তাঁহার সঙ্কল্প। আত্মীয়-স্বজন সকলে তাঁহার নির্ব্বুদ্ধিতা দেখিয়া তাঁহাকে ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টা করিতেছে। তাঁহার নব-যৌবন ও অনিন্দ্যরূপ দেখিয়া কত দুষ্ট ব্যক্তি তাঁহাকে প্রলুব্ধ করিবার চেষ্টা পাইতেছে। কিন্তু বেহুলা জগৎকে উপেক্ষা করিয়া ভেলায় ভাসিতেছে; কখনও নবঘনবিনিন্দিত নিতম্ব-লম্বী কেশপাশ মুক্ত করিয়া রূপপ্রতিমা বেহুলা দেব-সভায় নৃত্য করিতেছে; কখনও স্বামীর শব হইতে কৃমিকীট তাড়াইয়া নিবিষ্ট-মনে তাহা হইতে মাছিতা ভাঙ্গিতেছে; কখনও কর্ণে কুণ্ডল ও গলায় শঙ্খের মালা পরিয়া বেহুলা যোগিনী-বেশে মাতা অমলা ও পিতা সায় বেণেকে সান্ত্বনা দিতেছে; কখনও বা ডুমুনী সাজিয়া ব্যজনীহস্তে শ্বশুর-গৃহের সকলকে চমৎকৃত করিতেছে। বেহুলার দুশ্চর তপস্যা এই সমস্ত ব্যাপারকে শ্রদ্ধেয় ও উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছে। পাঠক বেহুলার কথা পড়িয়া না কাঁদিয়া থাকিতে পারিবেন না। পল্লী-কবিগণের মূর্খতা ও সহস্র ত্রুটী তাঁহার নিকট মার্জনা লাভ করিবে।

ফুল্লরার চরিত্রেও সেই উজ্জ্বল পাতিব্রত্য। দরিদ্র স্বামিগৃহে ভেরাণ্ডার থাম, তাহা কাল-বৈশাখীতে প্রত্যহ ভাঙ্গিয়া পড়ে। গ্রীষ্মকালের দারুণ রৌদ্রে পথের বালি উত্তপ্ত হয়, পা পুড়িয়া যায় ;- ফুল্লরা মাংসের পসরা মাথায় করিয়া হাটে হাটে পর্য্যটন করে। শীতকালে পুরাতন দোপাট্টাখানি গায়ে দিতে শত স্থান ছিন্ন হয় ; বনে তখন শাক পাওয়া যায় না। ফুল্লরার তাল-পত্রের ছাউনী ভাঙ্গা কুঁড়েতে একখানি মাটিয়া পাথর পর্য্যন্ত নাই ; গর্ত্ত করিয়া আমানি রাখিতে হয়। কখনও পসরা মাথায় করিয়া পরিশ্রান্ত ফুল্লরা তৃষ্ণায় ছট্ ফট্ করিতেছে ; যদি বা কোথাও মাংসের পসরা নামাইয়া পুকুরের জল খাইতে গিয়াছে, অমনই চিলে আধা-আধি মাংস সাবাড় করিয়া ফেলিয়াছে। আশ্বিন মাসে যখন বঙ্গের ঘরে ঘরে উৎসব, তখন দুঃখিনী ফুল্লরার মাংসের বিক্রয় নাই ; কারণ, সকলে দেবীর প্রসাদমাংস লাভ করিত, ফুল্লরার পসার কে কিনিবে ? সেই সময়ে চতুর্দ্দিকে আনন্দের চিত্র ;—নববস্ত্র-পরিহিত নরনারী আমোদে মত্ত ; ফুল্লরা বস্ত্রের অভাবে হরিণের ছাল পরিয়া থাকিত। বসন্তকালে প্রেমোৎসব ; যুবক ও রমণীরা সুখাভিলাসী ; ফুল্লরা ক্ষুধার জ্বালায় কুঁড়ে-ঘরে ছট্‌ফট্ করিত। এই তাহার বার মাসের কথা। কিন্তু যে দিন ষোড়শীরূপিণী চণ্ডী অতুল ঐশ্বর্য্যে প্রলুব্ধ করিয়া দুঃখিনী ব্যাধরমণীর স্বামিপ্রেমের কণিকা প্রার্থনা করিলেন, সে দিন দেখা গেল, স্বামিপ্রেমের তুলনায় কুবেরের অতুল ঐশ্বর্য্যও অতি অকিঞ্চিৎকর। ফুল্লরা কালকেতুর সোহাগে দুঃসহ দারিদ্র্য মাথায় বরণ করিয়া লইয়াছিল, তাহাতেই তাহার সমস্ত বল ও সেই প্রেমের কণামাত্র হানি হইলে সে জীবন্মৃত হইয়া পড়ে। এইরূপ রমণী-চরিত্র হিন্দু কবির কাব্য ভিন্ন অন্যত্র সুলভ নহে।

খুল্লনা অতি তরুণবয়স্কা। এই বয়সেই নারী প্রথম ভালবাসার আস্বাদ পাইয়া থাকে। কবিকঙ্কণ ছেলি রাখিবার ছুতায় বনে আনিয়া চম্পক ও কাঞ্চন কুসুমের পার্শ্বে এই কাঞ্চনপ্রতিমাকে স্থাপন করিয়া কাব্যের সাধ মিটাইয়াছেন। সেখানে সে যুক্তকরে ভ্রমরকে বলিতেছে, সে যদি ফিরিয়া গুঞ্জরণ করে, তবে ভ্রমরীর মাথা খাইবে—এই শপথ। কোকিলকে বলিতেছে, সুদূর গৌড় দেশ, যেখানে তাহার স্বামী আছে, সেইখানে যাইয়া কোকিল কেন ডাকে না ? অশোকতরুকে লতাবেষ্টিত দেখিয়া সে লতাকে সৌভাগ্যবতী মনে করিতেছে, এবং ‘ সই ’ বলিয়া তাহাকে আলিঙ্গন করিতেছে। এই নায়িকা শুধু কাব্যের উপযোগিনী নহে, ইহাকে সুগৃহিণী ও সন্তানবৎসলা-রূপে পরিণত করিয়া কবি ক্ষান্ত হইয়াছেন। যেখানে খুল্লনার ছেলে ধান্যক্ষেত্রে উৎপাত করিতেছে, এবং কৃষকগণ তাহাকে গালি দিতেছে, সেই সময়ে ইহার দুঃখমলিন মুখখানি আমাদিগকে বেদনা প্রদান করে। আর যে দিন সর্ব্বসী ছাগলকে শৃগালে ধরিয়া লইয়া গিয়াছে, লহনা জানিতে পারিলে তাহাকে মারিয়া খুন করিয়া ফেলিবে, এই আশঙ্কায় ও কষ্টে খুল্লনা চণ্ডীর শরণ লইতেছে, সেই দিন তাহার চিত্রখানি ভক্তিগঙ্গায় অবগাহন করিয়া উজ্জ্বলতর হইয়াছে ; তাহার কষ্ট সত্ত্বেও সে[illegible] আর তাহাকে কৃপা করা যায় না। ইহার পরে আর এক দৃশ্য,—খুল্লনা স্বামী

জ্ঞাতিবর্গের ভোজনের জন্য রন্ধন করিতেছে, রন্ধনশালায় খুল্লনা অন্নপূর্ণারূপিণী, এবং যখন স্বামী জ্ঞাতিবর্গকে নিরস্ত করিবার জন্য উৎকোচদানে উদ্যত, তখন গর্ব্বিতা সাধ্বী স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত হইয়া উৎকট পরীক্ষা দিতেছে, তখন খুল্লনা আমাদের নমস্যা হইয়াছে। তখন আর কৃপা করা যায় না।

অপর দিকে কাণাড়া ও কলিঙ্গার যুদ্ধে গর্ব্ব ও তেজ ফুটিয়া উঠিয়াছে। ধর্ম্মমঙ্গল কাব্যগুলি বঙ্গেতিহাসের সুদূর অধ্যায়ের ইঙ্গিত করিতেছে; সে অধ্যায় ঐতিহাসিক যুগের পূর্ব্ববর্ত্তী—তাম্রশাসন ও প্রস্তরলিপির যুগ। তখন বঙ্গীয় বীরগণ দিগ্বিজয়ী যোদ্ধা ছিলেন; গৌড়েশ্বর পালরাজগণের আদেশে তখন এক দিকে কামরূপের ও অপর দিকে উড়িষ্যার রাজারা এক পতাকার নিম্নে সমবেত হইতেন। বঙ্গীয় মহিলাগণের তখন কবি-বর্ণিত কটাক্ষ-সন্ধানই একমাত্র গুণবত্তা ছিল না। তাঁহারা ধনুর্বাণ লইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে অগ্রসর হইতেন। কাণাড়ার যুদ্ধকে আমরা কেবল কাব্য-কথা বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারি না। দুর্গাবতী, ঝাঁসীর রাণী প্রভৃতির ছবি তখনও বঙ্গদেশ হইতে লুপ্ত হয় নাই।

সুতরাং প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে দেবলীলা ও অদৃষ্টবাদের দ্বারা অভিভূত হইয়া পুরুষ-চরিত্রের গৌরব লুপ্ত হইলেও, রমণী-চরিত্রের মহিমা সুচিত্রিত হইয়াছিল। যাঁহারা অকুণ্ঠিতচিত্তে স্বামীর চিতানলে আরোহণ করিতেন, সীতা-সাবিত্রীর পবিত্র উপাখ্যান শ্রবণ করিতেন, এবং নানা প্রকার পারিবারিক দুঃখ ও অত্যাচার সহ্য করিয়া সহিষ্ণুতার প্রতিমূর্ত্তিতে পরিণত হইয়াছিলেন, কবিগণ তাঁহাদের প্রভাব অতিক্রম করিতে পারেন নাই।

ক্রমে যখন কবিগণ হিন্দু অন্তঃপুরের আদর্শ ত্যাগ করিয়া মসলমান কবির বর্ণিত জেনানার বিলাস ও লালসার সূচক চিত্রের ভাবে অধিকতর অনুপ্রাণিত হইলেন, তখন হীরা মালিনী ও বিদ্যার ন্যায় উপনায়িকা ও নায়িকাগণের সৃষ্টি হইল। কিন্তু তখনও এ দেশের স্নেহশীলা সাধ্বীগণের প্রভাব বঙ্গসাহিত্য হইতে বিদায়গ্রহণ করে নাই। কৃষ্ণচন্দ্র ও রাজবল্লভের মুসলমানী দরবারের আদর্শে গঠিত রাজসভা হইতে সুদূরে পল্লী-কবিগণ 'কবি' ও যাত্রাসঙ্গীতে উমা, মেনকা, যশোদা প্রভৃতির চিত্রে এ দেশের অন্তঃপুরবাসিনীগণের ছায়া পুনঃপুনঃ প্রতিভাত করিয়াছেন। কিন্তু তাহা কথা-সাহিত্যের অন্তর্গত নহে।

[সাহিত্য, ১৩১৫]

গিরিশচন্দ্র ঘোষ

মানব-হৃদয় স্পর্শ করা কলাবিদ্যার উদ্দেশ্য। কিন্তু ভিন্ন দেশে তাহার আকার কতক পরিমাণে ভিন্ন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য কলাবিদ্যার পার্থক্য লইয়া আমরা আলোচনা করিয়া থাকি। অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারি যে, পাশ্চাত্ত্যে বা প্রাচ্যে দেশভেদে বিভিন্নতা। এমন কি, ইংলণ্ড ও স্কটলণ্ডে বিভিন্নতা দেখা যায়। কবিতা, চিত্রপট, সঙ্গীত সকলই কিঞ্চিৎ ভিন্ন। তাহার কারণ, বোধ হয়, ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির ছবি। নির্ম্মল আকাশতলবাসী ইটালিয়ানের হৃদয়-ভাব—কুজ্ঝটিকাবৃত, ঝটিকা-আলোড়িত, তমাচ্ছন্ন পর্ব্বতশৃঙ্গ-নিবাসী স্কচ্ হইতে অবশ্যই ভিন্ন। স্কচের সঙ্গীতে বিষাদ-ছায়া নিশ্চয় পতিত হইবে। সেইরূপ ইটালিতে হর্ষোৎফুল্লভাব প্রতিফলিত হইতে থাকিবে। চিত্তবিমোহন কাশ্মীর-প্রকৃতি-শোভা কালিদাসের কবিতা সুললিত করিয়াছে,—নাটকেও কাটাকাটি, হানাহানি নাই। কিন্তু সেক্সপিয়ার উচ্চ কবি হইলেও তাঁহার উৎকৃষ্ট নাটকসকল বিয়োগান্তজনিত ঘোর ভীষণতাপূর্ণ। এক দেশের নাটক অপর দেশের নাটকের সহিত তুলনায় সমালোচিত হইতে পারে না। দার্শনিক জার্ম্মান সিলার নাটকে ভার্জিন মেরির অবতারণা করিয়া উচ্চ "জোয়ান অফ্ আর্ক" নাটক রচনা করিয়াছেন; কিন্তু সে ভাবে সেক্সপিয়ারের নাটক রচিত নয়। পশু-যুদ্ধ-আনন্দপ্রিয় স্পেনের নাটক নির্দ্দয়তাপূর্ণ। ফরাসী-বিপ্লবের অগ্রগামী ও পশ্চাদ্‌বর্ত্তী নাটকসকল প্রায়ই বিপ্লবের ভীষণতায় পরিপূর্ণ। সেক্সপিয়ারের 'টেম্‌পেষ্ট' নাটকের সহিত কালিদাসের 'শকুন্তলা' নাটকের বার বার তুলনা হইয়া থাকে। কিন্তু 'টেম্‌পেষ্ট' বায়ু-বিহারী দেহী ও কুহক-আশ্রয়ে রচিত। 'শকুন্তলা' ঋষির অভিশাপ ও অপ্সরার প্রণয়-ভিত্তি-স্থাপিত। এইরূপ বহু দৃষ্টান্তে সপ্রমাণ করা যায় যে, ভিন্ন দেশে ভিন্ন মস্তিষ্ক-প্রসূত নাটক ভিন্ন ভাবাপন্নই হইয়া থাকে; এবং এক দেশেই সময়-বিশেষে নাটকেরও বিশেষত্ব হয়। যথা—এলিজাবেথের সময়ের নাটকসকল দ্বিতীয় চার্লস-এর সমসাময়িক নাটক হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। সকল বস্তুই দেশকাল-পাত্র উপযোগী। সেই হেতু ভিন্ন দেশস্থ বা ভিন্ন সময়ের নাটক সুপাঠ্য হইলেও তাহার অনুকৃত রচনা আদরণীয় হয় না। যদি কোনও রঙ্গালয়ে 'শকুন্তলা' সুন্দররূপে অনুবাদিত হইয়া অভিনীত হয়, তবে তাহা দর্শকের মন কতদূর আকর্ষণ করিতে পারিবে, তাহার স্থিরতা নাই। পাশ্চাত্ত্য প্রদেশে অনুবাদিত 'শকুন্তলা' দর্শক আকর্ষণ করিয়াছিল সত্য, কাব্যেরও প্রশংসা হইয়াছিল, কিন্তু তাহা স্থায়ী-রূপে গৃহীত হয় নাই এবং হইতেও পারে না। অনেকেই বলেন, 'ওথেলো' অনুবাদিত হইয়া অভিনীত হউক। অবশ্য মানব-হৃদয়-সম্ভূত প্রদীপ্ত ঈর্ষ্যার

দর্শকের মন স্পর্শ করিবে। কিন্তু কৃষ্ণবর্ণ যোদ্ধা মুরের প্রেমে অনিন্দ্যসুন্দরী ডেস্‌ডিমোনার পিতৃগৃহ-ত্যাগ নিভৃতে পাঠ করিয়া বুঝিতে হইবে। উভয়ের প্রণয়ানুরাগে ভালবাসার কথা নাই, কেবল যুদ্ধ-বিক্রম ও কঠোর সঙ্কট হইতে কেশ-ব্যবধানে উদ্ধার-লাভ বর্ণিত। স্থির চিত্তে নিভৃত পাঠে তাহার সৌন্দর্য্য উপলব্ধি হয়। কিন্তু সেক্সপিয়ার-বর্ণিত 'ওথেলো'র মুখে অনুরাগ-চিত্র সহজে সাধারণের উপলব্ধি হয় না। বীরত্বে আকর্ষিত সুন্দরী-বর্ণনা সেক্সপিয়ারের পূর্ব্বে সেদেশে পুনঃপুনঃ হইয়াছে। দর্শকও তাহা পাঠ করিয়া ডেস্‌ডিমোনার অনুরাগ বুঝিতে পারেন। কিন্তু সেইরূপ নায়িকার প্রেমোদ্দীপ্তভাবে যাঁহারা অভ্যস্ত নন, তাঁহাদের নিকট উপবনে সুন্দর শোভা-হার-বিভূষিত স্থানে নায়ক-নায়িকার প্রেমালাপ অধিকতর হৃদয়গ্রাহী হয়।

এজন্য যিনি নাটক লিখিবেন, তাঁহাকে দেশীয়ভাবে অনুপ্রাণিত হইতে হইবে। দেশীয় স্বভাব-শোভা, দেশীয় নায়ক-নায়িকা, দেশীয় অবস্থা, উপস্থিতক্ষেত্রে দেশীয় মানব-হৃদয়-স্রোত—তাঁহাকে দৃঢ়রূপে মনোমধ্যে অঙ্কিত করিতে হইবে। ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দু ধর্ম্মপ্রাণ নাটকেরই স্থায়ী আদর করিবে। বাল্যকাল হইতেই হিন্দু,—শ্রীরাম, শ্রীকৃষ্ণ, ভীষ্ম, অর্জুন, ভীম প্রভৃতিকে চিনে, সেই উচ্চ আদর্শে গঠিত নায়কই হিন্দুর হৃদয়গ্রাহী হওয়া সম্ভব। যেরূপ বীর-চিত্র যুদ্ধপ্রিয় বীরজাতির আদরের, সেইরূপ সহিষ্ণু, আত্মত্যাগী ও ধর্ম্ম-সম্মানকারী নায়ক হিন্দু-হৃদয়ে স্থান পাইবে। দ্রৌপদীকে দুঃশাসন আকর্ষণ করিতেছে দেখিয়া, স্থির-গম্ভীর যুধিষ্ঠিরের ভাব হিন্দুর প্রিয়, কিন্তু তৎক্ষণাৎ দুঃশাসনের মস্তকচ্ছেদন পাশ্চাত্ত্যপ্রিয় হইত। এদেশের হৃদয়গ্রাহী মৌলিকত্ব ধর্ম্মপ্রসূত হইবে। বহুগুণযুক্ত রাজা ব্যভিচারী হইলে সতীত্বপূজক হিন্দু তাঁহাকে ঘৃণা করিবে। শ্রীরামচন্দ্র স্বর্ণ-সীতা গঠিত করিয়া অশ্বমেধ যজ্ঞ সমাধা করেন, শ্রীরামচন্দ্র আদর্শ রাজা। অস্থি-ত্যাগী দধীচি আদর্শ ত্যাগী ও অতিথি-সেবক। কিন্তু এরূপ ত্যাগ বা এরূপ নির্ম্মমতা কঠোর দেশে বাতুলতা বলিয়া যদিচ উপহসিত না হয়, ভ্রান্তিমূলক বলিতে ত্রুটি করিবে না। সতী নারীর অভিমান, প্রত্যেক দেশেই হৃদয়গ্রাহী। কিন্তু পাতাল-প্রবেশোন্মুখী-জানকীর অভিমান, পতি-সহবাস-পরিত্যক্তা অভিমানিনী হইতে অনেক প্রভেদ। শেষোক্ত নায়িকা—"যেন রাম আমার জন্ম-জন্মান্তরে স্বামী হন"—একথা বলিয়া অভিমান করেন না। স্বামীকে দেখিলে বসনে বদন আচ্ছাদন করেন, বাক্যালাপ করেন না। এইরূপ প্রত্যেক রসেই বিভিন্নতা দেখা যায়। এই জাতীয় অবস্থা নাটককারের প্রথম লক্ষ্য হওয়া উচিত। দ্বিতীয় লক্ষ্য—আত্মগোপন।

কবি বা ঔপন্যাসিক সকল স্থানে আসিয়া পাঠককে বুঝাইয়া দিতে পারেন। কঠিন সমস্যাস্থলে অবস্থা বর্ণনা করিয়া পাঠকের উপর মনোভাব বুঝিবার ভার দেওয়া তাঁহার চলে এবং ভার দেওয়া অনেক স্থলে উপন্যাসের সৌন্দর্য্য বলিয়া পরিগণিত হয়। যথা,—আয়েষা তিলোত্তমাকে আভরণ প্রদান করিয়া, দূর-দেশে গমন করিবে বলিতেছে। যথায় দোষ ধরিবার সম্ভাবনা, তাহা তিনি স্বয়ং খণ্ডন করিয়া যান,—

সর্ব্বস্থানেই স্বয়ং উপস্থিত আছেন। এমন কি, সমালোচকের প্রতি কটাক্ষ করিয়া আপনার সমালোচনা আপনি করিতে পারেন। উপন্যাস-গুরু ফিল্ডিংএর 'টম জোন্স' তাহার উদাহরণস্থল। ঔপন্যাসিকের আর এক সুবিধা, নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণের ন্যায় তাঁহার উপন্যাসগত ব্যক্তিসকলের পরিচয় এককালে দিতে বাধ্য নহেন। পাঠকের কৌতূহল জন্মাইবার নিমিত্ত কাহাকেও বা অন্য সাজে রাখিতে পারেন, পাঠক তাহার পরিচয় পায় না, আগ্রহের সহিত কে সে ব্যক্তি, অনুসন্ধান করে। ঔপন্যাসিক সুযোগ বুঝিয়া তাহার পরিচয় দিয়া পাঠককে চমৎকৃত করেন। সার্ ওয়াল্টার স্কটের "পাইরেট" উপন্যাস এই ঔপন্যাসিক-কৌশলের উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত-স্থল। নাট্যকার তাঁহার নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তির নিকট কাহাকেও গোপন রাখিতে পারেন, কিন্তু দর্শক তাহার পরিচয়-প্রাপ্ত। তাঁহাকে অন্য নাটকীয় কৌশলে চমৎকারিত্ব উৎপাদন করিতে হইবে, যেমন 'মার্চেণ্ট অফ্ ভিনিস'-এ সাইলক বুকের মাংস কাটিতে পারিবে, কিন্তু বুকের রক্ত যেন না পড়ে। নায়িকা বিচারালয়ে নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণের নিকট আত্মগোপন করিয়াছে, কিন্তু দর্শকের নিকট নয়। ঔপন্যাসিক এস্থলে দুই প্রকার ধাঁধা দিতে পারিতেন। আইনজ্ঞ-বেশে বিচারালয়ে কে আসিল, তাহার পরিচয় দেওয়া তাঁহার আবশ্যক নয়, কিন্তু আইনজ্ঞ-বেশে পোর্সিয়া উপস্থিত, তাহা নাট্যকারকে বলিয়া দিতে হইবে। সুতরাং আকাঙ্ক্ষা ও চমৎকারিত্ব উৎপাদন করা নাটককারের এক স্বতন্ত্র কৌশল। এ কৌশল সাধারণ শক্তি-উদ্ভূত নয়। আত্মগোপনই নাটককারের জীবন।

ঔপন্যাসিক বা কবি গল্পের ভিত্তি বর্ণনা করিতে পারেন, সমস্ত অবস্থাই তাঁহার আয়ত্ত; কিন্তু নাটককারকে হৃদয়ের ঘাতপ্রতিঘাতে আমূল গল্প করিতে হইবে। তূলিকা স্থান অঙ্কিত করিয়া নাটককারকে সাহায্য করে, কিন্তু তাহা চিত্রপট বলিয়া অনুভূত হয়, শক্তি-চালিত-লেখনী-চিত্রের ন্যায় সমস্ত ছবি স্বরূপভাবে প্রতিফলিত হয় না। তূলিকা-চিত্রিত দৃশ্যে ভ্রমর গুঞ্জন করিয়া কুসুমে বসিতে পায় না, কপোত-কপোতী পরস্পর পরস্পরকে আহ্বান করে না, মধুস্বরে পাখী গায় না। এ সমস্ত লেখনী বর্ণনায় করে: কিন্তু নাট্য-কবিরও পাখীর গান, ভ্রমর-গুঞ্জন দর্শককে শুনাইতে হইবে, বর্ণনায় নয়—ঘাত-প্রতিঘাতে। কেবল বর্ণিত হইলে নাট্যরস থাকিবে না। 'রোমিও-জুলিয়েট'-এ চন্দ্রোদয় হইয়াছে, তাহা বর্ণিত চন্দ্র নয়, হৃদয়-প্রতিঘাতী চন্দ্র। তপোবনে বারি-সিঞ্চন, ভ্রমর-গুঞ্জন বর্ণিত নহে—হৃদয়-প্রতিঘাতকারী। সে তপোবনে, সে ভ্রমর-গুঞ্জনে—পার্ব্বতী পরমেশ্বরের বন্দনা করিয়া, দীর্ঘ-শিখাধারী কবি কালিদাস নাই; আছেন—শকুন্তলা ও দুষ্মন্ত এবং নাট্য-কৌশলে অলক্ষিতে মদন। সেই ভ্রমর তপোবনে গুঞ্জন করিয়া, বিরহ-তাপিত দুষ্মন্তের করস্থিত চিত্রপটে আসিয়া আবার সজীব হইয়াছে, দুষ্মন্তের হৃদয়ে আঘাত দিয়াছে। নাটককারের দৃশ্যগুলি এইরূপ সর্ব্বস্থানে সজীব হইয়া নায়কের আঘাত করিবে।

যথায় উৎকট সমস্যা-স্থল, তথায় নাটককারকে আবরণ খুলিয়া মনোভাব দেখাইতে হইবে। উপন্যাসের নায়িকার মত 'বিষপাত্র' পান করিলেই চলিবে না। 'হ্যাম্‌লেট' আত্মহত্যা করিবে কিনা, তাহা বিরলে বসিয়া ভাবিতেছে বলিলে চলিবে না, তাহার জড়িত মস্তিষ্কে কিরূপ জড়িত ভাব প্রসূত হইতেছে, তাহা দেখাইতে হইবে। "দুঃখের সাগর-বিরুদ্ধে অস্ত্র-ধারণ" (Take up arms against a sea of troubles)-রূপ জড়িত উপমা—অবস্থায় প্রসূত হইবে। এই উপমা অনেকেই সর্ব্বাঙ্গীণ নয় বলিয়া দোষ দেন, কিন্তু নাট্যকার এরূপ সমালোচনার ভয় করিয়া উপমা সর্ব্বাঙ্গীণ করিতে পারিবেন না। তিনি যাহা অন্তরে বা বাহিরে দেখিয়াছেন, তাহাই নাটকে দেখাইবেন। অতি-নিকট সম্বন্ধ হইলেও যুবক-যুবতীর এক গৃহে বাস অসঙ্গত, এ কথা আত্ম-নির্ম্মলতাভিমানী সমাজে বলিতে ভয় পাইবেন না। তরল স্ত্রী-চরিত্র যে অতি দুঃখের সময়ে চাটুকারের প্রতারণায় চঞ্চল হইতে পারে; যথা—তৃতীয় রিচার্ডের কাঁপট্যে 'অ্যানি'র হৃদয়, তাহাও নির্ভীকচিত্তে প্রদর্শন করিবেন। ধর্ম্মের পুরস্কার—আর্থিক লাভ নয়; তাহা হইলে ধর্ম্ম একটি উচচ ব্যবসায় হইত। ধর্ম্মের পুরস্কারই ধর্ম্ম, ইহা দেখাইয়া সাধারণের বিরক্তিভাজন হইয়াও তাঁহাকে অটল থাকিতে হইবে। সংসারের অবস্থা যেন তাঁহার কল্পনা-মুকুরে প্রতিফলিত হয়। ইহাতে সংসারের অপ্রিয় হইতে হইলেও তিনি তোষামোদী কথায় সংসারকে সন্তুষ্ট করিতে পারিবেন না। আঘাত দিতে হয়—আঘাত দিবেন, তাহাতে বিরাগভাজন হইতে পারেন, কিন্তু কর্ত্তব্য-পরায়ণ হইবেন, এবং কর্ত্তব্য-পালন-ফলে অমরত্ব নিশ্চয়ই লাভ করিবেন।

[নাট্যমন্দির, ১৩১৭]

নাটকত্ব

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

মহাকাব্য, নাটক ও উপন্যাস, তিনটিই মনুষ্য-চরিত্র লইয়া রচিত। কিন্তু এই তিনটির মধ্যে বিশেষ প্রভেদ আছে।

মহাকাব্য—একটি বা একাধিক চরিত্র লইয়া রচিত হয়। কিন্তু মহাকাব্যে চরিত্র-চিত্রণ প্রসঙ্গমাত্র। কবির মুখ্য উদ্দেশ্য—সেই প্রসঙ্গক্রমে কবির কবিত্ব দেখানো। বর্ণনাই (যেমন প্রকৃতির বর্ণনা, ঘটনার বর্ণনা, মনুষ্যের প্রবৃত্তির বর্ণনা) কবির ...ন লক্ষ্য। চরিত্র উপলক্ষ্য মাত্র; যেমন রঘুবংশ। ইহাতে কবি প্রসঙ্গক্রমে ...ত্রগুলির অবতারণা করিয়াছেন। তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য—কতকগুলি বর্ণনা।

অজ-বিলাপে ইন্দুমতীর মৃত্যু উপলক্ষ্য মাত্র। এ বিলাপ অজের সম্বন্ধে যেরূপ খাটে, যে কোনও প্রেমিক স্বামী-সম্বন্ধে সেইরূপ খাটে। কবির উদ্দেশ্য—চরিত্র-নির্ব্বিশেষে প্রিয়জনের বিচ্ছেদে শোকের বর্ণনা করা ও সেই বর্ণনায় তাঁহার কবিত্ব দেখানো। উপন্যাসে, চরিত্রাবলি লইয়া একটা মনোহারী গল্পের রচনা করাই গ্রন্থকারের মুখ্য উদ্দেশ্য। উপন্যাসের মনোহারিত্ব সেই গল্পের বৈচিত্র্যের উপর প্রধানতঃ নির্ভর করে।

নাটক—কাব্য ও উপন্যাসের মাঝামাঝি; তাহাতে কবিত্ব চাই, গল্পের মনোহারিত্ব চাই। তাহার উপরে ইহার কতকগুলি বাঁধাবাঁধি নিয়ম আছে।

প্রথমতঃ, নাটকে একটা আখ্যানবস্তুর ঐক্য (unity of plot) চাই। একটি মাত্র বিষয়ই একখানি নাটকে প্রধান বর্ণনীয় বিষয়। অন্যান্য ঘটনা তাহাকে ফুটাইবার জন্যই উদ্দিষ্ট।

উদাহরণতঃ—উপন্যাসের গতি ধাবমান লঘু মেঘখণ্ডগুলির মত; তাহাদের গতি একদিকে বটে, কিন্তু কোনটি কোনটির অধীন নহে। নাটকের গতি নদীর স্রোতের মত,—অন্যান্য উপনদী তাহার উপর আসিয়া পড়িয়া তাহাকে পরিপুষ্ট করিতেছে মাত্র। অথবা উপন্যাসের আকার একটি শাখার মত,—চারিদিকে নানা প্রশাখা বিস্তৃত হইয়া সেখানেই তাহাদের বিভিন্ন পরিণতি হইয়াছে। কিন্তু নাটকের আকার মোচার মত, এক স্থান হইতে বাহির হইয়া পরে বিস্তৃত হইয়া একস্থানেই তাহা শেষ হইতে হইবে। প্রেম নাটকের মুখ্য বিষয় হইলে, সেই প্রেমের পরিণামেই নাটক শেষ করিতে হইবে; যেমন রোমিও ও জুলিয়েট। লোভ মুখ্য বিষয় হইলে, সেই লোভের পরিণামেই নাটক শেষ করিতে হইবে; যেমন ম্যাক্‌বেথ। উচ্চাশয় নাটকের মুখ্য বিষয় হইলে, তাহার পরিণামেই তাহার পরিণতি; যেমন জুলিয়স সিজার। নাটক প্রতিহিংসায় আরব্ধ হইলে, অন্তিমে প্রতিহিংসারই ফল দেখাইতে হইবে; যেমন হ্যাম্‌লেট।

তাহার উপরে, নাটকের আর একটি নিয়ম আছে। মহাকাব্যে বা উপন্যাসে এরূপ বাঁধাবাঁধি কোনও নিয়ম নাই। নাটকে প্রত্যেক ঘটনার সার্থকতা চাই। নাটকের মধ্যে অবান্তর বিষয় আনিয়া ফেলিতে পারিবে না। সকল ঘটনা বা সকল বিষয়ই নাটকের মুখ্য ঘটনার অনুকূল বা প্রতিকূল হওয়া চাই। নাটকে এমন একটি ঘটনা বা দৃশ্য থাকিবে না, যাহা নাটকে না থাকিলেও, নাটকের পরিণতি বর্ণিতরূপ হইত। নাটককার নাটকে যত অধিক ঘটনার সমাবেশ করিতে পারেন, ততই এ বিষয়ে তাঁহার ক্ষমতা প্রকাশ পাইতে পারে; আখ্যানবস্তু ততই মিশ্র হইতে পারে। কিন্তু সেই ঘটনাগুলি সেই মূল ঘটনার দিকেই চাহিয়া থাকিবে, তাহাকেই আগাইয়া দিবে, কিংবা পিছাইয়া দিবে। তবেই তাহা নাটক, নহিলে নয়। উপন্যাস এরূপ কোন নিয়মের অধীন নহে। মহাকাব্যে ঘটনাবলির একাগ্রতা বা সার্থকতা কিছুরই প্রয়োজন নাই।

কবিত্ব নাটকের একটি অঙ্গ; তাহা উপন্যাসে না থাকিলেও চলে। চরিত্রাঙ্কন নাটকে থাকা চাই; কাব্যে তাহা না থাকিলেও চলে।

নাটকের আর একটি প্রধান নিয়ম আছে, যাহা নাটককে কাব্য ও উপন্যাস উভয় হইতেই পৃথক্ করে। ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে নাটকের গল্প অগ্রসর হয়। নাটকীয় মুখ্য চরিত্র কখনও সরল রেখায় যায় না। জীবন একদিকে যাইতেছিল, এমন সময়ে ধাক্কা পাইয়া তাহার গতি অন্য দিকে ফিরিল; পুনরায় ধাক্কা পাইয়া আবার অন্যদিকে অগ্রসর হইল—নাটকে এইরূপ দেখাইতে হইবে। উপন্যাসে বা মহাকাব্যে ইহার কোনও প্রয়োজন নাই। অবশ্য প্রত্যেক মানুষের জীবন, যত সামান্যই হউক না কেন, কিছু-না-কিছু ধাক্কা পায়ই। কোনও মনুষ্য-জীবন একেবারে সরল রেখায় চলে না। একজন বেশ লেখাপড়া করিতেছিল, সহসা পিতার মৃত্যুতে তাহাকে লেখাপড়া ছাড়িয়া দিতে হইল। কেহ বা বিবাহ করিয়া, বহু পুত্রকন্যা হওয়ায় বিব্রত হইয়া পড়িয়া, দাস্য স্বীকার করিল। এরূপ ঘটনা-পরম্পরা প্রায় প্রত্যেক মনুষ্যের জীবনে ঘটিয়া থাকে। সেইজন্য যে কোনও ব্যক্তির জীবনের ইতিহাস লিখিতে হইলে তাহা নাটকের আকার কতক ধারণ করেই। কিন্তু প্রকৃত নাটকে এই ঘটনাগুলি একটু প্রবল ধাঁজের হওয়া চাই। ধাক্কা যত অধিক এবং যত প্রবল হইবে, ততই তাহা নাটকের যোগ্য উপকরণ হইবে।

অন্ততঃ নাটকের প্রধান চরিত্রগুলি—বাধা অতিক্রম করিতেছে, বা সে চেষ্টা করিতেছে, এরূপ দেখানো চাই। কেন্দ্রীয় চরিত্র যেখানে বাধা অতিক্রম করে, সে নাটককে ইংরাজিতে comedy বলে। বাধা অতিক্রান্ত হইলেই সেইখানেই সেই নাটকের শেষ। যেমন, দুই জনের বিবাহ যদি কোনও নাটকের মুখ্য ব্যাপার হয়, তাহা হইলে যতক্ষণ নানাবিধ বিঘ্ন আসিয়া তাহাদের বিবাহ সম্পন্ন হইতে না দেয়, ততক্ষণ নাটক চলিতেছে। যেই বিবাহ-কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গেল, সেইখানেই যবনিকা পড়িবে।

পরিশেষে বাধা অতিক্রান্ত নাও হইতে পারে। বাধা অতিক্রম করিবার পূর্ব্বেই জীবনের বা ঘটনার শেষ হইতে পারে। দুঃখ দুঃখই রহিয়া যাইতে পারে। এরূপ স্থলে ইংরাজিতে যাহাকে tragedy বলে, তাহার সৃষ্টি হয়। যেমন, উপরি-উক্ত উদাহরণ ধরুন—যদি নায়ক বা নায়িকার, বা উভয়েরই মৃত্যু হয়, কিংবা একজন বা উভয়ই নিরুদ্দেশ হয়। তাহার পরে আর কিছু বলিবার নাই। তখন সেইখানে যবনিকা পড়িবে।

ফলতঃ, সুখের ও দুঃখের বাধা ও শক্তি, চরিত্র ও বহির্ঘটনার সংঘর্ষণে নাটকের জন্ম। যুদ্ধ চাই; তা সে বাহিরের ঘটনাবলির সহিতই হউক, কিংবা নিজের সঙ্গেই হউক।

অন্তর্দ্বন্দ্ব যে নাটকে দেখানো হয়, তাহাই উচ্চ অঙ্গের নাটক; যেমন—হ্যাম্‌লেট কিং লিয়র। বহির্ঘটনার সহিত যুদ্ধ তদপেক্ষা নিম্নশ্রেণীর নাটকের উপাদান;

যেমন ওথেলো বা ম্যাক্‌বেথ। ওথেলোকে ইয়াগো বুঝাইল যে তাহার স্ত্রী ভ্রষ্টা। মূর্খ অমনই তাহাই বুঝিল। তাহার মনে কোনও দ্বিধা হইল না। ওথেলোতে কেবল একস্থানে ওথেলোর মনের মধ্যে দ্বিধা আসিয়াছে। সে দ্বিধা স্ত্রী-হত্যার দৃশ্যে। সেখানেও কিন্তু যুদ্ধ প্রেমে ও ঈর্ষ্যায় নহে; সেখানে যুদ্ধ—রূপমোহে ও ঈর্ষ্যায়। ম্যাক্‌বেথে যেটুকু দ্বিধা আছে, তাহা এতদপেক্ষা অনেক উচচ অঙ্গের। ডংকান্‌কে হত্যা করিবার পূর্ব্বে ম্যাক্‌বেথের হৃদয়ে যে যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহা ধর্ম্মে ও অধর্ম্মে, আতিথ্যে ও লোভে। কিং লিয়রের যুদ্ধ অন্য রকমের। সে যুদ্ধ অজ্ঞানে ও জ্ঞানে, বিশ্বাসে ও স্নেহে, অক্ষমতায় ও প্রবৃত্তিতে। হ্যাম্‌লেটের মনে যে যুদ্ধ, তাহা আলস্যে ও ইচ্ছায়, প্রতিহিংসায় ও সন্দেহে। এই যুদ্ধ নাটকের আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত চলিয়াছে।

এই অন্তর্দ্বন্দ্ব সব মহানাটকে আছেই আছে। প্রবৃত্তি ও প্রবৃত্তির সংঘাতে তরঙ্গ না উঠাইতে পারিলে, বিপরীত বায়ুর সংঘাতে ঘূর্ণি-ঝটিকা না উঠাইতে পারিলে, কবি জমকালো রকম নাটকের সৃষ্টি করিতে পারেন না।

অন্তর্বিরোধ না থাকিলে উচচ অঙ্গের নাটক হয় না। বাহিরের যুদ্ধ নাটকের বিশেষ উৎকর্ষ সাধন করে না। তাহা যে-সে নাটককার দেখাইতে পারেন। যে নাটকে কেবল তাহাই বর্ণিত হয়, তাহা নাটক নহে—ইতিহাস। যে নাটক বাহিরের যুদ্ধকে উপলক্ষ্যমাত্র করিয়া মনুষ্যের প্রবৃত্তিসমূহের বিকাশ করে, তাহা অবশ্য নাটক হইতে পারে, তথাপি তাহা উচচ অঙ্গের নাটক নহে। যে নাটক বৃত্তিসমূহের যুদ্ধ দেখায়, তাহাই উচচ অঙ্গের নাটক।

বৃত্তিসমূহের সামঞ্জস্য উচচ অঙ্গের নাটকে বহুল-পরিমাণে থাকে: যেমন সাহস, অধ্যবসায়, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, দয়া ইত্যাদি গুণের সমবায়। কিংবা দ্বেষ, জিঘাংসা, লোভ ইত্যাদি বৃত্তিসমূহের সমবায় একটি চরিত্রে থাকিতে পারে।

অনুকূল বৃত্তিসমূহের সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া নাটক লেখা তত শক্ত নহে। তাহাতে মনুষ্য-হৃদয়-সম্বন্ধে নাটককারের জ্ঞানেরও বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় না। আদর্শ চরিত্র ভিন্ন প্রত্যেক মনুষ্য-চরিত্র দোষ-গুণে গঠিত। দোষগুলি বাদ দিয়া কেবল-মাত্র গুণগুলি দেখাইলে একটি সম্পূর্ণ মনুষ্য-চরিত্র দেখানো হয় না। যে নাটককার একটি আদর্শ চরিত্র চিত্রিত করিতে বসিয়াছেন, তাঁহার বিষয়ে স্বতন্ত্র কথা। তিনি মনুষ্য-চরিত্র দেখাইতে বসেন নাই। তিনি দেব-চরিত্র—মনুষ্য-চরিত্র কিরূপ হওয়া উচিত—তাহাই দেখাইতে বসিয়াছেন। বস্তুতঃ, তিনি নাটকাকারে ধর্ম্ম-প্রচার করিতে বসিয়াছেন। আমি এ গ্রন্থগুলিকে নাটক বলি না—ধর্ম্ম-গ্রন্থ বলি। তাহাতে তিনি সে চরিত্রের যতপ্রকার গুণরাশি একত্র একখানি নাটকে দেখাইতে পারেন, ততই তাঁহার গুণপনা প্রকাশ পায়। কিন্তু তাহাতে মনুষ্য-চরিত্রের চিত্র হয় না।

বিপরীত বৃত্তিসমূহের সমবায় দেখানো অপেক্ষাকৃত দুরূহ ব্যাপার; এখ নাটককারের কৃতিত্ব বেশী। যিনি মনুষ্যের অন্তর্জগৎ উদ্‌ঘাটিত করিয়া

পারেন, তিনি প্রকৃত দার্শনিক কবি। বল ও দৌর্ব্বল্য, জিঘাংসা ও করুণা, জ্ঞান ও অজ্ঞান, গর্ব্ব ও নম্রতা, ক্রোধ ও সংযম—এক কথায় পাপ ও পুণ্যের সমাবেশে প্রকৃত উচচ অঙ্গের নাটক হয়। ইহাকেই আমি অন্তর্বিরোধ বলিতেছি। মানুষকে একটি শক্তি ধাক্কা দিতেছে, আর একটি শক্তি ধরিয়া রাখিতেছে, অশ্বচালকের ন্যায় কবি এক হস্তে চাবুক মারিতেছেন, অপর হস্তে রশ্মি ধরিয়া টানিয়া রাখিতেছেন, এইরূপ কবিই মহা-দার্শনিক কবি।

আর একটি গুণ নাটকে থাকা চাই। কি নাটক, কি উপন্যাস, কি মহাকাব্য, কোনটিই প্রকৃতিকে অতিক্রম করিতে পারিবে না। বস্তুতঃ, সকল সুকুমার কলাই প্রকৃতির অনুবর্ত্তী। প্রকৃতিকে সাজাইবার বা রঞ্জিত করিবার অধিকার তাহার আছে। কিন্তু প্রকৃতিকে উপেক্ষা করিবার অধিকার তাহার নাই।

এখন আমরা দেখিলাম যে, নাটকে এই গুণগুলি থাকা চাই; যথা—(১) ঘটনার ঐক্য, (২) ঘটনার সার্থকতা, (৩) ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাত-গতি, (৪) কবিত্ব, (৫) চরিত্র-চিত্রণ, (৬) স্বাভাবিকতা।

[সাহিত্য, ১৩১৮]

বিপিনচন্দ্র পাল

কেবল ভাল লাগে বলিয়াই কোনও কবিতাকে শ্রেষ্ঠ, আর ভাল লাগে না বলিয়াই কোনও কবিতাকে নিকৃষ্ট বলা যায় না। আমরা যাহাকে ভাল-লাগা বলি, তাহা একটা মিশ্র-অনুভূতি। কবিতা-বিশেষ লিখিয়া বা পড়িয়া যে আনন্দানুভব হয়, তাহাতে বর্ত্তমানের প্রত্যক্ষ এবং অতীতের বহুতর স্মৃতি অতিশয় ওতপ্রোত হইয়া জড়াইয়া থাকে। কবির কাব্য ভালই হউক আর মন্দই হউক, সৃষ্টিমাত্রেরই যে একটা আনন্দ আছে, কবি কবিতা রচনা করিতে সে আনন্দ অনুভব করেন। শিশু যখন বর্ণমালা শিখিয়া প্রথম দিন, স্লেটে "বাবা" "মা" "কাকা" "দাদা" প্রভৃতি পরিচিত কথাগুলি লিখে, সে দিন তার অপূর্ব্ব আনন্দ হয়। ইহাতে তার নিজের কৃতিত্বের প্রমাণ পাইয়া সে আনন্দিত হয়। অক্ষরগুলোর ছাঁদের ভাল-মন্দের সঙ্গে এ আনন্দানুভূতির কোনও-ই সম্পর্ক নাই। কবিও কবিতা রচনা করিয়া আপনার একটা কৃতিত্বের পরিচয় পাইয়া আনন্দিত হন। কবিতার ভাল-মন্দের উপরে এ আনন্দ নির্ভর করে না। সে বিচার অপরে করিবে। সে কথা পরে উঠিবে। তখন তাকে মন্দ বলিলে তাঁর আনন্দের হানি হইবে, কারণ সে মন্দ বলাতে তাঁর কৃতিত্বের

অভিমানে আঘাত লাগিবে। লোকে সে কবিতা পড়িয়া ভাল বলিলে, তাঁর আনন্দ বাড়িয়া উঠিবে, কারণ সে ভাল-বলাতে লোক-মধ্যে তাঁর কৃতিত্বের প্রতিষ্ঠা হইতেছে —এ বোধ তাঁর জন্মিবে। তারপর সৃষ্টিমাত্রতেই স্রষ্টার আত্মপ্রকাশ ও আত্মোপলব্ধি হয়। ইংরাজিতে এই আত্মপ্রকাশকে self-expression এবং আত্মোপলব্ধিকে self-realisation বলে। এই আত্মপ্রকাশের এবং আত্মোপলব্ধির‌ও একটা গভীর আনন্দ আছে। কবি কাব্য-রচনায় এই আনন্দও অনুভব করেন। এই দুই প্রকারের আনন্দ সকল কবিরই হয়। ভাল কবির‌ও হয়, মন্দ কবির‌ও হয়। ইহার দ্বারা কোনও কবিতার উৎকর্ষাপকর্ষের বিচার হয় না ও হইতেই পারে না, ইহা দেখিয়াছি। তারপর পাঠকের কথা। কবিতা-পাঠে আমরা যে আনন্দ পাই, তাহাও নানা কারণে জন্মে। যে কবিতায় আমাদের কোনও পূর্ব্ব-পরিচিত রসানুভূতিকে জাগাইয়া দেয়, তাহাতে আমরা আনন্দ পাই। আর আমাদের স্মৃতি নানা কারণে জাগিয়া উঠে। কিন্তু যে কারণেই জাগরূক হউক না কেন, প্রত্যক্ষের আশ্রয় ব্যতীত স্মৃতি জন্মে না। আগে যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম, তার অনুরূপ কোনও-কিছু দেখিলে, কিংবা দেখিতেছি ভাবিলেই, সেই প্রত্যক্ষের স্মৃতি জাগরূক হইয়া উঠে। এ ক্ষেত্রে আমি বর্ত্তমানে যাহা শুনিতেছি বা দেখিতেছি, তার পরিপূর্ণ মর্ম্ম না বুঝিয়াও, সেই পূর্ব্ব-স্মৃতিকে আশ্রয় করিয়া গভীর আনন্দ উপভোগ করিতে পারি। কিন্তু এই আনন্দ সত্য নহে, অধ্যাস-জনিত। ইহা-দ্বারা যে বিশেষ কবিতার আশ্রয়ে ইহা জন্মিয়াছে, তার উৎকর্ষ প্রমাণিত হইবে না। বৈষ্ণব মহাজনগণের ললিত পদাবলি শুনিয়া এক লম্পট ব্যক্তি অজস্র অশ্রুপাত করিতেছিল। কীর্ত্তন ভাঙ্গিলে তাকে প্রশ্ন করা হইল, "তুমি অমন-ভাবে আকুল হইয়া কাঁদিতেছিলে কেন, বল দেখি?" সে সরল ভাবে বলিল, "আর কিছু নয়, কীর্ত্তনীয়া যখন 'বঁধু! বঁধু!' বলিয়া ডাকিতেছিল, তখন আমার এক ব্যক্তির কথা মনে পড়িয়া গেল, যে আমাকে ঐ ভাবেই ডাকিত।" এখানে এ ব্যক্তি বৈষ্ণব-কবিতার যে রস গ্রহণ করিয়া কাঁদিল, তার দ্বারা সে-সকল পদাবলির উৎকর্ষা-পকর্ষের বিচার হইবে কি?

ফলতঃ, এই ভাল-লাগা ব্যাপারটার, এই আনন্দানুভূতিটার অন্তরালে ভাল-মন্দ, সত্য-কল্পিত, শ্রেষ্ঠ-নিকৃষ্ট অনেক কারণ বিদ্যমান থাকে। সে-সকল কারণের অনুসন্ধান না করিয়া কেবল ভাল লাগে বলিয়াই কোনও কবিতাকে শ্রেষ্ঠ, আর ভাল লাগে না বলিয়াই কোনও কবিতাকে নিকৃষ্ট বলা যায় না। ইংলণ্ডের অনেক লোকের কিপ্‌লিং-এর কবিতা ভাল লাগে; তা'দের টেনিসন একেবারেই ভাল লাগে না। অনেকের টেনিসন খুবই ভাল লাগে, কিন্তু ব্রাউনিং তারা পড়িতেই পারে না। এ ক্ষেত্রে কেন কার কি ভাল লাগে, ইহা না জানিয়া, এই সকল কবির কাব্য-সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ-নিকৃষ্ট-বিচার করা যায় না। কিপ্‌লিংকে অনেক লোকে ভালবাসে, কারণ কিপ্‌লিং-এর হালকা ভাবগুলি তা'দের মনোমত, এগুলিকে তারা সহজে ধরিতে ও বুঝিতে পারে। টেনিসনের আভিজাত্যের সঙ্গে ইহাদের ঘনিষ্ঠতা নাই;

শব্দ-সম্পদ্ এবং ভাব-সম্ভার—দু'এর কোনওটাই ইহারা ধরিতে পারে না। যাঁরা টেনিসন্‌কে ভালবাসেন, তাঁরা বহুল পরিমাণে তাঁর ঝঙ্কারেই মুগ্ধ হইয়া রহেন; ব্রাউনিং-এর সে ঝঙ্কার নাই বলিয়া ব্রাউনিং-এর কবিত্ব তাঁদের মনঃপূত হয় না। আবার হুইট্‌ম্যানের টেনিসনের আভিজাত্যও নাই, কিপলিং-এর লঘুতাও নাই, ব্রাউনিং-এর মার্জিত রুচিও (refined culture) নাই; এই জন্য অতি অল্প লোকেই তাঁর কবিতার রস আস্বাদন করিয়া থাকে। এইরূপে নানা লোকে নানা কারণে ভিন্ন ভিন্ন কবিতাকে বা ভিন্ন ভিন্ন কবিকে ভালবাসে। এই সকল কারণের মধ্যে কোন্‌টা সত্য রসানুভূতির প্রমাণ, আর কোন্‌টা অবান্তর বস্তুর উপরে প্রতিষ্ঠিত—ইহার দ্বারাই এগুলির কোন্‌টি কাব্য-বিচারে গ্রহণীয় আর কোন্‌টিই বা বর্জ্জনীয়, ইহার মীমাংসা হইবে। কেবল ভাল-লাগার বা না-লাগার দ্বারা এ বিচার হইতে পারে না।

একটি দৃষ্টান্ত—

"নাচিছে কদম্বমূলে, বাজায়ে মুরলী রে!
রাধিকারমণ।
চল সখি ত্বরা করি, দেখিগে প্রাণের হরি,
ব্রজের রতন।"

আমার নিকটে মধুসূদনের এই ব্রজাঙ্গনা-গীতি অপূর্ব্ব বোধ হয়। অমন মিষ্ট গীত, আমার মনে হয়, বাঙ্গালা ভাষায় কখনও ফোটে নাই, কখনও ফুটিবে না।

আর তোমার কাণে ও প্রাণে—

"যাই গো, ওই বাজায় বাঁশী
প্রাণ কেমন করে;
না গেলে, সে কেঁদে কেঁদে
চলে' যাবে মান-ভরে।"

গিরিশ ঘোষের এই সঙ্গীতটি অনাস্বাদিতপূর্ব্ব অমৃত বর্ষণ করে। তোমার বিবেচনায় অমন মিষ্ট গীত বাঙ্গালা ভাষায় কোনও দিন কেহ গাহে নাই, কোনও দিন কেহ আর গাহিতে পারিবে বলিয়াও মনে হয় না। মধুসূদনের ব্রজাঙ্গনাতে তুমি কোনও রস পাও না; গিরিশ ঘোষের গানে আমিও কোনও রস পাই না। এ অবস্থায় এই দুইটির মধ্যে কোন্‌টি বাস্তবিকই মিষ্ট, বাস্তবিকই কাব্যরসাত্মক, আর কোন্‌টি নয়, ইহার বিচার হইবে কিসে?

আমাকে যদি এ প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়, তবে বলিব যে, তোমার প্রশ্নের ভিতরেই আমার বিচারের সূত্রটিও রহিয়াছে। 'কোন্‌টি বাস্তবিকই মিষ্ট?' এই 'বাস্তবিক' কথাতেই বিচারের সূত্রটি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। 'বাস্তবিক মিষ্ট' বলিবার সময়ই, এটা মি মানিয়া লইয়াছ যে, যাহা মিষ্ট লাগে, তাহা এক নহে,—দুই জাতীয়। এক স্তবিক; আর এক যাহা বাস্তবিক নহে, অর্থাৎ অ-বাস্তবিক। যাহার বস্তুত্ব আছে,

তাহাই বাস্তবিক; যাহার বস্তুত্ব নাই, তাহাই অবাস্তব। সুতরাং তোমার নিজের কথাতেই, কেবল মিষ্টত্বের দ্বারা কবিতার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত বা প্রতিষ্ঠিত হয় না,—এই মিষ্টত্বের অন্তরালে বস্তুত্ব থাকা চাই। এই বস্তুত্বের দ্বারাও কবিতার বিচার হইবে, কেবল মিষ্টত্বের দ্বারা নহে। কেবল বস্তুত্বে কবিতা হয় না, কেবল মিষ্টত্বেও হয় না। বস্তুত্বের সঙ্গে মিষ্টত্বের, মিষ্টত্বের সঙ্গে বস্তুত্বের মিলন যেখানে, সেইখানেই সত্য কবিতা জন্মে; অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ কবিতামাত্রই রসাত্মক এবং বস্তুতন্ত্র।

সুতরাং কেবল মিষ্টত্বের দ্বারা কখনও কাব্যের ভাল-মন্দ-বিচার করা চলে না। মিষ্টত্ব একটা অনুভূতি। অনুভূতি বলিলেই, যে অনুভব করে এমন কোনও ব্যক্তি, আর যাহা তার এই অনুভবের বিষয় এমন কোন বস্তু,—এ দুইটিই বুঝায়। আর এই অনুভবের বিষয় দুই জাতীয় হইতে পারে। এক—যাহা বর্ত্তমানে আমাদের সমক্ষে উপস্থিত, দ্বিতীয়—যাহা অতীতে কোনও সময়ে উপস্থিত ছিল, এখন অনুপস্থিত হইয়াও ভাবযোগে কিংবা association of ideas-এর সহায়ে মনোমধ্যে জাগিয়া উঠিয়াছে; অর্থাৎ প্রত্যক্ষ অথবা স্মৃতি, এই দুই সূত্র ব্যতীত কোনও-কিছু আমাদের সত্য অনুভবের বিষয় হইতেই পারে না। সত্য অনুভব যখন বলিলাম, তখন মিথ্যা অনুভব সম্ভব, ইহাও মানিয়া লইলাম। সে মিথ্যা অনুভব কি? তার উৎপত্তি কিসে ও স্থিতি কোথায়? ইহাও জানা প্রয়োজন; নতুবা সত্য-মিথ্যার প্রভেদ করিব কিরূপে? সত্য অনুভব হয় বর্ত্তমান প্রত্যক্ষ, না হয় পূর্ব্ব প্রত্যক্ষের স্মৃতিকে ধরিয়া। সুতরাং যে অনুভবের মূলে বর্ত্তমান প্রত্যক্ষও নাই, আর পূর্ব্ব প্রত্যক্ষের স্মৃতিও নাই, সেই অনুভবকেই মিথ্যা বলিব। এই মিথ্যা অনুভবও আবার কোনও কোনও স্থলে একান্ত মিথ্যা, আর কোনও স্থলে বা সত্যাভাস হইতে পারে। শিশু প্রেমের বাহুপাশ-বন্ধন অথবা ভালবাসার জড়াজড়ি দেখিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠে। শিশুর এ অনুভব সত্য নহে, কিন্তু সত্যাভাস। ভালবাসার জড়াজড়ি যে কি, সে এখনও জানে না; জানিবে, সখ্যের আস্বাদন যে দিন পাইবে, সে দিন। এখন সে জানে মারামারিতেই কেবল জড়াজড়ি হয়। সুতরাং এখানে তাহাই সে সহজে কল্পনা করিল; অর্থাৎ এখানে বাস্তবিক যে ভাবটা নাই, সে আপনার মন হইতে তাহাই তার উপরে চাপাইল। এ গেল এক প্রকারের মিথ্যা অনুভব। এ অনুভব একান্ত মিথ্যা নয়, আধখানা সত্য মাত্র। শিশুর নিজের অন্তরের অনুভূতিটা সত্য, বাহিরে তার আরোপটা কল্পিত।

কিন্তু আর এক প্রকারের অনভব আছে, যাহা আধখানা সত্য বা সত্যাভাসও নয়—যাহা সর্ব্বৈব মিথ্যা, আদ্যোপান্ত স্বকপোলকল্পিত। যে ব্যক্তি জন্মে কোনও দিন কলিকাতা ছাড়িয়া যায় নাই, বরফ-পড়া কা'কে বলে, তাহা বা তার অনুরূপ কোনও-কিছু সে দেখে নাই; কেবল শুনিয়াছে যে, দুরন্ত শীতের দেশেই কেবল বরফ পড়ে; কেতাবে পড়িয়াছে যে, এই বরফ যখন পড়িতে আরম্ভ করে, তখন আশ্‌মান্-জমী যেন টুক্‌রা-টুক্‌রা ফেন-পুঞ্জে ভরিয়া যায়। এই শোনা-কথার উপরে সে তার মনে-ম

বরফ-পাতের একটা মন-গড়া ছবি আঁকিয়াছে। এই দৃশ্যের অনুভূতিটা নিতান্ত মিথ্যা ; ইহাতে প্রত্যক্ষের লেশমাত্র নাই। ইহা অনুমান-প্রতিষ্ঠিতও নহে ; কারণ অনুমানমাত্রই প্রত্যক্ষের উপরে গড়িয়া উঠে। ইহা উপমানও নহে ; কারণ একান্ত অপ্রত্যক্ষের উপমানও সম্ভবে না। ইহা উপমানের অনুমানের উপরে গঠিত। বস্তুর ছায়ার ছায়া, তস্য ছায়ামাত্র। ইহাতে বস্তুর চিহ্ন, সত্যের আভাসমাত্রও খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। আর রসমাত্রই যখন কোনও-না-কোনও বর্ত্তমান প্রত্যক্ষ বা পূর্ব্ব প্রত্যক্ষের স্মৃতির আশ্রয়ে জন্মে, তখন যে রস এ ভাবে জন্মে না, তাহা কখনই শ্রেষ্ঠ হইতে পারে না।

এই কষ্টিপাথর দিয়াই সকল কবিতার বিচার করিতে হয়। আমার নিকটে মধুসূদনের ব্রজাঙ্গনা-গীতি বেশী মিষ্ট লাগে। তোমার নিকটে গিরিশ ঘোষের "যাই গো ঐ বাজায় বাঁশী" বেশী মিষ্ট লাগে। এখানেও তোমার অনুভূতিই শ্রেষ্ঠ, না আমার অনুভূতি শ্রেষ্ঠ,—ইহার বিচারও ঐ 'বস্তু'র কষ্টিপাথর দিয়াই করিতে হইবে। নায়কের সঙ্কেতে তাঁর নিকটে যাইবার জন্য নায়িকার উদ্বেগই এই দুইটি কবিতার বিষয়। এই উদ্বেগই এখানে 'বস্তু'। এই উদ্বেগের অবস্থায় নায়ক-নায়িকার যে সত্য অভিজ্ঞতা বা অনুভূতি এবং এই অনুভূতি যে আকারে তাঁদের আচার-আচরণে, মুখের ভাবে, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের অবস্থানাদিতে প্রকাশিত হয়, তাহাই সে বস্তুর লক্ষণ। বস্তু-লক্ষণ দিয়াই মধুসূদনের ও গিরিশ ঘোষের এই দুইটি গানের উৎকর্ষাপকর্ষের বিচার হইবে,—আমার বা তোমার কোন্‌টা কতটুকু ভাল-লাগে, বা না-লাগে, তার দ্বারা এ বিচার হইবে না। এই বস্তু-লক্ষণ দিয়া বিচার করিতে গেলেই দেখি, মধুসূদনের গানে এই সত্য, প্রকৃত অভিজ্ঞতা বা অনভূতি একেবারেই নাই ; আর গিরিশ ঘোষের গানে তাহা পূরামাত্রায় বিদ্যমান রহিয়াছে। মধুসূদন বৈষ্ণব কবিদের অভিসারের কথা পড়িয়া তার একটা স্বকপোলকল্পিত মানস-ছবি আঁকিয়া রাখিয়াছিলেন, ললিত শব্দ যোজনা করিয়া সেই ছবিটিই এখানে প্রকট করিতে গিয়াছেন। আর গিরিশ ঘোষের এ-সকল কেবল পড়া-কথা নয়,—প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কথা। সুতরাং তাঁর গানে যে শক্তি, যে সত্য, যে সৌন্দর্য্য, যে রস ফুটিয়াছে, মধুসূদনের গীতিতে তাহা ফোটে নাই।

> "নাচিছে কদম্বমূলে বাজায়ে মুরলী রে !
> রাধিকারমণ।"

ইহাতে মধুসূদনের যে এ বস্তুর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা নাই, ইহা প্রমাণ করে। রাখাল-বালকেরা গ্রামের মাঠের প্রান্তে গাছতলায় বাঁশী বাজাইয়া নাচে, মধুসূদন ইহাই দেখিয়াছিলেন। তারা যে বাঁশী বাজাইয়া প্রণয়িজনকে আহ্বান করে না, এ কথা তিনি ভুলিয়া গিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ রাধিকা-বিরহে অধীর হইয়া রাধিকাকে ডাকিয়া [illegible]য়া বাঁশী বাজাইতেন ; আর রাধিকা আসিতেছেন কি না, তাই ভাবিতেন, কাণ [illegible]র নূপুরধ্বনি শোনা যায় কি না, অনুকূল বায়ু সে অঙ্গ-গন্ধ বহন করে কি
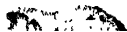
না,—বাঁশী বাজাইতেন আর তাই নিবিষ্ট চিত্তে লক্ষ্য করিতেন। শ্রীকৃষ্ণ রাধা-নামে সাধা বাঁশী বাজাইতেন, আর সর্ব্বেন্দ্রিয়কে কেন্দ্রীভূত করিয়া শ্রীরাধিকা আসিতেছেন কি না, তাই দেখিতেন। এ বাঁশী বাজে ধ্যানে, যোগে, সমাধিতে। এ অবস্থায় কোনও নায়ক বাঁশী বাজাইয়া তার তালে তালে নাচে না।

" নাচিছে কদম্বমূলে, বাজায়ে মুরলী রে !"—

শুনিলেই রাধিকারমণকে মনে পড়ে না,—মনে পড়ে এক সাঁওতাল যুবককে, যে এককালে আমাদের উঠানে আসিয়া বাঁশী বাজাইয়া নাচিত। এক 'নাচিছে' কথায়, মধুসূদন সব নষ্ট করিয়া দিয়াছেন। পাখীরা কুঞ্জ-দ্বারে নাচিয়া নাচিয়া আপনার প্রণয়ীকে ডাকে। কপোতী সন্ধ্যাকালে আপনার খোপের দরজায় নাচিয়া নাচিয়া আপনার সঙ্গীকে ডাকিয়া আনে। এ সকল সত্য। কিন্তু মানুষ ডাকে, নাচে না। সে ডাকে আর ধেয়ায়, ধেয়ায় আর ডাকে। ধ্যান নৃত্যের বিরোধী। কিন্তু আমি যখন ব্রজাঙ্গনা পড়ি, তখন এ সকল ভাবি না। আমি দেখি তার সুর। আমি দেখি তার শব্দ-সম্পদ্। আমি দেখি তার ছন্দ। আমি মজিয়া যাই তার অপূর্ব্ব ঝঙ্কারে। এই ঝঙ্কারটি বড় মিষ্ট। তারই জন্য ব্রজাঙ্গনাকে এমন মিষ্ট বলি। তুমি খোঁজ শব্দ নয়, অর্থ। তুমি চাও ছন্দ নয়, রস। এই জন্যই আমার যাহা মিষ্ট লাগে, তোমার তাহা তেমন মিষ্ট লাগে না।

তবে এ মীমাংসার একটা পথ হয়, যদি কবিতার ভাল-মন্দের বিচারটা তোমার রসের রাজ্যে যাইয়া হইবে, না আমার ঝঙ্কারের রাজ্যে আসিয়া হইবে,—এই কথাটা একবার দু'জনে মিলিয়া ঠিক করিয়া লইতে পারি।

[নারায়ণ, ১৩২২]

বাঙ্গলার গীতিকবিতা

চিত্তরঞ্জন দাশ

বাঙ্গলার জল, বাঙ্গলার মাটীর মধ্যে একটা চিরন্তন সত্য নিহিত আছে। সেই সত্য, যুগে যুগে আপনাকে নব নব রূপে, নব নব ভাবে প্রকাশিত করিতেছে। শত সহস্র পরিবর্ত্তন, আবর্ত্তন ও বিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে সেই চিরন্তন সত্যই ফুটিয়া উঠিয়াছে। সাহিত্যে, দর্শনে, কাব্যে, যুদ্ধে, বিপ্লবে, ধর্ম্মে, কর্ম্মে, অজ্ঞানে, অধর্ম্মে, স্বাধীনতায় পরাধীনতায়, সেই সত্যই আপনাকে ঘোষণা করিয়াছে, এখনও করিতেছে। যে বাঙ্গলার প্রাণ,—বাঙ্গলার মাটী, বাঙ্গলার জল, সেই প্রাণেরই বহিরাবরণ। ব

ঢেউখেলান শ্যামল শস্যক্ষেত্র, মধু-গন্ধ-বহ মুকুলিত আম্রকানন, মন্দিরে মন্দিরে ধূপ-ধূনা-জ্বালা সন্ধ্যার আরতি, গ্রামে গ্রামে ছবির মত কুটীর-প্রাঙ্গণ, বাঙ্গলার নদ-নদী, খাল-বিল, বাঙ্গলার মাঠ, বাঙ্গলার ঘাট, তালগাছ-ঘেরা বাঙ্গলার পুষ্করিণী, পূজার ফুলে ভরা গৃহস্থের ফুলবাগান, বাঙ্গলার আকাশ, বাঙ্গলার বাতাস, বাঙ্গলার তুলসীপত্র, বাঙ্গলার গঙ্গাজল, বাঙ্গলার নবদ্বীপ, বাঙ্গলার সেই সাগরতরঙ্গে চরণ-বিধৌত জগন্নাথের শ্রীমন্দির, বাঙ্গলার সাগর-সঙ্গম, ত্রিবেণী-সঙ্গম, বাঙ্গলার কাশী, বাঙ্গলার মথুরা-বৃন্দাবন, বাঙ্গালীর জীবন, আচার-ব্যবহার, বাঙ্গলার সমগ্র ইতিহাসের ধারা যে সেই চিরন্তন সত্য, সেই অখণ্ড অনন্ত প্রাণেরই পবিত্র বিগ্রহ! এই সবই যে সেই প্রাণ-ধারায় ফুটিয়া ভাসিতেছে, দুলিতেছে!

সেই প্রাণ-তরঙ্গে একদিন অকস্মাৎ ফুটিয়া উঠিল এক অপূর্ব্ব অসংখ্যদল পদ্মের মত বাঙ্গলার গীতিকাব্য! কিন্তু ফুল ত একদিনে ফুটে না। তাহার ফুটনের জন্য যে অতীতের অনেক আয়োজন আবশ্যক। তাহার প্রত্যেক দলের মধ্যে যে অনেক গান, অনেক কথা, অনেক কাহিনী। তাহার গন্ধের মধ্যে যে অনেক কালের অনেক স্মৃতি, অনেক মধু জড়াইয়া থাকে। তাহার ডাঁটায় যে জন্ম-জন্মান্তরের চিহ্ন লুকান থাকে। ফুল যে অনন্তকাল ধরিয়া ফুটিতে ফুটিতে ফুটিয়া উঠে।

বাঙ্গলার গীতিকাব্য যে কখন কোন্ আদিম উষায় ফুটিতে আরম্ভ করিল, আমি জানি না। শুনিয়াছি, সন্ধ্যা-ভাষায় লিখিত পুরাতন বৌদ্ধ দোঁহায় তাহার উন্মেষ দেখিতে পাওয়া যায়। চণ্ডিদাসের সময়ে সেই গীতিকাব্যের বিকশিত অবস্থা। কিন্তু তার আগে অনেক গীতিকাব্য না লেখা হইয়া থাকিলে এরূপ কবিতা সম্ভব হয় বলিয়া আমার মনে হয় না। আজকাল আমাদের সাহিত্যের ইতিহাস-সম্বন্ধে অনেক অনুসন্ধান, অনেক আলোচনা ও গবেষণা চলিতেছে। আশা করি, একদিন আমরা আমাদের গীতিকাব্যের এই হারান ধারাকে খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিব।

চণ্ডিদাসের লিখিত যে গীতিকাব্য, ইহাই বাঙ্গলার যথার্থ গীতিকাব্য। এই কবিতাগুলির মধ্যে যে প্রাণের সাড়া পাওয়া যায়, তাহাই বাঙ্গলা গীতিকবিতার প্রাণ। বাঙ্গলা চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া দেখিল, রূপে রূপে এ বিচিত্র ভুবন ভরিয়া আছে। কত কাল, কত যুগ, কোন্ অন্ধকারের অন্ধকারে রূপের ধ্যানে মগ্ন আমার বাঙ্গলা জাগিয়া দেখিল, ঊর্দ্ধে অনন্ত নীল, নীলের পর নীল, অঞ্চল-ধারে কল-কল্লোলে গঙ্গা বহিয়া যায়, চরণতলে কলহাস্যময় মহাসমুদ্র অনন্ত সুরে গাইয়া উঠিয়াছে,—তাহার বুকের উপর আছড়াইয়া পড়িতেছে; শিরে হিমালয় কাহার ধ্যানে নিমগন! বাঙ্গলা দেখিল, তাহার আশে পাশে এত রূপ, এত সুর, এত গান,—মন-প্রাণ বিচিত্র রসে ভরিয়া উঠিল। ভরা মনে, ভরা প্রাণে ব্যাকুল হইয়া শুনিল, প্রাণের ভিতর কাহার সাড়া, কাহার আকুল আহ্বান! তখন বাঙ্গালীর কবি গাইয়া উঠিল,—

"কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ"

বাঙ্গলা তখন প্রাণের ভিতর ডুব দিয়া দেখিল, কত মণি, কত মাণিক্য তাহার সেই আঁধার প্রাণের পরতে-পরতে আলোক বিকিরণ করিতেছে। ভাবিল, আমার প্রাণে কে আছে, কি আছে? কে আমাকে বাহির হইতে রূপে, রসে, গানে, গন্ধে জড়াইয়া-জড়াইয়া আকুল করে, আবার অন্তরের অন্তরে আসিয়া এমন করিয়া স্পর্শ করে? কাহাকে ব্যক্ত করিতে চাই? কে বিনা চেষ্টায় আপনা-আপনি এমন করিয়া ব্যক্ত হইয়া উঠে? বাঙ্গলা প্রাণে-প্রাণে বুঝিল, এ যে বাহিরের ও ভিতরের এক অপূর্ব্ব মিলন। এই মিলন উপভোগ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিল। চাহিয়া দেখিল, অনন্ত সাগর দূরে যেখানে দিক্‌চক্রবালের পরিধি-পারে মিলিয়াছে, সেখানে শুধু এক রেখার মত সরল, শান্ত, নিবিড়, যেন মিলাইয়াও মিলায় নাই, মিশিয়াও মিশে নাই, প্রভেদ অথচ অভেদ। আবার ফিরিয়া দেখিল, ধরণী মহাকাশকে চুম্বন করিতেছে, ঢলিয়া পড়িয়া বলিতেছে, "হে আকাশ, আমাকে লও, আমি যে তোমারই।" আকাশও ধরণীকে বুকের ভিতর টানিয়া লইয়াছে, বলিতেছে; "এস, এস, আমি ত তোমারই।" দেখিল, সে এক মহামিলন। বুঝিল, জন্মে-জন্মে, সকলই সার্থক। জন্ম সার্থক! মৃত্যু সার্থক! দেহ সার্থক! প্রাণ সার্থক! আত্মা সার্থক! এই মহামিলন সার্থক! বাহির শুধু বাহির নয়, অন্তর শুধু অন্তর নয়। ইন্দ্রিয় দিয়া যাহা প্রথম ধরা যায়, তাহা শুধু বহিরাবরণ। প্রত্যেক প্রত্যক্ষের, প্রত্যেক ভাবেরই একটা অন্তঃপ্রকৃতি আছে। সেই বহিরাবরণ ও অন্তঃপ্রকৃতি মিলিয়া-মিশিয়া এক। তাহারই নাম বস্তু। জীবন এই মহামিলন-মন্দির। কত বিচিত্র রূপ, কত বিচিত্র গন্ধ, কত বিচিত্র রস, কত না সুরের খেলা, কত না রসের মেলা ;—আমরা যে তিলে-তিলে নূতন হইয়া উঠিতেছি। বাঙ্গলার কবি তখন চামর ঢুলাইতে ঢুলাইতে গাইলেন,—

"নব রে নব নিতুই নব,
যখনি হেরি তখনি নব।"

আদিম যুগ হইতে বাঙ্গলার বুকে অনেক আশা, অনেক ভাব আপনা-আপনি জমাট বাঁধিতেছিল। সে যে হৃদয়ের মাঝে, জ্ঞানে কি অজ্ঞানে, কাহার খোঁজ করিতে-ছিল, মিলন-পরশের জন্য আকুল হইয়া অপেক্ষা করিতেছিল। মনের ভিতর ডুবিয়া ডুবিয়া যেই দেখিতে পাইল, আর সে আনন্দ ধরিয়া রাখিতে পারিল না। তখন কবি গাইয়া উঠিলেন,—

"হৃদয়ে আছিল বেকত হইল
দেখিতে পাইনু সে"

হৃদয়ের মাঝে যে ভাব আপনা-আপনি ফুটিতেছিল, সে যেন মূর্ত্তি ধরিয়া জাগিয়া উঠিয়াছে! সে রূপ কেমন? যেন,—

"চরণ-কমলে ভ্রমরা দোলয়ে
চৌদিকে বেড়িয়া ঝাঁক"

তাহাকে দেখিয়া কবি বাহ্যজ্ঞান হারাইয়াছিলেন, শুধু অন্তরের ভিতর মরমের সেই লুকান ঘরে বিভোর হইয়া দেখিতেছিলেন। যখন বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়া আসিল, তখন দেখিতে পাইলেন—তাঁহার সেই মানস-প্রতিমা, জীবন-প্রতিমা—

" চম্পক-বরণী, হরিণ-নয়নী * * *
চলে নীল সাড়ী নিঙ্গাড়ি নিঙ্গাড়ি
পরাণ সহিত মোর।"

ইহাই বাঙ্গলা গীতিকবিতার প্রাণ। প্রাণের সঙ্গে, মর্ম্মের সঙ্গে, ভাষার সঙ্গে, ভাবের সঙ্গে, কর্ম্মের সঙ্গে, ধর্ম্মের সঙ্গে,—জীবনের সঙ্গে, বাহিরের ও ভিতরের এমনই প্রাণস্পর্শী মিলন। বাঙ্গালী জানুক, আর নাই জানুক, বুঝুক, আর নাই বুঝুক, আমার বাঙ্গলার প্রাণ সে মহামিলনে ভোর হইয়া আছে। সেই মহামিলন-মন্দিরে পূজা যে নিয়ত চলিতেছে; বাঙ্গলার গান, তাহার আরাত্রিক—বাঙ্গলার ভাষা তাহার মন্ত্র। সেই বাঙ্গলার কবি চণ্ডিদাস। সেই কবিতা বাঙ্গালীর কবিতা।)

বাঙ্গলা দেশে সাহিত্যের অঙ্গনে এই গীতিকাব্য লইয়া আজকাল এক প্রকার মল্লযুদ্ধ বাঁধিয়াছে। নানাপ্রকার তর্ক-বিতর্ক, দলাদলি, দ্বেষ, ঈর্ষ্যা জাগিয়াছে। আজ দেখিতেছি, যে প্রাণের অনুভূতি লইয়া চণ্ডিদাস প্রভৃতি কবিরা গান গাইয়াছিলেন, সে ধারা, সে প্রাণের মতন, মনের মতন, সে " বিষামৃতে একত্র করিয়া " প্রাণরন্ধ্রে সে বংশী আর যেন ফুকারিয়া উঠে না। কাব্য লইয়া, কবিতা লইয়া, সাহিত্য লইয়া, রস-সৃষ্টি লইয়া, নানা বিশ্লেষণ, কঠোর অনুশাসন, ধর্ম্ম ও নীতির দোহাই, আদর্শের বড়াই, স্বজাতীয়তা ও বিজাতীয়তা, নিক্তির ওজনে তৌল করিয়া, কষ্টিপাথরে খাদ কত পড়ে, এই যাচাই, বাছাই, ঝাড়াই করিতেই দিন গত হয়, কিন্তু—

" দিন গত নহে শ্যাম, তব চরণে এ দিন গত "

সে সুরের, সে সৃষ্টির, সে জাগরণের, সে মিলনের কথা নাই, সে কথা বুঝিবার ইচ্ছাও নাই। সে বাঁশীর ধ্বনি আর শুনিতে পাই না—

" সিন্ধু নিকটে যদি কণ্ঠ শুখায়ব
কে দূর করব পিয়াসা "

আমাদের ঠিক সেই অবস্থা।

আজ এই সাহিত্যের প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া সেই তর্ক, মীমাংসা, যুক্তি, এই ভাব-দৈন্যের কারণ বুঝাইতে হইলে, আমি যে খুব ভাল করিয়া তাহার ঠিক মীমাংসা, ভাষ্য ও টীকা-টিপ্পনীর সহিত দেখাইতে পারিব, এমন হয় ত না-ও হইতে পারে; তবে বাঙ্গলা কবিতার প্রাণ ও বাঙ্গলা সাহিত্যের আদর্শ যে কি, তাহা বোধ হয়, বলিবার সময় সিয়াছে। তাই আজ এই সমবেত সাহিত্যের দরবারে আমি সেই সকল কথাই ত চাই, কোন্ পথে যাইলে হৃদয়-উৎসের দেখা মিলিবে, তাহারই খোঁজ করিব। এখন কথা হইতেছে—কাব্য কি? গীতিকবিতা কি? সাহিত্য কি?

সাহিত্যের আদর্শই বা কি? ফুল যেমন তাহার ভরা-রূপের ডালি লইয়া একদিনে ফুটিয়া উঠে না, তেমনি আদর্শও একদিনে, এক মুহূর্ত্তে প্রত্যক্ষ অনুভূতিতে আসে না। অনন্ত কালের যে অনাহত সঙ্গীতের আহ্বান চলিয়াছে, সেই আহ্বানের টানে ফুল আপনার সেই বিরাগ ও অনুরাগ লইয়া কত যুগ-যুগান্তরের স্মৃতির অক্ষুণ্ণ ধারার ভিতর দিয়া গৌরবে-সৌরভে আপনার আত্মবিকাশ করে। বিকাশই যে জীবনের ধর্ম্ম:—রূপে-রূপে বিকাশ, শতেক যুগের ফুল শত জন্ম ধরিয়া ফুটিয়া উঠিতেছে। ভাব-সাগরের প্রতি ঢেউ উঠিয়া, দুলিয়া, আপনার ইচ্ছায় খেলিয়া, আবার সাগরে মিলাইয়া যায়। জীবনের ধর্ম্ম ও বিকাশের ধর্ম্মই তাই। অনন্তকাল হইতে তাহা আছে, অনন্তকালই থাকিবে, তাই চণ্ডিদাস গাইয়াছেন,—

"মাটীর জনম না ছিল যখন,
তখন করেছি চাষ।
দিবস-রজনী না ছিল যখন,
তখন গণেছি মাস।"

সিতাসিত কালপক্ষ, দিবস রজনী, সবই ছিল, সবই আছে, সবই তেমনি করিয়া ফুটিয়া উঠিতেছে।

প্রথম কথা, গীতিকবিতার জন্ম কোথায়, কবিতা কি? সাধারণতঃ সোজা কথায় হয় ত বলিতে পারা যায় যে, ছন্দোবদ্ধ সুর-তালে বাঁধা কথাই কবিতা। সমাজ-বিজ্ঞানবিদ্ তাহার এক সামাজিক তত্ত্ব বাহির করিতে চান, মনস্তত্ত্ববিদ্ তাহার মানসিক বিশ্লেষণ করিতে পারেন। কিন্তু কল্প-কলার স্রষ্টা যে কবি, সে তাহার হৃদয়-মাঝারে যে স্বচ্ছ দর্পণখানি আছে, সেইখানে নয়ন ডুবাইয়া দেখে, সে উৎস কোথায়! প্রথম যুগে আদিম মানব যখন বহিঃপ্রকৃতির সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে বাস করিত, গাছের ডাল ভাঙ্গিয়া তৃণ দিয়া ছাইয়া, পাতা দিয়া ঘিরিয়া, কুটীর রচনা করিয়া, আপনাদের থাকিবার মত আশ্রয় করিয়া লইত; তখন হইতেই তাহাদের ভিতরে একটা সামাজিক ভাব পরস্পর পরস্পরের মধ্যে জাগিয়া উঠিত। তাহারা দলবদ্ধ হইয়া জীবন যাপন করিত। তখন তাহাদের শিক্ষা, অনুশীলন, হাব-ভাব, আচার-ব্যবহারের ধারা, সম্পূর্ণরূপে তাহাদের স্বভাবের ভিতর দিয়াই ফুটিয়া উঠিত। সেই স্বভাব-জাত সংস্কার, জ্ঞানে পরিণত হইবার পথে, স্বাভাবিক সুখ, দুঃখ, ভাব, অভাব যেমন জাগিত, তেমনি মিলিয়া-মিশিয়া পূরণ করিতে চেষ্টা করিত। পূর্ণিমা-রজনীতে যখন জ্যোৎস্নার অনাবিল ধারায় ধরিত্রীকে স্নাত দেখিত, বিহগ-বিহগীর মধুর স্বরলহরী শুনিত, নির্ঝরের জল-ধারায় আলোড়িত উপলখণ্ডের ভাষা শুনিত, তাহারা দল বাঁধিয়া নৃত্য করিত, গান করিত, আনন্দ-উদ্বেলিত হৃদয়ে অধীর হইয়া উন্মত্তবৎ কত ভাবের ও সুরের প্রকাশ করিত। পাখীর সমবেত কলরবোত্থিত গানের মত তাহাদেরও ভাষা ফুটিত। সেই প্রথম গান, সেই প্রথম প্রাণের আবেগ, সেই মানবের প্রথম সমাজ-বিজ্ঞান-বিদের বিশদ কথা।

দিন গেল, স্বভাব অভ্যাসে দাঁড়াইল, পরস্পর পরস্পরের অনুভূতির দ্বারা নানারূপে ভাব প্রকাশ করিতে লাগিল। দশ জনে মিলিয়া যে নৃত্য-গীত চলিত, তাহা ক্রমে অন্যরূপ আকার লইয়া অন্য আবেগের ধারায় নূতন রকমের সৃষ্টি হইতে লাগিল। স্ত্রী-পুরুষের সহজাত সংস্কার-বশে যুগলে মিলিতে লাগিল। তখন সেই দুইয়ের ভিতরে আদান-প্রদান, ভাব-অভাব, মিলন ও বিরহের পাওয়া ও না-পাওয়ার রস উপচিত হইল। গানের ধারাও নূতন হইল, এমনি করিয়া কবিতার জন্ম। তুমি আমি, আমি তুমি, হাসি-কান্নার বিলাস!

মনস্তত্ত্ববিদ্ বলেন যে, সেই সময়ে যত রকমের মানুষের মনে, যত রকমের সহজাত সংস্কারের খেলা হইতে লাগিল, তত রকমেই তাহার ভাব ও আকারে পরস্পর আপেক্ষিক পরিবর্ত্তন হইতে লাগিল। প্রত্যেক পরিবর্ত্তনই এক এক পৃথক্ ভাবের প্রকাশ, প্রত্যেক সেই প্রকাশের সঙ্গে সুরের ও ভাষার স্ফূর্ত্তি হইতে লাগিল। যেখানে যেমন ভাবটি ভিতরে ছিল, তেমনটিই বাহিরের আকার লইয়া প্রকাশ পায়। না-পাওয়ার জন্য যে ক্রন্দন, সেই ক্রন্দনে এক অপূর্ব্ব সুর উঠে, সেই সুর গানে পরিণত হয়। জীবন ও মৃত্যু, শোক ও আনন্দই সেই সংস্কার-যুগের বিশেষ লক্ষণ।

তারপর, দিন গেল, নানারূপে তাহা পূর্ণভাবে বিকশিত হইতে লাগিল। শীত কাটিয়া গেলে যেমন বসন্ত আসে, আদিম যুগের সে জড়তা কাটিয়া গেলে, তেমনি জীবনের সরসতা আসিল। বিচিত্র রসানুভূতিতে মানব উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। তখন কাঁদিত, দেহের স্বাভাবিক অভাবে; ক্রমে তাহার ভিতরে মনের ভাবাভাব জাগিল, রূপ-তৃষ্ণা আসিল, ভালবাসিতে শিখিল, পূর্ণ হইতে পূর্ণতর হইতে লাগিল।)

কিন্তু কল্পকলার যে স্রষ্টা,—যে কবি,—সে তাহার অনুভূতির ভিতর দিয়া বলিবে, এ যে লীলা! আনন্দঘন-রসাধার মায়াধীশ এমনি করিয়া রসভোগ-লীলা যুগে যুগে করেন। পাখীর বুকের ভিতরেও তিনি গান, সমীর-হিল্লোলেও তিনিই তান, জলের বুকে যে আলোকের নৃত্য, সেও যে সেই নিত্য সত্য রংরাজের রংএর খেলা। তাঁহার ত আদি অন্ত নাই। কেবল ফুটাইয়া ফুটাইয়া রূপে রূপে বিলাস করিয়া, ভাঙ্গিয়া, গড়িয়া জীবনের চিদানন্দঘন-রস পান করিতেছেন; বিশ্বপ্রকৃতিও সেই রস পান করিতেছে। সৃষ্টির আদি অন্ত কে খুঁজিয়া দিবে? আগে পরে কে বলিবে? ছোট বড় বিচার করিবে কে?

এই সমগ্র জীবনের অনুভূতিই সাহিত্য। প্রত্যেক পা-ফেলা ও প্রত্যেক পা-ফেলার দাগটি। মনস্তত্ত্ববিদ্ বলেন, এই রূপ-তৃষ্ণা-স্বভাব, সৃষ্টি-রক্ষার জন্য মিলিবার পন্থা। কল্পকলার স্রষ্টা বলে, এ তৃষা নয়, এ স্ফূর্ত্তি, রূপের ভিতর দিয়া রূপকে পাইবার, আপনাকে ফুটাইবার, খেলা করিবার, লীলার মাধুর্য্য। মাটি ফাটিয়া ণ তাহার শ্যামসুন্দর কোমলতা বিছাইয়া দেয়, ফুল ফোটে, পাখী গায়, আকাশে ব-রৌদ্রের রঙের পর রং ঝলকিয়া যায়, এ সবই আপনিই হয়; সে 'আপনি' সেই

লীলামৃত রসাধার। এ সবই তাঁরই প্রেমের বিচিত্র রূপ-রস! গভীর পঙ্ক হইতে পঙ্কজিনী শতদল বিকশিত করিয়া মৃদুল বাতাসে দুলে, সেও তাঁহারি লীলা। এ বিশ্ব-সৃষ্টি তাঁহারই, এ জীব-সৃষ্টির সকল খেলাই তাঁহারই; ইহা মায়া নয়, মিথ্যা নয়, কৈতব নয়। ইহা পূর্ণ, রূপে রূপে পূর্ণ, পূর্ণ হইতে পূর্ণতর বিলাস-লীলার বিচিত্র ক্রীড়া। এই অনুভূতির জীবন্ত, জ্বলন্ত প্রকাশই শ্রেষ্ঠ কল্পকলা, সেই অনুভূতিই সাহিত্যের রস।

কল্পকলার মূল কথা হইল সত্য—জীবনের বিশিষ্ট অনুভূতির সত্য। সে চিরন্তন সত্য কাল-দেশের পরিবর্ত্তনের ভিতরেও তাহার অন্তরঙ্গকে বদল করে না। কল্পকলার অন্তরঙ্গের আদর্শও দেশ-কাল-অতীত—সঙ্কীর্ণ-বুদ্ধির নীতি ও ধর্ম্মের অতীত। কল্পকলা সেই দিব্য দৃষ্টির কথা। এই যে সাধারণ মানুষের অনুভূতি, কল্পকলাবিদ্ তাহার ভিতরে দেখেন, সেই অনন্তের রসাভাস, সেই রসাভাসের জাগ্রত ছবিখানি তাহার জীবনের এক অনন্ত মুহূর্ত্তের ঋদ্ধি।

কলাবিদের কাছে ভিতর বাহির একই পদার্থ, পরস্পরকে ধরিয়া আছে। শ্রেষ্ঠ কলাবিদ্ Idealist নয়, Realist'ও নয়, সে Naturalist; শুধু ভাব লইয়াও সে স্বপ্নের দেশে ফুল ফুটায় না, শুধু দেহের রস-রক্তের সন্ধানেই কাটায় না। অনন্ত যেমন অনন্ত মুহূর্ত্ত ধরিয়া আপনা-আপনি নিজেকে স্বাভাবিক পরিণতিতে লইয়া আসে, কলাবিদ্‌ও তেমনিভাবে জীবনের ধারার সঙ্গে মিলাইয়া মিলাইয়া সৃষ্টি করেন। জীবন যে সাধনা, সে ত স্বপ্ন নয়। এই বিশ্ব যে অনুপম বিশ্বনাথের বিরাট্ শিল্প, এ মহাকাব্যে সকলেরই যথাযথ স্থান আছে, আলোও আছে, আঁধারও আছে। আদর্শ-জগৎই এই প্রত্যক্ষ জগৎ। বেদান্তের মায়াবাদ ভুল। এ প্রাণ সত্য; এ শ্রবণ সত্য, এ চক্ষু সত্য, এ রূপ সত্য, প্রতি অণুরেণু ধূলিকণা হইতে এই মহাবিশ্ব এক জাগ্রত প্রাণময় সত্য। মায়া বলিয়া কোন জিনিষই নাই। জগন্মিথ্যা নয়, এই রূপ-রস-শব্দ-স্পর্শ-গন্ধময়ী-পৃথিবীই কলাবিদের প্রাণ। প্রকৃতির প্রাণে যেমন অন্ধকারা যামিনীতে ঝড়াকারা নিশীথিনীর বিদ্যুৎস্ফুরণ হয়, কবির প্রাণেও তেমনি হয়। এমন কোন ক্রিয়াই নাই, যাহা কলাবিদের সৃষ্টির ভূমি হইতে দেখিবার বস্তু নহে। ইহাই সত্য বিন্দুর প্রাণের কথা; যিনি ভাবুক, যিনি রসিক, এই রস-সাধনা যাঁহার অন্তরঙ্গের ভিতর জাগিয়াছে, তিনি সকল কথা বুঝিবেন, তাই চণ্ডিদাস গাইয়াছেন—

> "বড় বড় জন রসিক কহয়ে
> রসিক কেহ ত নয়;
> তর তম করি বিচার করিলে
> কোটিকে গুটিক হয়।"

আমি যে মিলনের কথা বলিয়াছি, যিনি যথার্থ কবি, সত্যদ্রষ্টা, তিনি সেই মিলনের উদ্দেশেই বিভোর হইয়া আছেন।

যেমন বিশ্বপ্রকৃতির সকল সৃষ্টি, কল্পকলা-সৃষ্টিও ঠিক সেইরূপ। কারণ ও অকারণের ভিতর দিয়া স্রষ্টা এই মহারূপের বিলাস করিতেছেন, কারণ ও অকারণের মধ্য দিয়া আমরাও জীবনের সেই একই বিলাস-লীলা সাধন করিতেছি। এই যে সাম্য, এই যে সমদর্শন, ইহাই ভারতের শ্রেষ্ঠ দান। এই সাধনার ধারায় মানুষ জীবন্মুক্ত। কলাবিদের জীবন এই ধারায় গঠিত। পাপপুণ্যের বিচার তাঁহার নাই, পাপও সত্য, পুণ্যও সত্য, ত্যাগের বিরাট্ ভাবও তাঁহার কাছে যেমন সুন্দর, সংসারের স্বার্থপরতার খেলাও তাঁহার কাছে তেমনি মধুর। সবই তাঁহার কেন্দ্র, সব কেন্দ্র হইতেই সকলকে এ সমদর্শনের চক্ষু দিয়া দেখিবার ও অনুভব করিবার সাধন তাঁহার প্রাণে বর্ত্তিয়া আছে। তিনি সেই সাধনা, সেই সমদর্শনের প্রেম-রাগিণীতে সকলকে মোহিত করেন, নিজেও সেই সুধা পান করেন, সেই লীলার সহচর হইয়া রহেন, তাই চণ্ডিদাস গাইয়াছেন,—

> "রূপ করুণাতে পারিবে মিলিতে
> ঘুচিবে মনের ধান্দা
> কহে চণ্ডিদাস পূরিবেক আশ
> তবে ত খাইবে সুধা।"

এই বিশ্ব-সৃষ্টির রস-মাধুর্য্য উপভোগ জীবনের চরম। নিজে আত্মস্থ হইয়া এই বিশ্ব-আত্মার সহিত একান্ত যোগই মনুষ্যজীবনের শ্রেষ্ঠ অনুশাসন। এই মানব-প্রাণের অন্তর-ভূমির সহিত বিশ্ব-প্রাণের যে মিলন-ভূমির অপরূপ দৃশ্য, এই প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়ের সহিত যে অতীন্দ্রিয় মহা-মিলনের রস, তাহাই শ্রেষ্ঠ কল্পকলার রাজ্য, তাহাই সংসার ও পরমার্থের মিলনে সম্পূর্ণ জীবন। এই মহামিলনের প্রধান দূতী প্রেম, বিশ্লেষণে কোন নূতন সম্পদ্ গড়িয়া উঠে না। বিশ্লেষণে প্রাণের সমগ্র অনুভূতি হয় না, বিশ্লেষণ ভাঙ্গিতে পারে, সৃষ্টি করিতে পারে না। বিশ্লেষণ আমাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিয়া, সমগ্রতা হইতে দূরে রাখে, একাত্মবোধে অসহায় করিয়া তোলে,—একমাত্র প্রেমই এই মিলনের মহামন্ত্র, সেই সর্ব্বস্বধন। সেই প্রেমের দেবতা, পরিপূর্ণ, সবল, সহজ, সরল সোহাগ ও আবেগে সকলকেই বুকের ভিতর টানিয়া লন, তিনি এই সারা বিশ্বের, এ বিশ্ব তাঁহার! কবিতা যদি এই প্রেমের রাজ্যে না পৌঁছায়, এই প্রাণ চিন্তামণির 'মণি-কোটা'র মণি না মিলাইতে পারে, তবে তাহা প্রাণের কবিতা নয়। গীতিকবিতা সেই প্রাণের সে অতলস্পর্শ রূপ-সাগরে ডুবিয়া সেই সাগরের কাহিনী ফুটাইয়া তুলে।

৬। এইবার কবিতার ভাষা ও রীতির কথা। আমাদের দেশে একটা কথা আছে যে, "ছেঁদো কথায় ভুল না"—তাহার মানে ত সকলেই বুঝেন। কবিতার ছন্দ, তাল, সুর থাকিলেই যে তাহার মধ্যে সেই চিন্তামণির সাক্ষাৎকার মিলিবে, এমন ত [illegible], বরং অনেক সময়ে সেই মিলনের অন্তরায়। এইজন্যই যেখানে ভাবের দৈন্য, [illegible] উপমার প্রাচুর্য্য। পরিষ্কার কাচ যেমন মানুষের দৃষ্টির অন্তরায় না হইয়া

সাহায্য করে, কথাও ঠিক তেমনি ভাবকে জমাইয়া তুলে। কাচ যদি অপরিষ্কার হয়, চোখে ঝাপসা ঠেকে। ভাষাও তেমনি। কোন সুন্দরভাবই সুন্দর আকার না লইয়া ব্যক্ত হয় নাই। ফুলের দেহ হইতে যেমন তাহার রং ও তাহার আকার, যে যে স্থানে তাহার সেই সুন্দর সুবাস ভরিয়া রাখে, তাহাকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না, সেই ফুলকে নষ্ট না করিলে তাহার সুগন্ধটুকু আলাদা করা যায় না, তেমনি ভাবও ভাষাকে আশ্রয় করিয়া থাকে, ভাষাও ভাবকে আশ্রয় করিয়াই ফুটিয়া উঠে। শ্রেষ্ঠ কবিতার ভাবও ভাষাকে ছাড়াইয়া উঠে না, ভাষাও ভাবকে ছাড়াইয়া যাইতে পারে না। তাহা সুডৌল, নিখুঁত, সুন্দর, সহজ। তাহাকে গয়না পরাইতে হয় না। অলঙ্কার সৌন্দর্য্যকে বাড়াইবার জন্য; অলঙ্কার দিয়া সৌন্দর্য্যকে বাড়াইলে তাহাকে খর্ব্ব করা হয়, তাহার রূপের জ্বলন্ত সত্যকে অস্বীকার করা হয়। ভাষা-সম্বন্ধে যাহা বলিলাম, ছন্দ-সম্বন্ধেও ঠিক সেই কথাই বটে। কবিতা ও গানে কিছু প্রভেদ আছে। গানে যখন আমরা নিজেদের ব্যক্ত করি, তখন সুরই আমাদের প্রধান সহায়, কথা ভাবানুযায়ী উপলক্ষ্য মাত্র। পর্ব্বতের গায়ে ঘাত-প্রতিঘাতে ঝরনা যেমন বিচিত্র ধ্বনিতে গিরি-গহন মুখরিত করিয়া আপনার পথ আপনি কাটিয়া অবাধে বহিয়া যায়, গানও তেমনি আপনার পথ আপনি কাটিয়া সুরের ভিতর দিয়া পরম চরমে মিলাইয়া যায়। এ জীবন অণু হইতে অণীয়ান্, মহৎ হইতেও মহীয়ান্; জীবন ও মৃত্যু একই সুরের খেলা। আন্তরিকতা সেই জীবন ও মৃত্যুর বন্ধনী, আধ্যাত্মিকতা জীবনের প্রাণ—প্রাণের অন্তরতম জ্বলন্ত পাবক-শিখা। মানব-জীবন সেই শিখার জ্বলন্ত জাগ্রত মূর্ত্তি, ভাব ও ভাষা তাহার রং ও রঙের মিলন-মাধুর্য্য।

১) তাহার পর আর একটি কথা, তাহাকে বলে রূপান্তর। এই যে স্বাভাবিক মনের বিকাশ, তাহাকে ভাগবত-সত্যে তুলিয়া ধরা। সেই রূপান্তরই বস্তু ও ভাবের সমন্বয়। বস্তুর অন্তরের যে রূপ, তাহার উৎসকে খুলিয়া দিয়া তাহাকে সেই রূপচিন্তামণির অচিন্ত্য-দ্বৈতাদ্বৈতের মধ্যে টানিয়া তোলাই কল্পকলার শেষ রঙের খেলা। এই যে দেহ মন, এই যে ইন্দ্রিয়, তাহার অন্তরঙ্গ ভাবের সহিত সাক্ষাৎ ও সহজ করিয়া দেওয়ার নামই রূপান্তর। এই রূপান্তর দেখাইতে পারিলেই ভোগের মধ্যে ত্যাগ আপনি ফুটিয়া উঠে। ত্যাগের মধ্যে আনন্দ আপনিই উছলিয়া উঠে। সকল জিনিষকেই এই অনন্তের দিক্ হইতে দেখিলেই এই রূপান্তরে পৌঁছান সহজ হয়। শিল্পের সাধনা করিতে করিতে, রূপ হইতে রূপে বিলাস করিতে করিতে, জীবনে এমন এক মুহূর্ত্ত আসে, সেই অনন্ত মুহূর্ত্তে এই রূপ-রাগভরা শব্দ-স্পর্শ-গন্ধময়ী-পৃথিবীর রূপের মাঝে আসল রূপ ঝলসিয়া উঠে, যাঁহাকে চাই, তাঁহারই সাক্ষাৎকার। সেই শুভ-মুহূর্ত্তের জন্যই সকল কল্পকলাবিদের সাধন। সেই শুভ-মুহূর্ত্তেই সকল সৃষ্টি সুন্দর, মধুর, কল্যাণ ও মঙ্গল হইয়া উঠে।

সকল সৌন্দর্য্যের মধ্যে বিশ্বের আত্মা জাগ্রত 'মুখরিত' বিকশিত, সৌন্দর্য্য লীলায় লীলায়িত। প্রকৃতি ও মানব উভয়ের ভিতরই বিশ্বাত্মার সমান খেলা। সক

জীব, বৃক্ষ, লতা, পাতা, অণু, পরমাণু, সকলই প্রকৃতির মধ্যে। সাধনার পথে সাধক বিশ্বের দর্পণে তাহার নিজের মুখের ছায়া যখন দেখে, তখন তাহার সত্য রূপ প্রকটিত হয়। সে দেখে, তাহার সম্মুখে এক নূতন জগৎ,—সেই জগতের ও তাহার এক নাড়ী,—তাহার এক বিরাট্ হৃদয়। সেই বিরাট্ হৃৎপিণ্ড এই বিরাট্ প্রাণ-সমষ্টিকে বক্ষে করিয়া কালের ভিতর দিয়া অকালে ধাইতেছে। তখন তাহার মন সেই বিরাটের রূপের রসে মজিয়া এক অভিনব রূপান্তর সৃষ্টি করে। সেই রূপান্তরের সঙ্গে সঙ্গে সকল বৈচিত্র্যের মধ্যে এক মহামিলনের অনাহত সঙ্গীত ধ্বনিয়া উঠে। বাঙ্গলার গীতিকবিতায় আমি তাহারি সন্ধান পাইয়াছি।

[১৩২৩]

আধুনিক বঙ্গসাহিত্যে "মা"

জিতেন্দ্রলাল বসু

প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে যে ভাবতরঙ্গ বঙ্গের আদি কবি চণ্ডিদাস অবতারণা করিয়াছিলেন, তাহা যদি অবাধে বহিয়া যাইত তাহা হইলে বঙ্গসাহিত্য এতদিনে কান্ত-ভাবেই ডুবিয়া যাইত। বাঙ্গালী না হইলেও বিদ্যাপতির প্রভাবও বঙ্গসাহিত্যের উপর সামান্য নহে। এই দুইজন কবির প্রভাবে বৈষ্ণব-কাব্য-সাহিত্যের উৎপত্তি। তাই বৈষ্ণব-সাহিত্যে মধুর রসেরই প্রাবল্য। কিন্তু বৈষ্ণবী সাধনায় মধুর রসের স্থান যতই উচ্চে হউক, উহা পাইতে হইলে স্তরে স্তরে উঠিয়া যাইতে হয়, ক্রমাভিব্যক্তি এ সাধনারও মূল ভিত্তি—এই তত্ত্ব প্রকাশ করিবার জন্য নদীয়ার শ্রীগৌরাঙ্গ অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তিনি দেখাইয়া গিয়াছেন যে বাৎসল্যরসের সাধনা কত উপাদেয়। এই জন্য চৈতন্য-পরবর্তী বৈষ্ণব কবিদের কাছে আমরা বাৎসল্য রসের ছবি পাইয়াছি। তাঁহারা প্রেমার্দ্রচিত্তে মা যশোদার মূর্ত্তি চিত্রিত করিয়াছেন—শচী-মার অমর চিত্র আঁকিয়া সকলকে মুগ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ইহার পর বঙ্গসাহিত্যে যে কয়খানি প্রসিদ্ধ কাব্য-গ্রন্থ দেখিতে পাই, সেগুলির মধ্যেও মাতৃমূর্ত্তি উজ্জ্বলভাবে চিত্রিত। শৈব কাব্যগুলিতে গিরিরাণী ও গিরিনন্দিনীকে উপলক্ষ্য করিয়া যে মাতৃস্নেহের বাৎসল্য-রসের প্রস্রবণ সৃষ্ট হইয়াছে তাহা চিরকাল বাঙ্গালীর হৃদয় স্নিগ্ধ করিবে। মুকুন্দরামের চণ্ডীকাব্যেও এই চিত্র বেশ মনোরমভাবে চিত্রিত হইয়াছে। তারপর বাঙ্গালী চরিত্রে যেমন যেমন পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে, তেমনি মাতৃচিত্রগুলিও পরিবর্ত্তিত, বিকৃত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের যেখানে শেষ বলিয়া ধরা যাইতে পারে,

সেখান পর্য্যন্ত মাতৃচিত্র সুপরিস্ফুট। কারণ, আমাদের চরিত্রে যতই অবনতি ঘটিয়া থাকুক, আমরা মায়ের আসন টলাইতে তখনও শিখি নাই। আমাদের গার্হস্থ্যের মূলে মা, আমাদের সমাজের মূলে মা। বহুদিন পূর্ব্বে—জানি না, কোন্ যুগে—ভগবান্ রামচন্দ্র শ্রীমুখে বলিয়া গিয়াছেন, "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।"—আমরা সেই দেববাণী শুধু কথায় কথায় পর্য্যবসিত করিয়া রাখি নাই, জননীর সম্বন্ধে তাহা হৃদয়ে হৃদয়ে অনুভব করিয়াই আসিয়াছিলাম। ভারতীয় সাহিত্যে তাই মার আদর চিরকাল অক্ষুণ্ণই ছিল। আদি-কবি বাল্মীকি, কবি-গুরু বেদব্যাস, এত উজ্জ্বল-ভাবে মাতৃচিত্র অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন যে, সে চিত্রের অপলাপ এখনও আমরা করিতে পারি নাই।

বঙ্গের প্রাচীন কবিকুল তাঁহাদের কাব্যে দেবচরিত্র-ব্যপদেশেও গৃহচিত্র, সমাজচিত্র অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন। অতএব গৃহে ও সমাজে মার যে স্থান ছিল, তাহা আমরা তাঁহাদের কাব্য হইতে জানিতে ও বুঝিতে পারি। আরও বুঝিতে পারি যে বাঙ্গালীর অবস্থান্তর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালী যে রসপানে পরিপুষ্ট, তাহারও কেমন অবস্থান্তর হইয়া পড়িতেছিল। বাঙ্গালীর জীবন তাহার জননী-জীবনের সহিত অচ্ছেদ্য, অপরিহার্য্যভাবে জড়িত ছিল। ভারতে, এবং বিশেষতঃ বঙ্গদেশে, মার যে পরিমাণে ও যে ভাবে আদর ছিল, ততটা অন্য কোনও দেশে থাকিতে পারে নাই, তাহার কারণ আমাদের গৃহের অধিষ্ঠাত্রী দেবী "মা"। অন্যান্য পরিবারবর্গ সকলেই মার আজ্ঞাধীন অনুগ্রহজীবী বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এখনও বাঙ্গালী যখন বিবাহ করিতে যায়, তখন মাকে বলিয়া যায় যে তাঁহার দাসী আনিতে যাইতেছে। একান্নবর্ত্তী পরিবারে মার প্রভাব ভারতবাসী যতটা বুঝিতে পারে, ততটা অন্য দেশের লোকের বুঝিবার উপায় নাই। ভারতের সাহিত্যে মার কল্পনা মাতৃমূর্ত্তি—এই কল্পনার বলেই ভারতবাসী ভগবানে মাতৃত্বের আরোপ করিয়া নিজেকে ও জগৎকে ধন্য করিতে পারিয়াছে। এ কল্পনা জগতে আর কোথাও দেখা যায় না। বিশ্বমাতাকে লইয়া ভারতের ধর্ম্মে যে নূতন নূতন ভাবুকতার সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা দ্বারা ভারতের পুরাণ ও সাহিত্য চিরকালের জন্য সমৃদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। বিশেষতঃ বঙ্গদেশে ভগবানের মাতৃভাবের বড়ই আদর, ভক্তের মাতৃনাম-গানে বঙ্গসাহিত্য তাহার এক অংশ উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে। রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত প্রভৃতি মাতৃভক্ত সন্তানেরা তাঁহাদের পারমার্থিক সঙ্গীতে যে তান তুলিয়াছেন, তাহাতে কেবল ধর্ম্মসাহিত্যই যে পুষ্ট হইয়াছে তাহা নহে; ঐ সকলে যে স্নেহ, যে আবদার ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহা হইতে বুঝা যায় যে ঐ গুলিতে বঙ্গসমাজে মা ও ছেলের মধ্যে কি নিবিড় সম্পর্কই ছিল। মা যে কি বস্তু তাহা আমরা তখন বুঝিতাম; কাজেই তখনকার গানে, ভাবে, কাব্যে মার যথেষ্ট প্রভাব।

কিন্তু যখন ইউরোপীয় সাহিত্যের প্রভাব বাঙ্গালীর হৃদয় অধিকার করিয়া বসিল, তখন পূর্ব্বভাব অল্পে অল্পে সরিয়া দাঁড়াইল; সমাজে একটা বিপ্লব সূচিত হইল।

ইংরাজী-শিক্ষিত নব্যসমাজ উচ্ছৃঙ্খলতা ও অনাচারকে ধর্ম্ম বলিয়া বরণ করিলেন; তখন তাঁহাদের মানসিক অবস্থা যে কি হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, তাহা রাজনারায়ণ বসু মহাশয় তাঁহার "একাল ও সেকাল" গ্রন্থে প্রকাশ করিয়াছেন। এই দলের প্রায় সকলেই কালাপাহাড়ের মত দেশের সকল বস্তুর মূর্ত্তি ভাঙ্গিয়া ধূলিসাৎ করিবার জন্য চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। দেশের যা কিছু বরেণ্য বা আদরণীয় ছিল তাহা উপেক্ষিত হইতে লাগিল—ধর্ম্ম গেল, ভাব গেল, সাহিত্য গেল, আদর্শ গেল, স্বয়ং ভগবান্ উড়িয়া গেলেন। ইতিহাসে দেখা যায়, যখন একটা দেশে বিপ্লবের সূত্রপাত হয়, তখন সেই দেশে কতকগুলি শক্তিশালী পুরুষের আবির্ভাব হয়, তাঁহারাই এই বিপ্লবের কর্ণধার-স্বরূপ হইয়া যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তন-সূত্রে ঐ জীবন-সংগ্রাম প্রবর্ত্তিত করেন। ভারতের মধ্যে ঐ সংগ্রাম আরম্ভ হয় বঙ্গদেশে—তাই বঙ্গদেশে সে সময়ে কতকগুলি শক্তিশালী পুরুষের আবির্ভাব হইয়াছিল। বঙ্গসাহিত্যে এই শক্তিশালী পুরুষগণের অগ্রণী মাইকেল মধুসূদন দত্ত। ইনিই প্রথমে ইউরোপীয় আদর্শে বঙ্গসাহিত্য-রচনার সূত্রপাত করেন, কালিদাসকে ছাড়িয়া হোমরকে অনুকরণ করেন, দেশের পণ্ডিত-মণ্ডলীকে "Barren rascals" নামে অভিহিত করিয়া, Dr. বিশ্বনাথকে বর্জন করিয়া, বিলাতী আদর্শে নাটক প্রণয়ন করেন, গ্রীকপুরাণ হইতে বিষয় সংগ্রহ করেন, এবং মিল্টনের অনুকরণ করিতে গিয়া পাপী ও অসংযতচরিত্র রাবণকে কাব্যের নায়ক করিয়া দেশের মহান্ স্বার্থত্যাগের আদর্শ ভগবান্ রামচন্দ্রকে খর্ব্ব করিয়া ফেলেন। তাঁহার শক্তি বিদ্রোহের পথে—আর সে শক্তি বড় সহজ শক্তি নয়। প্রাকৃতিক নিয়মই এই যে, ঝঞ্ঝাবায়ু বহিলে আকাশে দূষিত বায়ু পরিষ্কৃত হয়—মাইকেলের দ্বারাও বঙ্গীয় সাহিত্যাকাশ তাহার দূষিত বায়ু পরিত্যাগ করিয়া সংশোধিত হইয়াছিল, সে কথা সকলেই জানেন। যে ভারতচন্দ্রের সমকক্ষ হইতে পারিবেন না বলিয়া রাজা রামমোহন রায় কবিতা লিখিতে বিরত হইয়াছিলেন, সেই ভারতচন্দ্রের প্রভাব এই শক্তির মুখে তৃণবৎ উড়িয়া গিয়াছিল এবং বঙ্গসাহিত্যে একটা নূতন তেজের সৃষ্টি করিয়াছিল।

কিন্তু যেমন একদিকে আকাশ পরিষ্কৃত হইল, তেমনি আর একদিকে মেঘ দেখা দিল। সাহিত্যে এক অনাচারের স্থানে অপর অনাচার প্রবেশ লাভ করিল। আমাদের সমাজ যতই অবনত হউক, তখনও সেখানে ত্যাগের আদর্শ প্রতিষ্ঠিত ছিল। তাহার পরিবর্ত্তে স্ব-স্ব-প্রধানত্বের আদর্শ মাথা তুলিয়া দাঁড়াইল। এই আদর্শ বঙ্গের একান্নবর্ত্তী পরিবারের মন্দির চূর্ণ না করিলেও, যেখানে তাহার মহত্ত্বটুকু দেবতার সম্মানে পূজিত হইত, সেই মন্দির-বেদীতে দারুণ আঘাত করিল। সমাজে যে পরিবর্ত্তন সূচিত হইল, তাহার মূলমন্ত্র আত্মসম্প্রসারণ। আগে আত্মীয়-স্বজন পরিবারের অঙ্গ বলিয়া গণ্য হইত, এখন হইতে তাহারা বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িতে লাগিল; পূর্ব্বে মা ছিলেন দেবী, এখন খুব জোর গৃহিণী; তাহার অধিক সম্মান আর তাঁহার রহিল না। এ সম্মানটুকুও দান অনুগ্রহদত্ত। যে দাবীর জোরে তিনি সে সম্মান আদায় করিয়া লইতেন এখন সেই জোরটুকু যেন রহিল না। ইউরোপে লোকে তো মা লইয়া সংসার শোভিত

করে না, তাহারা পত্নী লইয়া গৃহরূপ উদ্যান ভূষিত করে; তাহাদের কাছে পিতার পরিবারের চেয়ে নিজের পরিবারের আদর অনেক বেশী; অতএব সেই নব্য আদর্শের কাছে দেশীয় ত্যাগের আদর্শটা—মাতৃদেবীত্বের আদর্শটা—ম্লান হইয়া গেল।

এ রোগের লক্ষণ শুধু যে গৃহেই প্রকাশিত হইয়া ক্ষান্ত হইল, তাহা নহে; সাহিত্যেও ইহার প্রভাব দেখা দিতে আরম্ভ করিল। সাহিত্যে মাতৃচিত্র বিরল হইতে লাগিল। যেখানে বা সে চিত্র রহিল, সেখানেও তাহা অপ্রধান চরিত্র হিসাবে। 'মেঘনাদ বধে' মন্দোদরীর স্থান প্রমীলার অনেক নীচে। এই হইল অনর্থের সূত্রপাত। তখন একটা নূতন সাহিত্য-গঠনের যুগ—সে যুগ অনুপ্রাণিত হইল পাশ্চাত্ত্য ভাবে। ঈশ্বর গুপ্তের মিঠেকড়া চাবুক বড় কিছু করিতে পারিয়াছিল, এমন মনে হয় না। ফলে বাঙ্গালীর নূতন সাহিত্যে মার আদর কমিতেই লাগিল। এ সাহিত্য মাতৃ-স্নেহরসে সিক্ত হইয়া পবিত্র হইল না, ইহা পত্নীপ্রেম বা ভাবী পত্নীর আকাঙ্ক্ষা লইয়া রঙ্গভূমে অবতীর্ণ হইল। কিন্তু পত্নীপ্রেমের আদর্শও টলিয়াছিল, তাই এ প্রেমেও বিলাতী ছাপ পড়িল। তাই স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার উজ্জ্বল প্রতিভা লইয়া আসরে নামিলেন —"এই বন্দীই আমার প্রাণেশ্বর" এমনি বিলাতী কায়দা লইয়া। 'দুর্গেশনন্দিনী' বাঙ্গালায় একটা নবযুগ আনয়ন করিল সত্য, কিন্তু ইহাতে মাতৃত্বের চিহ্নমাত্র নাই। আয়েষা ও তিলোত্তমা দুইটি চরিত্রই বিলাতী ছাঁচে ঢালা। বঙ্কিমের এক একটি পুস্তক সৌন্দর্য্যের খনি, কলার আধার, সাহিত্য-শিল্পের সুনিপুণ অভিব্যক্তি—সে কথা একশতবার বলিব, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বলিতে হইবে যে প্রথম প্রথম তাঁহার প্রতিভা পাশ্চাত্ত্য আদর্শেই বিশেষভাবে পরিপুষ্ট হইয়াছিল। তিনি সেক্ষপীয়রেরই মত সূক্ষ্মদৃষ্টির সহিত ভালবাসা ও রূপ-লালসার চিত্র আঁকিয়াছেন, কালিদাসের মত সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিয়াছেন, অন্যান্য অনেক মহান্ ভাবের লীলাও দেখাইয়াছেন, কিন্তু তাঁহার সৃষ্ট এই অপূর্ব্ব সাহিত্য মাতৃ-চিত্র-হীন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তাঁহার 'দুর্গেশনন্দিনী,' 'কপালকুণ্ডলা,' 'মৃণালিনী,' 'চন্দ্রশেখর,'—অমর কাব্য হইলেও এ অংশে বিকলাঙ্গ। 'কৃষ্ণকান্ত' বা 'বিষবৃক্ষে' যে মাতৃ-চিত্র আছে, তাহা যেন ফুটিতে সাহস করে নাই—এত সংক্ষেপে ব্যক্ত হইয়াছে যে আমরা ইহার রস উপভোগ করিতে পারি না, উপভোগ করিবার সময়ই পাই না। এই চিত্রগুলি মাতৃস্নেহের পূর্ণানুভূতিতে আমাদের হৃদয় ভরিয়া দিতে পারে না। 'দেবীচৌধুরাণী'তে ও পরিবর্দ্ধিত 'ইন্দিরা'য় কবি মাতৃহৃদয়ের চিত্র আঁকিয়াছেন। প্রথমটি অতি সংক্ষিপ্ত এবং দ্বিতীয়টি সুভাষিণীর চরিত্রের পাশে যেন নিষ্প্রভ। তবু এ সময়ে বঙ্কিম বিদেশীয় প্রভাবের হাত হইতে প্রায় সম্পূর্ণ মাত্রায় নিষ্কৃতি পাইয়াছিলেন।

তবে বঙ্কিমচন্দ্র কি মাতৃহৃদয় বুঝিতেন না? মনুষ্য-হৃদয় যাঁহার প্রতিভার কাছে উন্মুক্ত ছিল, বিশেষতঃ যিনি স্ত্রী-হৃদয়কেই বিশেষ ভাবে বুঝিতেন, তিনি কি মা চিনিতেন না? যে কয়েকটি স্থলে তিনি মাতৃহৃদয়ের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়াছেন, সেইখানে আমরা বুঝিয়াছি যে কবি মাতৃস্নেহের মহিমা জানিতেন। তাঁহার অধিকাংশ গ্রন্থে

মাতৃচিত্র একেবারে নাই, এমন কি শেষ বয়সে তিনি যে কয়েকটি পুস্তক প্রণয়ন ও পরিবর্ত্তন করেন, তাহাতে দেশীয় ভাবের প্রাবল্য থাকিলেও মাতৃচিত্র নাই বা ফুটে নাই। যে কয়খানি গ্রন্থে মার কথা আছে তাহাও গৌণভাবে। 'কৃষ্ণকান্তের উইল'এ গোবিন্দলালের মাতা আছেন যেন কাশী যাইবার জন্যই—অর্থাৎ গোবিন্দলাল কর্ত্তৃক ভ্রমর-ত্যাগের উপলক্ষমাত্র হইয়া। সংসারে মা রহিয়াছেন, অথচ গোবিন্দলাল সব বিষয়ে পরামর্শ করে ভ্রমরের সঙ্গে, মার কথা ভাবেও না। 'কৃষ্ণকান্তের উইল' নায়িকা-প্রধান কাব্য, মাতৃ-প্রধান নহে। তারপর 'রজনী'। 'রজনী'তে গ্রন্থ-নায়কের একটি মা আছেন কবি একথা বলিয়াছেন, কিন্তু সেই মা-টিকে কবি একেবারে লুকাইয়া ফেলিয়াছেন; তিনি রহিলেন লোকলোচনান্তরালে, রোগশয্যায়—তাঁহার স্থান দখল করিলেন "লবঙ্গলতা," যুবতী বিমাতা। 'রজনী'কে যদি একমুহূর্ত্তের জন্যও সামাজিক উপন্যাস বলিয়া ভাবিতাম তাহা হইলে নিশ্চয় বলিতাম যে ইহা একটা অনাসৃষ্টি হইয়াছে, কিন্তু 'রজনী'তে কবি অপূর্ব্ব কৌশলের ও সৌন্দর্য্যের সাহায্যে কতকগুলি মনস্তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন মাত্র; তাই সেকথা বলিতে পারিলাম না। তাহা না বলিতে পারিলেও, একথা বলিবার বাধা নাই যে 'রজনী'তে মাতৃচিত্র খর্ব্ব হইয়াছে। 'বিষবৃক্ষে' কমলমণি খোকাকে লইয়া মাতৃস্নেহ একটুখানি করিয়াছে, কিন্তু সে নিতান্তই বিন্দুমাত্র। 'দেবীচৌধুরাণী'তে প্রফুল্ল ও প্রফুল্লের মাতাকে লইয়া পুস্তক আরম্ভ এবং আরম্ভেই মাতা শেষ হইয়া গেলেন। বলিয়াছি যে 'ইন্দিরা'য় কবি মার গৃহিণীপনার অবতারণা করিয়াছেন, কিন্তু সে চিত্রও যেন অবান্তর ভাবে চিত্রিত। এমন কেন হইল? ইহার কারণ অনুসন্ধান করিতে হইলে, বঙ্কিমচন্দ্র যে সময়ে ও যে অবস্থায় বঙ্গের নবসাহিত্যের সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহাই আমাদিগকে স্মরণ করিতে হইবে।

যে সময়ের কথা আমরা বলিতেছি, সে সময়ে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সহিত দেশের জনসাধারণের বিশ্লেষ প্রায় সম্পূর্ণ হইয়াছিল। তখনকার সাহিত্যিকগণ জনসাধারণকে লক্ষ্যান্তর্গত করিয়া সাহিত্য রচনা করিতেন না; করিবার প্রয়োজনীয়তাও উপলব্ধি করেন নাই। বিলাতী সমাজে মায়ের প্রতিপত্তি নাই, কাজেই বিলাতী উপন্যাসে, কাব্যে, নাটকে কোথাও মার তেমন আদর নাই। সেখানে দম্পতীকে অথবা প্রেমিক-প্রেমিকাকে অবলম্বন করিয়া সাংসারিক লীলা—তাই বিলাতী সাহিত্য নায়ক-নায়িকা-প্রধান। বঙ্গের নবযুগের নবসাহিত্য যে এই ভাববর্জিত হইবে তাহা আশা করা অন্যায়, কারণ কোনও কালের কোনও সাহিত্যই কালের প্রভাব অতিক্রম করিতে পারে নাই। বঙ্কিমচন্দ্র যদিও নব্যসাহিত্যিকদিগের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে এই প্রভাবকে অতিক্রম করিতে পারিয়াছিলেন, তথাপি উহা যে তাঁহার হৃদয়ে বিলক্ষণ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল তাহার প্রমাণের কিছুমাত্র অভাব নাই—সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ, আমরা এতাবৎ যাহা বলিতেছি, তাঁহার কাব্যে মাতৃগৌরবের হানি। সে সময়ের সাহিত্যে এ দোষ রহিয়া গিয়াছে।

এ তো গেল বঙ্কিম যুগের কথা। এখনকার কাব্য-সাহিত্যের কথা বলিতে গেলেও এ বিষয়ে আমরা এক প্রকার হতাশই হই। এখনকার যুগের কবি রবীন্দ্রনাথ। তাঁহার কাব্যসমুদ্রেও মাতৃস্নেহের চিত্র-রূপ রত্ন বড় বিরল; নাই এ কথা বলিতে পারি না। মহাভারতের অমৃতরাশি হইতে তিনি যখন সুধা আহরণ করিয়া দুই-এক বিন্দু আমাদের দান করিতেছিলেন, তখন আমাদের মনে আশা হইয়াছিল যে তাঁহার কাছ হইতে আমরা মাতৃমহিমা আরও বিস্তৃতভাবে শুনিতে পাইব, কিন্তু আমাদের আশা মনেই রহিয়া গেল, পূর্ণ হইল না।

কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের ও রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবের মধ্যে যে সময়ের ব্যবধান সেই সময়ই বঙ্গদেশে ভাবের অনেকটা পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল। এবং তাহা ঘটাইয়াছিল বহুল পরিমাণে বঙ্কিমচন্দ্রেরই প্রতিভা। দেশীয় ভাবের অভাবে দেশের যে ক্ষতি হইতেছে তাহা বঙ্কিম বুঝিতে পারিয়াছিলেন; তাই তিনি তাঁহার উপন্যাসে, কমলাকান্তে, লোকরহস্যে—নানা উপায়ে দেশীয় ভাব জাগ্রত করিবার প্রয়াস করিতেছিলেন। আজকাল দেশে যে মাতৃত্বের ভাব জাগিয়াছে; তাহা তাঁহারই সেই প্রয়াসের ফল। দেশের নিত্য আদর্শ "ত্যাগ," দেশের লোককে তিনিই শিখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। তিনিই শিখাইয়াছেন যে সুখ সংযমে ও ত্যাগে। সে শিক্ষা পূর্ণ মাত্রায় ফলবতী হইবার সময় এখনও আসে নাই এবং তাহার আশাও সুদূরপরাহত; কিন্তু তাহার কিছু ফল যে না ফলিয়াছিল তাহা বলা যায় না। ইহার প্রথম ফল উপন্যাসের আদর্শের পরিবর্ত্তন; এ পরিবর্ত্তনের পথ তিনিই দেখাইয়া গিয়াছেন। এবং দ্বিতীয় ফল, মাতৃমূর্ত্তির প্রতি সাহিত্যিকদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ। এ সম্বন্ধে হাস্যরসিক 'বাঙ্গালী চরিত'-প্রণেতাও যে কতক সাহায্য করিয়াছিলেন তাহা অস্বীকার করা যায় না। যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তন সকল প্রাকৃতিক ঘটনারই মূলে যেমন কার্য্য করে, ভাবজগতেও সেইরূপ করে। সাহিত্য ভিন্ন অন্য যে সকল ঘটনা এই উদ্বর্ত্তন-ব্যাপারের হেতুস্বরূপ হইয়াছিল, তাহার মধ্যে আদর্শ দর্শন ও মহাত্মগণের শিক্ষাই প্রধান। সমাজে সে সময়ে মাতৃভক্তির একটি বিরাট্ আদর্শ বর্ত্তমান ছিলেন—তাঁহাকে বঙ্গের আবালবৃদ্ধবণিতা সকলেই জানিতেন ও মানিতেন—তিনি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। দেশের শিক্ষিত সমাজকে বিদেশীয় প্রভাব হইতে রক্ষা করিয়া, দেশের ত্যাগের আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য সেই সময়ে আর এক মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়—সেই মহাপুরুষ রামকৃষ্ণ পরমহংস। তাঁহার শিক্ষায় ও আকর্ষণে অনেক শিক্ষিত ব্যক্তিই নিজ নিজ জীবনের গতি ফিরাইয়া ঠিক পথে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। এই সকল নানাবিধ কারণে সমাজেও অসাড় চৈতন্য আবার ফিরিয়া আসিয়াছিল।

এই লুপ্ত চেতনার পুনঃপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই যেন সাহিত্যিকগণের হৃদয়ে সাহিত্যে মাতৃচরিত্রের অভাববোধ জাগিয়া উঠিয়াছিল। এই যুগের দুইজন মহাকবি, দুই দলের প্রতিনিধি-স্বরূপ হইয়া অবতীর্ণ হইলেন। প্রথম নবীনচন্দ্র সেন—তিনি হইলেন নব্যতন্ত্রের মুখপাত্র; তিনি মহাভারতকে উল্টাইয়া তাঁহার মত-পোষক তিনখানি

কাব্য রচনা করিলেন। 'মেঘনাদ বধ'এ দোষ থাকায় তাহা নিন্দনীয় হইয়াছে, ইঁহারও কাব্যে সেই দোষ আরও একটু অতিরিক্তমাত্রায়। এ তিনখানি কাব্যও বঙ্গের জাতীয় কাব্য হইতে পারে নাই, কিন্তু এখানে সে কথার বিচার নিষ্প্রয়োজন। সে যাহাই হউক, নবীনবাবুর আত্মজীবনী হইতে আমরা জানিতে পারি যে মহাকবি বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলীতে মাতৃচিত্র ভালরূপে চিত্রিত না হওয়ার অভাব তিনি অনুভব করিয়াছিলেন। তিনি এই কাব্য-ত্রিতয়ে অর্থাৎ "রৈবতক, প্রভাস ও কুরুক্ষেত্রে" সুভদ্রা-চিত্র অঙ্কিত করিলেন, কতকটা ঐ অভাব পূর্ণ করিবার জন্য, কতকটা মাতৃত্বের একটা আদর্শ সৃষ্টি করিবার জন্যও বটে। কিন্তু সে চিত্র, বিদেশী আদর্শে গঠিত হওয়ায় এবং মাতৃহৃদয়ের স্বাভাবিক চিত্র না হওয়ায় পাঠকের হৃদয় স্পর্শ করিতে পারিল না। এ কথা আমরা পূর্ব্বেও বলিয়াছি এবং আবার বলিতেও কুণ্ঠিত নহি। একটা বড় রকমের আদর্শ সৃষ্টি করিব বলিয়া গ্রন্থ লিখিতে বসিলে যেমন কৃত্রিমতা দোষ আপনি আসিয়া পড়ে, এ কাব্যগুলিতেও সেই দোষ স্পষ্ট। তা যাহাই হউক, সাহিত্যে মাতৃগৌরব পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিবার প্রশংসা তাঁহার নিশ্চয়ই প্রাপ্য। কবি নবীনচন্দ্র যদি বেদব্যাসকে অতিক্রম না করিয়া বঙ্কিমচন্দ্রের উপদেশ-মত চলিতেন, তাহা হইলে বোধ হয় ভালই হইত। তাহা না করায় তাঁহার ক্ষমতা ও উদ্দেশ্য অনেক পরিমাণে ব্যর্থ হইয়াছে। তৎসত্ত্বেও সর্ব্বান্তঃকরণে বাঙ্গালীকে তাঁহার প্রদত্ত ঋণ স্বীকার করিতেই হইবে।

দ্বিতীয় মহাকবি গিরিশচন্দ্র ঘোষ। তাঁহার জীবন ও কর্ম্ম বুঝিবার সময় এখনও আসিয়াছে কি না সন্দেহ। কিন্তু এ কথা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে যে, তাঁহার নাট্যাবলীতে মাতৃমূর্ত্তি উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত, মাতৃমহিমা বিশেষ ভাবে ঘোষিত। গিরিশচন্দ্রের মাতৃভক্তি তাঁহার গ্রন্থাবলীতে ফুটিয়াছে; মার স্নেহ যে কি অপূর্ব্ব পদার্থ তাহা তিনি জীবনে যেমন দেখিয়াছিলেন ও বুঝিয়াছিলেন, তেমনি তাঁহার প্রসিদ্ধ নাটকগুলিতে দেখাইয়াছেন ও বুঝাইয়াছেন। যাঁহারা কোনও একটা অন্ধসংস্কারের বশবর্ত্তী না হইয়া গিরিশচন্দ্রের নাটক চর্চ্চা করিয়াছেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই কৃতজ্ঞ হৃদয়ে সাক্ষ্য দিবেন যে গিরিশচন্দ্র বঙ্গসাহিত্যকে যে অমূল্য উপহার দিয়াছেন—যে মহতী শিক্ষায় বাঙ্গালীকে অনুপ্রাণিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন—যদি বাঙ্গালী তাহা হৃদয়ের সহিত ধারণা করিবার যত্ন করে, তাহা হইলে বঙ্গবাসীর চরিত্র উন্নত হইবে। সে কথার পরিচয় ভবিষ্যতে কোনও দিন দিবার আশা রহিল; এখন এইটুকু মাত্র বলিবার বিষয় যে গিরিশচন্দ্র কি গার্হস্থ্য, কি পৌরাণিক, কি ঐতিহাসিক, তাঁহার সর্ব্ববিধ নাটকেই নিপুণ হস্তে মার মূর্ত্তি গঠিত করিয়া বঙ্গবাসীকে উপহার দিয়াছেন। বঙ্গসাহিত্যের নবযুগে চারি বিভাগে চারিজন মহাকবির উদয় হইয়াছে—যাঁহারা সাহিত্যের এই চারি বিভাগ সুসম্পন্ন করিয়া সাহিত্যকে পূর্ণতার পথে অগ্রসর করিয়া দিয়াছেন—কাব্য-বিভাগে মধুসূদন, উপন্যাস-বিভাগে বঙ্কিমচন্দ্র, নাটক-বিভাগে গিরিশচন্দ্র, খণ্ড কাব্য বা গীতিকাব্য-বিভাগে রবীন্দ্রনাথ। ইঁহাদের মধ্যে মাতৃচিত্র অঙ্কনে গিরিশ-চন্দ্রেরই প্রাধান্য, সে বিষয়ে সূক্ষ্মদর্শী পাঠকদিগের ভিতর মতদ্বৈধ হইবার সম্ভাবনা

নাই। গিরিশচন্দ্রের মনুষ্য-হৃদয়জ্ঞতা তাঁহার প্রায় সকল চিত্রেই সুব্যক্ত, তাঁহার মাতৃচিত্রগুলিও তাই অস্বাভাবিকতার দোষে দুষ্ট হয় নাই, ইহাই তাঁহার মাতৃচিত্রের বিশেষত্ব। তাঁহার একটা সমগ্র নাটক এই মাতৃগৌরবের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই নাট্যকাব্য তাঁহার পৌরাণিক নাটক 'জনা'।

'জনা' নাটকখানির সমালোচনা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে, অন্য কোনও সময়ে তাহা করিবার ইচ্ছা রহিল, কিন্তু এ কথাটুকু বলা অপ্রাসঙ্গিক নহে যে, এই নাটকে কবিবরের যে শক্তি ব্যক্ত হইয়াছে তাহা তাঁহার অন্যান্য শক্তি ব্যঞ্জক নাটকগুলির মধ্যেও দুষ্প্রাপ্য। যে কার্য্য নবীনবাবুর আদর্শ রমণী ও মাতা সুভদ্রা সাধিত করিতে পারেন নাই, জনা তাহা সাধিত করিয়াছে। বঙ্গের রঙ্গালয়সমূহে "জনা"র গৌরব এখনও অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে ও বোধ হয় চিরদিন থাকিবে। ইহার ফলে কত সহস্র লোকের মনে লুপ্তপ্রায় মাতৃমহিমার ছবি জাগিয়া উঠিয়াছে ও জাগাইয়া তুলিবে, তাহার ইয়ত্তা নাই। কারণ নাটকখানি প্রধানতঃ মাতৃগৌরবের উপর প্রতিষ্ঠিত; কবি উজ্জ্বল অক্ষরে নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, জগতে মাতৃ-আশীর্ব্বাদই সন্তানের অক্ষয় কবচ; মাতৃসেবাই প্রধান ধর্ম্ম ও পুণ্য; মার মনে কষ্ট দেওয়াই সকল বিপদের মূল। তিনি যে পথে চলিয়া এই শিক্ষা দিয়াছেন তাহাই হিন্দুদের চিরদিনের পথ, তাই তাঁহার শিক্ষায় যে কাজ হইয়াছে তাহা স্থায়ী-ফলপ্রসূ বলিয়া মনে হয়। অথচ এই মাতৃত্ব তিনি কোথাও কোমলতার আবরণে দুর্ব্বল করিয়া ফেলেন নাই। পাঠক ও দর্শক বীররমণীর অপূর্ব্ব প্রতিমূর্ত্তি দেখিয়া রোমাঞ্চিত হইয়াছে, পুত্রবাৎসল্যের প্রখরতা দেখিয়া বিস্ময়ান্বিত হইয়াছে, আবার মাতৃস্নেহের অমৃতস্পর্শে স্নিগ্ধ ও পবিত্র হইয়াছে। নাট্যাচার্য্য গিরিশচন্দ্রের শিক্ষা এস্থলে নিষ্ফল হয় নাই—বঙ্গসাহিত্যিকগণের হৃদয়ে আবার মাতৃমহিমা জাগিয়া উঠিয়াছে। তাই 'জনার কথা' একটু বিস্তৃতভাবেই বলিলাম।

বঙ্গীয় নাট্য-সাহিত্যে গিরিশচন্দ্রের পরেই কবিবর দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের স্থান। ক্ষীরোদপ্রসাদ প্রভৃতি অন্যান্য নাট্যকারগণও গিরিশচন্দ্রের শিক্ষায় অনুপ্রাণিত। কবিবর ডি. এল. রায়ের 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটকে ও 'পরপারে' নামক সামাজিক নাটকে মাতৃহৃদয়ের মহিমা প্রখ্যাত হইয়াছে। ক্ষীরোদপ্রসাদের 'উলুপী' নাটকেও মাতৃমহিমা কীর্ত্তিত হইয়াছে—পুত্র-বলিদানে। ফলতঃ এখন সাহিত্যের আবহাওয়া বদলাইয়াছে—বুঝি আমরাও একটু বদলাইয়াছি। কিন্তু এখনও আমাদের সমাজ-মন্দিরে মাতৃদেবীর পুনঃপ্রতিষ্ঠা সম্পূর্ণ হইয়াছে এমন মনে হয় না,—আমাদের স্ব-প্রধানত্ব এখনও প্রবল, তাই এই ক্ষুদ্র নিবন্ধের অবতারণা করিলাম। রমণীর পূর্ণতা মাতৃত্বে—মাতৃত্বের পূর্ণাভিষেকে আমাদের মঙ্গল। তাই বঙ্গসাহিত্যে মার আদর যত বাড়িবে ততই উহা পবিত্র হইবে এবং আমাদেরও পবিত্র করিবে।

[মানসী ও মর্ম্মবাণী, ১৩২৩]

সাহিত্যে "রূপান্তর"

বিপিনচন্দ্র পাল

সকল সাহিত্যেই মাঝে মাঝে এমন এক একটা কথার সৃষ্টি হয়, যাহাতে জনসাধারণের চিন্তাতে একটা যুগান্তর আনিয়া দেয়।

'সাহিত্যের রূপান্তর' কথাটি, আমার মনে হয়, এই জাতীয়।

প্রথমে যখন এই কথাটি ব্যবহৃত হইয়াছিল, সাধারণ লোকে ইহার মর্ম্ম বুঝিয়া উঠিতে পারে নাই; তবে ইহাতে যে বুঝিবার বস্তু আছে, এ ধারণা অনেকেরই জন্মিয়াছিল। কথাটি এখনও সকলে ভাল করিয়া ধরিতে পারেন নাই। ধরিতে পারিলে সাহিত্য-সমালোচনায় একটা নূতন বিজ্ঞানের সূত্রপাত হইবে।

সাহিত্য বলিতে এক্ষেত্রে রস-সাহিত্যমাত্র বুঝিতে হইবে। ব্যাপক অর্থে আজিকালি সাহিত্য শব্দে গণিত, দর্শন, ইতিহাস, জড়বিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান প্রভৃতি যাবতীয় লিপিবদ্ধ জ্ঞানকেই বুঝায়। ইংরাজিতে এ সকলই লিটারেচরের (literature) অন্তর্গত। কিন্তু যে সাহিত্যের রূপান্তরের কথা বলা হয়, তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে গণিত, দর্শন, ইতিহাস, জড় বা জীববিজ্ঞানাদির কোনও সম্বন্ধ নাই। গণিতের বা দর্শনের, ইতিহাসের বা ভূ-তত্ত্বের বা রসায়নের বা জড়বিজ্ঞানের বা physics-এর কথা যখন সাহিত্যের অঙ্গীভূত হয়, অর্থাৎ কোনও গণিতবিদ্ বা দার্শনিক বা ঐতিহাসিক বা ভূতত্ত্ববিদ্ বা রাসায়নিক বা জড়বিজ্ঞানবিদ্ যখন আপনাপন গবেষণাদিকে লিপিবদ্ধ ও প্রণালিবদ্ধ করিয়া কোনও সাহিত্যের অঙ্গ-পুষ্টি সম্পাদন করেন, তখন তাঁহাদের এ সকল রচনাতে গণিতের বা দর্শনের, ইতিহাসের বা ভূগোলের, জড়বিজ্ঞানের বা জীববিজ্ঞানের সত্য ও তথ্যসকল কোনও প্রকারের রূপান্তর প্রাপ্ত হয় না। ইঁহারা যে বস্তু বা ব্যাপারকে যে ভাবে দেখেন, ঠিক সেই ভাবেই তার বর্ণনা করিয়া থাকেন। আকাশের জ্যোতিষ্কমণ্ডলী যেখানে যে ভাবে ও যে রূপেতে, যে সকল সম্বন্ধেতে আবদ্ধ হইয়া দূরবীক্ষণের প্রত্যক্ষীভূত হয়, জ্যোতির্বিদ্যায় তাহাদের সেই সংস্থান ও সেই সম্বন্ধই বর্ণিত হইয়া থাকে। দ্রষ্টার অন্তরের রসানুভূতির দ্বারা তাহাতে কোনও প্রকারের রং ফলিয়া উঠে না।

এই রং ফলানটা দর্শনের বা জ্ঞানের কর্ম্ম নহে। আমাদের অন্তরের যে বৃত্তির দ্বারা আমরা বস্তু-সাক্ষাৎকারে সুখ বা দুঃখ, কিংবা হাস্য, অদ্ভুত, করুণ, রুদ্র, বীর, বীভৎস, ভয়ানক প্রভৃতি রস আস্বাদন করিয়া থাকি, সেই বৃত্তিই এ সকল বস্তুতে এ সকল রসের রং ফলাইয়া থাকে। এইজন্য এই বৃত্তিকে রঞ্জিনী বৃত্তি কহে। এই রঞ্জিনী বৃত্তির দ্বারাই যাবতীয় রসানুভব ও এই রসানুভূতির ফলে সমুদায় রস-সাহিত্যের সৃষ্টি হইয়া থাকে।

আলোক-বিজ্ঞান বর্ণের ধর্ম্ম প্রত্যক্ষ করিয়া, বিশ্বের অপূর্ব্ব বর্ণ-বৈ নিদানাদির নির্ণয় করিয়া থাকে। যে বর্ণটি যেভাবে যেখানে প্রকাশিত হয়, কিরূপে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ-সমাবেশে আকাশের মেঘমণ্ডলে নানা প্রকারের রং-লীলা প্রকটিত হয়, অথবা কি সূত্রে বনস্থলীতে পত্র-পল্লব-পুষ্পাদিতে বিচিত্র বর্ণসকল ফুটিয়া উঠে, আলোক-বিজ্ঞান কেবল তাহাই ব্যক্ত করে। কিন্তু শারদীয় ঊষার উদ্ভিন্ন আলোকে হিমানী-মণ্ডিত অত্যুচ্চ গিরিশৃঙ্গের বর্ণবিলাস দেখিয়া কবির বা ভাবুকের প্রাণের মর্ম্মে মর্ম্মে যে আনন্দলহরী জাগিয়া উঠে, আলোক-বিজ্ঞান তার খবর রাখে না।

সেইরূপ বিশ্বের বিচিত্র ধ্বনিসকলের অনুভূতিকে ধরিয়া, কিরূপে কোন্ সূত্রে কোন্ বাহন অবলম্বন করিয়া, এ সকল শব্দ দিঙ্মণ্ডলে ছড়াইয়া পড়ে; শব্দের সহিত আমাদের শ্রুতিযুগলের কি সম্বন্ধ; আমরা যে সকল শব্দ বা ধ্বনি উচ্চারণ করি, তার সঙ্গে আমাদের কণ্ঠনালীর কি সম্বন্ধ; সংগীতের মূর্চ্ছনা অন্তরা প্রভৃতির মূল উৎপত্তি ও লক্ষণ কি,—ধ্বনি-বিজ্ঞান বা acoustics তাহারই সত্য ও তথ্য নির্দ্ধারণ করিয়া থাকে। কিন্তু এ সকল ধ্বনি-সংযোগে মানুষ সংগীতের সৃষ্টি করিয়া কিরূপে যে আপনার অন্তরের বিবিধ রসানুভবকে ব্যক্ত ও সম্ভোগ করে, সে কথা শব্দ-বিজ্ঞান জানে না। কেন যে প্রত্যুষে ভৈরবীর আলাপ শুনিয়া, আমাদের মর্ম্মের স্তরে স্তরে জীবনের তরঙ্গ নাচিয়া উঠে; আবার কেনই বা মধ্য-রাত্রে বেহাগের আলাপ শুনিয়া আমাদের চিত্তের উপরে অদ্ভুত নিস্তব্ধতা আসিয়া ছাইয়া পড়ে; কিংবা সায়াহ্নের প্রাক্কালে, সূর্য্য যখন পশ্চিম গগনে ডুবিতে থাকে, আসন্ন অন্ধকারের ভয়-ভাবনায় পাখীরা যখন আপন আপন কুলায়ে প্রতিনিবৃত্ত হয়, পথ-শ্রান্ত পথিক যখন প্রান্তর-মধ্যে পথ চলিতে চলিতে গ্রামান্তে যাইয়া আশ্রয় লইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠে, তখন পূরবীর আলাপ শুনিয়া আমাদের প্রাণ, ঘরে বসিয়াই, কেন উদাস হইয়া উঠে, —এ সকল খবর শব্দ-বিজ্ঞান বা acoustics কিছুই রাখে না।

সেইরূপ দেহ-বিজ্ঞান বা physiology, অস্থি-বিজ্ঞান বা anatomy জীবদেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের, পেশি ও অস্থিসমূহের অন্ধিসন্ধির সন্ধান করিয়া, কোথায় কি-ভাবে কোন্ পেশী বা কোন্ অস্থি সমাবিষ্ট, তাহাই কেবল বলিয়া দেয়। কিন্তু এই রক্ত-মাংসের, এই অস্থিপেশিময় দেহযষ্টি দেখিয়া, আমাদের অন্তরে যে সকল অনুরাগ বা বিরাগের সঞ্চার হয়, তার কথা দেহ-বিজ্ঞান বা অস্থি-বিজ্ঞান কিছুই জানে না, কিছুই বুঝে না। এই অনুরাগে বা এই বিরাগে আমাদের চক্ষে একই দেহ-যষ্টির যে সকল রূপান্তর ঘটে, তার কথা বিজ্ঞান বা দর্শন জানে না, বুঝে না, বলিতে পারে না। এ রূপান্তর ঘটায় আমাদের অন্তরের রঞ্জিনী বৃত্তি। এই রূপান্তরের সংবাদ বহন করিয়া থাকে রস-সাহিত্য বা কল্প-সাহিত্য।

বর্ণ-বিজ্ঞান জগতের রংমহলে যাহা দেখে না, চিত্রকর তাহা দেখেন। শব্দ-বিজ্ঞান আকাশের শব্দ-ভাণ্ডারে যাহা শুনিতে পায় না গায়ক এবং সংগীতজ্ঞ তাহা

শোনেন। দেহ-বিজ্ঞান বা অস্থি-বিজ্ঞান জীবদেহের মধ্যে যে বস্তুর কোনও সন্ধান পায় না, চিত্রকর ও ভাস্কর তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া, তাহাতেই মজিয়া যান। জ্যোতির্বিদ্ গ্রহনক্ষত্র-খচিত, শত-রঞ্জিত গগন-পটে যে ছবি দেখেন না, কবি তাহা দেখিয়া বিভোর ও বিহ্বল হইয়া যান। এইরূপ ভাবে, এ সকল ক্ষেত্রে, চিত্রকর, গায়ক, ভাস্কর, ও কবির অন্তরের প্রস্ফুট রঞ্জিনী বৃত্তি, বর্ণের, স্বরের, জীবদেহের কিংবা বিশ্ব-প্রকৃতির মধ্যে যাহা কেবল বাহ্য ও বাহিরের পঞ্চেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য, তাহাকে আপনার রসের রং-এ রঞ্জিত করিয়া, তার অদ্ভুত রূপান্তর ঘটাইয়া থাকেন। এই বস্তুকেই সাহিত্যের রূপান্তর বলিতে পারা যায়।

আমাদের দেশের প্রাচীনেরা পঞ্চকোষের কথা কহিয়াছেন। প্রথম অন্নময় কোষ। আমরা আজিকালি যাহাকে জড়বিজ্ঞান বলি, ইংরাজিতে যাহাকে physico-chemical group of the sciences বলিতে পারা যায়, এই অন্নময়কোষই তার অধিকার। এই কোষের প্রতিষ্ঠা আমাদের পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়তে। তার উপরে বা ভিতরে প্রাণময় কোষ। এই প্রাণময় কোষেই আধুনিক জীববিজ্ঞান—ইংরাজীতে যাহাকে biological group of the sciences বলে,—তার অধিকার। এই কোষের প্রতিষ্ঠা আমাদের প্রাণানুভূতিতে। তারপর মনোময় কোষ, এই কোষের প্রতিষ্ঠা আমাদের মনোবৃত্তিতে; মনস্তত্ত্ব বা psychological group of the sciences-এর অধিকার এই কোষেতে। তার উপরে বা অভ্যন্তরে বিজ্ঞানময় কোষ। আমাদের অন্তরের যে বৃত্তির দ্বারা আমরা আমাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বহুত্বের মধ্যে একত্বের, অঙ্গের মধ্যে অঙ্গীর, অংশের মধ্যে অংশীর, বৈষম্যের মধ্যে সাম্যের প্রত্যক্ষ ও প্রতিষ্ঠা করিয়া থাকি, যে বৃত্তির দ্বারা, এক কথায়, আমরা যাবতীয় বিজ্ঞানাদি গড়িয়া তুলি, সেই বৃত্তিতে এই বিজ্ঞানময় কোষের প্রতিষ্ঠা। দর্শনের বা তত্ত্বজ্ঞানের (metaphysics বা philosophyর) অধিকার এই কোষে।

এই কোষ-চতুষ্টয়ের মধ্যে অন্নময় কোষ একান্ত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। রূপ-রস-শব্দ-স্পর্শাদি এই কোষের উপাদান। পঞ্চেন্দ্রিয়, পঞ্চতন্মাত্র ও পঞ্চমহাভূতের উপরে এই কোষ প্রতিষ্ঠিত। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গ্রামকে ধরিয়া এই অন্নময়কোষের জ্ঞান-লাভ সম্ভব। এই জন্য কোষ-পঞ্চকের মধ্যে এই অন্নময় কোষ সর্ব্বাপেক্ষা স্থূল। ইহা জীবের বাহ্যতম আবরণ।

তার পর প্রাণময় কোষ। প্রাণ-বস্তুর প্রমাণ ইন্দ্রিয়ানুভূতি, সত্য; কিন্তু ইন্দ্রিয়গ্রাম এই প্রাণ যে আছে, কেবল তাহাই বলিতে পারে; এই প্রাণের স্বরূপ কি, তাহা বলিতে পারে না। এই প্রাণ-বস্তু ইন্দ্রিয় ও অতীন্দ্রিয়ের মধ্যবর্ত্তী প্রথম সোপান-রূপ হইয়া আছে। এই প্রাণের এক দিকে ইন্দ্রিয়গ্রাম ও অন্য দিকে মন। প্রাণের এক প্রান্তে senses আর অন্য প্রান্তে psyche; এক দিকে বিষয়াপেক্ষী দর্শনাদি ইন্দ্রিয়, অন্য দিকে এ সকল ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা মন। ইন্দ্রিয়কে

ধরিয়া যেমন প্রাণের জগতে যাইয়া পড়ি, এই প্রাণকে ধরিয়া সেইরূপ মনোময় জগতে যাইয়া উপস্থিত হই। এই জন্যই অন্নময় কোষ ও মনোময় কোষের মধ্যে এই প্রাণময় কোষ সেতুস্বরূপ হইয়া আছে।

তার পর মনোময় কোষ। এই মনোময় কোষেই আমরা সর্ব্বপ্রথমে ইন্দ্রিয়াতীত রাজ্যের সাড়া পাই। ইন্দ্রিয়ের প্রতিষ্ঠা এক দিকে অন্নেতে, অর্থাৎ পঞ্চতন্মাত্রে, ও পঞ্চমহাভূতে; আর অন্য দিকে প্রাণে। ইন্দ্রিয়ের আশ্রিত অন্নময় জগৎ, ইন্দ্রিয়ের আশ্রয় প্রাণ। ইন্দ্রিয়ের প্রতিষ্ঠা প্রাণে, প্রাণের প্রামাণ্য ইন্দ্রিয়ে। ইন্দ্রিয় যেমন বিষয় ছাড়া নহে, প্রাণ সেইরূপ ইন্দ্রিয় ছাড়া নহে। কিন্তু মনের মধ্যে বিষয়ের অবর্ত্তমানেও ইন্দ্রিয়রসের প্রত্যক্ষ ও অনুভব হয়। মন অনুপস্থিতকে উপস্থিত, অবর্ত্তমানকে বর্ত্তমান, অপ্রত্যক্ষকে প্রত্যক্ষ বলিয়া ধারণ করিতে পারে। এই জন্য মন ইন্দ্রিয়ানুভূতির স্মৃতি বা আভাসমাত্র গ্রহণ করিয়া, আপনার মধ্যে বিবিধ বিষয়ের সৃষ্টি করিতে পারে। এই জন্যই, ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে অতি ঘনিষ্ঠযোগে আবদ্ধ হইলেও, মনের এমন শক্তি আছে, যাহাতে ইন্দ্রিয়ের অপ্রত্যক্ষ বিষয়কে সে আপনার মধ্যে প্রত্যক্ষ করিতে পারে এবং পূর্ব্ব-প্রত্যক্ষ বিবিধ ইন্দ্রিয়ানুভবকে মিলাইয়া মিশাইয়া, অভূতপূর্ব্ব বস্তুর সৃষ্টি করিয়া থাকে। নৃ-শৃঙ্গ, আকাশ-কুসুম এই সকলই এই জাতীয় মানস-সৃষ্টি। ইংরাজিতে এ সকলকে fancy creation বলা যায়।

এই জাতীয় মানস-সৃষ্টিতেও এক প্রকারের রূপান্তর হয় বটে, কিন্তু এখানে যে রূপান্তরের কথা হইতেছে, যে রূপান্তর রস-সাহিত্যের প্রাণস্বরূপ, ইহা সে জাতীয় রূপান্তর নহে। ফলতঃ ইহাকে রূপান্তর না বলিয়া রূপ-মিশ্রণ বলা যাইতে পারে। কেহ কখনও মানুষের শিং দেখে নাই, তবে অন্য জন্তুর শিং দেখিয়াছে। সে সকল জন্তুতে যে শিং দেখা গিয়াছিল, সেই শিংকে মানুষের মাথায় আনিয়া বসাইয়া নৃ-শৃঙ্গের সৃষ্টি হইয়াছে। মানুষ এবং শৃঙ্গ দুই ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ বস্তু। নৃ-শৃঙ্গে এই দুই ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ বস্তুর নিজের বিশিষ্ট রূপের কোনও বিপর্য্যয় বা পরিবর্ত্তন ঘটে না। মানুষ মানুষই থাকিয়া যায়, আর শৃঙ্গও শৃঙ্গই থাকিয়া যায়, মানুষও বদলায় না, শৃঙ্গও বদলায় না। কেবল যাহা ভিন্ন স্থানে, ভিন্ন সম্বন্ধে ছিল, তাহাকে এক করিয়া এই নৃ-শৃঙ্গের উৎপত্তি হইয়াছে। আকাশ-কুসুম সম্বন্ধেও তাহাই ঘটে। আকাশও প্রত্যক্ষ বস্তু, কুসুমও প্রত্যক্ষ বস্তু। কিন্তু আকাশে কুসুম ফোটে না, গাছে বা লতাতেই ফোটে। আকাশ-কুসুমে আকাশে ও কুসুমের মধ্যে যে সম্বন্ধের প্রতিষ্ঠা হয়, তাহাই অদৃষ্ট-পূর্ব্ব। এই সম্বন্ধ দুইটি পূর্ব্ব-দৃষ্ট বস্তুর মিলনে রচিত। এই সম্বন্ধ বাস্তব নহে, কল্পিত। এই সম্বন্ধে আকাশের আকাশত্ব বা কুসুমের কুসুমত্ব, দু'য়ের কোনটাই বদ্‌লাইয়া যায় না, অথচ একটা নূতন কল্পিত বস্তুর সৃষ্টি হয়। এই কারণে এখানে রূপান্তর শব্দের প্রয়োগ সত্য হইবে না।

যেমন মনোময় কোষে সত্য রূপান্তর ঘটে না, সেইরূপ বিজ্ঞানময় কোষেও ঘটে না। মন ইন্দ্রিয়ানুভূতি লইয়াই কারবার করে। ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ বিষয় লইয়াই

মন আপনার যাবতীয় মানস-সৃষ্টির প্রতিষ্ঠা করে। বিজ্ঞান সেইরূপ অতীন্দ্রিয় তত্ত্বে বিহার করে। বহুত্বের মধ্যে একত্ব দর্শন করিতে গেলে, এই বহুত্বের প্রত্যক্ষ রূপ-রসাদির বৈচিত্র্যকে উপেক্ষা করিয়া, এ সকলের মধ্যে ও অন্তরালে অপ্রত্যক্ষ তত্ত্ব-বস্তুর ধ্যান করিতে হয়। মনোময় কোষের আশ্রয়—রূপ ; বিজ্ঞানময় কোষের আশ্রয়—স্বরূপ। রূপ বৈচিত্র্যের প্রকাশ করে। জগতের বহুত্ব রূপ লইয়া। অরূপই কেবল এই বৈচিত্র্য ও এই বহুত্বকে নিরস্ত করিয়া, নিরাকার ও শূন্যে বিশিষ্টতা ও এই বিচিত্রতা-পূর্ণ এই বিশ্বের একত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়া থাকে। বিজ্ঞান যে একত্ব প্রতিষ্ঠিত করে, তাহার উপলব্ধি করিতে হইলে, সকল রূপকে নিরস্ত করিতে হয়। অথচ রূপকে রাখিয়াই কেবল রূপান্তর ঘটাইতে পারা যায়, রূপকে বিনাশ করিয়া নহে। কিন্তু একত্বে, নিরাকারে, নির্ব্বিশেষে, কোনও রূপের প্রতিষ্ঠা হয় না, হইতেই পারে না। একত্বে যখন রূপের প্রতিষ্ঠা হয়, তখনই সে এক বহু হয়। নিরাকারে যখন রূপের প্রকাশ হয়, তখনই তাহা সাকার হইয়া যায়। নির্ব্বিশেষে যখন বৈশিষ্ট্যের প্রতিষ্ঠা হয়, তখন তাহা আর নির্ব্বিশেষ থাকে না। অতএব রূপের প্রতিষ্ঠা অসম্ভব বলিয়া, বিজ্ঞানময়-জগতে—যেখানে কেবল সত্তা বা Being মাত্র আছে, কিন্তু প্রকাশ বা Doing নাই, সেখানে—রূপান্তর হয় না, হইতে পারে না।

কিন্তু এখানেও কবি-কল্পনা নানা প্রকারের রূপের সৃষ্টি করিতে গিয়াছে। বেদের পুরুষ-সূক্তে তার প্রমাণ পাই :—

"পুরুষের সহস্র মস্তক, সহস্র চক্ষু ও সহস্র চরণ। তিনি পৃথিবীকে সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত করিয়া দশ অঙ্গুলি পরিমাণ অতিরিক্ত হইয়া অবস্থিত থাকেন।

"যাহা হইয়াছে, অথবা যাহা হইবেক, সকলি সেই পুরুষ। তিনি অমরত্ব-লাভে অধিকারী হয়েন, কেন না, তিনি অন্ন-দ্বারা অতিরোহণ করেন"।

"তাঁহার এতাদৃশ মহিমা, তিনি কিন্তু ইহা অপেক্ষাও বৃহত্তর। বিশ্ব-জীবসমূহ তাঁহার একপাদ মাত্র, আকাশে অমর অংশ তাঁহার তিন পাদ।

"পুরুষ আপনার তিন পাদ লইয়া উপরে উঠিলেন। তাঁহার চতুর্থ অংশ এই স্থানে রহিল। তিনি তদনন্তর ভোজনকারী ও ভোজন-রহিত (চেতন ও অচেতন) তাবৎ বস্তুতে ব্যাপ্ত হইলেন।

"তাঁহা হইতে বিরাট্ জন্মিলেন, এবং বিরাট্ হইতে সেই পুরুষ। তিনি জন্ম-গ্রহণপূর্ব্বক পশ্চাদ্ভাগে ও পুরোভাগে পৃথিবীকে অতিক্রম করিলেন।"—ইত্যাদি।

এখানে কবি এক অদ্ভুত পুরুষ কল্পনা করিয়াছেন। নিরাকার, সত্তামাত্র জ্ঞেয়, পরম-তত্ত্ব কি বস্তু, ইহা ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ না হইলেও সমাধি-প্রত্যক্ষ বটে। এই বিচিত্রতাময় জগতের মূলে যে একটা একত্ব আছে, ইহা আমরা বুঝি। এই একত্বের উপলব্ধি লাভ করিতে হইলে, আমাদিগকে মন হইতে, চিন্তা হইতে, ধ্যান ও জ্ঞান হইতে, জগতের যাবতীয় রূপ-রসাদির বৈচিত্র্য, বৈশিষ্ট্য, ও বহুত্বকে দূর করিয়া দিতে হয়। রূপের অনুভবের সঙ্গে এই একের অপরোক্ষ উপলব্ধি সম্ভব নহে।

"নেতি" "নেতি" বলিয়া ব্যতিরেকী পন্থার অনুসরণেই এই একত্বের উপলব্ধি করিতে হয়। আর যখন অন্বয়ী-পন্থাতে ইহার অনুভব লাভ করিতে হয়, তখন—"এই সকল রূপের মধ্যে সেই অরূপ আছেন," "এই সকল বিচিত্রতার অন্তরালে সেই মহান্ এক রহিয়াছেন"—এই ভাবে; অথবা "তাঁহারই দ্বারা এই সকল রূপের প্রকাশ হইতেছে," "তাঁহারই শক্তিতে ও জ্ঞানে বিশ্বের অশেষ বৈচিত্র্য স্থিতি করিতেছে."—এই রূপে তাঁহার চিন্তা বা ধ্যান করিতে হয়।

এইরূপ ধ্যানেও বস্তুর রূপান্তর হয় বটে। কিন্তু হয়,—বিজ্ঞানময় কোষে নহে, কিন্তু আনন্দময় কোষে। এই ধ্যান করিতে করিতে চিত্তে যে সকল ভাব উৎসারিত হয়, সেই ভাবের রং পড়িয়া তখন বিশ্বের রূপ বদ্‌লাইয়া যায়। তখন, সেই ভাবের অঞ্জনে রঞ্জিত-চক্ষু সাধক—

"স্থাবর জঙ্গম দেখে,
দেখে না তারা মূর্ত্তি
যাহা নেত্রে পড়ে,
হয় ইষ্টদেব স্ফূর্ত্তি।"

নিরাকারের সাধকের অধিকার মুখ্যতঃ বিজ্ঞানময় কোষে। কিন্তু যদিও কোষ-পঞ্চকে আনন্দময় কোষ বলিয়া একটি পৃথক্ কোষের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, আনন্দ-বস্তু সকল কোষকে ছাইয়া, সকল কোষকে ছাপিয়া আছে। অন্ন, প্রাণ, মন, বিজ্ঞান—সকলই আনন্দময়। জড়ে, জীবে, মননে, চিন্তনে, ধ্যানে, আনন্দ সর্ব্বত্র উৎসারিত, সর্ব্বত্র উচ্ছ্বসিত। এইজন্য নিরাকারের ধ্যানে যখন এই আনন্দ-রস উথলিয়া উঠে, তখন নিরাকারেরও "আকার" বদ্‌লাইয়া যায়; "অরূপে" রূপ ফুটিয়া উঠে। তখন—

"সর্ব্বজীবে হয়,
ব্রহ্মভাবোদয়,
চিদানন্দ জেগে উঠে।"

কিন্তু এইটি হয়, আনন্দ-রস-প্রভাবে। সকল ক্ষেত্রেই এই আনন্দ-বস্তু বা রস-বস্তু আপনার রসান মাখাইয়া বস্তুর রূপান্তর ঘটায়। এই রূপান্তরকেই সাহিত্যের রূপান্তর বলা যায়।

[নারায়ণ, ১৩২৪]

কবি-প্রসঙ্গ

রামপ্রসাদ

পূর্ণচন্দ্র বসু

১)

পৃথিবীর সাহিত্য-সংসারে পারমার্থিক কবিতায় রামপ্রসাদের পদাবলী এক অপূর্ব্ব পদার্থ। কোন জাতীয় সাহিত্য-ভাণ্ডারে সেরূপ রত্নরাজি বিরাজিত নাই। প্রসাদী পদাবলীর প্রকৃতি ও বিশেষ ধর্ম্ম আর কোন প্রকার ধর্ম্ম-সঙ্গীতে বিদ্যমান দেখা যায় না। রামপ্রসাদ সেন এক স্বতন্ত্র ধরণ অবলম্বন করিয়াছিলেন। কারণ, প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তিমাত্রেই আপন আপন নূতন পথ আবিষ্কার করিয়া লয়েন। তাঁহা-দিগের হৃদয়-ভাব ও চিন্তা এক নূতন পথে প্রবাহিত হয়। সুতরাং সে সমস্ত ভাব ও চিন্তা এক নূতন ভাবে বিকশিত হইয়া পড়ে।

রামপ্রসাদ সেনের কল্পনা অতি তেজস্বিনী ছিল। তাঁহার কল্পনা সম্মুখে যাহা প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাই গ্রহণ করিয়া সুবর্ণে মণ্ডিত করিয়াছে। তাঁহার কল্পনা পার্থিব সুন্দর পদার্থের অন্বেষণে ব্যস্ত হয় নাই; দেখে নাই,—কোথায় কুসুমিত কুঞ্জবন, স্বচ্ছ সরোবর, ভীষণ জলপ্রপাত, প্রকাণ্ড পর্ব্বতমালা ও মনোহর শস্যক্ষেত্র। সে কল্পনা সম্মুখে যাহাই দেখিয়াছে, তাহাই অবলম্বন করিয়া একটি একটি মনোহর সঙ্গীত প্রস্তুত করিয়াছে। রামপ্রসাদ যখন যেখানে উপস্থিত, সেই স্থানের বিষয় তাঁহার কল্পনাকে অমনি আকৃষ্ট করিয়াছে। রামপ্রসাদের কল্পনা যেন নিয়তই জাগরিত রহিয়াছে। জাগরিত থাকিয়া যাহা কিছু দেখিয়াছে, অমনি তাহাকে সাত্ত্বিকভাবে পরিপূর্ণ করিয়াছে; পৃথিবীর সামান্য ধূলিরাশিকেও সুবর্ণে মিশ্রিত করিয়াছে। রামপ্রসাদ যে দৃশ্যের সম্মুখে উপস্থিত, তাহাতে যে কেবল আপন-হৃদয়ের সাত্ত্বিকভাব আরোপিত করিয়াছেন, এমত নহে; তাহাকে প্রধানতঃ কবিত্বে পরিপূর্ণ করিয়াছেন। প্রকৃতি কবির চক্ষে কিরূপ দেখায়, তাহাই যদি বিকশিত করা কবিত্বের ধর্ম্ম হয়, রামপ্রসাদের সঙ্গীতে তবে কবিত্বের কিছুই অভাব নাই। রামপ্রসাদের হৃদয় ধর্ম্মপরায়ণ ছিল, তাঁহার মন কল্পনায় পরিপূর্ণ ছিল। রামপ্রসাদ যাহা দেখিতেন, প্রথমে তাঁহার হৃদয় তাহাতে আকৃষ্ট হইত; হৃদয়ের আকর্ষণে তাহাতে ধর্ম্ম-ভাব প্রতিফলিত হইত; তৎপরে কল্পনার উজ্জ্বল অলঙ্কারে তাহা বিভূষিত হইত। যে ক্ষুদ্র জগতে রামপ্রসাদ বাস করিতেন, তাহার চারিদিক্‌স্থ যাবতীয় পদার্থকে তিনি সাত্ত্বিকভাবের কল্পনা-দ্বারা পরিপূর্ণ করিয়াছিলেন। তিনি প্রকৃত জগতের উপর আর একটি নূতন জগৎ সৃষ্টি করিয়াছিলেন। রজতময়ী পার্থিব প্রকৃতিকে তিনি কনকভূষণে মণ্ডিত করিয়াছিলেন। কঠিন মৃত্তিকাময় জগৎকে তিনি ইন্দ্রজালে পরিপূর্ণ করিয়াছিলেন। তিনি প্রকৃতির

কর্ণকুহরে এক নূতন সঙ্গীত-ধ্বনির অমৃত বর্ষণ করিয়াছিলেন। প্রকৃতিও তাঁহার নূতন গীতে বিমুগ্ধ হইয়াছিল; বিমুগ্ধ হইয়া সেই গান চারিদিকে প্রতিধ্বনিত করিয়াছিল। তিনি যাবতীয় সামান্য পদার্থকে ধর্ম্ম-গান সঙ্গীত করিতে শিক্ষা দিয়াছিলেন। আজিও আমরা সেই সমস্ত যৎসামান্য পদার্থের সমীপে উপনীত হইয়া রামপ্রসাদের সঙ্গীতে যেন উদ্বোধিত হইয়া গাহিয়া উঠি,—

"মা আমায় ঘুরাবে কত—
কলুর চোক-ঢাকা বলদের মত?
ভবের গাছে বেঁধে দিয়ে মা, পাক দিতেছ অবিরত।
তুমি কি দোষে করিলে আমায়, ছ'টা কলুর অনুগত?
মা শব্দ মমতাযুত, কাঁদ্‌লে কোলে করে সুত।
দেখি ব্রহ্মাণ্ডেরই এই রীতি মা, আমি কি ছাড়া জগত?
দুর্গা দুর্গা দুর্গা ব'লে ত'রে গেল্ পাপী কত।
একবার খুলে দে মা চ'খের ঠুলি, দেখি তোমার অভয় পদ।
কুপুত্র অনেকেই হয় মা, কুমাতা নয় কখন ত।
রামপ্রসাদের এই আশা মা, অন্তে থাকি পদানত॥"

রামপ্রসাদের সঙ্গীতাবলী তাঁহার সাধকত্বের ও কবিত্বের অমোঘ নিদর্শন। রসাত্মক বাক্যই যদি কাব্যের লক্ষণ হয়, তবে রামপ্রসাদের সঙ্গীতাবলী একখানি চমৎকার কাব্য। বাঙ্গালা ভাষায় তাহা এক অদ্বিতীয় কাব্য। সে কাব্য শান্তরসের প্রস্রবণ এবং সে প্রস্রবণ কল্পনা-লতিকায় সুশোভিত। রামপ্রসাদ হৃদয়কে মাতাইয়া তোলেন তাঁহার ভক্তিরসে। তাঁহার সঙ্গীতাবলী যে ভক্তিরসের আধার, তাহা বিষয়ীর রাজসিক ভক্তি নহে,—যে রাজসিক ভক্তি কেবল বাহ্য জাঁকজমকে প্রকাশিত হইতে চায়; কিন্তু তাহা প্রকৃত সাধকের সাত্ত্বিক ভক্তি। সেই সাত্ত্বিক ভক্তির সহিত বিষয়িগণের রাজসিক ভক্তির কিরূপ প্রভেদ, তাহা এই সঙ্গীতে প্রতীত হইতেছে,—

"মন, তোর এত ভাবনা কেন?
জয় কালী ব'লে বস্ না ধ্যানে।
জাঁকজমকে ক'রলে পূজা, অহঙ্কার হয় মনে মনে,
আমি লুকিয়ে মায়ের ক'রব পূজা, জানবে নাকো জগজ্জনে।
ধাতু পাষাণ মাটির মূর্ত্তি, কাজ কি রে তোর সে গঠনে?
আমি মনোময় প্রতিমা গ'ড়ে, বসা'ব হৃদ্-পদ্মাসনে।
আলোচাল আর পাকা কলা, কাজ কি সে তোর আয়োজনে?
আমি ভক্তি-সুধা মাকে দিয়ে, তৃপ্ত হ'ব মনে মনে।
মেষ মহিষ ছাগ-আদি, কাজ কি রে তোর বলিদানে?
জয় কালী ব'লে দাও রে বলি, এ দেহের ষড়্ রিপুগণে।
কাজ কি রে তোর বিল্বদলে, কাজ কি রে তোর গঙ্গাজলে?
এ দেহে আছে সহস্র দল, দাও রে মায়ের শ্রীচরণে।

ঝাড় লণ্ঠন বাতির আলো, কাজ কি রে তোর রোশনায়ে ?
এ দেহে আছে জ্ঞান-দীপ, জ্ব'লতে থা'কবে নিশি দিনে।
রামপ্রসাদ বলে, ঢাকে ঢোলে, কাজ কি তোর সে বাজনে ?
জয় কালী ব'লে দাও করতালি, মন রেখে মায়ের শ্রীচরণে ॥"

রামপ্রসাদের এই সাত্ত্বিক ভক্তি অনেক স্থলেই বড় সুন্দর লাগে। তাহার শান্তরসে মন আর্দ্র হইয়া যায়। তাই, রামপ্রসাদের গীতাবলী গাহিবামাত্র মনকে ক্ষণিকের জন্যও প্রমত্ত করে।

রামপ্রসাদের এই ভক্তি-প্রগাঢ়তা বেদান্ত ও আগমের গাম্ভীর্য্যে পরিপূর্ণ। এক এক স্থানে তন্মধ্যে বেদান্ত ও আগমের নিগূঢ় তত্ত্বসকল প্রস্ফুটিত হইয়া তাঁহার সঙ্গীতকে আরও গম্ভীর করিয়া তুলিয়াছে। যাঁহারা সে গভীরতায় ডুবিতে পারেন, তাঁহারা সেই সঙ্গীতের রসাস্বাদনে দ্বিগুণ মোহিত হয়েন। দেখেন, কত ভাব কত অল্প কথায় কেমন সুন্দরভাবে প্রকটিত। সেই ভাবের সৌন্দর্য্য নানা অলঙ্কার-ভূষণে চতুর্গুণ বৰ্দ্ধিত। (রূপক-শোভা নহিলে কি তত দূর গভীর ভাবের সুন্দর বিকাশ হয় ? রূপক-শোভা ধারণ করাতেই তাহাদের গাম্ভীর্য্য বর্দ্ধিত হইয়াছে।) গভীরকে আরও গভীর করিয়া তুলিয়াছে। উপমার সৌন্দর্য্যে ভাব-কুসুমাবলি কান্তি ধারণ করিয়াছে। সেই কান্তি-মধ্যে তাহাদের গাম্ভীর্য্য প্রকাশিত। প্রকাশিত কি লুক্কায়িত, তত বুঝা যায় না। অৰ্দ্ধ প্রকাশিত, অৰ্দ্ধ লুক্কায়িত। কি সুন্দর শোভা! সঙ্গীতে এত সুন্দর শোভা কোথাও নাই ; সেই সুন্দর শোভায় ভাব-কুসুমাবলি প্রস্ফুটিত। ভক্তি-রসসৌরভে দিক্ আমোদিত। ধৰ্ম্মভাবে মন পুলকিত। শান্তরসে চিত্ত বিগলিত। যে গীতে চিত্ত এত বিগলিত হয়, সে গীতের শক্তি অতি অসাধারণ বলিতে হইবে। শক্তির শক্তিতে সে শক্তি পরিপূর্ণ। ভক্তির শক্তিতে সে শক্তি পরিপূর্ণ। মুক্তির শক্তিতে সে শক্তি পরিপূর্ণ। তাই তাহার এত অসাধারণ শক্তি!

রামপ্রসাদ শক্তির উপাসক ছিলেন ; সেই শক্তি শ্যামা, সেই শক্তি শ্যাম। শ্যাম ও শ্যামা একই শক্তি ; একই শক্তি এই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়-কর্ত্রী। এই শক্তির প্রকৃত জ্ঞান বিষয়ী লোকের হওয়া বড়ই কঠিন। মায়া-মোহ না কাটাইতে পারিলে এবং বিষয়-বৈরাগ্যের উদয় না হইলে প্রকৃত ঈশ্বর-জ্ঞান হয় না। হিন্দুশাস্ত্রে ভক্তি-সাধন-পথের অনেক স্তর আছে। যে আধ্যাত্মিক স্তরে আসিয়া জীব মায়া-মোহের হাত হইতে মুক্তি-লাভ করিতে পারেন, সেই মুক্তির স্তরে আসিয়া তাঁহার ভগবৎ-প্রত্যক্ষ হইবার সম্ভাবনা। এই ভগবৎ-প্রত্যক্ষ-পক্ষে ভক্ত যত নিকটবর্ত্তী হয়েন, তদনুসারে তাঁহার সালোক্য এবং সামীপ্য-মুক্তি সম্ভাবিত হয়। মনুষ্যত্ব হইতে মুক্ত হইয়া যে লোকে জীব দেবত্বে উপনীত হয়েন, সংসার-মায়া হইতে বিমুক্ত হইয়া দেব-লোকে আসেন, সেই লোকে তাঁহার সালোক্য-মুক্তি হয়। দেবগণের সহিত এক লোকে থাকার নাম সালোক্য। এই দেবত্ব-লাভের পর সূক্ষ্মদৃষ্টি-প্রভাবে ভক্ত যত ভগবদ্দর্শনের সমীপবর্ত্তী হইয়া একেবারে ঈশ্বরের সম্যক্ ঐশ্বর্য্য-মূর্ত্তি দেখিতে পান,

ততই তাঁহার সামীপ্য-মুক্তি সম্ভাবিত হয়। এই ঐশ্বর্য্য-মূর্ত্তি তেমনই প্রত্যক্ষ হয়, যেমন অর্জুনের দিব্যচক্ষে প্রত্যক্ষ হইয়াছিল। সামীপ্য-মুক্তি লাভ হইলে যোগীর সারূপ্য বা সার্ষ্টি মুক্তি হয়। এই আধ্যাত্মিক স্তরে আসিয়া যোগী ঈশ্বরের স্বরূপ হইয়া তাঁহার ঐশ্বর্য্যভোগী হন। ঈশ্বরের সহিত সমান ঐশ্বর্য্যশালী হওয়ার নামই সার্ষ্টি বা সারূপ্য মুক্তি। যোগ-সাধন-দ্বারা এইরূপ যোগৈশ্বর্য্য-লাভে সমর্থ হওয়া যায়। এ সমস্ত মুক্তি লাভ করিয়া যোগী যে স্তরে আসিয়া দাঁড়ান, তৎপরে কেহ কেহ সেই ঐশ্বর্য্য-লাভেই অভিভূত হইয়া পড়েন, কেহ কেহ বা তৎপরে সাযুজ্য বা ঈশ্বরে লয়-মুক্তির প্রয়াসী হন। সাযুজ্য-মুক্তিলাভেও জীবের গুণভাব থাকে। কারণ, তখন সগুণ ভগবানের সহিত একীভূত ভাব ঘটে মাত্র। গুণভাব যত দিন থাকে, ততদিন জীবের সংসার-গতি নিবারিত হয় না। এই গুণভাবের একেবারে বিনাশ-সাধন না করিতে পারিলে নিস্ত্রৈগুণ্য হয় না; নিস্ত্রৈগুণ্য না হইলে ব্রহ্ম-পদ-লাভ হয় না। এই ব্রহ্ম-পদ-লাভের নামই মোক্ষ। নির্গুণত্ব হেতু জীবাত্মা নির্গুণ-ব্রহ্মে বিলীন হইয়া যান। গুণাতীত হইলে তবে জীবের সংসারগতি ঘুচে। সংসার-গতি না ঘুচিলে জীব পরমানন্দ অমৃতধাম লাভ করিতে পারে না। ভক্তি ও শক্তি-সাধন-পথে এতই আধ্যাত্মিক স্তর। এক এক আধ্যাত্মিক স্তর হইতে তদূর্দ্ধ স্তরে যাইতে পারিলে, নিম্ন স্তরের মুক্তি-সাধন হয়।

লোকে অগ্রে সাযুজ্য-মুক্তির প্রয়াসী হইতে পারে না। কারণ, সে ভাব অনেক দূরের কথা। সে-মুক্তির প্রয়াসী হইতে হইলে জীবকে সারূপ্য মুক্তি লাভ করিয়া অনেক দূর আধ্যাত্মিক স্তরে উপনীত হইতে হয়। রামপ্রসাদ যে আধ্যাত্মিক স্তরে উপনীত হইয়াছিলেন, সে স্তরে তিনি শুধু সালোক্যেরই প্রয়াসী হইয়াছিলেন। ভগবদ্দর্শন জন্য তিনি একান্ত লোলুপ হইয়াছিলেন। অভয়-পদ-লাভের জন্য তাঁহার একান্ত লালসা হইয়াছিল। ভক্তের প্রথম লালসাই এই। যে শক্তি লাভ করিতে পারিলে এই লালসা পূর্ণ হয়, অভয়-পদের দর্শন লাভ হয়, সেই শক্তি-সাধনার জন্য রামপ্রসাদ সংসার-বিরাগী হইয়াছিলেন। এই একান্ত লালসা তাঁহার অনেক সঙ্গীতে দেখিতে পাওয়া যায়। তদূর্দ্ধ আধ্যাত্মিক স্তরের আস্বাদ-গ্রহণ করিবার শক্তি তাঁহার জন্মে নাই। তথাপি রামপ্রসাদ যে, সে সকল মুক্তির কথায় একেবারে অনভিজ্ঞ ছিলেন, এমতও বোধ হয় না। লয়-মুক্তি পর্য্যন্তও যে তাঁহার এ যাত্রার আশা ছিল, তাহা তিনি,—

"মা, আমি তোমারে খাব।
তুমি খাও কি আমি খাই মা, এবার (এ যাত্রায়)
দুটার একটা ক'রে যাব।।" ইত্যাদি

এই গীতে প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। এই গীতে ব্রহ্মের সহিত বিলীন হইবার আশা বিলক্ষণ জানাইয়াছিলেন। আর এক গীতেও তাঁহার এই লয়-মুক্তি-জ্ঞান প্রতীত হইয়াছে। যখন তিনি পরলোক-তত্ত্বের মীমাংসায় গাহিয়া উঠিলেন,—

"বল দেখি ভাই, কি হয় ম'লে?"

তখন তিনি সেই পরলোক-তত্ত্বের মীমাংসায় জীবের সালোক্যাদি নানা গতি বর্ণন করিয়া, শেষে তাহার পরা গতির কথা বলিয়া গীত শেষ করিলেন। বলিলেন, যেরূপ "জলবিম্ব মিশায় জলে"—সেইরূপ জীবাত্মা পরমাত্মায় মিশিলে তখন তাহার পরলোক-গতি শেষ হয়। নহিলে রামপ্রসাদ বলিয়াছিলেন যে, যিনি যাহা বলেন, সে সকলই সত্য ; কোন মুক্তিই অসত্য নহে, কিন্তু সে সকল মুক্তি-লাভেও আত্মার পরলোক-গতি নিবারিত হয় না। মৃত্যুর পর আবার জন্ম, আবার মৃত্যু, আবার সংসার, আবার জন্ম। মৃত্যুর পর জীবের পরলোক এইরূপ চিরদিনই চলে। কিছুতেই তাহার সংসার-গতি নিবারিত হয় না। যতদিন আসক্তি ও কামনা থাকে, ততদিন সূক্ষ্মদেহ থাকে ; যতদিন সূক্ষ্মদেহ থাকে, ততদিন সংসার থাকে। অনাসক্ত হইলে যখন আত্মা নিষ্কাম হেতু বিদেহ হয়, তখন তিনি দেহাবরণ হইতে মুক্ত হইয়া ব্রহ্মে একেবারে মিশিয়া যান, তখন তাঁহার স্থূলদেহ পরিবর্জন বা মৃত্যুর পর আর লোকান্তর থাকে না। "যেমন জলবিম্ব মিশায় জলে" তেমনি জীবের শেষ হয়। যে ব্রহ্মসত্ত্ব হইতে আত্মার জীবত্ব ঘটিয়াছিল, সেই মহান্ ও অনন্ত ব্রহ্মসত্ত্বে তিনি আবার বিলীন হন। তখন তাঁহার আর জীবত্ব থাকে না। তাঁহার বিশেষ ভাব শেষ হইলে তিনি অবিশেষ ভাবে উপনীত হন। এই বিশেষ ভাবই জীবত্ব। জীবত্ব যতদিন আছে, ততদিন পরলোক আছে। পরলোকে যদি এই জীবত্বের নাশ না হয়, তবে আবার বিশেষ ভাব ঘটে। বিশেষ ভাব ঘটিলেই আবার মৃত্যু। অবিশেষ ভাবে উপনীত হইতে পারিলেই আত্মা অমৃত পদ লাভ করিতে পারেন। তখন এই আত্মার মৃত্যু-ভয়-নাশন প্রকৃত অভয় পদ লব্ধ হয়। তখন তিনি অবিশেষ পরমাত্মায় কিরূপ মিশিয়া যান?—

"যেমন জলবিম্ব মিশায় জলে।"

রামপ্রসাদ এই শক্তি-সাধন-পথে কেমন ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হইয়াছিলেন, তাহা তাঁহার গীতাবলীতে প্রকাশিত আছে। ভগবদ্ভক্তির যতই প্রগাঢ়তা জন্মিয়াছে, ততই তিনি এক এক ভাবে উপনীত হইয়া এক এক সঙ্গীত রচনা করিয়াছেন। তাঁহার ভক্তি-সাধনার প্রতিপদের চিহ্ন এই সঙ্গীত-মালা। সেই চিহ্ন-অনুসারে তাঁর সঙ্গীত-মালা গাঁথিতে পারিলে, ভক্তি-শাস্ত্রের এক রমণীয় রত্নমালা লাভ হয়। এই রত্নহারে তিনি শ্যামাসুন্দরীকে শোভিতা করিয়াছিলেন। ভক্ত ভিন্ন কি অন্য কেহ এ হার গাঁথিতে পারে? ভক্তি-রত্নমালায় মহাশক্তি ভগবতী সুশোভিতা।

সংসারে ঈশ্বর ভুলিয়া আত্ম-পূজা, সন্ন্যাসে সংসার ভুলিয়া ঈশ্বর-পূজা। যিনি এ দুয়ের সামঞ্জস্য করিয়া চলিতে পারেন, তিনিই মনু এবং গীতোক্ত গৃহস্থ-সন্ন্যাসী। যিনি সংসারে থাকিয়া তাহার পাপে পরিলিপ্ত না হন, যিনি উদাসীন হইয়াও সংসারী, তিনিই প্রকৃত ভক্তি-পথের পথিক। রামপ্রসাদের জীবনে এই দৃষ্টান্ত। তাঁহার সঙ্গীত-মধ্যেও এই ধর্ম্মের উপদেশ। তাঁহার গানে বিষয়ীর সমুদয় ভাব ; কিন্তু বিষয়ীর ভাব-মধ্যেও বৈরাগ্য। ঘোর বিষয়ীর হৃদয়ে যদি বৈরাগ্য ও ধর্ম্মানুরাগ সঞ্জাত হয়, তিনি যে ভাবে গান গাহিবেন, রামপ্রসাদ সেই ভাবে গান গাহিয়া গিয়াছেন। তিনি

সমুদয় বিষয়-সামগ্রীকে ঈশ্বর-ভাবে পূর্ণ করিয়াছেন। সমুদয় শিশু তাঁহার নিকট কালী-নাম লেখা। ভক্তিময়ী রাধিকার চক্ষে যেমন সমুদয় বৃন্দাবন কৃষ্ণময়, তাঁহার শ্রবণে বংশীধ্বনিও যেমন রাধাময়, তেমনি রামপ্রসাদের ভক্তিতে সর্ব্বসংসার তারাময়। সর্ব্বসংসার তাঁহাকে ভক্তি-পথে আহ্বান করিতেছে। সর্ব্বসংসার তাঁহার নিকট ভক্তি-গীত গাহিতেছে। এই জন্য তাঁহার গীতাবলী কি বিরাগী, কি বিষয়ী, সকলেরই মনোজ্ঞ। বিষয়ী যখন বৈরাগ্যে ও ভক্তিভাবে পূর্ণ হয়েন, তখন তিনি রামপ্রসাদের গীত গাহিয়া বসেন ; আবার বিরাগী যখন বিষয়ের দিকে দৃষ্টিপাত করেন, তখন তিনি প্রসাদী পদাবলী গাহিয়া উঠেন। এই জন্য রামপ্রসাদ সর্ব্বজনমনোরঞ্জন। ভিখারী তাঁহার বৈরাগ্যে পরিতৃপ্ত হইয়া তদীয় সঙ্গীত-সুধা পান করেন, বৃদ্ধজনগণ ভক্তিভাবে গদ্‌গদ হইয়া তদীয় সঙ্গীতামৃতের রসাস্বাদ করিতে চাহেন ; এ দিকে তরুণবয়স্কেরা তাঁহার কবিত্বে বিমুগ্ধ হইয়া তাঁহার সঙ্গীত-রসে নিমগ্ন হয়েন। এইজন্য যেমন রামপ্রসাদের গীতাবলী বঙ্গদেশে সুপ্রচলিত,—এমত আর কাহারও নহে।

রামপ্রসাদের সঙ্গীতে যেমন, এমন আর কোন জাতীয় ধর্ম্ম-সঙ্গীতে, সাধুজনের মৃত্যুর প্রতি নির্ভয়তা—সুন্দর, সরল অথচ সংসাহসপূর্ণ ভাষায় পরিব্যক্ত হয় নাই। রামপ্রসাদের গীতে কেমন এক সাহসিকতা ও নির্ভীকতা আছে, যাহা কোন কবির ভাষায় দেখা যায় না। অথচ সঙ্গীতের পদগুলি নিতান্ত সরল। সেই সরল পদ-মধ্য হইতে যেন রামপ্রসাদের অন্তর্ব্বল প্রকাশিত হইতেছে—রামপ্রসাদের তেজ, ধর্ম্মের এবং সাধু-জীবনের বল-দর্প ও সাহস প্রকাশিত হইতেছে। পদগুলি পড়িলে বোধ হয়, যেন রামপ্রসাদ ত্রিসংসার পরাজিত করিয়াছেন। কিন্তু আশ্চর্য্য এই, এত সাহস, এত বল, এমত সামান্য ভাষায় কেমন প্রকাশিত হইয়াছে! বাস্তবিক, রামপ্রসাদের বাগ্‌ভঙ্গী অতি চমৎকার ; আর কোন কবির ভাষায় সেরূপ বাগ্‌ভঙ্গী দেখা যায় না। মৃত্যুকে তুচ্ছ-জ্ঞান কেন, দেবতাকেও তিনি সাধন-বলে, এবং সাধু-জীবনের সৎসাহসে পূর্ণ হইয়া, সন্তান যেমন জনক-জননীকে নিতান্ত আপনার ভাবিয়া বলদর্পিত বাক্যে উক্তি করে, তেমনি বল-দর্পে সম্বোধন করিয়াছেন। যে গীতগুলি এই প্রকার ধর্ম্ম-সাহসে পরিপূর্ণ, সেই গীতগুলি গাহিবার সময়ে আমরাও যেন তদ্রূপ সাহসে পূর্ণ হই, দেবগণকে একবার আপনার জ্ঞান করি, মৃত্যুকে হেয়-জ্ঞান হয়, এবং দেব-ভাব অন্তরে উদ্রিক্ত হইয়া পশু-ভাবকে বিতাড়িত করিয়া দেয়। তখন মনে হয়, আমরা দেবতার সন্তান, স্বর্গধাম আমাদিগের স্বদেশ, মৃত্যু তাহার সোপান। তবে মৃত্যুকে ভয় কি? দেব-অসি করে ধারণ করিয়া, মাতৃসদৃশ সমগ্র পাপবৈরী ছেদন করিতে পারিলে শিবও আপন বক্ষ পাতিয়া আমাদিগকে স্থান দান করিবেন। তখন মনে-মনে আর একবার আমরা শ্যামাপূজা করি, শক্তির উপাসক হই। রামপ্রসাদের হৃদয়-ভাব আমাদের হৃদয়ে সমুদিত হয়। তাঁহার হৃদয় আসিয়া অমনি আমাদের হৃদয়ে মিলিয়া যায়। তখন আমরা শিবশঙ্করীকে দেব-ভাবে পর্য্যবেক্ষণ করি। তাহাতে ঐশ্বরিক শক্তি দেখি। তাহাতে মানবীয় দেব-ভাব দেখি। তাহাতে ধর্ম্মের জয় দেখি, তাহাতে

স্ত্রীজাতির ভক্তি-ভাবের প্রাবল্য দেখি। শান্তশীল শিবের হৃদয় হইতে কালীরূপী শক্তি উদ্ভূত দেখি। দেবশক্তি কেমন প্রবলা, তাহা ধর্ম্মের অসি ও পাপবৈরগণের মুণ্ডমালায় প্রতীত করি। তখন হৃদয় কালীময় হয়, শক্তিতে পরিপূর্ণ হয়। ভবের ঐশ্বর্য্য, ধর্ম্মের শান্তিভাব, শক্তিরই পদতলে। যাঁহার ধর্ম্মশক্তি আছে, সম্পদ্, শান্তি ও সুখ তাঁহার পদতলে।

[আর্য্যদর্শন, ১২৮২]

দীনবন্ধু মিত্র

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

যে বৎসর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের মৃত্যু হয়, সেই বৎসর মাইকেল মধুসূদন দত্ত-প্রণীত 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য' 'রহস্যসন্দর্ভে' প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়। ইহাই মধুসূদনের প্রথম বাঙ্গালা কাব্য। তাহার পর-বৎসর দীনবন্ধুর প্রথম গ্রন্থ 'নীলদর্পণ' প্রকাশিত হয়।

সেই ১৮৫৯।৬০ সাল বাঙ্গালা সাহিত্যে চিরস্মরণীয়—উহা নূতন-পুরাতনের সন্ধিস্থল। পুরানো দলের শেষ কবি ঈশ্বরচন্দ্র অস্তমিত, নূতনের প্রথম কবি মধুসূদনের নবোদয়। ঈশ্বরচন্দ্র খাঁটি বাঙ্গালী, মধুসূদন ডাহা ইংরেজ। দীনবন্ধু ইঁহাদের সন্ধিস্থল। বলিতে পারা যায় যে, ১৮৫৯।৬০ সালের মত দীনবন্ধুও বাঙ্গালা কাব্যের নূতন-পুরাতনের সন্ধিস্থল।

দীনবন্ধু ঈশ্বর গুপ্তের একজন কাব্য-শিষ্য। ঈশ্বরচন্দ্রের কাব্য-শিষ্যদিগের মধ্যে দীনবন্ধু গুরুর যতটা কবি-স্বভাবের উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন, এত আর কেহ নহে। দীনবন্ধুর হাস্যরসে যে অধিকার, তাহা গুরুর অনুকারী। বাঙ্গালীর প্রাত্যহিক জীবনের সঙ্গে দীনবন্ধুর কবিতার যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, তাহাও গুরুর অনুকারী। যে রুচির জন্য দীনবন্ধুকে অনেকে দূষিয়া থাকেন, সে রুচিও গুরুর।

কিন্তু কবিত্ব-সম্বন্ধে গুরুর অপেক্ষা শিষ্যকে উচ্চ আসন দিতে হইবে। ইহা গুরুরও অগৌরবের কথা নহে। দীনবন্ধুর হাস্যরসে অধিকার যে ঈশ্বর গুপ্তের অনুকারী বলিয়াছি, সে কথার তাৎপর্য্য এই যে, দীনবন্ধু ঈশ্বর গুপ্তের সঙ্গে একজাতীয় ব্যঙ্গ-প্রণেতা ছিলেন। আগেকার দেশীয় ব্যঙ্গ-প্রণালী এক জাতীয় ছিল, এখন আর এক জাতীয় ব্যঙ্গে আমাদিগের ভালবাসা জন্মিতেছে। আগেকার লোক কিছু মোটা কাজ ভালবাসিত, এখন সরুর উপর লোকের অনুরাগ। আগেকার রসিক, লাঠিয়ালের ন্যায় মোটা লাঠি লইয়া সজোরে শত্রুর মাথায় মারিতেন, মাথার খুলি ফাটিয়া যাইত।

এখনকার রসিকেরা, ডাক্তারের মত সরু ল্যান্‌সেট্‌খানি বাহির করিয়া, কখন কুচ করিয়া ব্যথার স্থানে বসাইয়া দেন, কিছু জানিতে পারা যায় না, কিন্তু হৃদয়ের শোণিত ক্ষত-মুখে বাহির হইয়া যায়। এখন ইংরেজ-শাসিত সমাজে ডাক্তারের শ্রীবৃদ্ধি—লাঠিয়ালের বড় দুরবস্থা। সাহিত্য-সমাজে লাঠিয়াল আর নাই, এমন নহে; দুর্ভাগ্যক্রমে সংখ্যায় কিছু বাড়িয়াছে, কিন্তু তাহাদের লাঠি ঘুণে-ধরা; বাহুতে বল নাই, তাহারা লাঠির ভরে কাতর; শিক্ষা নাই, কোথায় মারিতে কোথায় মারে। লোক হাসায় বটে, কিন্তু হাস্যের পাত্র তাহারা স্বয়ং। ঈশ্বর গুপ্ত বা দীনবন্ধু এ জাতীয় লাঠিয়াল ছিলেন না। তাঁহাদের হাতে পাকা বাঁশের মোটা লাঠি, বাহুতেও অমিত বল, শিক্ষাও বিচিত্র। দীনবন্ধুর লাঠির আঘাতে অনেক জলধর ও রাজীব মুখোপাধ্যায় জলধর বা রাজীব-জীবন পরিত্যাগ করিয়াছে।

কবির প্রধান গুণ—সৃষ্টি-কৌশল। ঈশ্বর গুপ্তের এ ক্ষমতা ছিল না। দীনবন্ধুর এ শক্তি অতি প্রচুর-পরিমাণে ছিল। তাঁহার প্রণীত জলধর, জগদম্বা, মল্লিকা, নিমচাঁদ দত্ত প্রভৃতি এই সকল কথার উজ্জ্বল উদাহরণ। তবে যাহা সূক্ষ্ম, কোমল, মধুর, অকৃত্রিম, করুণ, প্রশান্ত—সে সকলে দীনবন্ধুর তেমন অধিকার ছিল না। তাঁহার লীলাবতী, তাঁহার মালতী, কামিনী, সৈরিন্ধ্রী, সরলা প্রভৃতি রসজ্ঞের নিকট তাদৃশ আদরণীয়া নহে।* তাঁহার বিনায়ক, রমণীমোহন, অরবিন্দ, ললিতমোহন মন মুগ্ধ করিতে পারে না। কিন্তু যাহা স্থূল, অসঙ্গত, অসংলগ্ন, বিপর্যাস্ত, তাহা তাঁহার ইঙ্গিতমাত্রেরও অধীন; ওঝার ডাকে ভূতের দলের মত স্মরণমাত্র সারি দিয়া আসিয়া দাঁড়ায়।

কি উপায় লইয়া দীনবন্ধু এই সকল চিত্র রচনা করিয়াছিলেন, তাহার আলোচনা করিলে বিস্মিত হইতে হয়। বিস্ময়ের বিষয়—বাঙ্গালা সমাজ-সম্বন্ধে দীনবন্ধুর বহুদর্শিতা। সকল শ্রেণীর বাঙ্গালীর দৈনিক জীবনের সকল খবর রাখে, এমন বাঙ্গালী লেখক আর নাই। এ বিষয়ে বাঙ্গালী লেখকদিগের এখন সাধারণতঃ বড় শোচনীয় অবস্থা। তাঁহাদিগের অনেকেরই লিখিবার যোগ্য শিক্ষা আছে, লিখিবার শক্তি আছে, কেবল যাহা জানিলে তাঁহাদের লেখা সার্থক হয়, তাহা জানা নাই। তাঁহারা অনেকেই দেশ-বৎসল, দেশের মঙ্গলার্থ লেখেন, কিন্তু দেশের অবস্থা কিছুই জানেন না। কলিকাতার ভিতর স্বশ্রেণীর লোকে কি করে, ইহাই অনেকের স্বদেশ-সম্বন্ধীয় জ্ঞানের সীমা। কেহ-বা অতিরিক্ত দুই-চারিখানা পল্লীগ্রাম, বা দুই-একটা ক্ষুদ্র নগর দেখিয়াছেন, কিন্তু সে বুঝি কেবল পথ-ঘাট, বাগান-বাগিচা, হাট-বাজার। লোকের সঙ্গে মিলেন নাই। দেশ-সম্বন্ধীয় তাঁহাদের যে জ্ঞান, তাহা সচরাচর সংবাদপত্র হইতে প্রাপ্ত। সংবাদপত্র-লেখকেরা আবার সচরাচর (সকলে নহেন) ঐ শ্রেণীর লেখক—ইংরেজেরা ত বটেনই। কাজেই তাঁহাদের কাছেও দেশ-সম্বন্ধীয় যে জ্ঞান পাওয়া যায়, তাহা, দার্শনিকদিগের ভাষায়, রজ্জুতে সর্পজ্ঞানবৎ ভ্রম-জ্ঞান বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যাইতে পারে। এমন বলিতেছি না যে, কোন বাঙ্গালী লেখক গ্রাম্য প্রদেশ

ভ্রমণ করেন নাই। অনেকে করিয়াছেন, কিন্তু লোকের সঙ্গে মিশিয়াছেন কি? না মিশিলে, যাহা জানিয়াছেন, তাহার মূল্য কি?

বাঙ্গালী লেখকদিগের মধ্যে দীনবন্ধুই এ বিষয়ে সর্ব্বোচ্চ স্থান পাইতে পারেন। দীনবন্ধুকে রাজকার্য্যানুরোধে, মণিপুর হইতে গাঞ্জাম পর্য্যন্ত, দার্জিলিং হইতে সমুদ্র পর্য্যন্ত, পুনঃপুনঃ ভ্রমণ করিতে হইয়াছিল। কেবল পথ-ভ্রমণ বা নগর-দর্শন নহে। ডাকঘর দেখিবার জন্য গ্রামে গ্রামে যাইতে হইত। লোকের সঙ্গে মিশিবার তাঁহার অসাধারণ শক্তি ছিল। তিনি আহ্লাদপূর্ব্বক সকল শ্রেণীর লোকের সঙ্গে মিশিতেন। ক্ষেত্রমণির মত গ্রাম্য প্রদেশের ইতর লোকের কন্যা, আদুরীর মত গ্রাম্য বর্ষীয়সী, তোরাপের মত গ্রাম্য প্রজা, রাজীবের মত গ্রাম্য বৃদ্ধ, নশীরাম ও রতার মত গ্রাম্য বালক, পক্ষান্তরে নিমচাঁদের মত সহুরে শিক্ষিত মাতাল, অটলের মত নগর-বিহারী গ্রাম্য বাবু, কাঞ্চনের মত মনুষ্য-শোণিতপায়িনী নগরবাসিনী রাক্ষসী, নদেরচাঁদ হেমচাঁদের মত 'উন্‌পাঁজুরে বরাখুরে' হাপ্‌-পাড়াগেঁয়ে হাপ্‌-সহুরে বয়াটে ছেলে, ঘটিরামের মত ডিপুটি, নীলকুঠির দেওয়ান, আমীন, তাগাদ্‌গীর, উড়ে বেহারা, দুলে বেহারা, পেঁচোর-মা কাওরাণীর মত লোকের পর্য্যন্ত তিনি নাড়ী-নক্ষত্র জানিতেন। তাহারা কি করে, কি বলে, তাহা ঠিক জানিতেন। কলমের মুখে তাহা ঠিক বাহির করিতে পারিতেন,—আর কোন বাঙ্গালী লেখক তেমন পারে নাই। তাঁহার আদুরীর মত অনেক আদুরী আমি দেখিয়াছি, তাহারা ঠিক আদুরী। নদেরচাঁদ, হেমচাঁদ আমি দেখিয়াছি, তাহারা ঠিক নদেরচাঁদ বা হেমচাঁদ। মল্লিকা দেখা গিয়াছে,—ঠিক অমনি ফুটন্ত মল্লিকা। দীনবন্ধু অনেক সময়েই শিক্ষিত ভাস্কর বা চিত্রকরের ন্যায় জীবিত আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া চরিত্রগুলি গঠিতেন। সামাজিক বৃক্ষে সামাজিক বানর সমারূঢ় দেখিলেই অমনি তুলি ধরিয়া তাহার লেজ শুদ্ধ আঁকিয়া লইতেন। এটুকু গেল তাঁহার Realism; তাহার উপর Idealize করিবারও বিলক্ষণ ক্ষমতা ছিল। সম্মুখে জীবন্ত আদর্শ রাখিয়া আপনার স্মৃতির ভাণ্ডার খুলিয়া, তাহার ঘাড়ের উপর অন্যের দোষ-গুণ চাপাইয়া দিতেন। যেখানে যেটি সাজে, তাহা বসাইতে জানিতেন। গাছের বানরকে এইরূপ সাজাইতে সাজাইতে সে একটা হনুমান্ বা জাম্ববানে পরিণত হইত। নিমচাঁদ, ঘটিরাম, ভোলাচাঁদ প্রভৃতি বন্য জন্তুর এইরূপে উৎপত্তি। এই সকল সৃষ্টির বাহুল্য ও বৈচিত্র্য বিবেচনা করিলে, তাঁহার অভিজ্ঞতা বিস্ময়কর বলিয়া বোধ হয়।

কিন্তু কেবল অভিজ্ঞতায় কিছু হয় না। সহানুভূতি ভিন্ন সৃষ্টি নাই। দীনবন্ধুর সামাজিক অভিজ্ঞতাই বিস্ময়কর নহে—তাঁহার সহানুভূতিও অতিশয় তীব্র। বিস্ময় এবং বিশেষ প্রশংসার কথা এই যে, সকল শ্রেণীর লোকের সঙ্গেই তাঁহার তীব্র সহানুভূতি। গরিব-দুঃখীর দুঃখের মর্ম্ম বুঝিতে এমন আর কাহাকেও দেখি নাই। তাই দীনবন্ধু অমন একটা তোরাপ কি রাইচরণ, একটা আদুরী কি রেবতী লিখিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার এই তীব্র সহানুভূতি কেবল গরিব-দুঃখীর সঙ্গে নহে—ইহা সর্ব্বব্যাপী।

তিনি নিজে পবিত্র-চরিত্র ছিলেন, কিন্তু দুশ্চরিত্রের দুঃখ বুঝিতে পারিতেন। দীনবন্ধুর পবিত্রতার ভান ছিল না। এই বিশ্বব্যাপী সহানুভূতির গুণেই হউক বা দোষেই হউক তিনি সর্ব্বস্থানে যাইতেন, শুদ্ধাত্মা পাপাত্মা সকল শ্রেণীর লোকের সঙ্গে মিশিতেন কিন্তু অগ্নিমধ্যস্থ অদাহ্য শিলার ন্যায় পাপাগ্নি-কুণ্ডেও আপনার বিশুদ্ধি রক্ষা করিতেন। নিজে এই প্রকার পবিত্রচেতা হইয়াও সহানুভূতি-শক্তির গুণে তিনি পাপিষ্ঠের দুঃখ পাপিষ্ঠের ন্যায় বুঝিতে পারিতেন। তিনি নিমচাঁদ দত্তের ন্যায় বিশুষ্ক-জীবন-সুখ, বিফলীকৃত-শিক্ষা, নৈরাশ্য-পীড়িত মদ্যপের দুঃখ বুঝিতে পারিতেন; বিবাহ-বিষয়ে ভগ্ন-মনোরথ রাজীব মুখোপাধ্যায়ের দুঃখ বুঝিতে পারিতেন; গোপীনাথের ন্যায় নীলকরের আজ্ঞানুবর্ত্তিতার যন্ত্রণা বুঝিতে পারিতেন। দীনবন্ধুকে আমি বিশেষ জানিতাম। তাঁহার হৃদয়ের সকল ভাগই আমার জানা ছিল। আমার এই বিশ্বাস, এরূপ পরদুঃখকাতর মনুষ্য আর আমি দেখিয়াছি কি-না সন্দেহ। তাঁহার গ্রন্থেও সেই পরিচয় আছে।

কিন্তু এ সহানুভূতি কেবল দুঃখের সঙ্গে নহে। সুখ-দুঃখ, রাগ-দ্বেষ সকলেরই সঙ্গে তুল্য সহানুভূতি। আদুরীর বাউটিপৈঁছার সুখের সঙ্গে সহানুভূতি, তোরাপের রাগের সঙ্গে সহানুভূতি, ভোলাচাঁদ যে শুভ কারণবশতঃ শ্বশুর-বাড়ী যাইতে পারে না, সে সুখের সঙ্গেও সহানুভূতি। সকল কবিরই এ সহানুভূতি চাই, তা নহিলে কেহই উচ্চ শ্রেণীর কবি হইতে পারেন না। কিন্তু অন্য কবিদিগের সঙ্গে ও দীনবন্ধুর সঙ্গে একটু প্রভেদ আছে। সহানুভূতি প্রধানতঃ কল্পনা-শক্তির ফল। আমি আপনাকে ঠিক অন্যের স্থানে কল্পনার দ্বারা বসাইতে পারিলেই তাহার সঙ্গে আমার সহানুভূতি জন্মে। যদি তাহাই হয়, তবে এমন হইতে পারে যে, অতি নির্দ্দয় নিষ্ঠুর ব্যক্তিও, কল্পনা-শক্তির বল থাকিলে, কাব্য-প্রণয়ন-কালে দুঃখীর সঙ্গে আপনার সহানুভূতি জন্মাইয়া লইয়া কাব্যের উদ্দেশ্য-সাধন করেন। কিন্তু আবার এমন শ্রেণীর লোকও আছেন যে, দয়া প্রভৃতি কোমল বৃত্তি-সকল তাঁহাদের স্বভাবে এত প্রবল যে, সহানুভূতি তাঁহাদের স্বতঃসিদ্ধ—কল্পনার সাহায্যের অপেক্ষা করে না। মনস্তত্ত্ববিদেরা বলিবেন, এখানেও কল্পনা-শক্তি লুকাইয়া কাজ করে, তবে সে কার্য্য এমন অভ্যস্ত, বা শীঘ্র সম্পাদিত যে, আমরা বুঝিতে পারি না। এখানেও কল্পনা বিরাজমান। তাহাই না হয় হইল, তথাপি একটা প্রভেদ হইল। প্রথমোক্ত শ্রেণীর লোকের সহানুভূতি তাঁহাদের ইচ্ছা বা চেষ্টার অধীন, দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকের সহানুভূতি তাঁহাদের ইচ্ছাধীন নহে—তাঁহারাই সহানুভূতির অধীন। এক শ্রেণীর লোক যখন মনে করেন তখনই সহানুভূতি আসিয়া উপস্থিত হয়, নহিলে সে আসিতে পারে না; সহানুভূতি তাঁহাদের দাসী। অপর শ্রেণীর লোকেরা নিজেই সহানুভূতির দাস, তাঁহারা তাহাকে চান-বা-না-চান, সে আসিয়া ঘাড়ে চাপিয়াই আছে, হৃদয় ব্যাপিয়া আসন পাতিয়া বিরাজ করিতেছে। প্রথমোক্ত শ্রেণীর লোকের কল্পনা-শক্তি বড় প্রবল; দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকের প্রীতি, দয়াদি বৃত্তি-সকল প্রবল।

দীনবন্ধু এই দ্বিতীয় শ্রেণীর লোক ছিলেন। তাঁহার সহানুভূতি তাঁহার অধীন বা আয়ত্ত নহে; তিনি নিজেই সহানুভূতির অধীন। তাঁহার সর্ব্বব্যাপিনী সহানুভূতি তাঁহাকে যখন যে পথে লইয়া যাইত, তখন তিনি তাহাই করিতে বাধ্য হইতেন। তাঁহার গ্রন্থে যে রুচির দোষ দেখিতে পাওয়া যায়, বোধ হয়, এখন তাহা আমরা বুঝিতে পারিব। তিনি নিজে সুশিক্ষিত এবং নির্ম্মলচরিত্র; তথাপি তাঁহার গ্রন্থে যে রুচির দোষ দেখিতে পাওয়া যায়, তাঁহার প্রবলা দুর্দ্দমনীয়া সহানুভূতিই তাহার কারণ। (যাহার সঙ্গে তাঁহার সহানুভূতি, যাহার চরিত্র আঁকিতে বসিয়াছেন, তাহার সমুদায় অংশই তাঁহার কলমের আগায় আসিয়া পড়িত। কিছু বাদ-সাদ দিবার তাঁহার শক্তি ছিল না;) কেন-না, তিনি সহানুভূতির অধীন—সহানুভূতি তাঁহার অধীন নহে। আমরা বলিয়াছি যে, তিনি জীবন্ত আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া চরিত্র-প্রণয়নে নিযুক্ত হইতেন। সেই জীবন্ত আদর্শের সঙ্গে সহানুভূতি হইত বলিয়াই তিনি তাহাকে আদর্শ করিতে পারিতেন। কিন্তু তাঁহার উপর আদর্শের এমনই বল যে, সেই আদর্শের কোন অংশ ত্যাগ করিতে পারিতেন না। তোরাপের সৃষ্টি-কালে, তোরাপ যে ভাষায় রাগ প্রকাশ করে, তাহা বাদ দিতে পারিতেন না। আদুরীর সৃষ্টি-কালে, আদুরী যে ভাষায় রহস্য করে, তাহা বাদ দিতে পারিতেন না। নিমচাঁদ গড়িবার সময়ে, নিমচাঁদ যে ভাষায় মাতলামি করে, তাহা ছাড়িতে পারিতেন না। অন্য কবি হইলে, সহানুভূতির সঙ্গে একটা বন্দোবস্ত করিত,—বলিত, "তুমি আমাকে তোরাপের বা আদুরীর বা নিমচাঁদের স্বভাব-চরিত্র বুঝাইয়া দাও, কিন্তু ভাষা আমার পছন্দ-মত হইবে,—ভাষা তোমার কাছে লইব না।" কিন্তু দীনবন্ধুর সাধ্য ছিল না, সহানুভূতির সঙ্গে কোন প্রকার বন্দোবস্ত করেন। সহানুভূতি তাঁহাকে বলিত, "আমার হুকুম—সবটুকু লইতে হইবে —মায় ভাষা। দেখিতেছ না যে, তোরাপের ভাষা ছাড়িলে, তোরাপের রাগ আর তোরাপের রাগের মত থাকে না; আদুরীর ভাষা ছাড়িলে, আদুরীর তামাসা আর আদুরীর তামাসার মত থাকে না; নিমচাঁদের ভাষা ছাড়িলে, নিমচাঁদের মাতলামি আর নিমচাঁদের মাতলামির মত থাকে না; সবটুকু দিতে হইবে।" দীনবন্ধুর সাধ্য ছিল না যে বলেন, "না, তা হবে না।" তাই আমরা একটা আস্ত তোরাপ, আস্ত নিমচাঁদ, আস্ত আদুরী দেখিতে পাই। রুচির মুখ-রক্ষা করিতে গেলে, ছেঁড়া তোরাপ, কাটা আদুরী, ভাঙ্গা নিমচাঁদ আমরা পাইতাম।

আমি এমন বলিতেছি না যে, দীনবন্ধু যাহা করিয়াছেন, বেশ করিয়াছেন। গ্রন্থে রুচির দোষ না ঘটে, ইহাই সর্ব্বতোভাবে বাঞ্ছনীয়, তাহাতে সংশয় কি? আমি যে কয়টা কথা বলিলাম, তাহার উদ্দেশ্য প্রশংসা বা নিন্দা নহে। মানুষটা বুঝানই আমার উদ্দেশ্য। দীনবন্ধুর রুচির দোষ তাঁহার ইচ্ছায় ঘটে নাই—তাঁহার তীব্র সহানুভূতির গুণেই ঘটিয়াছে। গুণেও দোষ জন্মে, ইহা সকলেই জানে।—কথাটায় আমরা মানুষটা বুঝিতে পরিতেছি। গ্রন্থ ভাল হোক আর মন্দ হোক, মানুষটা বড় ভালবাসিবার মানুষ। তাঁহার জীবনেও তাহাই দেখিয়াছি। দীনবন্ধুকে যত লোক ভালবাসিয়াছে,

এমন আমি কখন দেখি নাই বা শুনি নাই। সেই সর্ব্বব্যাপিনী তীব্রা সহানুভূতিই তাহার কারণ।

দীনবন্ধুর এই দুইটি গুণ—(১) তাঁহার সামাজিক অভিজ্ঞতা, (২) তাঁহার প্রবল এবং স্বাভাবিক সর্ব্বব্যাপিনী সহানুভূতি—তাঁহার কাব্যের গুণ-দোষের কারণ, এই তত্ত্বটি বুঝানো এই সমালোচনার প্রধান উদ্দেশ্য। আমি ইহাও বুঝাইতে চাই যে, যেখানে এই দুইটির মধ্যে একটির অভাব হইয়াছে, সেইখানেই তাঁহার কবিত্ব নিষ্ফল হইয়াছে। যাহারা তাঁহার প্রধান নায়ক-নায়িকা, তাহাদিগের চরিত্র যে তেমন মনোহর হয় নাই, ইহাই তাহার কারণ। আদুরী বা তোরাপ জীবন্ত চিত্র; কামিনী বা লীলাবতী, বিজয় বা ললিতমোহন সেরূপ নয়। সহানুভূতি আদুরী ও তোরাপের বেলা তাহাদের স্বভাব-সিদ্ধ ভাষা পর্য্যন্ত আনিয়া কবির কলমের আগায় বসাইয়া দিয়াছিল; কামিনী বা বিজয়ের বেলা, লীলাবতী বা ললিতের বেলা—চরিত্র ও ভাষা উভয়ই বিকৃত কেন? যদি তাঁহার সহানুভূতি স্বাভাবিক এবং সর্ব্বব্যাপী, তবে এখানে সহানুভূতি নিষ্ফল কেন? কথাটা বুঝা সহজ।—এখানে অভিজ্ঞতার অভাব। প্রথমে নায়িকাদের কথা ধরুন।

লীলাবতী বা কামিনী শ্রেণীর নায়িকা-সম্বন্ধে তাঁহার কোন অভিজ্ঞতা ছিল না। ছিল না—কেন-না, কোন লীলাবতী বা কামিনী বাঙ্গালী-সমাজে ছিল না। হিন্দুর ঘরে ধেড়ে মেয়ে, কোর্টশিপের পাত্রী হইয়া, যিনি কোর্ট করিতেছেন, তাহাকে প্রাণ-মন সমর্পণ করিয়া বসিয়া আছে, এমন মেয়ে বাঙ্গালী-সমাজে ছিল না—কেবল আজ-কাল নাকি দুই-একটা হইতেছে, শুনিতেছি। ইংরেজের ঘরে তেমন মেয়ে আছে; ইংরেজ-কন্যার জীবনই তাই। আমাদিগের দেশের প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থেও তেমনই আছে। দীনবন্ধু ইংরেজি ও সংস্কৃত নাটক-নবেল ইত্যাদি পড়িয়া এই ভ্রমে পড়িয়াছিলেন যে, বাঙ্গালা-কাব্যে বাঙ্গালার সমাজস্থিত নায়ক-নায়িকাকেও সেই ছাঁচে ঢালা চাই। কাজেই যাহা নাই, যাহার আদর্শ সমাজে নাই, তিনি তাহাই গড়িতে বসিয়াছিলেন। এখন আমি ইহাও বুঝিয়াছি যে, তাঁহার চরিত্র-প্রণয়ন-প্রথা এই ছিল যে, জীবন্ত আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া চিত্রকরের ন্যায় চিত্র আঁকিতেন। এখানে জীবন্ত আদর্শ নাই, কাজেই ইংরেজি ও সংস্কৃত গ্রন্থের মধ্যগত মৃৎপুত্তলগুলি দেখিয়া সে চরিত্রের গঠন করিতে হইত। জীবন্ত আদর্শ সম্মুখে নাই, কাজেই সে সর্ব্বব্যাপিনী সহানুভূতিও সেখানে নাই; কেন-না, সর্ব্বব্যাপিনী সহানুভূতিও জীবন্ত ভিন্ন জীবন-হীনকে ব্যাপ্ত করিতে পারে না—জীবনহীনের সঙ্গে সহানুভূতির কোন সম্বন্ধ নাই। এখানে পাঠক দেখিলেন যে, দীনবন্ধুর সামাজিক অভিজ্ঞতাও নাই, স্বাভাবিক সহানুভূতিও নাই। এই দুইটি লইয়াই দীনবন্ধুর কবিত্ব। কাজেই এখানে কবিত্ব নিষ্ফল।

যেখানে দীনবন্ধুর প্রধান নায়িকা কোর্টশিপের পাত্রী নহে—যথা সৈরিন্ধ্রী—সেখানেও দীনবন্ধু জীবন্ত আদর্শ পরিত্যাগ করিয়া পুস্তকগত আদর্শ অবলম্বন করিয়াছেন। কাজেই সেখানেও নায়িকার চরিত্র স্বাভাবিক হইতে পায় নাই।

দীনবন্ধুর নায়কগুলির সম্বন্ধে ঐরূপ কথাই বলা যাইতে পারে। দীনবন্ধুর নায়কগুলি সর্ব্বগুণসম্পন্ন বাঙ্গালী যুবা—কাজকর্ম্ম নাই, কাজকর্ম্মের মধ্যে কাহারও philanthropy, কাহারও কোর্টশিপ। এরূপ চরিত্রের জীবন্ত আদর্শ বাঙ্গালা-সমাজেই নাই, কাজেই এখানেও অভিজ্ঞতা নাই। এখানেও তাই দীনবন্ধুর কবিত্ব নিষ্ফল।

যে প্রণালী অবলম্বন করিয়া দীনবন্ধু জলধর বা জগদম্বা বা নিমচাঁদের চরিত্র প্রণীত করিয়াছিলেন, যদি এখানে সেই প্রথা অবলম্বন করিতেন, তাহা হইলে এখানেও তাঁহার কবিত্ব সফল হইত। তাঁহার সে শক্তি যে বিলক্ষণ ছিল, তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। বোধ হয়, তাঁহার চিত্তের উপর ইংরেজি সাহিত্যের আধিপত্য বেশী হইয়াছিল বলিয়াই এ স্থলে সে পথে যাইতে ইচ্ছা করেন নাই। পক্ষান্তরে, ভিন্ন প্রকৃতির কবি, অর্থাৎ যাঁহাদের সহানুভূতি কল্পনার অধীনা—স্বাভাবিকী নহে, তাঁহারা এমন স্থলে কল্পনার বলে সেই জীবনহীন আদর্শকে জীবন্ত করিয়া, সহানুভূতিকে জোর করিয়া ধরিয়া আনিয়া বসাইয়া একটা নবীনমাধব বা লীলাবতীর চরিত্রকে জীবন্ত করিতে পারিতেন। সেক্ষপিয়র অবলীলাক্রমে জীবন্ত Caliban বা Ariel-এর সৃষ্টি করিয়াছেন, কালিদাস অবলীলাক্রমে উমা বা শকুন্তলার সৃষ্টি করিয়াছেন। এখানে সহানুভূতি কল্পনার আজ্ঞাকারিণী।

(দীনবন্ধুর এই অলৌকিক সমাজজ্ঞতা এবং তীব্র সহানুভূতির ফলেই তাঁহার প্রথম নাটক-প্রণয়ন।) যে সকল প্রদেশে নীল প্রস্তুত হইত, সেই সকল প্রদেশে তিনি অনেক ভ্রমণ করিয়াছিলেন,—নীলকরের তাৎকালিক প্রজা-পীড়ন সবিস্তারে অবগত হইয়াছিলেন। এই প্রজা-পীড়ন তিনি যেমন জানিয়াছিলেন, এমন আর কেহই জানিতেন না। তাঁহার স্বাভাবিক সহানুভূতির বলে সেই পীড়িত প্রজাদিগের দুঃখ তাঁহার হৃদয়ে আপনার ভোগ্য দুঃখের ন্যায় প্রতীয়মান হইল, কাজেই হৃদয়ের উৎস কবিকে লেখনী-মুখে নিঃসৃত করিতে হইল। নীলদর্পণ বাঙ্গালার Uncle Tom's Cabin. 'টম্ কাকার কুটীর' আমেরিকার কাফ্রিদিগের দাসত্ব ঘুচাইয়াছে; নীলদর্পণ নীল-দাসদিগের দাসত্ব-মোচনের অনেকটা কাজ করিয়াছে। নীলদর্পণে গ্রন্থকারের অভিজ্ঞতা এবং সহানুভূতি পূর্ণমাত্রায় যোগ দিয়াছিল বলিয়া, নীলদর্পণ তাঁহার প্রণীত সকল নাটকের অপেক্ষা শক্তিশালী। অন্য নাটকের অন্য গুণ থাকিতে পারে, কিন্তু নীলদর্পণের মত শক্তি আর কিছুতেই নাই। তাঁহার আর কোন নাটকই পাঠককে বা দর্শককে তাদৃশ বশীভূত করিতে পারে না। বাঙ্গালা ভাষায় এমন অনেকগুলি নাটক-নবেল বা অন্যবিধ কাব্য প্রণীত হইয়াছে, যাহার উদ্দেশ্য সামাজিক অনিষ্টের সংশোধন। প্রায়ই সেগুলি কাব্যাংশে নিকৃষ্ট; তাহার কারণ—কাব্যের মুখ্য উদ্দেশ্য সৌন্দর্য-সৃষ্টি; তাহা ছাড়িয়া, সমাজ-সংস্করণকে মুখ্য উদ্দেশ্য করিলে কাজেই কবিত্ব নিষ্ফল হয়। কিন্তু নীলদর্পণের মুখ্য উদ্দেশ্য এবংবিধ হইলেও কাব্যাংশে তাহা উৎকৃষ্ট; তাহার কারণ এই যে, গ্রন্থকারের মোহময়ী সহানুভূতি সকলই মাধুর্য্যময় করিয়া তুলিয়াছে।

উপসংহারে আমার কেবল ইহাই বক্তব্য যে, দীনবন্ধুর কবিত্বের দোষ-গুণের যে উৎপত্তি-স্থল নির্দ্দিষ্ট করিলাম, ইহা তাঁহার গ্রন্থ হইতেই যে পাইয়াছি, এমন নহে ; বহি পড়িয়া একটা আন্দাজি theory খাড়া করিয়াছি, এমন নহে। গ্রন্থকারের হৃদয় আমি বিশেষ জানিতাম, তাই এ কথা বলিয়াছি ও বলিতে পারিয়াছি। যাহা গ্রন্থকারের হৃদয়ে পাইয়াছি, গ্রন্থেও তাহা পাইয়াছি বলিয়া এ কথা বলিলাম। গ্রন্থকারকে না জানিলে, তাঁহার গ্রন্থ এরূপে বুঝিতে পারিতাম কি-না, বলিতে পারি না। অন্যে, যে গ্রন্থকারের হৃদয়ের এমন নিকটে স্থান পায় নাই, সে বলিতে পারিত কি-না, জানি না। কথাটা দীনবন্ধুর গ্রন্থের পাঠকমণ্ডলীকে বুঝাইয়া বলিব, ইহা আমার বড় সাধ ছিল। দীনবন্ধুর গ্রন্থের প্রশংসা বা নিন্দা করা আমার উদ্দেশ্য নহে ; কেবল, সেই অসাধারণ মনুষ্য কিসে অসাধারণ ছিলেন, তাহাই বুঝানো আমার উদ্দেশ্য।

[১২৮৩]

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বাঙ্গালা সাহিত্যে আর যাহারই অভাব থাকুক, কবিতার অভাব নাই। উৎকৃষ্ট কবিতারও অভাব নাই—বিদ্যাপতি হইতে রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত অনেক সুকবি বাঙ্গালায় জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, অনেক উত্তম কবিতা লিখিয়াছেন ; বলি[illegible] গেলে বরং বলিতে হয় যে, বাঙ্গালা সাহিত্য কাব্যরাশি-ভারে কিছু পীড়িত। তবে আবার ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা সংগ্রহ করিয়া সে বোঝা আরও ভারি করি কেন ? সেই কথাটা আগে বুঝাই।

প্রবাদ আছে যে, গরীব বাঙ্গালীর ছেলে সাহেব হইয়া মোচার ঘণ্টে অতিশয় বিস্মিত হইয়াছিলেন। সামগ্রীটা কি এ ? বহু কষ্টে পিসিমা তাঁহাকে সামগ্রীটা বুঝাইয়া দিলে, তিনি স্থির করিলেন যে, এ "কেলাকা ফুল"। রাগে সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া যায় যে, এখন আমরা সকলেই মোচা ভুলিয়া কেলাকা ফুল বলিতে শিখিয়াছি। তাই আজ ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা সংগ্রহ করিতে বসিয়াছি। আর যেই কেলাকা ফুল বলুক, ঈশ্বর গুপ্ত মোচা বলেন।

একদিন বর্ষাকালে গঙ্গাতীরস্থ কোন ভবনে বসিয়া ছিলাম। প্রদোষকালে —প্রস্ফুটিত চন্দ্রালোকে বিশাল বিস্তীর্ণ ভাগীরথী লক্ষবীচি-বিক্ষেপশালিনী— মৃদু পবনহিল্লোলে তরঙ্গভঙ্গ-চঞ্চল-চন্দ্রকরমালা লক্ষ তারকার মত ফুটিতেছিল ও নিবিতেছিল। যে বারাণ্ডায় বসিয়া ছিলাম, তাহার নীচে দিয়া বর্ষার তীব্রগামী

বারিরাশি মৃদু রব করিয়া ছুটিতেছিল। আকাশে নক্ষত্র, নদী-বক্ষে নৌকায় আলো, তরঙ্গে চন্দ্ররশ্মি! কাব্যের রাজ্য উপস্থিত হইল। মনে করিলাম, কবিতা পড়িয়া মনের তৃপ্তিসাধন করি। ইংরেজি কবিতায় তাহা হইল না—ইংরেজির সঙ্গে এ ভাগীরথীর ত কিছুই মিলে না। কালিদাস-ভবভূতিও অনেক দূরে।

মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র—কাহাতেও তৃপ্তি হইল না। চুপ করিয়া রহিলাম। এমন সময়ে গঙ্গা-বক্ষ হইতে মধুর সঙ্গীতধ্বনি শুনা গেল। জেলে জাল বাহিতে বাহিতে গাহিতেছে—

"সাধো আছে মা মনে—
দুর্গা ব'লে প্রাণ ত্যজিব,
জাহ্নবী-জীবনে!"

তখন প্রাণ জুড়াইল—মনের স্থর মিলিল—বাঙ্গালা ভাষায় বাঙ্গালীর মনের আশা শুনিতে পাইলাম—এ জাহ্নবী-জীবন দুর্গা বলিয়া প্রাণ ত্যজিবারই বটে, তাহা বুঝিলাম। তখন সেই শোভাময়ী জাহ্নবী, সেই সৌন্দর্য্যময় জগৎ সকলই আপনার বলিয়া বোধ হইল—এতক্ষণ পরের বলিয়া বোধ হইতেছিল।

সেইরূপ আজিকার দিনের অভিনব এবং উন্নতির পথে সমারূঢ় সৌন্দর্য্যবিশিষ্ট বাঙ্গালা সাহিত্য দেখিয়া অনেক সময়ে বোধ হয়—হৌক সুন্দর, কিন্তু এ বুঝি পরের—আমাদের নহে। খাঁটি বাঙ্গালা কথায়, খাঁটি বাঙ্গালীর মনের ভাব ত খুঁজিয়া পাই না। মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ—শিক্ষিত বাঙ্গালীর কবি;—ঈশ্বর গুপ্ত বাঙ্গালার কবি। (এখন আর খাঁটি বাঙ্গালী কবি জন্মে না—জন্মিবার জো নাই—জন্মিয়া কাজ নাই।) বাঙ্গালার অবস্থা আবার ফিরিয়া অবনতির পথে না গেলে খাঁটি বাঙ্গালী কবি আর জন্মিতে পারে না। আমরা "বৃত্রসংহার" পরিত্যাগ করিয়া "পৌষপার্ব্বণ" চাই না। কিন্তু তবু বাঙ্গালীর মনে পৌষপার্ব্বণে যে একটা সুখ আছে, বৃত্রসংহারে তাহা নাই। পিঠাপুলিতে যে একটা সুখ আছে, শচীর বিম্বাধর-প্রতিবিম্বিত সুধায় তাহা নাই। সে জিনিষটা একেবারে ছাড়িলে চলিবে না; দেশশুদ্ধ জোনস্, গমিসের তৃতীয় সংস্করণে পরিণত হইলে চলিবে না। বাঙ্গালী নাম রাখিতে হইবে। জননী জন্মভূমিকে ভালবাসিতে হইবে। যাহা মার প্রসাদ, তাহা যত্ন করিয়া তুলিয়া রাখিতে হইবে। এই দেশী জিনিষগুলি মার প্রসাদ। এই খাঁটি বাঙ্গালাটি, এই খাঁটি দেশী কথাগুলি মার প্রসাদ। মার প্রসাদে পেট না ভরে, বিলাতী খাদ্য বাজার হইতে কিনিয়া খাইতে পারি—কিন্তু মার প্রসাদ ছাড়িব না।

ঈশ্বর গুপ্ত কবি। কিন্তু কি রকম কবি? ভারতবর্ষে পূর্ব্বে জ্ঞানিমাত্রকেই কবি বলিত। শাস্ত্রবেত্তারাও সকলেই "কবি"। ধর্ম্ম-শাস্ত্রকারও কবি, জ্যোতিষ-শাস্ত্রকারও কবি। তারপর কবিশব্দের অর্থের অনেক রকম পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। "কাব্যেষু মাঘঃ কবি-কালিদাসঃ"—এখানে অর্থটা ইংরেজি Poet শব্দের মত। তারপর এই শতাব্দীর প্রথমাংশে "কবির লড়াই" হইত। দুই দল গায়ক

জুটিয়া ছন্দোবন্ধে পরস্পরের কথার উত্তর-প্রত্যুত্তর দিতেন। সেই রচনার নাম "কবি"।

আবার আজকাল কবি অর্থে Poet; তাহাকে পারা যায়, কিন্তু "কবিত্ব" সম্বন্ধে আজকাল বড় গোল। ইংরেজিতে যাহাকে Poetry বলে, এখন তাহাই কবিত্ব। এখন এই অর্থ প্রচলিত, সুতরাং এই অর্থে ঈশ্বর গুপ্ত কবি কি-না, আমরা বিচার করিতে বাধ্য।

পাঠক বোধ হয় আমার কাছে এমন প্রত্যাশা করেন না যে, এই কবিত্ব কি সামগ্রী, তাহা আমি বুঝাইতে বসিব। অনেক ইংরেজ ও বাঙ্গালী লেখক সে চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহাদের উপর আমার বরাত দেওয়া রহিল। আমার এই মাত্র বক্তব্য যে, সে অর্থে ঈশ্বর গুপ্তকে উচ্চাসনে বসাইতে সমালোচক সম্মত হইবেন না। মনুষ্য-হৃদয়ের কোমল, গম্ভীর, উন্নত, অস্ফুট ভাবগুলি ধরিয়া, তাহাদিগকে গঠন দিয়া, অব্যক্তকে তিনি ব্যক্ত করিতে জানিতেন না। সৌন্দর্য্য-সৃষ্টিতে তিনি তাদৃশ পটু ছিলেন না। তাঁহার সৃষ্টিই বড় নাই। মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ—ইঁহারা সকলেই এ কবিত্বে তাঁহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। প্রাচীনেরাও তাঁহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ভারতচন্দ্রের ন্যায় হীরা-মালিনী গড়িবার তাঁহার ক্ষমতা ছিল না। কাশীরামের মত সুভদ্রা-হরণ কি শ্রীবৎস-চিন্তা, কৃত্তিবাসের মত তরণীসেন-বধ, মুকুন্দরামের মত ফুল্লরা গড়িতে পারিতেন না। বৈষ্ণব কবিদের মত বীণার ঝঙ্কার দিতে জানিতেন না। তাঁহার কাব্যে সুন্দর, করুণ, প্রেম—এ সব সামগ্রী বড় বেশী নাই। কিন্তু তাঁহার যাহা আছে, তাহা আর কাহারও নাই। আপন অধিকারের ভিতর তিনি রাজা।

সংসারের সকল সামগ্রী কিছু ভাল নহে। যাহা ভাল, তাহাও কিছু এত ভাল নহে যে, তাহার অপেক্ষা ভাল আমরা কামনা করি না। সকল বিষয়েই প্রকৃত অবস্থার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট আমরা কামনা করি। সেই উৎকর্ষের আদর্শ-স্থল আমাদের হৃদয়ে অস্ফুট রকম থাকে। সেই আদর্শ ও সেই কামনা, কবির সামগ্রী। যিনি তাহা হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন, তাহাকে গঠন দিয়া শরীরী করিয়া আমাদের হৃদয়গ্রাহী করিয়াছেন, সচরাচর তাঁহাকেই আমরা কবি বলি। মধুসূদনাদি তাহা পারিয়াছেন, ঈশ্বরচন্দ্র তাহা পারেন নাই বা করেন নাই, এই জন্য এই অর্থে আমরা মধুসূদনাদিকে শ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া ঈশ্বরচন্দ্রকে নিম্ন শ্রেণীতে ফেলিয়াছি। কিন্তু এইখানেই কি কবিত্বের বিচার শেষ হইল? কাব্যের সামগ্রী কি আর কিছুই রহিল না?

রহিল বৈকি। যাহা আদর্শ, যাহা কমনীয়, যাহা আকাঙ্ক্ষিত, তাহা কবির সামগ্রী। কিন্তু যাহা প্রকৃত, যাহা প্রত্যক্ষ, যাহা প্রাপ্ত, তাহাই বা নয় কেন? তাহাতে কি কিছু রস নাই? কিছু সৌন্দর্য্য নাই? আছে বৈকি। ঈশ্বর গুপ্ত সেই রসে রসিক, সেই সৌন্দর্য্যের কবি। যাহা আছে, ঈশ্বর গুপ্ত তাহার কবি। তিনি এই বাঙ্গালা সমাজের কবি। তিনি কলিকাতা সহরের কবি। তিনি বাঙ্গালার গ্রাম্য দেশের কবি। এই সমাজ, এই সহর, এই দেশ—বড় কাব্যময়। অন্যে তাহাতে

বড় রস পান না। তোমরা পৌষপার্ব্বণে পিঠাপুলি খাইয়া অজীর্ণে দুঃখ পাও, তিনি তাহার কাব্যরসটুকু সংগ্রহ করেন। অন্যে নববর্ষে মাংস চিবাইয়া, মদ গিলিয়া, গাঁদাফুল সাজাইয়া কষ্ট পায়, ঈশ্বর গুপ্ত মক্ষিকাবৎ তাহার সার আদান করিয়া নিজে উপভোগ করেন, অন্যকেও উপহার দেন। দুর্ভিক্ষের দিন,—তোমরা মাতা বা শিশুর চক্ষে অশ্রুবিন্দুশ্রেণী সাজাইয়া মুক্তাহারের সঙ্গে তাহার উপমা দাও, তিনি চালের দরটি কষিয়া দেখিয়া তাহার ভিতর একটু রস পান,—

"মনের চেলে মন ভেঙ্গেচে
ভাঙ্গা মন আর গড়ে নাকো।"

তোমরা সুন্দরীগণকে পুষ্পোদ্যানে বা বাতায়নে বসাইয়া প্রতিমা সাজাইয়া পূজা কর; তিনি তাহাদের রান্নাঘরে উনুনগোড়ায় বসাইয়া, শাশুড়ী-ননদের গঞ্জনায় ফেলিয়া সত্যের সংসারের এক রকম খাঁটি কাব্যরস বাহির করেন,—

"বধূর মধুর খনি, মুখ শতদল।
সলিলে ভাসিয়া যায়, চক্ষু ছলছল॥"

ঈশ্বর গুপ্তের কাব্য চালের কাঁটায়, রান্নাঘরের ধুঁয়ায়, নাটুরে মাঝির ধ্বজির ঠেলায়, নীলের দাদনে, হোটেলের খানায়, পাঁটার অস্থি-স্থিত মজ্জায়। তিনি আনারসে মধুর রস ছাড়া কাব্যরস পান, তপ্‌সে মাছে মৎস্য-ভাব ছাড়া তপস্বি-ভাব দেখেন, পাঁটার বোকাগন্ধ ছাড়া একটু দধীচির গায়ের গন্ধ পান। তিনি বলেন, "তোমাদের এ দেশ, এ সমাজ বড় রঙ্গ-ভরা। তোমরা মাথা কুটাকুটি করিয়া দুর্গোৎসব কর, আমি কেবল তোমাদের রঙ্গ দেখি। তোমরা এ ওকে ফাঁকি দিতেছ, এ ওর কাছে মেকি চালাইতেছ, এখানে কাষ্ঠ হাসি হাস, ওখানে মিছা কান্না কাঁদ, আমি বসিয়া বসিয়া দেখিয়া হাসি। তোমরা বল, বাঙ্গালীর মেয়ে বড় সুন্দরী, বড় মনোমোহিনী, প্রেমের আধার, প্রাণের সুসার, ধর্ম্মের ভাণ্ডার,—তা হইলে হইতে পারে; কিন্তু আমি দেখি, উহারা বড় রঙ্গের জিনিষ। মানুষে যেমন রূপী বাঁদর পোষে, আমি বলি, পুরুষে তেমনি মেয়েমানুষ পোষে,—উভয়কেই মুখভেঙ্গানতেই সুখ।" স্ত্রীলোকের রূপ আছে—তাহা তোমার-আমার মত ঈশ্বর গুপ্তও জানিতেন, কিন্তু তিনি বলেন, "উহা দেখিয়া মুগ্ধ হইবার কথা নহে—উহা দেখিয়া হাসিবার কথা।" তিনি স্ত্রীলোকের রূপের কথা পড়িলে হাসিয়া লুটাইয়া পড়েন। মাঘ মাসের প্রাতঃস্নানের সময়ে, যেখানে অন্য কবি রূপ দেখিবার জন্য যুবতীগণের পিছে-পিছে যাইতেন, ঈশ্বরচন্দ্র সেখানে তাহাদের নাকাল দেখিবার জন্য যান। তোমরা হয়ত, সেই নীহার-শীতল স্বচ্ছসলিলধৌত কষিতকান্তি লইয়া আদর্শ গড়িবে; তিনি বলিলেন, "দেখ দেখি, কেমন তামাসা! যে জাতি স্নানের সময়ে পরিধেয় বসন লইয়া বিব্রত, তোমরা তাদের পাইয়া এত বাড়াবাড়ি কর!" তোমরা মহিলাগণের গৃহকর্ম্মে আস্থা ও যত্ন দেখিয়া বলিবে, "ধন্য স্বামি-পুত্র-সেবাব্রত! ধন্য স্ত্রীলোকের স্নেহ ও ধৈর্য্য!"

ঈশ্বরচন্দ্র তখন তাহাদের হাঁড়িশালে গিয়া দেখিবেন—রন্ধনের চাল চর্ব্বণেই গেল, পিটুলির জন্য কোন্দল বাধিয়া গেল, স্বামি-ভোজন করাইবার সময়ে শাশুড়ী-ননদের মুণ্ড-ভোজন হইল, এবং কুটুম্ব-ভোজনের সময়ে লজ্জার মুণ্ড-ভোজন হইল। স্থূল কথা, ঈশ্বর গুপ্ত Realist এবং ঈশ্বর গুপ্ত Satirist; ইহা তাঁহার সাম্রাজ্য, এবং ইহাতে তিনি বাঙ্গালা সাহিত্যে অদ্বিতীয়।

ব্যঙ্গ অনেক সময়ে বিদ্বেষ-প্রসূত। ইউরোপে অনেক ব্যঙ্গকুশল লেখক জন্মিয়াছেন। তাঁহাদের রচনা অনেক সময়ে হিংসা, অসূয়া, অকৌশল, নিরানন্দ এবং পরশ্রীকাতরতাপরিপূর্ণ; পড়িয়া বোধ হয়, ইউরোপীয় যুদ্ধ ও ইউরোপীয় রসিকতা এক মার পেটে জন্মিয়াছে—দু'য়ের কাজ মানুষকে দুঃখ দেওয়া। ইউরোপীয় অনেক কুসামগ্রী এই দেশে প্রবেশ করিতেছে—এই নরঘাতিনী রসিকতাও এ দেশে প্রবেশ করিয়াছে। 'হুতোম পেঁচার নক্সা' বিদ্বেষপরিপূর্ণ। (ঈশ্বর গুপ্তের ব্যঙ্গে কিছুমাত্র বিদ্বেষ নাই। শত্রুতা করিয়া তিনি কাহাকেও গালি দেন না। কাহারও অনিষ্ট কামনা করিয়া কাহাকেও গালি দেন না। মেকির উপর রাগ আছে বটে, তা ছাড়া সবটাই রঙ্গ, সবটা আনন্দ; কেবল ঘোর ইয়ারকি।) গৌরীশঙ্করকে গালি দিবার সময়েও রাগ করিয়া গালি দেন না। সেটা কেবল জিগীষা—ব্রাহ্মণকে কুভাষায় পরাজয় করিতে হইবে, এই জিদ। 'কবির লড়াই'—ঐ রকম শত্রুতাশূন্য গালাগালি। ঈশ্বর গুপ্ত কবির লড়াইয়ে শিক্ষিত—সে ধরণটা তাঁহার ছিল। (অন্যত্র তাও না—কেবল আনন্দ। যে যেখানে সমুখে পড়ে, তাহাকেই ঈশ্বরচন্দ্র তাহার গালে এক চড়, নহে একটা কাণমলা দিয়া ছাড়িয়া দেন; কারণ—আর কিছুই নয়, দুই জনে একটু হাসিবার জন্য।) কেহই চড়-চাপড় হইতে নিস্তার পাইতেন না। গবর্ণর-জেনেরল, লেপ্টেনাণ্ট-গবর্ণর, কৌন্সিলের মেম্বর হইতে মুটে, মাঝি, উড়িয়া, বেহারা কেহ ছাড়া নাই। এক-একটি চড়-চাপড় এক-একটি বজ্র—যে মারে, তাহার রাগ নাই; কিন্তু যে খায়, তাহার হাড়ে হাড়ে লাগে। তাহাতে আবার পাত্রাপাত্র বিচার নাই। যে সাহসে তিনি বলিয়াছেন—

"বিড়ালাক্ষী বিধুমুখী, মুখে গন্ধ ছুটে,"

আমাদের সে সাহস নাই। তবে বাঙ্গালীর মেয়ের উপর নীচের লিখিত দুই চরণে আমাদের ঢেরা সই রহিল—

"সিন্দুরের বিন্দুসহ কপালেতে উল্কি।
নসী জশী ক্ষেমী বামী রামী শ্যামী গুলকী।।"

মহারাণীকে স্তুতি করিতে করিতে দেশী Agitatorদের কাণ ধরিয়া টানাটানি—

"তুমি মা কল্পতরু, আমরা সব পোষা গোরু,
শিখিনি শিং বাঁকানো,
কেবল খাব খোল বিচালি ঘাস।

যেন রাঙ্গা আমলা তুলে মামলা
গামলা ভাঙ্গে না,
আমরা ভুসি পেলেই খুসি হব,
ঘুঁসি খেলে বাঁচব না ॥"

সাহেব-বাবুরা কবির কাছে অনেক কাণমলা খাইয়াছেন। একটা নমনা—

"যখন আস্‌বে শমন করবে দমন
কি বোলে তায় বুঝাইবে।
বুঝি হুট্ বোলে, বুট পায়ে দিয়ে
চুরুট ফুকে স্বর্গে যাবে?"

এক কথায় সাহেবদের নৃত্য-গীত—

"গুড়ু গুড়ু গুম গুম লাফে লাফে তাল।
তারা রারা রারা রারা লালা লালা লাল ॥"

সখের বাবু, বিনা সম্বলে—

"তেড়া হ'য়ে তুড়ি মারে, টপ্পাগীত গেয়ে।
গোচে-গাচে বাবু হন, পচা শাল চেয়ে ॥
কোনরূপে পিত্তি-রক্ষা—এটোকাঁটা খেয়ে।
শুদ্ধ হন বেনো গাঙ্গে, বেনো জলে নেয়ে ॥"

কিন্তু অনেক স্থানেই ঈশ্বর গুপ্তের ঐ ধরণ নাই। (অনেক স্থানেই কেবল রঙ্গরস, কেবল আনন্দ। তপসে মাছ লইয়া আনন্দে—

"কষিত কনক কান্তি, কমনীয় কায়।
গালভরা গোঁপদাড়ি, তপস্বীর প্রায় ॥
মানুষের দৃশ্য নও, বাস কর নীরে।
মোহন-মণির প্রভা, ননীর শরীরে ॥"

অথবা আনারসে—

"লুণ মেখে লেবুরস, বসে যুক্ত করি।
চিন্ময়ী চৈতন্যরূপা, চিনি তায় ভরি ॥"

অথবা পাঁটা—

"সাধ্য কার এক মুখে মহিমা প্রকাশে।
আপনি করেন বাদ্য, আপনার নাশে ॥
হাড়কাঠে ফেলে দিই, ধ'রে দুটি ঠ্যাঙ্গ।
সে সময়ে বাদ্য করে, ছ্যাড্যাং ছ্যাড্যাং ॥
এমন পাঁটার নাম যে রেখেছে বোকা।
নিজে সেই বোকা নয়, ঝাড়ে-বংশে বোকা ॥")

(তবে ইহা স্বীকার করিতে হয় যে, ঈশ্বর গুপ্ত মেকির উপর গালিগালাজ করিতেন। মেকির উপর যথার্থ রাগ ছিল। মেকি বাবুরা তাঁহার কাছে গালি খাইতেন, মেকি

সাহেবেরা গালি খাইতেন, মেকি ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতেরা—"নস্য-লোসা দধি-চোষার" দল—গালি খাইতেন। হিন্দুর ছেলে মেকি খ্রীষ্টিয়ান হইতে চলিল দেখিয়া তাঁহার রাগ সহ্য হইত না। মিশনরিদের ধর্ম্মের মেকির উপর বড় রাগ। মেকি পলিটিক্সের উপর রাগ।)

(অনেক সময়ে ঈশ্বর গুপ্তের অশ্লীলতা এই ক্রোধসম্ভূত। অশ্লীলতা ঈশ্বর গুপ্তের কবিতার একটি প্রধান দোষ। তবে ইহাও জানি যে, ঈশ্বর গুপ্তের অশ্লীলতা প্রকৃত অশ্লীলতা নহে। যাহা ইন্দ্রিয়াদির উদ্দীপনার্থ, বা গ্রন্থকারের হৃদয়স্থিত কদর্য্যভাবের অভিব্যক্তি-জন্য লিখিত হয়, তাহাই অশ্লীলতা; তাহা পবিত্র, সভ্য ভাষায় লিখিত হইলেও অশ্লীল। আর যাহার উদ্দেশ্য সেরূপ নহে, কেবল পাপকে তিরস্কৃত বা উপহসিত করা যাহার উদ্দেশ্য, তাহার ভাষা রুচি এবং সভ্যতার বিরুদ্ধ হইলেও অশ্লীল নহে।) ঋষিরাও এরূপ ভাষা ব্যবহার করিতেন। সেকালের বাঙ্গালীদিগের ইহা এক প্রকার স্বভাবসিদ্ধ ছিল। আমি এমন অনেক দেখিয়াছি,—অশীতিপর বৃদ্ধ, ধর্ম্মাত্মা, আজন্ম সংযতেন্দ্রিয়, সভ্য, সুশীল, সজ্জন—এমন সকল লোকও কুকাজ দেখিয়া রাগিলেই "বদ্ জোবান" আরম্ভ করিতেন। তখনকার রাগ-প্রকাশের ভাষাই অশ্লীল ছিল। ফলে, সে সময়ে ধর্ম্মাত্মা এবং অধর্ম্মাত্মা উভয়কেই অশ্লীলতায় সুপটু দেখিতাম;—প্রভেদ এই দেখিতাম, যিনি রাগের বশীভূত হইয়া অশ্লীল, তিনি ধর্ম্মাত্মা; যিনি ইন্দ্রিয়ান্তরের বশে অশ্লীল, তিনি পাপাত্মা। সৌভাগ্যক্রমে সেরূপ সামাজিক অবস্থা ক্রমে ক্রমে বিলুপ্ত হইতেছে।

ঈশ্বর গুপ্ত ধর্ম্মাত্মা, কিন্তু সেকেলে বাঙ্গালী। তাই ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা অশ্লীল। (সংসারের উপর, সমাজের উপর ঈশ্বর গুপ্তের রাগের কারণ অনেক ছিল। সংসার, বাল্যকালে বালকের অমূল্য রত্ন যে মাতা, তাহা তাঁহার নিকট হইতে কাড়িয়া লইল। খাঁটি সোণা কাড়িয়া লইয়া তাহার পরিবর্ত্তে এক পিত্তলের সামগ্রী দিয়া গেল—মার বদলে বিমাতা। তারপর যৌবনের যে অমূল্যরত্ন—শুধু যৌবনের কেন?—যৌবনের, প্রৌঢ়বয়সের, বার্দ্ধক্যের তুল্যরূপেই অমূল্যরত্ন যে ভার্য্যা, তাহার বেলাও সংসার বড় দাগা দিল। যাহা গ্রহণীয় নহে, ঈশ্বরচন্দ্র তাহা লইলেন না, কিন্তু দাগাবাজির জন্য সংসারের উপর ঈশ্বরের রাগটা রহিয়া গেল। তারপর অল্পবয়সে পিতৃহীন, সহায়হীন হইয়া ঈশ্বরচন্দ্র অন্ন-কষ্টে পড়িলেন।) কত বানরে, বানরের অট্টালিকায় শিকলে বাঁধা থাকিয়া ক্ষীর, সর, পায়সান্ন ভোজন করে, আর তিনি দেবতুল্য প্রতিভা লইয়া ভূমণ্ডলে আসিয়া শাকান্নের অভাবে ক্ষুধার্ত্ত। কত কুক্কুর বা মর্কট বরূষে (barouche) জুড়ী জুতিয়া তাঁহার গায়ে কাদা ছড়াইয়া যায়, আর তিনি হৃদয়ে বাগ্‌দেবী-ধারণ করিয়াও খালি পায়ে বর্ষার কাদা ভাঙ্গিয়া উঠিতে পারেন না। দুর্ব্বল মনুষ্য হইলে এ অত্যাচারে হারি মানিয়া, রণে ভঙ্গ দিয়া, পলায়ন করিয়া দুঃখের অন্ধকার-গহ্বরে লুকাইয়া থাকে। কিন্তু প্রতিভাশালীরা প্রায়ই বলবান্।

ঈশ্বর গুপ্ত সংসারকে—সমাজকে—স্বীয় বাহুবলে পরাস্ত করিয়া, তাহার নিকট হইতে ধন, যশ, সম্মান আদায় করিয়া লইলেন। কিন্তু অত্যাচারজনিত যে ক্রোধ, তাহা মিটিল না। জ্যেঠা মহাশয়ের জুতা তিনি সমাজের জন্য তুলিয়া রাখিয়াছিলেন। এখন সমাজকে পদতলে পাইয়া বিলক্ষণ উত্তম-মধ্যম দিতে লাগিলেন। সেকেলে বাঙ্গালীর ক্রোধ কদর্য্যের উপর কদর্য্য ভাষাতেই অভিব্যক্ত হইত। বোধ হয়, ইহাদিগের মনে হইত, বিশুদ্ধ পবিত্র কথা, দেবদ্বিজাদি প্রভৃতি যে বিশুদ্ধ ও পবিত্র, তাহারই প্রতি ব্যবহার্য্য;—যে দুরাত্মা, তাহার জন্য এই কদর্য্য ভাষা। এইরূপে ঈশ্বরচন্দ্রের কবিতায় অশ্লীলতা আসিয়া পড়িয়াছে।

আমরা ইহাও স্বীকার করি যে, তাহা ছাড়া অন্য বিষয়ে অশ্লীলতাও তাঁহার কবিতায় আছে। (কেবল রঙ্গাদির জন্য, শুধু ইয়ারকির জন্য এক-আধটু অশ্লীলতাও আছে। কিন্তু দেশকাল বিবেচনা করিলে, তাহার জন্য ঈশ্বরচন্দ্রের অপরাধ ক্ষমা করা যায়। সেকালে অশ্লীলতা ভিন্ন কথার আমোদ ছিল না। যে ব্যঙ্গ অশ্লীল নহে, তাহা সরস বলিয়া গণ্য হইত না। যে কথা অশ্লীল নহে, তাহা সতেজ বলিয়া গণ্য হইত না। যে গালি অশ্লীল নহে, তাহা কেহ গালি বলিয়া গণ্য করিত না। তখনকার সকল কাব্যই অশ্লীল। চোর-কবি "চোর-পঞ্চাশৎ" দুই পক্ষে অর্থ খাটাইয়া লিখিলেন—বিদ্যাপক্ষে এবং কালীপক্ষে—দুই পক্ষে সমান অশ্লীল। তখন পূজা-পার্ব্বণ অশ্লীল, উৎসবগুলি অশ্লীল—দুর্গোৎসবের নবমীর রাত্রি বিখ্যাত ব্যাপার। যাত্রার সঙ অশ্লীল হইলেই লোকরঞ্জক হইত। পাঁচালী, হাফ-আকড়াই অশ্লীলতার জন্যই রচিত। ঈশ্বর গুপ্তের সেই বাতাসে জীবন প্রাপ্ত ও বর্দ্ধিত। অতএব ঈশ্বর গুপ্তকে আমরা অনায়াসে একটুখানি মার্জনা করিতে পারি।)

আর একটা কথা আছে। অশ্লীলতা সকল সভ্য সমাজেই ঘৃণিত। তবে, যেমন লোকের রুচি ভিন্ন ভিন্ন, তেমনি দেশভেদেও রুচি ভিন্ন ভিন্ন প্রকার। এমন অনেক কথা আছে, যাহা ইংরেজেরা অশ্লীল বিবেচনা করেন, আমরা করি না। আবার এমন অনেক কথা আছে, যাহা আমরা অশ্লীল বিবেচনা করি, ইংরেজেরা করেন না। ইংরেজের কাছে, প্যান্টালুন বা উরুদেশের নাম অশ্লীল—ইংরেজের মেয়ের কাছে সে নাম মুখে আনিতে নাই। আমরা ধুতি, পায়জামা বা উরু শব্দগুলিকে অশ্লীল মনে করি না। মা, ভগিনী বা কন্যা কাহারও সম্মুখে ঐ সকল কথা ব্যবহার করিতে আমাদের লজ্জা নাই। পক্ষান্তরে, স্ত্রী-পুরুষে মুখ-চুম্বনটা আমাদের সমাজে অতি অশ্লীল ব্যাপার; কিন্তু ইংরেজের চক্ষে উহা অতি পবিত্র কার্য্য—মাতৃপিতৃ-সমক্ষেই উহা নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। এখন আমাদের সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্যক্রমে, আমরা দেশী জিনিষ সকলই হেয় বলিয়া পরিত্যাগ করিতেছি, বিলাতি জিনিষ সবই ভাল বলিয়া গ্রহণ করিতেছি। দেশী সুরুচি ছাড়িয়া আমরা বিদেশী সুরুচি গ্রহণ করিতেছি। শিক্ষিত বাঙ্গালী এমনও আছেন যে, তাঁহাদের পর-স্ত্রীর মুখ-চুম্বনে আপত্তি নাই, কিন্তু পর-স্ত্রীর অনাবৃত চরণ, আলতা-পরা, মল-পরা পা-দর্শনে বিশেষ আপত্তি।

ইহাতে আমরা যে কেবলই জিতিয়াছি, এমত নহে। একটা উদাহরণের দ্বারা বুঝাই।

মেঘদূতের একটি কবিতায় কালিদাস কোন পর্ব্বত-শৃঙ্গকে ধরণীর স্তন বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ইহা বিলাতি রুচিবিরুদ্ধ; স্তন বিলাতি রুচি-অনুসারে অশ্লীল কথা। কাজেই এই উপমাটি নব্যের কাছে অশ্লীল। নব্য বাবু হয়ত ইহা শুনিয়া কাণে আঙ্গুল দিয়া পর-স্ত্রী-মুখচুম্বন ও করস্পর্শের মহিমা-কীর্ত্তনে মনোযোগ দিবেন। কিন্তু আমি ভিন্ন রকম বুঝি। আমি এ উপমার অর্থ এই বুঝি যে, পৃথিবী আমাদিগের জননী; তাই তাঁহাকে ভক্তিভাবে, স্নেহ করিয়া 'মাতা বসুমতী' বলি; আমরা তাঁহার সন্তান; সন্তানের চক্ষে, মাতৃস্তনের অপেক্ষা সুন্দর, পবিত্র, জগতে আর কিছুই নাই—থাকিতে পারে না। অতএব এমন পবিত্র উপমা আর হইতে পারে না। ইহাতে যে অশ্লীলতা দেখে, আমার বিবেচনায় তাহার চিত্তে পাপ-চিন্তা ভিন্ন কোন বিশুদ্ধ ভাবের স্থান হয় না। কবি এখানে অশ্লীল নহেন,—এখানে পাঠকের হৃদয়—নরক। এখানে ইংরেজি রুচি বিশুদ্ধ নহে,—দেশী রুচিই বিশুদ্ধ।

আমাদের দেশের অনেক প্রাচীন কবি এইরূপ বিলাতি রুচির আইনে ধরা পড়িয়া বিনাপরাধে অশ্লীলতা-অপরাধে অপরাধী হইয়াছেন। স্বয়ং বাল্মীকি কি কালিদাসেরও অব্যাহতি নাই। যে ইউরোপে মসুর জোলার নবেলের আদর, সে ইউরোপের রুচি বিশুদ্ধ, আর যাঁহারা রামায়ণ, কুমারসম্ভব লিখিয়াছেন, সীতা-শকুন্তলার সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহাদের রুচি অশ্লীল। এই শিক্ষা আমরা ইউরোপীয়ের কাছে পাই। কি শিক্ষা! তাই আমি অনেকবার বলিয়াছি, ইউরোপের কাছে বিজ্ঞান, ইতিহাস, শিল্প শেখ; আর সব দেশীয়ের কাছে শেখ।

অন্যের ন্যায় ঈশ্বর গুপ্তও হাল আইনে অনেক স্থানে ধরা পড়েন। সে সকল স্থানে আমরা তাঁহাকে বেকসুর খালাস দিতে রাজি। কিন্তু ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হয় যে, আর অনেক স্থানেই তত সহজে তাঁহাকে নিষ্কৃতি দেওয়া যায় না। অনেক স্থানে তাঁহার রুচি বাস্তবিক কদর্য্য, যথার্থ অশ্লীল এবং বিরক্তিকর। তাহার মার্জ্জনা নাই।

ঈশ্বর গুপ্তের কবিত্ব কি প্রকার, তাহা বুঝিতে গেলে, তাঁহার দোষ-গুণ দুই বুঝাইতে হয়। শুধু তাই নহে। তাঁহার কবিত্বের অপেক্ষা আর একটা বড় জিনিষ পাঠককে বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছি। ঈশ্বর গুপ্ত নিজে কি ছিলেন, তাহাই বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছি। কবির কবিত্ব বুঝিয়া লাভ আছে, সন্দেহ নাই; কিন্তু কবিত্ব অপেক্ষা কবিকে বুঝিতে পারিলে আরও গুরুতর লাভ। কবিতা দর্পণ-মাত্র—তাহার ভিতর কবির অবিকল ছায়া আছে; দর্পণ বুঝিয়া কি হইবে? ভিতরে যাহার ছায়া, ছায়া দেখিয়া তাহাকে বুঝিব। কবিতা, কবির কীর্ত্তি—তাহা ত আমাদের হাতেই আছে—পড়িলেই বুঝিব। কিন্তু যিনি এই কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, তিনি কি গুণে, কি প্রকারে, এই কীর্ত্তি রাখিয়া গেলেন, তাহাই বুঝিতে হইবে। তাহাই

জীবনী- ও সমালোচনা-দত্ত প্রধান শিক্ষা এবং জীবনী ও সমালোচনার মুখ্য উদ্দেশ্য।

ঈশ্বরচন্দ্রের জীবনীতে আমরা অবগত হই যে, একজন অশিক্ষিত যুবা কলিকাতায় আসিয়া সাহিত্যে ও সমাজে আধিপত্য সংস্থাপন করিল। কি শক্তিতে? তাহাও দেখিতে পাই—নিজ প্রতিভা-গুণে। কিন্তু ইহাও দেখিতে পাই যে, প্রতিভানুযায়ী ফল ফলে নাই। প্রভাকর মেঘাচ্ছন্ন। সে মেঘ কোথা হইতে আসিল? বিশুদ্ধ রুচির অভাবে। এখন ইহা একপ্রকার স্বাভাবিক নিয়ম যে, প্রতিভা ও সুরুচি পরস্পর সখী; প্রতিভার অনুগামিনী সুরুচি। ঈশ্বর গুপ্তের বেলা তাহা ঘটে নাই কেন? এখানে দেশ, কাল, পাত্র বুঝিয়া দেখিতে হইবে। তাই আমি দেশের রুচি বুঝাইলাম, কালের রুচি বুঝাইলাম এবং পাত্রের রুচি বুঝাইলাম। বুঝাইলাম যে, পাত্রের রুচির অভাবের কারণ (১) পুস্তক-দত্ত সুশিক্ষার অল্পতা, (২) মাতার পবিত্র সংসর্গের অভাব, (৩) সহধর্ম্মিণী, অর্থাৎ যাঁহার সঙ্গে একত্র ধর্ম্ম শিক্ষা করি, তাঁহার পবিত্র সংসর্গের অভাব, (৪) সমাজের অত্যাচারে এবং তজ্জনিত সমাজের উপর কবির জাতক্রোধ। যে মেঘে প্রভাকরের তেজোহ্রাস করিয়াছিল, এই সকল উপাদানে তাহার জন্ম। স্থূল তাৎপর্য্য এই যে, ঈশ্বরচন্দ্র যখন অশ্লীল তখন কুরুচির বশীভূত হইয়াই অশ্লীল, ভারতচন্দ্রাদির ন্যায় কোথাও কুপ্রবৃত্তির বশীভূত হইয়া অশ্লীল নহেন। তাই দর্পণতলস্থ প্রতিবিম্বের সাহায্যে প্রতিবিম্বধারী সত্তাকে বুঝাইবার জন্য আমরা ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের অশ্লীলতা-দোষ এত সবিস্তারে সমালোচনা করিলাম।

মানুষটা কে, আর একটু ভাল করিয়া বুঝা যাউক—কবিতা না হয় এখন থাক। আমরা বলিয়াছি, ঈশ্বর গুপ্ত বিলাসী ছিলেন না; অথচ দেখিতে পাই, মুখের আটক-পাটক কিছুই নাই। অশ্লীলতায় ঘোর আমোদ, ইয়ারকি-ভরা পাঁটার স্তোত্র লেখেন, তপ্‌সে মাছের মজা বুঝেন, লেবু-দিয়া-আনারসের পরমভক্ত সুরাপান-সম্বন্ধে * মুক্তকণ্ঠ—আবার বিলাসী কারে বলে? কথাটা বুঝিয়া দেখা যাউক।

পরমার্থ-বিষয়ে ঈশ্বরচন্দ্র গদ্যে-পদ্যে যত লিখিয়াছেন, এত আর কোন বিষয়েই বোধ হয় লিখেন নাই। অনেকের পক্ষে ঐগুলি নীরস বলিয়া বোধ হইবে, কিন্তু যদি পাঠক ঈশ্বর গুপ্তকে বুঝিতে চাহেন, তবে দেখিবেন সেগুলি ফরমায়েসি কবিতা নহে—কবির আন্তরিক কথা তাহাতে আছে। এই সকল গদ্য ও পদ্য প্রণিধান করিয়া দেখিলে, আমরা বুঝিতে পারিব যে, ঈশ্বর গুপ্তের ধর্ম্মে একটা কৃত্রিম ভান ছিল না। ঈশ্বরে তাঁহার আন্তরিক ভক্তি ছিল। তিনি বিলাসী হউন, কোন হবিষ্যাশী নামাবলীধারীতে সেরূপ আন্তরিক ঈশ্বরে ভক্তি দেখিতে পাই না।

* সুরাপানের মার্জনা নাই। মার্জনার আমিও কোন কারণ দেখাইতে ইচ্ছুক নহি। কেবল সে সম্বন্ধে পাঠককে ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ কবির এই উক্তিটি স্মরণ করিতে বলি,—

"একো হি দোষো গুণসন্নিপাতে নিমজ্জতীন্দোঃ কিরণেম্বিবাঙ্কঃ"

সাধারণ ঈশ্বরবাদী বা ঈশ্বর-ভক্তের মত তিনি ঈশ্বরবাদী ও ঈশ্বর-ভক্ত ছিলেন না। তিনি ঈশ্বরকে নিকটে দেখিতেন; যেন প্রত্যক্ষ দেখিতেন, যেন মুখামুখী হইয়া কথা কহিতেন। আপনাকে যথার্থ ঈশ্বরের পুত্র, ঈশ্বরকে আপনার সাক্ষাৎ মূর্ত্তিমান্ পিতা বলিয়া দৃঢ় বিশ্বাস করিতেন। মুখামুখী হইয়া বাপের সঙ্গে বচসা করিতেন। কখন বাপের আদর পাইবার জন্য কোলে বসিতে যাইতেন, আপনি বাপকে কত আদর করিতেন—উত্তর না পাইলে কাঁদাকাটা বাধাইতেন। বলিতে কি, তাঁহার ঈশ্বরে গাঢ় পুত্রবৎ অকৃত্রিম প্রেম দেখিয়া চক্ষের জল রাখা যায় না। অনেক সময়েই দেখিতে পাই যে, মূর্ত্তিমান্ ঈশ্বর সম্মুখে পাইতেছেন না, কথার উত্তর পাইতেছেন না বলিয়া তাঁহার অসহ্য যন্ত্রণা হইতেছে, বাপকে বকিয়া ফাটাইয়া দিতেছেন। বাপ নিরাকার নির্গুণ চৈতন্যমাত্র, সাক্ষাৎ মূর্ত্তিমান্ বাপ নহেন, এ কথা মনে করিতেও অনেক সময়ে কষ্ট হইত:—

কাতর কিঙ্কর আমি, তোমার সন্তান।
আমার জনক তুমি, সবার প্রধান॥
বার বার ডাকিতেছি, কোথা ভগবান্।
এক বার তাহে তুমি নাহি দাও কাণ॥
সর্ব্বদিকে সর্ব্বলোকে কত কথা কয়।
শ্রবণে সে সব রব প্রবেশ না হয়॥
হায় হায় কব কায়, ঘটিল কি জ্বালা।
জগতের পিতা হ'য়ে তুমি হ'লে কালা॥
মনে সাধ কথা কই, নিকটে আনিয়া।
অধীর হ'লেম ভেবে বধির জানিয়া॥

এ ভক্তের স্তুতি নহে—এ বাপের উপর বেটার অভিমান। ধন্য ঈশ্বরচন্দ্র! তুমি পিতৃপদ লাভ করিয়াছ, সন্দেহ নাই। আমরা কেহই তোমার সমালোচক হইবার যোগ্য নহি।

বৈষ্ণবগণ বলেন, হনুমানাদি দাস্যভাবে, শ্রীদামাদি সখ্যভাবে, নন্দ-যশোদা পত্রভাবে এবং গোপীগণ কান্তভাবে সাধনা করিয়া ঈশ্বর পাইয়াছিলেন। কিন্তু পৌরাণিক ব্যাপার-সকল আমাদিগের হইতে এত দূর-সংস্থিত যে, তদালোচনায় আমাদের যাহা লভনীয়, তাহা আমরা বড় সহজে পাই না। যদি হনুমান, উদ্ধব, যশোদা বা শ্রীরাধাকে আমাদের কাছে পাইতাম, তবে সে সাধনা বুঝিবার চেষ্টা কতক সফল হইত। বাঙ্গালায় দুই জন সাধক আমাদের বড় নিকট। দুই জনই বৈদ্য, দুই জনই কবি। এক রামপ্রসাদ সেন, আর এক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। ইঁহারা কেহই বৈষ্ণব ছিলেন না, কেহই ঈশ্বরকে প্রভু, সখা, পুত্র বা কান্তভাবে দেখেন নাই। রামপ্রসাদ ঈশ্বরকে সাক্ষাৎ মাতৃভাবে দেখিয়া ভক্তি সাধিত করিয়াছিলেন—ঈশ্বরচন্দ্র পিতৃভাবে। রামপ্রসাদের মাতৃপ্রেমে আর ঈশ্বরচন্দ্রের পিতৃপ্রেমে ভেদ বড় অল্প।

তুমি হে ঈশ্বর গুপ্ত ব্যাপ্ত ত্রিসংসার।
আমি হে ঈশ্বর গুপ্ত—কুমার তোমার॥
পিতৃনামে নাম পেয়ে, উপাধি পেয়েছি।
জন্মভূমি জননীর কোলেতে বসেছি॥]
তুমি গুপ্ত আমি গুপ্ত, গুপ্ত কিছু নয়।
তবে কেন গুপ্তভাবে ভাব গুপ্ত রয়?]

পুনশ্চ—আরও নিকটে,—

তোমার বদনে যদি না সরে বচন।
কেমনে হইবে তবে কথোপকথন॥
আমি যদি কিছু বলি, বুঝে অভিপ্রায়।
ইসেরায় ঘাড় নেড়ে সায় দিও তায়॥]

যাহার এই ঈশ্বর-ভক্তি—যে ঈশ্বরকে এইরূপ সর্ব্বদা নিকটে, অতি নিকটে দেখে—ঈশ্বর-সংসর্গ-তৃষ্ণায় যাহার হৃদয় এইরূপে দগ্ধ—সে কি বিলাসী হইতে পারে? হয় হউক। আমরা এরূপ বিলাসী ছাড়িয়া সন্ন্যাসী দেখিতে চাই না।

তবে ঈশ্বর সন্ন্যাসী, হবিষ্যাশী বা অভোক্তা ছিলেন না। পাঁটা, তপ্‌সে মাছ বা আনারসের গুণ গায়িতে ও রসাস্বাদনে—উভয়েই সক্ষম ছিলেন। যদি ইহা বিলাসিতা হয়, তিনি বিলাসী ছিলেন। তাঁহার বিলাসিতা তিনি নিজে স্পষ্ট করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন:—

লক্ষ্মীছাড়া যদি হও খেয়ে আর দিয়ে।
কিছু মাত্র সুখ নাই হেন লক্ষ্মী নিয়ে॥
যতক্ষণ থাকে ধন তোমার আগারে।
নিজে খাও, খেতে দাও, সাধ্য-অনুসারে॥
ইথে যদি কমলার মন নাহি সরে।]
পঁ্যাচা ল'য়ে যান মাতা কৃপণের ঘরে॥

শাকান্ন মাত্র যে ভোজন না করে, তাহাকেই বিলাসি-মধ্যে গণনা করিতে হইবে, ইহাও আমি স্বীকার করি না। গীতায় ভগবদুক্তি এই:—

আয়ুঃসত্ত্ববলারোগ্য-সুখপ্রীতিবিবর্দ্ধনাঃ।
স্নিগ্ধা রস্যাঃ স্থিরা হৃদ্যা আহারাঃ সাত্ত্বিকপ্রিয়াঃ॥

স্থূলকথা এই—যাহা আগে বলিয়াছি—ঈশ্বর গুপ্ত মেকির বড় শত্রু। মেকি মানুষের শত্রু, এবং মেকি ধর্ম্মের শত্রু। লোভী, পরদ্বেষী অথচ হবিষ্যাশী ভণ্ডের ধর্ম্ম তিনি গ্রহণ করেন নাই। ভণ্ডের ধর্ম্মকে ধর্ম্ম বলিয়া তিনি জানিতেন না। তিনি জানিতেন, ধর্ম্ম ঈশ্বরানুরাগে—আহার-ত্যাগে নহে। যে ধর্ম্মে ঈশ্বরানুরাগ ছাড়িয়া পানাহার-ত্যাগকে ধর্ম্মের স্থানে খাড়া করিতে চাহিত, তিনি তাহার শত্রু। সেই ধর্ম্মের প্রতি বিদ্বেষবশতঃ পাঁটার স্তোত্রে, আনারসের গুণ-গানে [illegible]তপ্‌সের মহিমা-

বর্ণনায় কবির এত সুখ হইত। মানুষটা বুঝিলাম; নিজে ধার্ম্মিক, ধর্ম্মে খাঁটি, মেকির উপর খড়্গহস্ত। ধার্ম্মিকের কবিতায় অশ্লীলতা কেন দেখি, বোধ হয় তাহাও বুঝিয়াছি। বিলাসিতা কেন দেখি, বোধ হয় তাহা এখন বুঝিলাম।

ঈশ্বর গুপ্তের কবিতার কথা বলিতে বলিতে তাঁহার ব্যঙ্গের কথায়, ব্যঙ্গের কথা হইতে তাঁহার অশ্লীলতার কথায়, অশ্লীলতার কথা হইতে তাঁহার বিলাসিতার কথায় আসিয়া পড়িয়াছিলাম। এখন ফিরিয়া যাইতে হইতেছে।

অশ্লীলতা যেমন তাঁহার কবিতার এক প্রধান দোষ, শব্দাড়ম্বরপ্রিয়তা তেমনি আর এক প্রধান দোষ। শব্দচ্ছটায়, অনুপ্রাস-যমকের ঘটায় তাহার ভাবার্থ অনেক সময়ে একেবারে ঘুচিয়া মুছিয়া যায়। অনুপ্রাস-যমকের অনুরোধে অর্থের ভিতর কি ছাই-ভস্ম থাকিয়া যায়, কবি তাহার প্রতি কিছুমাত্র অনুধাবন করিতেছেন না দেখিয়া, অনেক সময়ে রাগ হয়, দুঃখ হয়, হাসি পায়, দয়া হয়,—পড়িতে আর প্রবৃত্তি হয় না। যে কারণে তাঁহার অশ্লীলতা, সেই কারণে এই যমকানুপ্রাসে অনুরাগ—দেশ, কাল, পাত্র। সংস্কৃত সাহিত্যের অবনতির সময় হইতে যমকানুপ্রাসের বড় বাড়াবাড়ি। ঈশ্বর গুপ্তের পূর্ব্বেই কবিওয়ালার কবিতায়, পাঁচালিওয়ালার পাঁচালিতে ইহার বেশী বাড়াবাড়ি। দাশরথি রায় অনুপ্রাস-যমকে বড় পটু—তাই তাঁহার পাঁচালি লোকের এত প্রিয় ছিল। দাশরথি রায়ের কবিত্ব না ছিল, এমত নহে। কিন্তু অনুপ্রাস-যমকের দৌরাত্ম্যে তাহা প্রায় একেবারে ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে; পাঁচালিওয়ালা ছাড়িয়া তিনি কবির শ্রেণীতে উঠিতে পান নাই। এই অলঙ্কার-প্রয়োগের পটুতায় ঈশ্বর গুপ্তের স্থান তাঁহার পরেই—এত অনুপ্রাস-যমক আর কোন বাঙ্গালীতে ব্যবহার করে নাই। এখানেও মার্জিত রুচির অভাব-জন্য বড় দুঃখ হয়।

অনুপ্রাস-যমক যে সর্ব্বত্রই দূষ্য, এমত কথা আমি বলি না। ইংরেজিতে ইহা বড় কদর্য্য শুনায় বটে, কিন্তু সংস্কৃতে ইহার উপযুক্ত ব্যবহার অনেক সময়েই বড় মধুর। কিছুরই বাহুল্য ভাল নহে—অনুপ্রাস-যমকের বাহুল্য বড় কষ্টকর। রাখিয়া-ঢাকিয়া, পরিমিতভাবে ব্যবহার করিতে পারিলে বড় মিঠে। বাঙ্গালাতেও তাই। মধুসূদন দত্ত মধ্যে মধ্যে পদ্যে অনুপ্রাসের ব্যবহার করেন,—বড় বুঝিয়া-সুঝিয়া, রাখিয়া-ঢাকিয়া ব্যবহার করেন—মধুর হয়। শ্রীমান্ অক্ষয়চন্দ্র সরকার গদ্যে কখন কখন দুই-এক বুঁদ অনুপ্রাস ছাড়িয়া দেন, রস উছলিয়া উঠে।

ঈশ্বর গুপ্তের এক-একটি অনুপ্রাস বড় মিঠে,—

বিবিজান চলে যান লবেজান ক'রে।

ইহার তুলনা নাই। কিন্তু ঈশ্বর গুপ্তের সময়-অসময় নাই, বিষয়-অবিষয় নাই, সীমা-সরহদ্দ নাই—একবার অনুপ্রাস-যমকের ফোয়ারা খুলিলে আর বন্ধ হয় না, আর কোন দিকে দৃষ্টি থাকে না, কেবল শব্দের দিকে। এইরূপ শব্দ-ব্যবহারে তিনি

অদ্বিতীয়। তিনি শব্দের প্রতিযোগিশূন্য অধিপতি। এই দোষ-গুণের উদাহরণ-স্বরূপ দুইটি গীত 'বোধেন্দুবিকাশ' হইতে উদ্ধৃত করিলাম :—

রাগিণী বেহাগ—তাল একতালা

কে রে বামা, বারিদবরণী,
তরুণী, ভালে ধ'রেছে তরণী,
কাহার' ঘরণী, আসিয়ে ধরণী, করিছে দনুজ-জয়।
হের হে ভূপ, কি অপরূপ, অনুপ রূপ, নাহি স্বরূপ,
মদন-নিধন-করণ-কারণ, চরণ-শরণ লয়॥
বামা হাসিছে, ভাষিছে, লাজ না বাসিছে,
হুহুঙ্কার-রবে সকল শাসিছে, নিকটে আসিছে,
বিপক্ষ নাশিছে, গ্রাসিছে বারণ-হয়।
বামা টলিছে চলিছে, লাবণ্য গলিছে,
সঘনে বলিছে, গগনে চলিছে,
কোপেতে জ্বলিছে, দনুজ দলিছে, ছলিছে ভুবনময়॥
কে রে, ললিতরসনা, বিকটদশনা,
করিয়ে ঘোষণা, প্রকাশে বাসনা,
হ'য়ে শবাসনা, বামা বিবসনা, আসবে মগনা রয়॥

রাগিণী বেহাগ—তাল একতালা

কে রে বামা, ষোড়শী রূপসী,
সুবেশী, এ যে নহে মানুষী,
ভালে শিশুশশী, করে শোভে অসি,
রূপমসী, চারু ভাগ।
দেখ, বাজিছে ঝম্প, দিতেছে ঝম্প,
মারিছে লম্ফ, হ'তেছে কম্প,
গল রে পৃথ্বী, করে কি কীর্ত্তি, চরণে কৃত্তিবাস॥
কে রে করাল-কামিনী, মরাল-গামিনী,
কাহার স্বামিনী, ভুবনভামিনী,
রূপেতে প্রভাত করেছে যামিনী,
দামিনীজড়িত-হাস।
কে রে যোগিনী-সঙ্গে, রুধির-রঙ্গে,
রণতরঙ্গে নাচে ত্রিভঙ্গে,
কুটিলাপাঙ্গে, তিমির-অঙ্গে, করিছে তিমির নাশ।
আহা, যে দেখি পর্ব্ব, যে ছিল গর্ব্ব,
হইল খর্ব্ব, গেল রে সর্ব্ব,
চরণসরোজে পড়িয়ে শর্ব্ব, করিছে সর্ব্বনাশ।

দেখি নিকট-মরণ, কর রে স্মরণ
মরণ-হরণ, অভয়-চরণ,
নিবিড় নবীন নীরদবরণ, মানসে কর প্রকাশ ॥

ঈশ্বর গুপ্ত অপূর্ব্ব শব্দকৌশলী বলিয়া তাঁহার যেমন এই গুরুতর দোষ জন্মিয়াছে, তিনি অপূর্ব্ব শব্দকৌশলী বলিয়া তেমনি তাঁহার এক মহৎ গুণ জন্মিয়াছে। যখন অনুপ্রাস-যমকে মন না থাকে, তখন (তাঁহার বাঙ্গালা ভাষা, বাঙ্গালা সাহিত্যে অতুল। যে ভাষায় তিনি পদ্য লিখিয়াছেন, এমন খাঁটি বাঙ্গালায়, বাঙ্গালীর এমন প্রাণের ভাষায় আর কেহ পদ্য কি গদ্য কিছুই লেখে নাই। তাহাতে সংস্কৃতজনিত কোন বিকার নাই--ইংরেজিনবিশীর বিকার নাই; পাণ্ডিত্যের অভিমান নাই--বিশুদ্ধির বড়াই নাই। ভাষা হেলে না, টলে না, বাঁকে না--সরল, সোজা পথে চলিয়া গিয়া পাঠকের প্রাণের ভিতর প্রবেশ করে।) এমন বাঙ্গালীর বাঙ্গালা ঈশ্বর গুপ্ত ভিন্ন আর কেহই লেখে নাই--আর লিখিবার সম্ভাবনাও নাই। কেবল ভাষা নহে--ভাবও তাই। (ঈশ্বর গুপ্ত দেশী কথা, দেশী ভাব প্রকাশ করেন। তাঁহার কবিতায় 'কেলাকা ফুল' নাই।)

ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা-প্রচারের জন্য আমরা যে উদ্‌যোগী, তাহার বিশেষ কারণ, তাঁহার ভাষার এই গুণ। খাঁটি বাঙ্গালা আমাদিগের বড় মিঠে লাগে--ভরসা করি, পাঠকেরও লাগিবে। এমন বলিতে চাই না যে, ভিন্ন ভাষার সংস্পর্শে ও সংঘর্ষে বাঙ্গালা ভাষার কোন উন্নতি হইতেছে না, বা হইবে না; হইতেছে ও হইবে। কিন্তু বাঙ্গালা ভাষা যাহাতে জাতি হারাইয়া, ভিন্ন ভাষার অনুকরণ-মাত্রে পরিণত হইয়া পরাধীনতা-প্রাপ্ত না হয়, তাহাও দেখিতে হয়। বাঙ্গালা ভাষা বড় দোটানার মধ্যে পড়িয়াছে। ত্রিপথগামিনী এই স্রোতস্বতীর ত্রিবেণীর মধ্যে আবর্ত্তে পড়িয়া আমরা ক্ষুদ্র লেখকেরা অনেক ঘুরপাক খাইতেছি। এক দিকে সংস্কৃতের স্রোতে মরাগাঙ্গে উজান বহিতেছে--কত 'ধৃষ্টদ্যুম্ন-প্রাড্‌বিবাক-মলিম্লুচ' গুণ ধরিয়া সেকেলে বোঝাই নৌকাসকল টানিয়া উঠাইতে পারিতেছে না; আর এক দিকে ইংরেজির ভরাগাঙ্গে বেনোজল ছাপাইয়া দেশ ছারখার করিয়া তুলিয়াছে--মাধ্যাকর্ষণ, যবক্ষারজান, ইবোলিউশন, ডিবলিউশন, প্রভৃতি জাহাজ, পিনেস, বজরা, ক্ষুদে লঞ্চের জ্বালায় দেশ উৎপীড়িত,--মাঝে স্বচ্ছসলিলা পুণ্যতোয়া কৃশাঙ্গী এই বাঙ্গালা ভাষার স্রোত বড় ক্ষীণ বহিতেছে। ত্রিবেণীর আবর্ত্তে পড়িয়া লেখক তুল্যরূপেই ব্যতিব্যস্ত। এ সময়ে ঈশ্বর গুপ্তের রচনার প্রচারে কিছু উপকার হইতে পারে।

ঈশ্বর গুপ্তের আর এক গুণ, তাঁহার কৃত সামাজিক ব্যাপার-সকলের বর্ণনা অতি মনোহর। তিনি যে সকল রীতি-নীতি বর্ণিত করিয়াছেন, তাহা অনেক বিলুপ্ত হইয়াছে বা হইতেছে। সে সকল পাঠকের নিকট বিশেষ আদরণীয় হইবে, ভরসা করি।

ঈশ্বর গুপ্তের স্বভাব-বর্ণনা 'নবজীবনে' বিশেষ প্রকারে প্রশংসিত হইয়াছে; আমরা ততটা প্রশংসা করি না। ফলে তাঁহার যে বর্ণনার শক্তি ছিল, তাহার সন্দে

নাই। ‘বর্ষাকালের নদী,’ ‘প্রভাতের পদ্ম’ প্রভৃতি কয়েকটি প্রবন্ধে তাঁহার পরিচয় পাইবেন।

স্থূল কথা, তাঁহার কবিতার অপেক্ষা তিনি অনেক বড় ছিলেন। তাঁহার প্রকৃত পরিচয় তাঁহার কবিতায় নাই। যাঁহারা বিশেষ প্রতিভাশালী, তাঁহারা প্রায় আপন আপন সময়ের অগ্রবর্ত্তী। ঈশ্বর গুপ্তও আপন সময়ের অগ্রবর্ত্তী ছিলেন। আমরা দুই–একটা উদাহরণ দিই।

প্রথম, দেশবাৎসল্য। দেশবাৎসল্য পরমধর্ম্ম, কিন্তু এ ধর্ম্ম অনেক দিন হইতে বাঙ্গালা দেশে ছিল না; কখনও ছিল কিনা, বলিতে পারি না। এখন ইহা সাধারণ হইতেছে দেখিয়া আনন্দ হয়, কিন্তু ঈশ্বর গুপ্তের সময়ে ইহা বড়ই বিরল ছিল। তখনকার লোকে আপন আপন সমাজ, আপন আপন জাতি, বা আপন আপন ধর্ম্মকে ভালবাসিত, ইহা দেশবাৎসল্যের ন্যায় নহে—অনেক নিকৃষ্ট। মহাত্মা রামমোহন রায়ের কথা ছাড়িয়া দিয়া রামগোপাল ঘোষ ও হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে বাঙ্গালা দেশে দেশবাৎসল্যের প্রথম নেতা বলা যাইতে পারে। ঈশ্বর গুপ্তের দেশবাৎসল্য তাঁহাদিগেরও কিঞ্চিৎ পূর্ব্বগামী। ঈশ্বর গুপ্তের দেশবাৎসল্য তাঁহাদের মত ফলপ্রদ না হইয়াও তাঁহাদের অপেক্ষাও তীব্র ও বিশুদ্ধ। নিম্নের কয় ছত্র পদ্য, ভরসা করি, সকল পাঠকই মুখস্থ করিবেন:—

ভ্রাতৃভাব ভাবি' মনে দেখ দেশবাসিগণে,
প্রেমপূর্ণ নয়ন মেলিয়া;
কতরূপ স্নেহ করি' দেশের কুকুর ধরি'
বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া।

তখনকার লোকের কথা দূরে থাক, এখনকার কয়জন লোক ইহা বুঝে? এখনকার কয়জন লোক এখানে ঈশ্বর গুপ্তের সমকক্ষ? (ঈশ্বর গুপ্তের কথায় যা, কাজেও তাই ছিল। তিনি বিদেশের ঠাকুরের প্রতি ফিরিয়াও চাহিতেন না, দেশের কুকুর লইয়াও আদর করিতেন।) মাতৃভাষা-সম্বন্ধে যে কবিতাটি আছে, পাঠককে তাহা পড়িতে বলি। ‘মাতৃ-সম মাতৃভাষা,’ সৌভাগ্যক্রমে এখন অনেকে বুঝিতেছেন, কিন্তু ঈশ্বর গুপ্তের সময়ে কে সাহস করিয়া এ কথা বলে? ‘বাঙ্গালা বুঝিতে পারি,’ এ কথা স্বীকার করিতে অনেকের লজ্জা হইত। আজিও না-কি কলিকাতায় এমন অনেক কৃতবিদ্য নরাধম আছে, যাহারা মাতৃভাষাকে ঘৃণা করে,—যে তাহার অনুশীলন করে, তাহাকেও ঘৃণা করে এবং আপনাকে মাতৃভাষা-অনুশীলনে পরাঙ্মুখ ইংরেজি-নবিশ বলিয়া পরিচয় দিয়া আপনার গৌরব-বৃদ্ধির চেষ্টা পায়। যখন এই মহাত্মারা সমাজে আদৃত, তখন এ সমাজ ঈশ্বর গুপ্তের সমকক্ষ হইবার অনেক বিলম্ব আছে।

দ্বিতীয়, ধর্ম্ম। ঈশ্বর গুপ্ত ধর্ম্মেও সমকালিক লোকদিগের অগ্রবর্ত্তী ছিলেন। তিনি হিন্দু ছিলেন, কিন্তু তখনকার লোকদিগের ন্যায় উপধর্ম্মকে হিন্দুধর্ম্ম বলিতেন না। এখন যাহা বিশুদ্ধ হিন্দুধর্ম্ম বলিয়া শিক্ষিত-সম্প্রদায়ে অনেকেই গ্রহণ

করিতেছেন, ঈশ্বর গুপ্ত সেই বিশুদ্ধ, পরম মঙ্গলময় হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই ধর্ম্মের যথার্থ মর্ম্ম কি, তাহা অবগত হইবার জন্য তিনি সংস্কৃতে অনভিজ্ঞ হইয়াও অধ্যাপকের সাহায্যে বেদান্তাদি দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন এবং বুদ্ধির অসাধারণ প্রাখর্য্য-হেতু সে সকলে যে তাঁহার বেশ অধিকার জন্মিয়াছিল, তাঁহার প্রণীত গদ্যে-পদ্যে তাহা বিশেষ জানা যায়।

তৃতীয়। ঈশ্বর গুপ্তের রাজনীতি বড় উদার ছিল। তাহাতেও যে তিনি সময়ের অগ্রবর্ত্তী ছিলেন, সে কথা বুঝাইতে গেলে অনেক কথা বলিতে হয়, সুতরাং নিরস্ত হইলাম।

১২৯২

অক্ষয়চন্দ্র সরকার

আধুনিক বঙ্গে গান বা গীতি-কাব্যের প্রভূত আধিপত্য। ইহার সাহিত্য সঙ্গীতময়; ইহার কাব্য সঙ্গীতময়; ইহার আমোদ-আহ্লাদ, বিলাস-কৌতুক সকলেই সঙ্গীত; ধ্যান, ধারণা, কীর্ত্তন, ভজন,—সঙ্গীতে; ক্রন্দন, কলহ—তাহাও সঙ্গীতে। বঙ্গদেশ যেমন গীতি-কবিতাকে আপনার সর্ব্বাবয়বের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা করিয়াছে, গীতি-কবিতাও সেইরূপ বঙ্গদেশকে গৌরবান্বিত করিয়াছে। বাঙ্গালির গীতি-কাব্য বাঙ্গালি বিচিত্র বিমানে অঙ্কিত করিয়া 'এই দেখ' বলিয়া জগতের সমক্ষে ধরিতে পারে। বৈষ্ণব ভক্তবৃন্দের মধুর পদাবলী, সাধক রামপ্রসাদ প্রভৃতির কালী-কীর্ত্তন, হরুঠাকুর প্রভৃতির কবিগান, নিধুবাবু প্রভৃতির টপ্পা—আমাদের গৌরবের সামগ্রী, পরিচয়ের স্থল। ইংরেজি সাহিত্যের আগমে বঙ্গসাহিত্য নূতন পরিচ্ছদে নিত্য পরিশোভিত হইতেছে, কিন্তু এখনও গীতি-কবিতা তেমনই উজ্জ্বলা; তেমনই মধুরা।

সেই 'জয় জগদীশ হরে!'—হইতে এই 'বন্দে মাতরম্!'—পর্য্যন্ত;

সেই "ললিত-লবঙ্গলতা-পরিশীলন-কোমল-মলয়-সমীরে,
মধুকর-নিকর-করম্বিত-কোকিল-কূজিত-কুঞ্জকুটিরে।"—হইতে

এই "শুভ্র-জ্যোৎস্না-পুলকিত-যামিনীং
ফুল্লকুসুমিত-দ্রুমদল-শোভিনীম্,"—পর্য্যন্ত

এক অনন্ত স্রোত, অনন্ত প্রবাহ অবিরাম গতিতে, অবিচ্ছিন্ন অবয়বে, দু'কূল ভাসাইয়া কুলু কুলু রব করিয়া, বাঙ্গালির প্রেমভক্তি, বাঙ্গালির অনুরক্তি, বাঙ্গালির কোমল হৃদয়ের কোমল ধর্ম্ম, বাঙ্গালির সরল প্রাণের তরল মর্ম্ম,—এই আট শত বৎসর সমানে বহিয়া

আনিয়া অনন্তের চরণ-প্রান্তে নীত করিতেছে। ইহাই বাঙ্গালির জীবন; ইহাই বাঙ্গালির ইতিহাস। আমরা ভাল বা মন্দ, আর পাঁচ জনে বিচার করুন; আমরা যে কি, তাহা অগ্রে আমাদের বুঝা চাই। আমরা স্বভাবের সৌন্দর্য্যের গোলাম; গোলাম বটে, কিন্তু পিয়ারের গোলাম; মনিবের হাবভাব, লীলা-লাবণ্য, রস-রঙ্গ —সকলই বুঝি; তিনি তাঁহার লীলাখেলা আমাদের দেখাইতে ভালবাসেন, আমরা দেখিতে ভালবাসি।

দুঃখও মজায়ে মজায়ে ভোগ করিতে শিখিয়াছি। দুঃখের মজা ক্রন্দনে; আমরা দুঃখে মজিতে জানি, কাঁদিতে জানি। কাঁদিতে কাঁদিতে গাহিতে জানি। গাহিতে গাহিতে সুখ-দুঃখের সমাধি-দাতাকে ডাকিতে জানি। স্বভাবের সৌন্দর্য্য-বোধের এই উচ্ছ্বাস, আর সেই সৌন্দর্য্য-উপভোগের উল্লাস, দুঃখের হৃদয়দ্রাবী ক্রন্দন, আর ক্রন্দনের পর নিবেদন, আর সুখ-দুঃখ সকল সময়েই ভক্তিভরে ভগবানের ভজন—এই পঞ্চোপকরণে বাঙ্গালির গীতি-কাব্য। আর সেই গীতি-কাব্যই বাঙ্গালির নিত্য জীবন এবং ধারাবাহিক ইতিহাস।

এই অনন্তচারিণী, সুখ-দুঃখ-ভক্তি-বাহিনী সুরধুনী-গীতি-কবিতার অমৃত-ধারার হরিদ্বার-ক্ষেত্র—জয়দেব গোস্বামী। জাহ্নবী সর্ব্বত্রই পূতসলিলা; তথাপি হরিদ্বার সেই পূতবারির পুণ্যতীর্থ। গীতগোবিন্দ সেইরূপ বাঙ্গালির গীতি-কাব্যের অপূর্ব্ব পুণ্যতীর্থ। বাঙ্গালায় যেখানে যে প্রবর, শাখা, সম্প্রদায় থাকুক, সকলেরই এক গোত্রে উৎপত্তি। বাঙ্গালায় গীতি-কাব্য একমাত্র জয়দেব-গোত্রজ।

জয়দেব প্রভৃতি বঙ্গে যেরূপ ভক্তি-ক্ষেত্র স্থাপনা করেন, সেইরূপ এক অভিনব সাহিত্য এবং সঙ্গীত-ক্ষেত্রও সংস্থাপন করেন। জয়দেবের ভাষা, জয়দেবের ছন্দ, জয়দেবের পদবিন্যাসপদ্ধতি এবং সঙ্গীত-রীতি, আর পাঁচটা জিনিষের সংঘর্ষণ পাইয়া ক্রমে ক্রমে এই ছন্দোবন্ধময়ী, পদলালিত্য-সমন্বিত, সঙ্গীত-জীবন বঙ্গভাষার সৃষ্টি করিয়াছে।

জয়দেবের ভাষা সংস্কৃত ও বাঙ্গালার মধ্যবর্ত্তিনী ভাষা। একটু অনুধাবন করিলেই গীতগোবিন্দের শ্রোতারা উহা উপলব্ধি করিতে পারেন।

"দিনমণি-মণ্ডল-মণ্ডন ভবখণ্ডন মুনিজন-মানস-হংস।
কালিয়-বিষধর-গঞ্জন জনরঞ্জন যদুকুল-নলিন-দিনেশ॥
মধু-মুর-নরক-বিনাশন গরুড়াসন সুর-কুল-কেলি-নিদান।
অমল-কমল-দল-লোচন ভবমোচন ত্রিভুবন-ভবন-নিধান॥"

বাঙ্গালির মুখে এরূপ নাম-সঙ্কীর্ত্তন 'বাঙ্গালা বলিব না ত, কি বলিব?

"চন্দন-চর্চ্চিত-নীল-কলেবর-পীতবসন-বনমালী"

আর

"ধীর-সমীরে যমুনাতীরে বসতি বনে বনমালী"

এইরূপ পদ-সকল চিরদিনই আদর্শ বাঙ্গালা বলিয়া গৃহীত হইবে।

"চল সখি কুঞ্জং সতিমিরপুঞ্জং শীলয় নীলনিচোলং"

—দূতীর মুখে এইরূপ ভারতী শুনিলে একটু হাসি পায়; মনে হয়, দূতী বুঝি আপনার উপদেশের গাম্ভীর্য্য-প্রদর্শন-জন্যই অনর্থক অনুস্বার দিয়া বাঙ্গালাকে সংস্কৃত করিতেছে। বাস্তবিক, জয়দেবের গানগুলির ভাষা এমনই সহজ, এমনই সরল, এমনই বাঙ্গালার মতনই বটে।

বাঙ্গালা পদ্যের ছন্দ প্রধানত দুইটি: পয়ার ও ত্রিপদী। ঐ দুইটির লঘু-গুরু, ভঙ্গ-অভঙ্গ, কুঞ্চিত-বিস্তৃত, মিত্র-অমিত্র করিয়া সমগ্র বাঙ্গালা কাব্য গ্রথিত হইয়াছে। তদ্ভিন্ন একাবলী-আদি যে সকল ছন্দ আছে, তাহার প্রায় সকলগুলিই বাঙ্গালা ছন্দের পরিবার-মধ্যে পরকীয়া পরিচারিকা,—বাঙ্গালার আসরে না নাচিতে পারে, না গাহিতে পারে; পাঁচটার মিশালে একটু আসর জাঁকাইয়া বসিয়া থাকে মাত্র। আসরের যুড়ী—পয়ার ও ত্রিপদী।

জয়দেবের গীতগোবিন্দে ঐ দুই ছন্দের পূর্ব্বাভাস সুস্পষ্ট পরিলক্ষিত হয়।

বাঙ্গালার কোন ছন্দই প্রথমে অক্ষরবৃত্তি ছিল না, সকল ছন্দই মাত্রাবৃত্তি ছিল। এক এক চরণে দশ হইতে বিশ পর্য্যন্ত অক্ষরসংখ্যা থাকিলেও ছন্দ সাধারণত পয়ার নামে অভিহিত হইত। একাবলী, দ্বাদশাক্ষরী প্রভৃতি ছন্দের পৃথক্ নাম ছিল না। পদ্য-মাত্রকেই পয়ার বলা হইত। দুই চরণে এক পয়ার; দুই চরণের শেষের দুই অক্ষরে মিল থাকিবে, আর প্রতি চরণে পাঁচ হইতে দশ যে-কোন অক্ষরের পর যতি থাকিলেই চলিবে। যখন চৌদ্দ অক্ষরের চরণ লইয়া পয়ার হইয়াছে, তখনও ছয়, সাত, আট —ইহার মধ্যে যে-কোন অক্ষরের পর যতি থাকিত। এমন কি, ভারতচন্দ্রেও এরূপ আছে। জয়দেবের অনেকগুলি গান এইরূপ পয়ার বলিলেই চলে:—

সরসমসৃণমপি মলয়জপঙ্কং।
পশ্যতি বিষমিব বপুষি সশঙ্কম্ ॥
দিশি দিশি কিরতি সজল-কণজালং।
নয়ন-নলিনমিব বিদলিত-নালম্ ॥
নয়ন-বিষয়মপি কিশলয়তল্পং।
গণয়তি বিহিত-হুতাশ-বিকল্পম্ ॥
ত্যজতি ন পাণি-তলেন কপোলং।
বালশশিমিব সায়মলোলম্ ॥
হরিরিতি হরিরিতি জপতি সকামং।
বিরহবিহিত-মরণেব নিকামম্ ॥

—এইটি চতুর্থ সর্গের গীতাংশ। এইরূপ ষষ্ঠের, সপ্তমের, নবমের এবং একাদশের অনেকগুলি গীতে দৃষ্ট হইবে। সকল স্থলেই দুই চরণ, শেষে মিল, চরণের মধ্যে যতি, এবং তের, চৌদ্দ বা পনের অক্ষর-মাত্র আছে।

ত্রিপদীতে দুই চরণ এবং চরণের শেষে পরস্পর মিল থাকে। প্রতি চরণে দুইটি করিয়া মধ্য-যুক্তি থাকে; তাহাতেই প্রতি চরণ ত্রিপদী হয়। দুইটি যতি-স্থলে

আবার মিল থাকে। জয়দেবে তিনটি ত্রিপদীর গান আছে :—একটির কিয়দংশ আমরা পূর্ব্বেই উদ্ধৃত করিয়াছি, 'দিনমণি-মণ্ডল-মণ্ডন ভবখণ্ডন' ইত্যাদি। এখনকার দিনে ঐটিকে ভঙ্গ-ত্রিপদী বলিতে হয়। আর একটিরও দুই চরণ (ধীরসমীরে ইত্যাদি, এবং চল সখি কুঞ্জং ইত্যাদি) উদ্ধৃত হইয়াছে। এইটি ত্রিপদী, তবে কোথাও পাঁচের পর, কোথাও ছয়ের পর মধ্য-যতি আছে। তৃতীয়টির ভণিতা এইরূপ :—

"ইহ রসভণনে কৃতহরিগুণনে মধুরিপু-পদসেবকে।
কলিযুগ-চরিতং ন বসতু দুরিতং কবি-নৃপ-জয়দেবকে ॥"

—ঐ তিনটি সম্পূর্ণ গান, ত্রিপদী। এক-আধ চরণ ত্রিপদী অন্য গানের মধ্যেও আছে। জয়দেবের প্রসিদ্ধ

" স্মরগরলখণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনং, দেহি পদ-পল্লবমুদারম্ "

এইরূপ।

জয়দেবের ভাষা ও ছন্দের সম্বন্ধে বোধ হয় যথেষ্ট বলা হইল। এক্ষণে তাঁহার গান-সম্বন্ধে কিছু বলিব। বাঙ্গালার কীর্ত্তনাঙ্গ সঙ্গীত-নায়কগণের নিকট বড় আদরের জিনিষ, অথচ সাধারণের হৃদয়গ্রাহী। এরূপ হৃদয়দ্রাবিণী করুণা-গীতি জগতে আর আছে কি-না জানি না। কীর্ত্তনে সমজ্দার অসমজ্দার নাই। যে কোন ভাবের মানুষ হও না, ভদ্র-অভদ্র, সাধু-ভণ্ড, মূর্খ-জ্ঞানী, দুঃখি-ধনী—কীর্ত্তন সকলকে সমতলে বসাইবে; হৃদয় গলাইবে; দুই গণ্ড দিয়া দর-বিগলিত ধারা বহাইবে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, দুঃখের মজা ক্রন্দনে। এখন বলি, ক্রন্দনের মজা কীর্ত্তনে। বাঙ্গালি কান্নার মজা জানে বলিয়াই কীর্ত্তন পাইয়াছে; আর কীর্ত্তন পাইয়াছে বলিয়াই কান্নার মজা বুঝিয়াছে। যে কাঁদে নাই, সে মানুষ নহে; আর যে কীর্ত্তনে কাঁদে নাই, সে বাঙ্গালি নহে। এই কীর্ত্তনের পরিচিত আদিগুরু—জয়দেব গোস্বামী।

জয়দেবের পদাবলী আজি আট শত বৎসর ধরিয়া, সমানে একই ভাবে গীত হইতেছে। আর কোন সঙ্গীতকারের এমন শুভাদৃষ্ট হইয়াছে কি-না, জানি না। বেদের সামগীতি বা দায়ূদের সামগীতি (Psalms) সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া গীত হইতেছে বটে, কিন্তু সে সকল মানব-জীবনের অত্যদ্ভুত স্ফূর্ত্তি-ব্যঞ্জক বিকাশ, এবং মানব-হৃদয়ের আশ্চর্য্য উচ্ছ্বাস হইলেও সঙ্গীত নহে; তালের খেলা, তানের লীলা, যন্ত্রযোগে স্বর-সঙ্গতি, দ্রুত বিলম্বিত গতি, এ সকল তাহাতে নাই। সামগানাদি সঙ্গীত নহে। জয়দেবের গীতগোবিন্দ কিন্তু রাগে-তালে, সুরে-লয়ে ভরপূর। এই বিগত আট শত বৎসর বাঙ্গালি সঙ্গীত-চর্চায় শিথিল-প্রযত্ন হয় নাই; বনের মধ্যে বন-বিষ্ণুপুর দিল্লীর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়াছে; পাহাড়ের উপর ত্রিপুরা নানা রাগের ধ্রুবপদের সৃষ্টি করিয়াছে; আর বঙ্গ-কেন্দ্র নবদ্বীপে মহাপ্রভু অবতীর্ণ হওয়াতে, সমগ্র বঙ্গের সর্ব্বত্র গোস্বামী বৈষ্ণবগণ কীর্ত্তনের ঐকান্তিকী সাধনা করিয়াছেন। এত সাধনাতেও আধুনিক কীর্ত্তন কিন্তু জয়দেবকে এক বিন্দু অতিক্রম

করিতে পারে নাই। কোরানের ভাষার মত জয়দেবের কীর্ত্তন চিরদিনই অননুকরণীয় এবং অনুল্লঙ্ঘনীয় রহিয়াছে, অথচ একই ভাবে সমানে গীত হইতেছে। তাহাতেই বলিতেছিলাম, আর কোন সঙ্গীতকারের যে এমন শুভাদৃষ্ট হইয়াছে, তাহা জানি না। জয়দেব আমাদের আদি অথচ চিরকালই জীবন্ত গুরু।

জয়দেব হইতে যে কেবল বঙ্গের কীর্ত্তনাঙ্গের উৎপত্তি হইয়াছে, এমন নহে,—পাঁচালি প্রভৃতিও জয়দেবের অনুকরণে সৃষ্ট হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হয়।

গান-সময়ে গায়কের স্থিতি ও গতি-বিভেদ উপলক্ষ্য করিয়া বাঙ্গালায় গান-পদ্ধতির বিভেদ হইয়াছে এবং ভিন্ন নামকরণ হইয়াছে। গায়কেরা পাদচারণ করিয়া বেড়াইলে পাঁচালি, নাচিয়া নাচিয়া গাহিলে নাচাড়ি, বসিয়া গান করিলে বৈঠকী, ও কেবল দণ্ডায়মান থাকিয়া গান করিলে দাঁড়া-গান। যে-কোন প্রকারের গান, গায়ক যে-কোন ভঙ্গিতে গাহিবেন, এমন নহে; এক একরূপ কেতার গান এক একরূপ ধরণে গীত হইত; এখনও প্রায় তাহাই হয়। কৃত্তিবাসের রামায়ণ প্রধানত পাঁচালি। কবিকঙ্কণের চণ্ডীমঙ্গলে পাঁচালি ও নাচাড়ি—দুই আছে; নাচাড়ি অতি অল্প। আমরা যত দূর দেখিয়াছি, তাহাতে ধর্ম্মের গানে নাচাড়ি খুব বেশী ছিল। তখনকার ধ্রুবপদ ও ভজন, সঙ্গে সঙ্গে এখনকার খেয়াল, ঠুংরি, টপ্পা—এই সকল প্রধানত বৈঠকী গান। কীর্ত্তন পত্তনে প্রধানত বৈঠকী। প্রাচীন সখী-সম্বাদাদি দাঁড়া-কবি বলিয়া পরিচিত।

প্রাচীন পাঁচালি-পদ্ধতির বক্ষ্যমাণ লক্ষণগুলি দেখিতে পাওয়া যায়,—পাঁচালিতে গান থাকে, ও ছড়া বা পয়ার থাকে। ইহাতেই সাধারণ ভাষায় বলে, 'খানিক তার রাগ-রাগিণী আর খানিক তার মুখ-জবানী।' পাঁচালিতে যে গান বা 'পদ' থাকিত, তাহার মুখটুকু ধ্রুব বা স্থির পদ; ইহাকেই ধুয়া বলিত, আর বাকিটুকু অন্তরা। অন্তরায় দুই, চারি বা অনেক কলি থাকিত, প্রত্যেক কলির পর ধুয়াটি গাহিতে হইত। ছড়ার পর গান, আবার ছড়া, আবার গান, এইরূপ ক্রমাগত থাকে। প্রতি ছড়া ও তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী গান প্রায় একই ভাবের হয়; অর্থাৎ যে বিষয়ের গান সেই বিষয়েরই ছড়া হয়। বর্ত্তমান সময়ে পাঁচালি প্রায় ঐরূপই আছে, তবে গানের মুখভাগ এখন আর প্রায়ই ধুয়ার মত করিয়া গীত হয় না।

জয়দেবের গীতগোবিন্দ বাঙ্গালার আদি পাঁচালি বলিলেও চলে। ইহাতে ছড়া, গান, ধুয়া, অন্তরা ঠিক পাঁচালির মতনই আছে; তবে বাঙ্গালায় যাহাকে 'ছড়া' বলে, সংস্কৃতে তাহাকে 'শ্লোক' বলিতে হয়, এই মাত্র প্রভেদ। জয়দেব-কৃত প্রসিদ্ধ দশাবতার-বর্ণনে, 'জয় জগদীশ হরে!' এইটুকু ধ্রুবপদ বা ধুয়া। আর—

"প্রলয়-পয়োধি-জলে ধৃতবানসি বেদং
বিহিত-বহিত্র-চরিত্রমখেদম্।
কেশবধৃত-মীন-শরীর—"

ইত্যাদি দশটি পদ দশটি কলি। প্রতি কলির শেষে ধুয়া ধরিতে হয়—'জয় জগদীশ হরে!' আর শেষের এই শ্লোকটি ছড়া—

"বেদানুদ্ধরতে জগন্তি বহতে ভূগোলমুদ্বিভ্রতে,
দৈত্যং দারয়তে বলিং ছলয়তে ক্ষত্রক্ষয়ং কুর্ব্বতে।
পৌলস্ত্যং জয়তে হলং কলয়তে কারুণ্যমাতন্বতে,
ম্লেচ্ছান্ মূর্চ্ছয়তে দশাকৃতিকৃতে কৃষ্ণায় তুভ্যং নমঃ॥"

জয়দেবে প্রায়ই অগ্রে গান, তাহার পর সেই বিষয়ের শ্লোক বা সংস্কৃত ছড়া আছে। জয়দেবের দশাবতার-বর্ণনের গানটি ছাড়া আর সকল গানেই আটটি করিয়া কলি এবং এক একটি ধুয়া আছে; শেষের কলিটিতে ভণিতা থাকে, তাহাতে ধুয়া লাগে না।

জয়দেবের গানে এবং শ্লোকে বিভেদ না বুঝিয়া ক্বচিৎ কোন কোন গায়কে দুই-একটি শ্লোকও গান করিয়া থাকেন, কিন্তু ভাল গায়কে প্রায়ই সেরূপ ভুল করেন না। গীতগোবিন্দ হইতেই যে ধুয়া-লাগানো গান এবং সেই গান ও ছড়ার মিশালে পাঁচালি সৃষ্ট হইয়াছে, তাহা একরূপ অনুমান করিতে পারা যায়। অন্তত, এ কথা বলিতে পারা যায় যে, ঐরূপ ছড়া, গান ও ধুয়া-মিশ্রিত কোনরূপ ধরণ যে জয়দেবের পূর্ব্বে বঙ্গদেশে ছিল, তাহার কোন প্রমাণ নাই। বঙ্গের কীর্ত্তনাঙ্গের সহিত যে গীতগোবিন্দের ঠিক সেইরূপ সম্বন্ধ, তাহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। নাচাড়ি-গান পাঁচালির অঙ্গজ, কিন্তু কখন স্বতন্ত্র ছিল কি-না সন্দেহ। তখনও যেমন ছিল, এখনও সেইরূপ,—রামায়ণ, চণ্ডীর গান প্রভৃতির অঙ্গীভূত হইয়া আছে।

উত্তর-পশ্চিম ও বেহার প্রদেশ ধরিয়া বলিতে গেলে 'রামযাত্রা'ই আদি-যাত্রা। রামায়ণ ও রামযাত্রা—একই কথা। অয়ন এবং যাত্রা—দুই কথার একই অর্থ। রামযাত্রা নামের অনুকরণে—'কৃষ্ণযাত্রা' কথার সৃষ্টি হয়; ক্রমে অভিনয়-মাত্রই যাত্রা হইয়াছে। রামায়ণের আদি-গায়ক কুশ ও লবের নামে অভিনেতা মাত্রের নাম কুশীলব হইয়াছে। হিন্দুস্থানের 'রাম'যাত্রায় এখনও দুই জন বালক কুশীলব —প্রধান গায়ক। এই দুই বালক-অভিনেতার, অর্থাৎ কুশীলবের অনুকরণে বাঙ্গালায় যাত্রার যুড়ী হইয়াছে। সমগ্র হিন্দুস্থানে আদি-যাত্রা রামযাত্রা হইলেও ইদানীন্তন বঙ্গে সর্ব্বাগ্রে কৃষ্ণযাত্রার সৃষ্টি হইয়াছে। কুশীলবের পরিবর্ত্তে শ্রীদাম-সুবলের যুড়ী করিয়া কৃষ্ণযাত্রার অবতারণা হয়। বোধ হয়, প্রথম যাত্রায় কালীয়-দমনের পালা গীত হইয়া থাকিবে, নহিলে পূর্ব্বে কৃষ্ণযাত্রা-মাত্রকেই কালীয়-দমন বলিবে কেন? যদিও জয়দেবের বহুকাল পরে বঙ্গে কালীয়-দমনের সৃষ্টি হয়, তথাপি জয়দেবের পদাবলী কালীয়-দমন যাত্রার জান্ ছিল। প্রথমে পরমানন্দ অধিকারী, তাঁহার পরে বদন ও গোবিন্দ অধিকারী যাত্রার মধ্যে জয়দেবের পদাবলী আবৃত্তি করিতেন, ব্যাখ্যা করিতেন, গান করিতেন; মধ্যে মধ্যে ঘটকালি

ও কথোপকথন থাকিত মাত্র। জয়দেবের সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন মহাজন-পদাবলীও আবৃত্ত, গীত ও ব্যাখ্যাত হইত। এখনও নীলকণ্ঠ গীতরত্ন সেই প্রাচীন পদ্ধতি রক্ষা করিতেছেন।

বাঙ্গালার কবির গান প্রধানত চারি ভাগে বিভক্ত—ঠাকুরণবিষয়, সখীসম্বাদ, বিরহ ও খেঁউড়। তাহার মধ্যে ঠাকুরণ-বিষয় কেবল বন্দনা বলিলেই হয়, আর দুর্গোৎসব-সময়ে বিশিষ্ট লোকের ভবনে কবিগান হইত বলিয়া ঠাকুরণ-বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গে আগমনী, অষ্টমী, বিজয়া প্রভৃতি গীত হইত। খেঁউড়, কবির পূর্ব্ব হইতেই বঙ্গদেশে প্রচলিত ছিল; বাঙ্গালার রুচির গুণে কবিগান যখন পক্ষ বিস্তার করিয়া বাঙ্গালা জুড়িয়া বসিতেছিল, তখন ইহার পুচ্ছধারী হইয়াছিল মাত্র। সুতরাং কবির প্রধান অঙ্গ সখীসম্বাদ ও বিরহ।

দেখিতে গেলে, গীতগোবিন্দের বার-আনা ভাগ সখীসম্বাদ। প্রথম সর্গে মূল গ্রন্থারম্ভ সখীসম্বাদে—"রাধাং সরসমিদমূচে সহচরী।" ইহাতে জয়দেবের প্রসিদ্ধ সরস-বসন্ত-সময়-বন-বর্ণন। প্রথম সর্গের দ্বিতীয় কল্পেও সখ্যুক্তি—"সখীসমক্ষং পুনরাহ রাধিকাম্।" ইহাতে শ্রীহরির রাস-বিলাস-বর্ণন। দ্বিতীয় সর্গে, সখীর প্রতি রাধিকার উক্তি। ইহাকেও সখীসম্বাদ বলা যায়। তৃতীয় সর্গে, শ্রীহরির স্বগত বিলাপ। আবার চতুর্থ সর্গে, শ্রীহরি-সমীপে সখীসম্বাদ। পঞ্চমে, রাধিকার নিকটে সখীসম্বাদ। ষষ্ঠে, আবার শ্রীহরির নিকটে সখীসম্বাদ। এই তিনটিতে নায়ক-নায়িকার বিরহ-বর্ণন। সপ্তমে, রাধিকা স্বগতা। সপ্তমের দ্বিতীয় কল্পে, সখীর প্রতি রাধিকা। শেষের শ্লোক কয়টি আবার স্বগত। অষ্টমে, রাধা-কৃষ্ণ-সম্বাদ। নবমে, সখীসম্বাদে রাধিকাকে প্রবোধদান। দশমে, শ্রীহরি-কর্ত্তৃক রাধিকার মানভঞ্জন। একাদশের প্রথম কল্পে, সখীসম্বাদে উপদেশ। একাদশের দ্বিতীয় কল্প হইতে দ্বাদশের শেষ পর্য্যন্ত মিলন। তাহাতেই বলিতেছিলাম, জয়দেবের বার-আনা ভাগ সখীসম্বাদ; তবে মাথুর-সখীসম্বাদ জয়দেবের নাই। জয়দেবের সখী-সম্বাদের প্রায় অর্দ্ধেক বসন্ত- ও বিরহ-বর্ণন। সুতরাং এদিকেও দেখা যায়, জয়দেব হইতেই সখীসম্বাদের ভাবভঙ্গি এবং বিরহের উপকরণ অনুকৃত, আকৃষ্ট ও সংগৃহীত হইয়াছে।

এই সমালোচনায় আমরা একরূপ বুঝিতে পারিতেছি যে, বাঙ্গালার কি কীর্ত্তন, কি পাঁচালি, কি যাত্রা, কি কবি—অল্প-বিস্তর, কোনো-না-কোন বিষয়ে, জয়দেব গোস্বামীর কাছে সকলেই ঋণী। এখনও বঙ্গের গীতি-সাহিত্য সেই মহাজনের দ্বারস্থ, তাঁহার নিকট পদানত।

জয়দেব, এক দিক্ দিয়া দেখিলে, যেমন বঙ্গের গীতি-গঙ্গাস্রোতের হরিদ্বার-স্বরূপ—আমাদের মূল প্রস্রবণ, চির মহাজন মহাগুরু এবং আদিকবি; সেইরূপ অন্য দিক্ দিয়া দেখিলে, সংস্কৃত-রূপ বিশাল ভারতসাগরে জয়দেবের গীতগোবিন্দ আমাদের গঙ্গাসাগর।

হরিদ্বারই বল, আর গঙ্গাসাগরই বল, জয়দেব উভয় ভাবেই আমাদের পুণ্যতীর্থ। গঙ্গাসাগর বিশাল ভারতসাগরের অতি ক্ষুদ্র অংশ হইলেও আমাদের নিজস্ব সাগর; আমাদের কূল-প্লাবন, কুল-পাবন।

বঙ্গের সাহিত্য-জগতে জয়দেব আদিগুরু; তিনি গীতিকাব্যের কল্পতরু। বঙ্গের ধর্ম্ম-জগতে জয়দেব কোমল-কর চন্দ্রমা, চৈতন্যদেব প্রদীপ্ত সূর্য্য। এই চন্দ্র-সূর্য্যের আলোক-উত্তাপে বঙ্গ-বৈষ্ণবের দিবা-বিভাবরী আলোকিত ও পুলকিত রহিয়াছে।

[নবজীবন, ১২৯৩]

বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস

বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর

বঙ্গ-সাহিত্যের প্রথম কবি বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস। দুই জনে সমসাময়িক লোক ছিলেন, সমান বিষয় লইয়াই দুই জনের কবিতা—রাধাকৃষ্ণের মিলন-বিরহ, মানাভিমান, পূর্ব্বরাগ-অনুরাগ। কিন্তু বিষয় এক হইলেও দুই জন কবির ভাব অবশ্য সম্পূর্ণ এক নহে, দুই জনের বর্ণনার মধ্যে একটা বিশেষ স্বাতন্ত্র্য লক্ষিত হয়। বিদ্যাপতি আপন হৃদয়ের মধ্য দিয়া রাধাকৃষ্ণকে দেখিয়াছেন, আপন রুচি-অনুযায়ী আঁকিয়াছেন, সাজাইয়াছেন; চণ্ডীদাসও নিজের মত করিয়া তাঁহাদিগকে গড়িয়াছেন, নিজের হৃদয়ের ভাব দিয়া তাঁহাদের প্রেম বর্ণনা করিয়াছেন। সুতরাং হৃদয়ের একই ভাব বর্ণনা করিতে বসিলেও উভয় কবির বর্ণনা যে বিভিন্ন হইবে তাহাতে আশ্চর্য্য কিছুই নাই। বিদ্যাপতিও রাধার রূপ খুলিয়া বলিয়া গিয়াছেন, চণ্ডীদাসও রাধার রূপের বর্ণনা করিয়াছেন; তাই বলিয়া দুই জনের রূপ-বর্ণনা কি একই রকম? দুই জনেই রাধার রূপের সুখ্যাতি করিয়াছেন, দুই জনেই রাধাকে সুন্দরী বলিয়াছেন, সে সুন্দরী বাঙ্গালাদেশের সুন্দরী—সেই কৃষ্ণ কেশগুচ্ছ, সেই মৃগলোচন, সেই চন্দ্র-বদন, কিন্তু তথাপি দুই জনের বর্ণনা—কি তফাৎ! এক বর্ণনার মর্ম্মে মর্ম্মে বিদ্যাপতি, আর এক বর্ণনার মর্ম্মে মর্ম্মে চণ্ডীদাস। লেখার সহিত গ্রন্থকার অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধে জড়িত।

শুধু ভাবের কথা কেন, বিদ্যাপতির সহিত চণ্ডীদাসের ভাষারও বিস্তর প্রভেদ। বিদ্যাপতি হিন্দীর ধারে ধারে ফিরিয়াছেন, তাঁহার অনেক কথা স্পষ্ট হিন্দী; চণ্ডীদাস বাঙ্গালী, তাঁহার লেখায় হিন্দী বড় একটা জোর করিয়া উঠিতে পারে নাই, তবে প্রাচীন বাঙ্গালার হিন্দীর সহিত সম্পর্ক আছে যে, ইহা বুঝা যায়। বিদ্যাপতি বাছিয়া বাছিয়া

মধ্যে মধ্যে শ্রুতিমধুর কথা সংগ্রহ করেন, তাঁহার সাজ-সজ্জার একটু পারিপাট্য আছে; চণ্ডীদাস সাদাসিধা, ভাব আসিতেই হুহু করিয়া লিখিয়া যান, অন্যদিকে তাঁহার বড়-একটা লক্ষ্য থাকে না। বিদ্যাপতি যেন কিছু গুছাইয়া বসিয়াছেন; চণ্ডীদাসের কোন দিকে খেয়াল নাই।

বিদ্যাপতি অপেক্ষা চণ্ডীদাসকে প্রেমের কবি বলা যাইতে পারে। প্রেমের সুরে চণ্ডীদাস যেমন গাহিতে পারিয়াছেন, বিদ্যাপতি তেমন পারেন নাই। চণ্ডীদাসের কবিতার সর্ব্বত্রই প্রেমের বিশেষ বিকাশ হইয়াছে। সুখের প্রতিই তাঁহার এক মাত্র টান নহে। একটা উচচ ভাবের প্রতি তাঁহার লক্ষ্য আছে—প্রেম আর মোহ যে সম্পূর্ণ বিভিন্ন পদার্থ তাহা তিনি জানেন। চণ্ডীদাস ত বলিয়াছেন,

" পিরীতি না কহে কথা।
পিরীতি লাগিয়া পরাণ ছাড়িলে
পিরীতি মিলায় তথা ॥"

বাস্তবিক, প্রেম কি যেখানে সেখানে মিলে? প্রেমের দুয়ারে যে প্রাণ বলি দিতে পারে, সেই প্রেম পায়। আপনাকে প্রেমে ঢালিয়া দিতে হইবে, প্রেমে আর আপনার স্বাতন্ত্র্য থাকিবে না। যাহারা সুখের জন্য প্রেম চাহে, তাহাদের কপালে সুখ উঠে না।

" সুখের লাগিয়া যে করে পিরীতি
দুখ যায় তার ঠাঞি ॥"

আমাদের বর্ত্তমান ‹ ‹ন কবিও তাহাই বলিয়াছেন, " এরা সুখের লাগি চাহে প্রেম, প্রেম মেলে না।" চণ্ডীদাস পিরীতিকে সকল রসের সার বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন,

" পিরীতি রসের সার।
পিরীতি রসের রসিক নহিলে
কি ছার পরান তার ॥"

বিদ্যাপতিও প্রেমের উপরে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু চণ্ডীদাসের মত উচচভাবের কথা তাঁহার মন্তব্যে পাওয়া যায় না। বিদ্যাপতি কহিয়াছেন,

" প্রেম কারণ জীউ উপেখয়ে
জগজন কো নাহি জানে।"

প্রেমের জন্য জীবন উপেক্ষা করে, বিদ্যাপতি স্বীকার করিয়াছেন, তথাপি চণ্ডীদাসের উপরি-উদ্ধৃত কবিতায় প্রেমের মহান্ ভাব যেমন ব্যক্ত হইয়াছে, বিদ্যাপতির লেখায় কি এ ভাব তেমন পরিস্ফুট হইয়াছে? চণ্ডীদাসের কথার ধরণে একটা সরল সুন্দর ভাব আছে, বিদ্যাপতিতে তাহা নাই। কিন্তু পাঠকেরা একেবারে হতাশ

হইবেন না, বিদ্যাপতির দুই একটি গান যাহা আছে, তাহা বাঙ্গালা সাহিত্যের বিশেষ গৌরব, অন্য কোনও সাহিত্যে বোধ করি তেমনটি নাই।

চণ্ডীদাস প্রেমের জ্বালা বেশ বুঝেন, জ্বালা যাহারা সহিতে পারে না তাহারা প্রেমের রাজ্যে বাস করিবার অযোগ্য। জ্বলনই ত প্রেম, সুখের মাঝে কি প্রেম তেমন ফুটিতে পায় ?

"দ্বিজ চণ্ডীদাসে বলে পিরীতি এমতি।
যার যত জ্বালা তার ততই পিরীতি॥"

চণ্ডীদাস আর এক স্থলে বলিয়াছেন,

"সদা জ্বালা যাব, তবে ত তাহার
মিলয়ে পিরীতি ধন।"

কিন্তু থাক্, শুধু শেষ দুই লাইনের মন্তব্যটুকু দেখিয়া দুই জন কবির স্বাতন্ত্র্য সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করা যায় না। দুই জনের রূপ-বর্ণনা, দুই জনের মিলন-বিরহের ভাবপ্রকাশ, দুই জনের উপমা-অলঙ্কার, এ সকল বিশেষ করিয়া মিলাইয়া দেখিতে হইবে। তবেই না দুই জন কবির স্বাতন্ত্র্য সম্যক্‌রূপে হৃদয়ঙ্গম হইবে? চণ্ডীদাস যে প্রেমধনে ধনী, সে বিষয়ে আমাদের সংশয় না থাকিতে পারে, কিন্তু আরও কিছু না বলিলে—আরও ভাল করিয়া বিদ্যাপতির রচনার সহিত তাঁহার লেখার তুলনা না করিলে আমরা দুইজন কবির প্রাণ ধরিতে পারি না।

চণ্ডীদাসকে বিদ্যাপতির সহিত তুলনায় আমরা দুঃখের কবি বলিতে পারি। চণ্ডীদাস যে তাঁহার লেখায় অনবরত দুঃখের কথা পাড়িয়াছেন তাহা নহে, কিন্তু তাঁহার রচনায়, হয়ত অজ্ঞাতসারে, কেমন একটা দুঃখের ভাব প্রবেশ করিয়াছে। লেখা দেখিয়া মনে হয়, কবির জীবনে তেমন সুখের প্রসাদলাভ ঘটে নাই। প্রাচীন কবিদিগের সম্বন্ধে নিঃসন্দিগ্ধ চিত্তে আমরা কিছু বলিতে পারি না—যেখানে পণ্ডিতদিগেরই পদস্খলন-সম্ভাবনার অসদ্ভাব নাই, সেখানে আমরা জোর করিয়া মন্তব্য প্রকাশ করি কিরূপে? কিন্তু বোধ হয়, চণ্ডীদাসের জীবনে দুঃখ-কষ্টের বিশেষ প্রভাব পড়িয়াছে। মোদ্দা তাহা হৌক বা না হৌক, তাঁহার হৃদয় দুঃখভাবসিক্ত ছিল সন্দেহ নাই। কিন্তু আপাততঃ সে কথা লইয়া তর্ক করিতে বসিবার আবশ্যকতা দেখি না। কথাটায় তর্কের বিশেষ কিছু নাইও।

বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস উভয়েই শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বরাগ বর্ণনা করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ রাধার রূপে হৃদয় হারাইয়াছেন, রাধার সৌন্দর্য্যে কোনও পবিত্র মহান্ ভাবের বিকাশ দেখিয়া নহে, রাধার রাঙ্গা অধরে, নলিন নয়নেই তিনি আকৃষ্ট। শ্রীকৃষ্ণের প্রেম—যদি ইহাকেও প্রেম বলিতে হয়—রূপজ-মোহ মাত্র। অতীন্দ্রিয় ভাবের এখানে সম্পূর্ণ অভাব। এ প্রেম যৌবনের জোয়ারেই টিঁকিয়া থাকে, তাহার পর যৌবনাবসানে মরিয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণ গুণের অথবা উচ্চ ভাবের ধার দিয়াও যান নাই। ভোগলালসা

পরিতৃপ্তি বৈ তাঁহার অপর কোনও উদ্দেশ্য দেখা যায় না। এখন দেখিতে হইবে, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণ রাধার সৌন্দর্য্য কিরূপ দেখিয়াছেন।

বিদ্যাপতির শ্রীকৃষ্ণ 'রাধার বাহ্যসৌন্দর্য্য' বৈ কিছুই দেখেন নাই। তিনি রাধার প্রত্যেক অঙ্গ স্বতন্ত্রভাবে দেখিয়াছেন—অধরের রাঙিমা, নয়নের চাহনি, চরণের গজেন্দ্র গমন। রাধা হাসিয়া কথা বলিতেছেন, সে হাসির সৌন্দর্য্য কিরূপ? না, শরৎ পূর্ণিমার চন্দ্র যেন অমৃত বর্ষণ করিতেছে। বিদ্যাপতির কৃষ্ণ রাধার সকল বাহ্যসৌন্দর্য্য এক করিয়া মোটামুটি ভাবে প্রায় দেখেন নাই। কেবল দু'এক জায়গায় রাধাকে এক করিয়া দেখিয়াছেন মাত্র। সেখানে রাধার সহিত নিষ্কলঙ্ক চন্দ্রের তুলনা করিয়াছেন। অন্য উপমাও এক আধটি আছে। কিন্তু সকল উপমাই রাধার বাহিরের জিনিসে—তা' চন্দ্রেই হৌক, বিদ্যুতেই হৌক, আর যাহাতেই হৌক। শ্রীকৃষ্ণের উপর সে সৌন্দর্য্যের প্রভাব একটী শ্লোকে বেশ ভাল করিয়া প্রকাশ পাইয়াছে। সে শ্লোকটী,

"সজনি ভাল করি পেখন না ভেল।
মেঘ-মালা সঞে তড়িত-লতা জন
হৃদয়ে শেল দেই গেল॥" ইত্যাদি।

চণ্ডীদাসের কৃষ্ণও রাধার বাহ্যসৌন্দর্য্য-মুগ্ধ। তিনিও রাধার বদনকমল, হরিণনয়ন দেখিয়াছেন। কিন্তু চণ্ডীদাসের কৃষ্ণ বিদ্যাপতির কৃষ্ণ অপেক্ষা রাধাকে দেখিয়াছেন ভাল করিয়া। বিদ্যাপতির কৃষ্ণ রাধার তাঁহার প্রতি লক্ষ্যই অধিক নিরীক্ষণ করিয়া দেখিয়াছেন, সমস্ত রাধাকে দেখিবার—তেমন বিশেষ করিয়া দেখিবার—তাঁহার সুবিধা হইয়া উঠে নাই, কিন্তু খানিকটা রাধাকে তিনি বেশ করিয়া দেখিয়াছেন। চণ্ডীদাসের কৃষ্ণ রাধার আড়নয়নে ঈষৎ হাসি লক্ষ্য করিয়াছেন, কিন্তু সমস্ত রাধাকে—আপাদমস্তক—তিনি দেখিতে ভুলেন নাই। রাধাকে ভাগে ভাগে অঙ্গে অঙ্গে ছাড়া এক করিয়াও তিনি অনেকটা দেখিয়াছেন। বিদ্যাপতি অপেক্ষা চণ্ডীদাস রাধার মধ্য হইতে দেখিয়া তুলনা দিয়াছেন। যেমন,

"হিয়ার মালা, যৌবনের ডালা,
পসারী পসারল যেন॥"

এখন এই পূর্ব্বরাগে বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের কৃষ্ণ কিরূপভাবে রাধাকে দেখিয়াছেন, দেখিতে হইবে। দুই জনের রাধাই হাবভাবশূন্যা নহেন। কিন্তু বিদ্যাপতির রাধা ফিকির-কৌশলে দক্ষা অধিক। চণ্ডীদাসের কৃষ্ণ দেখিয়াছেন, রাধার হাসির চাহনি পর্য্যন্ত। কিন্তু বিদ্যাপতির কৃষ্ণ দেখিয়াছেন আরও ঢের। রাধা হাসিয়া তাঁহার পানে ফিরিয়া দেখেন, দূরে গিয়া সখীদিগের ডাকিবার ছলে শ্রীকৃষ্ণের পানে চাহিয়া লয়েন, ইত্যাদি। শুধু ইহাই নহে, মুক্তাহার ছিঁড়িয়া ফেলিয়া সখীদিগকে

মুক্তা কুড়াইতে বলেন, এই অবসরে তাঁহার শ্যাম-দর্শন হয়। এ রাধা চণ্ডীদাসের রাধা অপেক্ষা পাকা। চণ্ডীদাসের রাধার এতটা কৈ ত শুনা যায় না।

কিন্তু শুধু শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বরাগের উপর নির্ভর করিয়া রাধা-সম্বন্ধে এত কথা বলা কি ভাল দেখায়? নায়িকার পূর্ব্বরাগটাও মনোযোগসহকারে দেখা আবশ্যক। রাধিকাসুন্দরীও ত শ্রীকৃষ্ণে মজগুল। বিদ্যাপতির রাধিকা, চণ্ডীদাসের রাধিকা দুই জনেই শ্যামের রূপে মুগ্ধ, দুই জনেই বংশীধরের বাঁশীর সুরে আকুল। কিন্তু চণ্ডীদাসের রাধার কথায় এই আকুলতা যেমন ব্যক্ত হইয়াছে, বিদ্যাপতির রাধায় তেমন হয় নাই। বিদ্যাপতির রাধা সখীর নিকট শ্রীকৃষ্ণের বাঁশীর কথা বলিতেছেন,

"কি কহব রে সখি ইহ দুঃখ ওর।
বাঁশী নিশাস গরলে তনু ভোর॥
হঠ সঞে পৈঠয়ে শ্রবণক মাঝ।
তৈখনে বিগলিত তনু-মনোলাজ॥" ইত্যাদি।

আর চণ্ডীদাসের রাধিকা? এক কথায় তাঁহার সব বলা হইয়াছে—"বাঁশী কেন বলে রাধা রাধা?" তাইত, এত নাম থাকিতে বাঁশীতে রাধা নামই বাজে কেন? রাধাপেক্ষা কি সংসারে আর মিষ্ট নাম নাই? তাহা ত নয়, নাম ত ঢের আছে। কিন্তু —কিন্তু মাধবের নিকট রাধা বৈ আর নাম নাই। তাই না? তাহা নয়ত কি?

বিদ্যাপতির কবিতায় অনেক কথা বলিয়া একটী ভাব প্রকাশ হইয়াছে, চণ্ডীদাস ভাবটুকু ছুঁইয়া গেছেন মাত্র। আর যেখানে অনেক কথা তিনি বলিয়াছেন, সেখানে ভাবেরও প্রায় বিস্তৃতি লক্ষিত হয়। এই আকুলতার ভাব-প্রকাশক তাঁহার একটী গান আছে। তাহা এইখানে উদ্ধৃত করিয়া দিই। পাঠকেরা শুনিলেই বুঝিতে পারিবেন, এ গান মর্ম্ম বিঁধিয়া উঠিয়াছে কি না।

"সই কেবা শুনাইল শ্যাম-নাম।
কাণের ভিতর দিয়া, মরমে পশিল গো,
আকুল করিল মোর প্রাণ।
না জানি কতেক মধু,
শ্যাম-নামে আছে গো,
বদন ছাড়িতে নাহি পারে।
জপিতে জপিতে নাম, অবশ করিল গো,
কেমনে পাইব সই তারে?
নাম-পরতাপে যার
ঐছন করিল গো,
অঙ্গের পরশে কিবা হয়?
যেখানে বসতি তার, নয়নে দেখিয়া গো,
যুবতী ধরম কৈছে রয়?

পাসরিতে করি মনে, পাসরা না যায় গো,
কি করিব, কি হবে উপায় ?
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে, কুলবতী কুল নাশে,
আপনার যৌবন যাচায় ॥”

এ আকুলতা, হাসি বাঁশী বাদ দিয়া বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের নায়িকার পূর্ব্বরাগে নায়কের যে রূপ-বর্ণনা আছে, তাহা দেখিলেও বুঝা যায়, বিদ্যাপতি অপেক্ষা চণ্ডীদাস কত উচ্চস্তরের কবি। বিদ্যাপতির বর্ণনায় কেমন যেন একটা ভাবের আঁটাআঁটি আছে বলিয়া বোধ হয়। সব সময়ে ভাবগুলি যেন আপনি আসে নাই—বিদ্যাপতির সংস্কৃত সাহিত্যে দখল ছিল বলিয়া আসিয়া গিয়াছে। চণ্ডীদাসে ভাবের কি স্বাভাবিক স্ফূর্ত্তি! হৃদয়ের কি স্বতঃ উচ্ছ্বাস! লেখনী-হস্তে কড়িকাষ্ঠের পানে চাহিয়া তাঁহাকে ভাবিতে হয় নাই। তিনি জ্যোৎস্নাকে চাহিলেন, তাঁহার সম্মুখের কাগজের উপর জ্যোৎস্না ফুটিয়া পড়িল। তিনি কৃষ্ণকে সাজাইতে কোটী যুগ চাহিলেন, তাঁহার কৃষ্ণের অঙ্গুলি-উপরে যুগযুগান্তর প্রতিবিম্বিত হইল। বিদ্যাপতি অধরের রাঙিমা, বদনের ছাঁদটী লইযাই প্রায় সন্তুষ্ট। চণ্ডীদাস অধরের রাঙিমায় ডুবিতে চাহেন, অধরের হৃদয়ে বসিয়া তাঁহাকে চুম্বনের সুখ অনুভব করিতে হইবে। বিদ্যাপতি বলিলেন, মুখখানি ত বেশ, চাঁদই বা লাগে কোথায় ? চণ্ডীদাস বলিলেন, তাহা ত বটেই, কিন্তু শুধু তাহা দেখিয়া কি ফল, একবার চাঁদের হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া দেখ—দেখিবে, চন্দ্র নিংড়াইয়া যে সারের সার বাহির হইবে, ঐ মুখখানি তাহা দিয়া গঠিত। বিদ্যাপতি দূরে দাঁড়াইয়া বলিলেন ; চণ্ডীদাস আপনাকে সেই সৌন্দর্য্যে হারাইয়া বলিলেন।

পাঠকেরা এতক্ষণ মনে করিতেছেন, চণ্ডীদাসের দিকে আমরা কিছু ঢলিয়া পড়িয়াছি, নহিলে বিদ্যাপতির বিরহ-বর্ণনার এখনও উল্লেখ করা হইল না কেন। আমরা একেবারে কাহারও দিকে ঢলিয়া পড়ি নাই, তবে ক্রমে ক্রমে সকল কথা বলিব, একেবারে চারিদিক্ লইয়া আলোচনার বিশেষ সুবিধা বোধ হয় না। বিদ্যাপতির বিরহ ছাড়িবার জিনিস নহে। তাঁহার বিরহের কতকগুলি গান বড়ই চমৎকার ভাবময়। স্থানে স্থানে উদ্ধৃত করিলেই পাঠকেরা বুঝিতে পারিবেন। বিদ্যাপতি গাহিয়াছেন,

“সজল নয়ান করি, পিয়া পথ হেরি হেরি
তিল এক হয় যুগ চারি।”

প্রিয়তমের পথ চাহিয়া দিন আর কাটে না। সময় ত আগেকার মতই চলিয়াছে, আগেকার মতই দিন আসে যায়, কিন্তু রাধার কত যুগ কাটিয়া গেল। পথ পানে চাহিয়া থাকিলে কি তবে যুগ যুগ কাটিয়া যায় ? যায় বৈকি। দিন হু হু করিয়া চলিয়া যায়, তবু দিন ফুরায় না। রাধারও তিলে তিলে যুগ কাটিয়া যাইতেছে, তাই

তাঁহার দিন কাটিতেছে না। আর এই দিন কাটে না বলিয়াই তাঁহার সজলনয়ান। রাধার "তিল এক হয় যুগ চারি।"

রাধা যে শুধু সজল নয়নে পথ চাহিয়াই থাকেন, তাহা নহে। বিরহের মধ্যে অভিশাপ লাগিয়া আছে। কিন্তু অভিশাপ কাহাকে? কালকে বুঝি? কালকে হইলে ত রক্ষা ছিল, কিন্তু রাধা কালকেই বিরহের কারণ ঠাহরেণ নাই, তাঁহার লক্ষ্য সচেতন পদার্থে। রাধার অভিশাপ শুনিলেই তাহা বঝা যায়।

"নারীর দীর্ঘ নিশ্বাস, পড়ুক তাহাব পাশ
পিয়া মোর যার পাশ বৈসে।"

তাহার পাশে এই দীর্ঘ নিশ্বাস পড়ুক। এ কি সহজ কথা? তাহার বুকে শেল বিঁধাইয়া দিলে বুঝি প্রাণের আশ মিটে না, দীর্ঘ নিশ্বাসে তাহার কোমল হৃদয় খাক হইয়া যাক—সে যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিয়া মরুক। রাধা, রাধা, তুমি তাহার হৃদয়ে ছুরিকা বিঁধাইয়া দাও, তাহার হৃদয়ের শোণিতে তোমার বিরহ-জ্বালার উপশম কর, কিন্তু এ অভিশাপ দিও না গো। এ অভিশাপ তাহাকে—কাহাকে কে জানে?—তাহাকে দিও না।

চণ্ডীদাসের রাধাও আগেভাগে অভিসম্পাত করিয়া বসেন। কিন্তু তাঁহার আবার এ রোগ কেন? কারণ অবশ্যই আছে।

"সই কেমনে ধরিব হিয়া?
আমার বঁধুয়া আন বাড়ী যায
আমার আঙ্গিনা দিয়া!
সে বঁধু কালিয়া না চায ফিবিযা,
এমতি করিল কে?
আমার অন্তর যেমন করিছে,
তেমতি হউক সে॥
যাহার লাগিয়া সব তেয়াগিনু,
লোকে অপযশ কয়।
সেই গুণনিধি, ছাড়িয়া পিরীতি,
আর জানি কাব হয়?
আপনা আপনি, মন বুঝাইতে,
পরতীত নাহি হয়।
পরের পরাণ হরণ করিলে
কাহার পরাণে সয়?
যুবতী হইয়া, শ্যাম ভাঙাইয়া,
এমতি করিল কে?
আমার পরাণ যেমতি করিছে,
তেমতি হউক সে।"

পাঠকেরা চণ্ডীদাসের রাধার অভিশাপের সহিত বিদ্যাপতির রাধার অভিশাপের তুলনা করিয়া দেখিলে দুই জনের মধ্যে একটা বিশেষ প্রভেদ দেখিতে পাইবেন। দুইজনেরই অভিশাপের মর্ম্ম কি এক নয়? মর্ম্ম একই বটে, দুই জনেই সেই "পিয়া মোর যার পাশে বৈসে" তাহাকে অভিশাপ দিতেছেন। দুই জনেরই শাপের মূল এক। কিন্তু দুই জন এক ভাবে অভিশাপ দিলেও দুই জনের কি তফাৎ! একজন বলিলেন, তাহার পার্শ্বে এই দীর্ঘ নিশ্বাস পড়ুক, তাহার হৃদয়ে আর কিছুই বাঁচিয়া থাকিয়া কাজ নাই, কেবল এই মর্ম্মভেদী অনন্ত যাতনাময় নিশ্বাস সেখানে কাঁদিয়া বেড়াক। আর একজন বলিলেন, আমার হৃদয় যেরূপ করিতেছে তাহার হৃদয়ও সেইরূপ হৌক। তোমার হৃদয় কি করিতেছে তুমিই জান, আমরা তাহা জানিতে চাহি না, কিন্তু পরের হৃদয় তুমি ভাঙ্গিতে চাহ কেন? তোমার হৃদয়ের সুখশান্তিটুকু কি তাহাকে দিতে পার? কৈ তাহাত চাহ না। তাহা চাহিবে কেন? তবে আর অভিশাপ কিসের? তোমার দীর্ঘ নিশ্বাস তাহার হৃদয়ে মাথা ঠুকিয়া কাঁদিয়া মরুক, ইহাই না তোমার বাসনা? তুমি সেই রাধা—বিদ্যাপতির হাত হইতে চণ্ডীদাসের হাতে আসিয়াছ মাত্র, কিন্তু তুমি সেই।

সে যাহা হৌক, বিদ্যাপতির বিরহ গানগুলিতে কেমন একটী ভাব আছে। তাঁহার "এ ভরা বাদর" শুনিলে বর্ষাকালের বিরহের ভাব কেমন যেন হৃদয়ে জাগিয়া উঠে। তাঁহার "সময় বসন্ত, কান্ত রহুঁ দূরদেশে" শুনিলে বসন্তের বিরহও তেমনি ফুটিয়া উঠে। কিন্তু বিরহের অথবা মিলনের কথা ছাড়িয়া দিয়া, বিদ্যাপতির কবিতার মর্ম্মগত একটা কি ভাব আছে, আমাদিগকে দেখিতে হইবে। চণ্ডীদাসের কবিতায় পিরীতি ভরপূর। তাঁহার কবিতা পিরীতিময়। তাঁহার ভাব, "পিরীতি নগরে বসতি করিব, পিরীতে বাঁধিব ঘর।" তিনি পিরীতি পিরীতি করিয়া মাতিয়া গিয়াছেন। তাঁহার গানগুলিতে এত পিরীতি আছে যে, সকলগুলি উদ্ধৃত করিয়া দিলে একখানি রীতিমত পুঁথি হয়। বিদ্যাপতির কবিতাকে চণ্ডীদাসের তুলনায় যৌবনাচ্ছন্ন বলা যাইতে পারে। চণ্ডীদাসের কবিতায় যৌবনের অভাব দেখা যায় না বটে, কিন্তু তাই বলিয়া তাহা যৌবনাচ্ছন্ন নহে। আর বিদ্যাপতিতে কেমন একটা অতৃপ্তির ভাব দেখা যায়। তাঁহার এই অতৃপ্তির একটী গান একেবারে বিখ্যাত। সে গান আমাদের,

"জনম অবধি হাম রূপ নেহারিনু,
নয়ন না তিরপিত ভেল।
সোই মধুর বোল শ্রবণ হিঁ শুননু,
শ্রুতিপথে পরশ না গেল॥
কত মধুযামিনী রভসে গোঁয়াইনু,
না বুঝনু কৈছন কেল।
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু,
তবু হিয়া জুড়ন না গেল॥"

এ গানটী আমরা সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করি নাই, মধ্যে খানিকটা তুলিয়া দিয়াছি মাত্র। বিদ্যাপতির কবিতায় আরও স্থানে স্থানে এই ভাবের বিকাশ হইয়াছে। তাঁহার একটী বাসন্তী বিরহের গানেও আছে,

"অনিমিখ নয়নে নাহ-মুখ নিরখিতে
তিরপিত না হোয় নয়ান।"

বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস-সম্বন্ধে মোটামুটী অনেক কথা বলা হইয়াছে। আর অধিক বকাবকি করিয়া পাঠকগণের ধৈর্য্যচ্যুতি করিব না। এখন সংক্ষেপে ইঁহাদের সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা বলিয়া শেষ করা যাক। বিদ্যাপতির কবিতা দেখিলে তাঁহাকে পণ্ডিত বলিয়া মনে হয়। বাস্তবিক, তাঁহার লেখায় সংস্কৃত সাহিত্যের ছায়া দেখা যায়। তাঁহার উপরে জয়দেবের বিশেষ প্রভাব। চণ্ডীদাস ঠাকুরে কাহারও বড় প্রভাব দেখা যায় না। জয়দেব তিনি পড়িয়াছিলেন কিনা জানি না, কিন্তু তাঁহার লেখায় জয়দেবের তেমন প্রভাব ত কৈ লক্ষিত হয় না। চণ্ডীদাসের লেখার স্থানে স্থানে তাঁহার নাট্যরসাস্বাদন-ক্ষমতারও বেশ পরিচয় পাওয়া যায়। মানময়ী রাধার নিকট শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং-দৌত্য দেখিলেই আমাদের কথা সপ্রমাণ হইবে। চণ্ডীদাসের ছন্দ প্রায়ই কিছু ছুটন্ত; বিদ্যাপতি কিছু ধীর। কিন্তু লেখা দেখিয়া চণ্ডীদাসকে যেমন সহজে চেনা যায়, বিদ্যাপতিকে তেমন সহজে ধরা যায় না। চণ্ডীদাস আপনার লেখায় ফুটিয়াছেন অধিক।

[ভারতী, ১২৯৬]

প্যারীচাঁদ মিত্র

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বাঙ্গালা সাহিত্যে প্যারীচাঁদ মিত্রের স্থান অতি উচ্চ। তিনি বাঙ্গালা সাহিত্যের এবং বাঙ্গালা গদ্যের একজন প্রধান সংস্কারক। কথাটা বুঝাইবার জন্য বাঙ্গালা গদ্যের ইতিবৃত্ত পাঠককে কিছু স্মরণ করাইয়া দেওয়া আমার কর্ত্তব্য।

একজনের কথা অপরকে বুঝানো যে ভাষা-মাত্রেরই উদ্দেশ্য, ইহা বলা অনাবশ্যক। কিন্তু কোন কোন লেখকের রচনা দেখিয়া বোধ হয় যে, তাঁহাদের বিবেচনায় যত অল্প লোকে তাঁহাদিগের ভাষা বুঝিতে পারে, ততই ভাল। সংস্কৃতে কাদম্বরী-প্রণেতা এবং ইংরাজিতে এমর্সনের রচনা প্রচলিত ভাষা হইতে এত দূর পৃথক্ যে, বহু কষ্ট স্বীকার না করিলে, কেহ তাঁহাদিগের গ্রন্থ হইতে কোন রস পায় না। অন্যে তাঁহার গ্রন্থ

পাঠ করিয়া কোন উপকার পাইবে, এরূপ যে-লেখকের উদ্দেশ্য, তিনি সচরাচর বোধগম্য ভাষাতেই গ্রন্থ-প্রণয়ন করিয়া থাকেন। যে দেশের সাহিত্যে সাধারণ-বোধগম্য ভাষাই সচরাচর ব্যবহৃত হয়, সেই দেশের সাহিত্যই দেশের মঙ্গলকর হয়। মহা-প্রতিভাশালী কবিগণ তাঁহাদিগের হৃদয়স্থ উন্নত ভাব-সকল তদুপযোগী উন্নত ভাষা ব্যতীত ব্যক্ত করিতে পারেন না; এই জন্য অনেক সময়ে, মহাকবিগণ দুরূহ ভাষার আশ্রয় লইতে বাধ্য হন এবং সেই সকল উন্নত ভাবের অলঙ্কার-স্বরূপ পদ্যে সে সকলকে বিভূষিত করেন।* কিন্তু গদ্যের এরূপ কোন প্রয়োজন নাই। গদ্য যত সুখবোধ্য হইবে, সাহিত্য ততই উন্নতিকারক হইবে। যে সাহিত্যের পাঁচ-সাতজন-মাত্র অধিকারী, সে সাহিত্যের জগতে কোন প্রয়োজন নাই।

প্রাচীন কালে, অর্থাৎ এ দেশে মুদ্রাযন্ত্র স্থাপিত হইবার পূর্ব্বে, বাঙ্গালায় সচরাচর পুস্তক-রচনা সংস্কৃতের ন্যায় পদ্যেই হইত। গদ্য-রচনা যে ছিল না, এমন কথা বলা যায় না; কেন-না, হস্তলিখিত গদ্য-গ্রন্থের কথা শুনা যায়। সে সকল গ্রন্থও এখন প্রচলিত নাই, সুতরাং তাহাদের ভাষা কিরূপ ছিল, তাহা এক্ষণে বলা যায় না। মুদ্রাযন্ত্র সংস্থাপিত হইলে, গদ্য-বাঙ্গালা-গ্রন্থ প্রথম প্রচারিত হইতে আরম্ভ হইল। প্রবাদ আছে যে, রাজা রামমোহন রায় সে সময়ের প্রথম গদ্য-লেখক। তাঁহার পরে যে গদ্যের সৃষ্টি হইল, তাহা লৌকিক বাঙ্গালা ভাষা হইতে সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন। এমন কি, বাঙ্গালা ভাষা দুইটি স্বতন্ত্র বা ভিন্ন ভাষায় পরিণত হইয়াছিল; একটির নাম সাধু ভাষা, অর্থাৎ সাধুজনের ব্যবহার্য্য ভাষা, আর একটির নাম অপর ভাষা, অর্থাৎ সাধু ভিন্ন অপর ব্যক্তিদিগের ব্যবহার্য্য ভাষা। এ স্থলে সাধু অর্থে পণ্ডিত বুঝিতে হইবে। আমি নিজে বাল্যকালে ভট্টাচার্য্য-অধ্যাপকদিগকে যে ভাষায় কথোপকথন করিতে শুনিয়াছি, তাহা সংস্কৃত-ব্যবসায়ী ভিন্ন অন্য কেহই ভাল বুঝিতে পারিতেন না। তাঁহারা কদাচ 'খয়ের' বলিতেন না—'খদির' বলিতেন; কদাচ 'চিনি' বলিতেন না—'শর্করা' বলিতেন। 'ঘি' বলিলে তাঁহাদের রসনা অশুদ্ধ হইত, 'আজ্য'ই বলিতেন, কদাচিৎ কেহ ঘৃতে নামিতেন। 'চুল' বলা হইবে না—'কেশ' বলিতে হইবে। 'কলা' বলা হইবে না—'রম্ভা' বলিতে হইবে। ফলাহারে বসিয়া 'দই' চাহিবার সময়ে 'দধি' বলিয়া চীৎকার করিতে হইবে। আমি দেখিয়াছি, একজন অধ্যাপক একদিন 'শিশুমার' ভিন্ন 'শুশুক' শব্দ মুখে আনিবেন না, শ্রোতারাও কেহ শিশুমার অর্থ জানে না, সুতরাং অধ্যাপক মহাশয় কি বলিতেছেন, তাহার অর্থবোধ লইয়া অতিশয় গণ্ডগোল পড়িয়া গিয়াছিল। পণ্ডিতদিগের কথোপকথনের ভাষাই যখন এইরূপ ছিল, তখন তাঁহাদের লিখিত বাঙ্গালা ভাষা আরও কি ভয়ঙ্কর ছিল, তাহা

* কবি যদি ভাষার উপর প্রকৃতরূপে প্রভুত্ব স্থাপন করিতে পারেন, তাহা হইলে মহাকাব্যও অতি প্রাঞ্জল ভাষায় রচিত হয়। সংস্কৃতে রামায়ণ ও কালিদাসের মহাকাব্য-সকল কাব্যের শ্রেষ্ঠ। কিন্তু এরূপ সুখবোধ্য কাব্যও সংস্কৃতে আর নাই।

বলা বাহুল্য। এরূপ ভাষায় কোন গ্রন্থ প্রণীত হইলে, তাহা তখনই বিলুপ্ত হইত; কেন-না, কেহ তাহা পড়িত না। কাজেই বাঙ্গালা সাহিত্যের কোন শ্রীবৃদ্ধি হইত না।

এই সংস্কৃতানুসারিণী ভাষা প্রথম মহাত্মা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার দত্তের হাতে কিছু সংস্কার-প্রাপ্ত হইল। ইঁহাদিগের ভাষা সংস্কৃতানুসারিণী হইলেও তত দুর্ব্বোধ্য নহে। বিশেষতঃ, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভাষা অতি সুমধুর ও মনোহর। তাঁহার পূর্ব্বে কেহই এরূপ সুমধুর বাঙ্গালা গদ্য লিখিতে পারে নাই, এবং তাঁহার পরেও কেহ পারে নাই। কিন্তু তাহা হইলেও সর্ব্বজন-বোধগম্য ভাষা হইতে ইহা অনেক দূরে রহিল। সকল প্রকার কথার এ ভাষায় ব্যবহার হইত না বলিয়া, ইহাতে সকল প্রকার ভাব প্রকাশ করা যাইত না এবং সকল প্রকার রচনা ইহাতে চলিত না। গদ্যে ভাষার ওজস্বিতা এবং বৈচিত্র্যের অভাব হইলে ভাষা উন্নতিশালিনী হয় না। কিন্তু প্রাচীন প্রথায় আবদ্ধ এবং বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভাষার মনোহারিতায় বিমুগ্ধ হইয়া কেহই আর কোন প্রকার ভাষায় রচনা করিতে ইচ্ছুক বা সাহসী হইত না। কাজেই বাঙ্গালা সাহিত্য পূর্ব্বমত সঙ্কীর্ণ পথেই চলিল।

ইহা অপেক্ষা বাঙ্গালা ভাষায় আরও একটি গুরুতর বিপদ্ ঘটিয়াছিল। সাহিত্যের ভাষাও যেমন সঙ্কীর্ণ পথে চলিতেছিল, সাহিত্যের বিষয়ও ততোধিক সঙ্কীর্ণ পথে চলিতেছিল। যেমন ভাষাও সংস্কৃতের ছায়ামাত্র ছিল, সাহিত্যের বিষয়ও তেমনই সংস্কৃতের এবং কদাচিৎ ইংরাজির ছায়ামাত্র ছিল। সংস্কৃত বা ইংরাজি গ্রন্থের সার-সঙ্কলন বা অনুবাদ ভিন্ন বাঙ্গালা সাহিত্য আর কিছুই প্রসব করিত না। বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রতিভাশালী লেখক ছিলেন সন্দেহ নাই, কিন্তু তাঁহারও শকুন্তলা ও সীতার বনবাস সংস্কৃত হইতে, ভ্রান্তিবিলাস ইংরাজি হইতে এবং বেতালপঞ্চবিংশতি হিন্দি হইতে সংগৃহীত। অক্ষয়কুমার দত্তের ইংরাজি একমাত্র অবলম্বন ছিল। আর সকলে তাঁহাদের অনুকারী এবং অনুবর্ত্তী। বাঙ্গালি লেখকেরা গতানুগতিকের বাহিরে হস্তপ্রসারণ করিতেন না। জগতের অনন্ত ভাণ্ডার আপনাদের অধিকারে আনিবার চেষ্টা না করিয়া, সকলেই ইংরাজি ও সংস্কৃতের ভাণ্ডারে চুরির সন্ধানে বেড়াইতেন। সাহিত্যের পক্ষে ইহার অপেক্ষা গুরুতর বিপদ্ আর কিছুই নাই। বিদ্যাসাগর মহাশয় ও অক্ষয়কুমার যাহা করিয়াছিলেন, তাহা সময়ের প্রয়োজনানুমত, অতএব তাঁহারা প্রশংসা ব্যতীত অপ্রশংসার পাত্র নহেন; কিন্তু সমস্ত বাঙ্গালি লেখকের দল সেই একমাত্র পথের পথিক হওয়াই বিপদ্।

এই দুইটি গুরুতর বিপদ্ হইতে প্যারীচাঁদ মিত্রই বাঙ্গালা সাহিত্যকে উদ্ধৃত করেন। যে ভাষা সকল বাঙ্গালির বোধগম্য এবং সকল বাঙ্গালি-কর্ত্তৃক ব্যবহৃত, প্রথম তিনিই তাহা গ্রন্থ-প্রণয়নে ব্যবহার করিলেন; এবং তিনিই প্রথম ইংরাজি ও সংস্কৃতের ভাণ্ডারে পূর্ব্বগামী লেখকদিগের উচ্ছিষ্টাবশেষের অনুসন্ধান না করিয়া, স্বভাবের অনন্ত ভাণ্ডার হইতে আপনার রচনার উপাদান সংগ্রহ করিলেন। এক

'আলালের ঘরের দুলাল' নামক গ্রন্থে এই উভয় উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল। আলালের ঘরের দুলাল বাঙ্গালা ভাষায় চিরস্থায়ী ও চিরস্মরণীয় হইবে। উহার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট গ্রন্থ তৎপরে কেহ প্রণীত করিয়া থাকিতে পারেন, অথবা ভবিষ্যতে কেহ করিতে পারেন কিন্তু আলালের ঘরের দুলালের দ্বারা বাঙ্গালা সাহিত্যের যে উপকার হইয়াছে, আর কোন বাঙ্গালা গ্রন্থের দ্বারা সেরূপ হয় নাই এবং ভবিষ্যতে হইবে কি-না সন্দেহ।

আমি এমন বলিতেছি না যে, আলালের ঘরের দুলালের ভাষা আদর্শ-ভাষা। উহাতে গাম্ভীর্য্যের এবং বিশুদ্ধির অভাব আছে এবং উহাতে অতি উন্নত ভাব-সকল, সকল সময়ে, পরিস্ফুট করা যায় কি-না সন্দেহ। কিন্তু উহাতেই প্রথম এ বাঙ্গালা দেশে প্রচারিত হইল যে, যে-বাঙ্গালা সর্ব্বজন-মধ্যে কথিত এবং প্রচলিত, তাহাতে গ্রন্থ রচনা করা যায়, সে রচনা সুন্দরও হয়, এবং যে সর্ব্বজন-হৃদয়-গ্রাহিতা সংস্কৃতানুযায়িনী ভাষার পক্ষে দুর্লভ, এ ভাষার তাহা সহজ গুণ। এই কথা জানিতে পারা বাঙ্গালি জাতির পক্ষে অল্প লাভ নহে, এবং এই কথা জানিতে পারার পর হইতে উন্নতির পথে বাঙ্গালা সাহিত্যের গতি অতিশয় দ্রুতবেগে চলিতেছে। বাঙ্গালা ভাষার এক সীমায় তারাশঙ্করের কাদম্বরীর অনুবাদ, আর এক সীমায় প্যারীচাঁদ মিত্রের আলালের ঘরের দুলাল। ইহার কেহই আদর্শ-ভাষায় রচিত নয়। কিন্তু আলালের ঘরের দুলালের পর হইতে বাঙ্গালি লেখক জানিতে পারিল যে, এই উভয় জাতীয় ভাষার উপযুক্ত সমাবেশ-দ্বারা এবং বিষয়-ভেদে, একের প্রবলতা ও অপরের অল্পতা-দ্বারা আদর্শ বাঙ্গালা গদ্যে উপস্থিত হওয়া যায়। প্যারীচাঁদ মিত্র আদর্শ বাঙ্গালা গদ্যের সৃষ্টিকর্ত্তা নহেন, কিন্তু বাঙ্গালা গদ্য যে-উন্নতির পথে যাইতেছে, প্যারীচাঁদ মিত্র তাহার প্রধান ও প্রথম কারণ। ইহাই তাঁহার অক্ষয় কীর্ত্তি।

আর তাঁহার দ্বিতীয় অক্ষয় কীর্ত্তি এই যে, তিনিই প্রথম দেখাইলেন যে, সাহিত্যের প্রকৃত উপাদান আমাদের ঘরেই আছে,—তাহার জন্য ইংরাজি বা সংস্কৃতের কাছে ভিক্ষা চাহিতে হয় না। তিনিই প্রথম দেখাইলেন যে, যেমন জীবনে তেমনই সাহিত্যে, ঘরের সামগ্রী যত সুন্দর, পরের সামগ্রী তত সুন্দর বোধ হয় না। তিনিই প্রথম দেখাইলেন যে, যদি সাহিত্যের দ্বারা বাঙ্গালা দেশকে উন্নত করিতে হয়, বাঙ্গালা দেশের কথা লইয়াই সাহিত্য গড়িতে হইবে। প্রকৃত পক্ষে, আমাদের জাতীয় সাহিত্যের আদি আলালের ঘরের দুলাল। প্যারীচাঁদ মিত্রের এই দ্বিতীয় অক্ষয় কীর্ত্তি।

অতএব বাঙ্গালা সাহিত্যে প্যারীচাঁদ মিত্রের স্থান অতি উচ্চ। এই কথাই আমার বক্তব্য।

[১২৯৯]

বঙ্কিমচন্দ্র

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

যে কালে বঙ্কিমের নবীনা প্রতিভা লক্ষ্মীরূপে সুধাভাণ্ড হস্তে লইয়া বাংলাদেশের সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন তখনকার প্রাচীন লোকেরা বঙ্কিমের রচনাকে সসম্মান-আনন্দের সহিত অভ্যর্থনা করেন নাই।

সেদিন বঙ্কিমকে বিস্তর উপহাস বিদ্রূপ গ্লানি সহ্য করিতে হইয়াছিল। তাঁহার উপর একদল লোকের সুতীব্র বিদ্বেষ ছিল, এবং ক্ষুদ্র যে-লেখক-সম্প্রদায় তাঁহার অনুকরণের বৃথা চেষ্টা করিত, তাহারই আপন ঋণ গোপন করিবার প্রয়াসে তাঁহাকে সর্বাপেক্ষা অধিক গালি দিত।

আবার এখনকার যে নূতন পাঠক ও লেখক-সম্প্রদায় উদ্ভূত হইয়াছেন, তাঁহারাও বঙ্কিমের পরিপূর্ণ প্রভাব হৃদয়ের মধ্যে অনুভব করিবার অবকাশ পান নাই। তাঁহারা বঙ্কিমের গঠিত সাহিত্য-ভূমিতেই একেবারে ভূমিষ্ঠ হইয়াছেন, বঙ্কিমের নিকট যে তাঁহারা কতরূপে কতভাবে ঋণী, তাহার হিসাব বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়া তাঁহারা দেখিতে পাইতেছেন না।

কিন্তু বর্ত্তমান লেখকের সৌভাগ্যক্রমে আমাদের সহিত যখন বঙ্কিমের প্রথম সাক্ষাৎকার হয়, তখন সাহিত্য প্রভৃতি-সম্বন্ধে কোনোরূপ পূর্ব্বসংস্কার আমাদের মনে বদ্ধমূল হইয়া যায় নাই এবং বর্ত্তমান কালের নূতন ভাব-প্রবাহও আমাদের নিকট অপরিচিত অনভ্যস্ত ছিল। তখন বঙ্গসাহিত্যের যেমন প্রাতঃসন্ধ্যা উপস্থিত, আমাদের সেইরূপ বয়ঃসন্ধিকাল। বঙ্কিম বঙ্গসাহিত্যে প্রভাতের সূর্য্যোদয় বিকাশ করিলেন, আমাদের হৃদ্‌পদ্ম সেই প্রথম উদ্‌ঘাটিত হইল।

পূর্ব্বে কী ছিল এবং পরে কী পাইলাম, তাহা দুই কালের সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া আমরা এক মুহূর্ত্তেই অনুভব করিতে পারিলাম। কোথায় গেল সেই অন্ধকার, সেই একাকার, সেই সুপ্তি, কোথায় গেল সেই বিজয়-বসন্ত, সেই গোলে-বকাওলি, সেই বালক-ভুলোনো কথা—কোথা হইতে আসিল এত আলোক, এত আশা, এত সঙ্গীত, এত বৈচিত্র্য। বঙ্গদর্শন যেন তখন আষাঢ়ের প্রথম বর্ষার মত "সমাগতো রাজবদুন্নতধ্বনিঃ।" এবং মুষলধারে ভাববর্ষণে বঙ্গসাহিত্যের পূর্ব্ববাহিনী পশ্চিমবাহিনী সমস্ত নদী নির্ঝরিণী অকস্মাৎ পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া যৌবনের আনন্দবেগে ধাবিত হইতে লাগিল। কত কাব্য নাটক উপন্যাস কত প্রবন্ধ কত সমালোচনা কত মাসিকপত্র কত সংবাদপত্র বঙ্গভূমিকে জাগ্রত প্রভাত-কলরবে মুখরিত করিয়া তুলিল। বঙ্গভাষা সহসা বাল্যকাল হইতে যৌবনে উপনীত হইল।

আমরা কিশোরকালে বঙ্গসাহিত্যের মধ্যে ভাবের সেই নবসমাগমের মহোৎসব দেখিয়াছিলাম ; সমস্ত দেশ ব্যাপ্ত করিয়া যে-একটি আশার আনন্দ নূতন হিল্লোলিত

হইয়াছিল, তাহা অনুভব করিয়াছিলাম ; সেই জন্য আজ মধ্যে মধ্যে নৈরাশ্য উপস্থিত হয়। মনে হয় সেদিন হৃদয়ে যে অপরিমেয় আশার সঞ্চার হইয়াছিল, তদনুরূপ ফললাভ করিতে পারি নাই। সে জীবনের বেগ আর নাই। কিন্তু এ নৈরাশ্য অনেকটা অমূলক। প্রথম সমাগমের প্রবল উচ্ছ্বাস কখনও স্থায়ী হইতে পারে না। সেই নব আনন্দ নবীন আশার স্মৃতির সহিত বর্ত্তমানের তুলনা করাই অন্যায়। বিবাহের প্রথম দিনে যে রাগিণীতে বংশীধ্বনি হয়, সে-রাগিণী চিরদিনের নহে। সেদিন কেবল অবিমিশ্র আনন্দ এবং আশা, তাহার পর হইতে বিচিত্র কর্ত্তব্যমিশ্রিত দুঃখসুখ, ক্ষুদ্র বাধাবিঘ্ন, আবর্ত্তিত বিরহমিলন—তাহার পর হইতে গভীর গম্ভীরভাবে নানাপথ বাহিয়া নানা শোকতাপ অতিক্রম করিয়া সংসারপথে অগ্রসর হইতে হইবে, প্রতিদিন আর নহবৎ বাজিবে না। তথাপি সেই একদিনের উৎসবের স্মৃতি কঠোর কর্ত্তব্যপথে চিরদিন আনন্দ সঞ্চার করে।

বঙ্কিমচন্দ্র স্বহস্তে বঙ্গভাষার সহিত যে-দিন নবযৌবনপ্রাপ্ত ভাবের পরিণয় সাধন করাইয়াছিলেন, সেই দিনের সর্ব্বব্যাপী প্রফুল্লতা এবং আনন্দ উৎসব আমাদের মনে আছে। সেদিন আর নাই। আজ নানা লেখা নানা মত নানা আলোচনা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। আজ কোনো দিন বা ভাবের স্রোত মন্দ হইয়া আসে, কোনো দিন বা অপেক্ষাকৃত পরিপুষ্ট হইয়া উঠে।

এইরূপ হইয়া থাকে এবং এইরূপই হওয়া আবশ্যক। কিন্তু কাহার প্রসাদে এরূপ হওয়া সম্ভব হইল, সে-কথা স্মরণ করিতে হইবে। আমরা আত্মাভিমানে সর্ব্বদাই তাহা ভুলিয়া যাই।

ভুলিয়া যে যাই তাহার প্রথম প্রমাণ, রামমোহন রায়কে আমাদের বর্ত্তমান বঙ্গদেশের নির্ম্মাণকর্ত্তা বলিয়া আমরা জানি না। কি রাজনীতি, কি বিদ্যাশিক্ষা, কি সমাজ, কি ভাষা, আধুনিক বঙ্গদেশে এমন কিছুই নাই রামমোহন রায় স্বহস্তে যাহার সূত্রপাত করিয়া যান নাই। এমন কি, আজ প্রাচীন শাস্ত্রালোচনার প্রতি দেশের যে এক নূতন উৎসাহ দেখা যাইতেছে, রামমোহন রায় তাহারও পথ-প্রদর্শক। যখন নবশিক্ষাভিমানে স্বভাবতই পুরাতন শাস্ত্রের প্রতি অবজ্ঞা জন্মিবার সম্ভাবনা, তখন রামমোহন রায় সাধারণের অনধিগম্য বিস্মৃত-প্রায় বেদপুরাণতন্ত্র হইতে সারোদ্ধার করিয়া প্রাচীন শাস্ত্রের গৌরব উজ্জ্বল রাখিয়াছিলেন।

বঙ্গদেশ অদ্য সেই রামমোহন রায়ের নিকট কিছুতেই হৃদয়ের সহিত কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতে চাহেন না। রামমোহন বঙ্গসাহিত্যকে গ্রাণিট্‌স্তরের উপর স্থাপন করিয়া নিমজ্জন দশা হইতে উন্নত করিয়া তুলিয়াছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্র তাহারই উপর প্রতিভার প্রবাহ ঢালিয়া স্তরবদ্ধ পলি মৃত্তিকা ক্ষেপণ করিয়া গিয়াছেন। আজ বাংলাভাষা কেবল দৃঢ় বাসযোগ্য নহে, উর্ব্বরা শস্যশ্যামলা হইয়া উঠিয়াছে। বাসভূমি যথার্থ মাতৃভূমি হইয়াছে। এখন আমাদের মনের খাদ্য প্রায় ঘরের দ্বারেই ফলিয়া

মাতৃভাষার বন্ধ্যদশা ঘুচাইয়া যিনি তাহাকে এমন গৌরবশালিনী করিয়া তুলিয়াছেন, তিনি বাঙালীর যে কী মহৎ কী চিরস্থায়ী উপকার করিয়াছেন, সে-কথা যদি কাহাকেও বুঝাইবার আবশ্যক হয়, তবে তদপেক্ষা দুর্ভাগ্য আর কিছুই নাই। তৎপূর্ব্বে বাংলাকে কেহ শ্রদ্ধাসহকারে দেখিত না। সংস্কৃত পণ্ডিতেরা তাহাকে গ্রাম্য এবং ইংরাজি পণ্ডিতেরা বর্ব্বর জ্ঞান করিতেন। বাংলা ভাষায় যে কীর্ত্তি উপার্জন করা যাইতে পারে, সে-কথা তাঁহাদের স্বপ্নের অগোচর ছিল। এই জন্য কেবল স্ত্রীলোক ও বালকের জন্য অনুগ্রহপূর্ব্বক দেশীয় ভাষায় তাঁহারা সরল পাঠ্যপুস্তক রচনা করিতেন। সেই সকল পুস্তকের সরলতা ও পাঠযোগ্যতা-সম্বন্ধে যাঁহাদের জানিবার ইচ্ছা আছে, তাঁহারা রেভেরণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত পূর্ব্বতন এণ্ট্রেন্স্-পাঠ্য বাংলা-গ্রন্থে দন্তস্ফুট করিবার চেষ্টা করিয়া দেখিবেন। অসম্মানিত বঙ্গভাষাও তখন অত্যন্ত দীন মলিনভাবে কালযাপন করিত। তাহার মধ্যে যে কতটা সৌন্দর্য্য, কতটা মহিমা প্রচ্ছন্ন ছিল, তাহা তাহার দারিদ্র্য ভেদ করিয়া স্ফূর্ত্তি পাইত না। যেখানে মাতৃভাষার এত অবহেলা, সেখানে মানবজীবনের শুষ্কতা, শূন্যতা, দৈন্য কেহই দূর করিতে পারে না।

এমন সময়ে তখনকার শিক্ষিতশ্রেষ্ঠ বঙ্কিমচন্দ্র আপনার সমস্ত শিক্ষা সমস্ত অনুরাগ সমস্ত প্রতিভা উপহার লইয়া সেই সঙ্কুচিতা বঙ্গভাষার চরণে সমর্পণ করিলেন; তখনকার কালে কী যে অসামান্য কাজ করিলেন, তাহা তাঁহারই প্রসাদে আজিকার দিনে আমরা সম্পূর্ণ অনুমান করিতে পারি না।

তখন তাঁহার অপেক্ষা অনেক অল্পশিক্ষিত প্রতিভাহীন ব্যক্তি ইংরাজীতে দুইছত্র লিখিয়া অভিমানে স্ফীত হইয়া উঠিতেন। ইংরাজি-সমুদ্রে তাঁহারা যে কাঠবিড়ালীর মতো বালির বাঁধ নির্ম্মাণ করিতেছেন, সেটুকু বুঝিবার শক্তিও তাঁহাদের ছিল না।

বঙ্কিমচন্দ্র যে সেই অভিমানে সেই খ্যাতির সম্ভাবনা অকাতরে পরিত্যাগ করিয়া তখনকার বিদ্বজ্জনের অবজ্ঞাত বিষয়ে আপনার সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিলেন, ইহা অপেক্ষা বীরত্বের পরিচয় আর কী হইতে পারে? সম্পূর্ণ ক্ষমতাসত্ত্বেও আপন সমযোগ্য লোকের উৎসাহ এবং তাঁহাদের নিকট প্রতিপত্তির প্রলোভন পরিত্যাগ করিয়া একটি অপরীক্ষিত অপরিচিত অনাদৃত অন্ধকার পথে আপন নবীন জীবনের সমস্ত আশা-উদ্যম-ক্ষমতাকে প্রেরণ করা কত বিশ্বাস এবং কত সাহসের বলে হয়, তাহার পরিমাণ করা সহজ নহে।

কেবল তাহাই নহে। তিনি আপনার শিক্ষাগর্ব্বে বঙ্গভাষার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিলেন না, একেবারেই শ্রদ্ধা প্রকাশ করিলেন। যত কিছু আশা আকাঙ্ক্ষা সৌন্দর্য্য প্রেম মহত্ত্ব ভক্তি স্বদেশানুরাগ, শিক্ষিত পরিণত বুদ্ধির যত কিছু শিক্ষালব্ধ চিন্তাজাত ধনরত্ন সমস্তই অকুণ্ঠিতভাবে বঙ্গভাষার হস্তে অর্পণ করিলেন। পরম সৌভাগ্য-গর্ব্বে সেই অনাদর-মলিন ভাষার মুখে সহসা অপূর্ব্ব লক্ষ্মীশ্রী প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিল।

তখন পূর্ব্বে যাঁহারা অবহেলা করিয়াছিলেন তাঁহারা বঙ্গভাষার যৌবন-সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া একে একে নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিলেন। বঙ্গসাহিত্য প্রতিদিন গৌরবে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতে লাগিল।

বঙ্কিম যে গুরুতর ভার লইয়াছিলেন, তাহা অন্য কাহারও পক্ষে দুঃসাধ্য হইত। প্রথমত, তখন বঙ্গভাষা যে অবস্থায় ছিল তাহাকে যে শিক্ষিত ব্যক্তির সকল প্রকার ভাবপ্রকাশে নিযুক্ত করা যাইতে পারে, ইহা বিশ্বাস ও আবিষ্কার করা বিশেষ ক্ষমতার কার্য্য। দ্বিতীয়ত, যেখানে সাহিত্যের মধ্যে কোনো আদর্শ নাই, যেখানে পাঠক অসামান্য উৎকর্ষের প্রত্যাশাই করে না, যেখানে লেখক অবহেলাভরে লেখে এবং পাঠক অনুগ্রহের সহিত পাঠ করে, যেখানে অল্প ভালো লিখিলেই বাহবা পাওয়া যায় এবং মন্দ লিখিলেও কেহ নিন্দা করা বাহুল্য বিবেচনা করে, সেখানে কেবল আপনার অন্তরস্থিত উন্নত আদর্শকে সর্ব্বদা সম্মুখে বর্ত্তমান রাখিয়া, সামান্য পরিশ্রমে সুলভ-খ্যাতিলাভের প্রলোভন সম্বরণ করিয়া, অশ্রান্ত যত্নে অপ্রতিহত উদ্যমে দুর্গম পরিপূর্ণতার পথে অগ্রসর হওয়া অসাধারণ মাহাত্ম্যের কর্ম্ম। চতুর্দ্দিগ্‌ব্যাপী উৎসাহহীন জীবনহীন জড়ত্বের মতো এমন গুরুভার আর কিছু নাই ; তাহার নিয়ত প্রবল ভারাকর্ষণ-শক্তি অতিক্রম করিয়া উঠা যে কত নিরলস চেষ্টা ও বলের কর্ম্ম, তাহা এখনকার সাহিত্য-ব্যবসায়ীরাও কতকটা বুঝিতে পারেন, তখন যে আরও কত কঠিন ছিল তাহা কষ্টে অনুমান করিতে হয়। সর্ব্বত্রই যখন শৈথিল্য এবং সে-শৈথিল্য যখন নিন্দিত হয় না, তখন আপনাকে নিয়মব্রতে বদ্ধ করা মহাসত্ত্বলোকের দ্বারাও সম্ভব।

বঙ্কিম আপনার অন্তরের সেই আদর্শ অবলম্বন করিয়া প্রতিভাবলে যে-কার্য্য করিলেন, তাহা অত্যাশ্চর্য্য। বঙ্গদর্শনের পূর্ব্ববর্ত্তী এবং তাহার পরবর্ত্তী বঙ্গসাহিত্যের মধ্যে যে উচ্চ-নীচতা, তাহা অপরিমিত। দার্জিলিং হইতে যাঁহারা কাঞ্চনজঙ্ঘার শিখরমালা দেখিয়াছেন, তাঁহারা জানেন সেই অভ্রভেদী শৈলসম্রাটের উদয় রবিরশ্মি-সমুজ্জ্বল তুষারকিরীট চতুর্দ্দিকের নিস্তব্ধ গিরিপারিষদবর্গের কত ঊর্দ্ধে সমুত্থিত হইয়াছে! বঙ্কিমচন্দ্রের পরবর্ত্তী বঙ্গসাহিত্য সেইরূপ আকস্মিক অত্যুন্নতি লাভ করিয়াছে; একবার সেইটি নিরীক্ষণ এবং পরিমাণ করিয়া দেখিলেই বঙ্কিমের প্রতিভার প্রভূত বল সহজে অনুমান করা যাইবে।

বঙ্কিম নিজে বঙ্গভাষাকে যে শ্রদ্ধা অর্পণ করিয়াছেন, অন্যেও তাহাকে সেইরূপ শ্রদ্ধা করিবে ইহাই তিনি প্রত্যাশা করিতেন। পূর্ব্ব অভ্যাসবশত সাহিত্যের সহিত যদি কেহ ছেলেখেলা করিতে আসিত, তবে বঙ্কিম তাহার প্রতি এমন দণ্ড বিধান করিতেন যে, দ্বিতীয়বার সেরূপ স্পর্দ্ধা দেখাইতে সে আর সাহস করিত না।

তখন সময় আরো কঠিন ছিল। বঙ্কিম নিজে দেশব্যাপী একটি ভাবের আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছিলেন। সেই আন্দোলনের প্রভাবে কত চিত্ত চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল, এবং আপন ক্ষমতার সীমা উপলব্ধি করিতে না পারিয়া কত লোকে যে এক লম্ফে লেখক হইবার চেষ্টা করিয়াছিল, তাহার সংখ্যা নাই। লেখার প্রয়াস জাগিয়া উঠিয়াছে

অথচ লেখার উচ্চ আদর্শ তখন দাঁড়াইয়া যায় নাই। সেই সময়ে সব্যসাচী বঙ্কিম এক হস্ত গঠন-কার্য্যে আর এক হস্ত নিবারণ-কার্য্যে নিযুক্ত রাখিয়াছিলেন। একদিকে অগ্নি জ্বালাইয়া রাখিতেছিলেন আর একদিকে ধূম এবং ভস্মরাশি দূর করিবার ভার নিজেই লইয়াছিলেন।

রচনা এবং সমালোচনা এই উভয় কার্য্যের ভার বঙ্কিম একাকী গ্রহণ করাতেই বঙ্গসাহিত্য এত সত্বর এমন দ্রুত পরিণতি লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিল।

এই দুষ্কর ব্রতানুষ্ঠানের যে ফল তাহাও তাঁহাকে ভোগ করিতে হইয়াছিল। মনে আছে, বঙ্গদর্শনে যখন তিনি সমালোচক-পদে আসীন ছিলেন, তখন তাঁহার ক্ষুদ্র শত্রুর সংখ্যা অল্প ছিল না। শত শত অযোগ্য লোক তাঁহাকে ঈর্ষ্যা করিত এবং তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব অপ্রমাণ করিবার চেষ্টা করিতে ছাড়িত না।

কণ্টক যতই ক্ষুদ্র হৌক্ তাহার বিদ্ধ করিবার ক্ষমতা আছে। এবং কল্পনাপ্রবণ লেখকদিগের বেদনাবোধও সাধারণের অপেক্ষা কিছু অধিক। ছোটো ছোটো দংশনগুলি যে বঙ্কিমকে লাগিত না, তাহা নহে; কিন্তু কিছুতেই তিনি কর্ত্তব্যে পরাঙ্মুখ হন নাই। তাঁহার অজেয় বল, কর্ত্তব্যের প্রতি নিষ্ঠা এবং নিজের প্রতি বিশ্বাস ছিল। তিনি জানিতেন, বর্ত্তমানের কোনো উপদ্রব তাঁহার মহিমাকে আচ্ছন্ন করিতে পারিবে না, সমস্ত ক্ষুদ্র শত্রুর ব্যূহ হইতে তিনি অনায়াসে নিষ্ক্রমণ করিতে পারিবেন। এই জন্য চিরকাল তিনি অম্লানমুখে বীরদর্পে অগ্রসর হইয়াছেন, কোনো দিন তাঁহাকে রথ-বেগ খর্ব্ব করিতে হয় নাই।

সাহিত্যের মধ্যে দুই শ্রেণীর যোগী দেখা যায়, ধ্যানযোগী এবং কর্ম্মযোগী। ধ্যানযোগী একান্তমনে বিরলে ভাবের চর্চ্চা করেন, তাঁহার রচনাগুলি সংসারী লোকের পক্ষে যেন উপরি-পাওনা—যেন যথালাভের মতো।

কিন্তু বঙ্কিম সাহিত্যে কর্ম্মযোগী ছিলেন। তাঁহার প্রতিভা আপনাতে আপনি স্থিরভাবে পর্য্যাপ্ত ছিল না। সাহিত্যের যেখানে যাহা কিছু অভাব ছিল সর্ব্বত্রই তিনি আপনার বিপুল বল এবং আনন্দ লইয়া ধাবমান হইতেন। কি কাব্য, কি বিজ্ঞান, কি ইতিহাস, কি ধর্ম্মতত্ত্ব, যেখানে যখনই তাঁহাকে আবশ্যক হইত, সেখানে তখনই তিনি সম্পূর্ণ প্রস্তুত হইয়া দেখা দিতেন। নবীন বঙ্গসাহিত্যের মধ্যে সকল বিষয়েই আদর্শ স্থাপন করিয়া যাওয়া তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। বিপন্ন বঙ্গভাষা আর্ত্তস্বরে যেখানেই তাঁহাকে আহ্বান করিয়াছে, সেইখানেই তিনি প্রসন্ন চতুর্ভুজ মূর্ত্তিতে দর্শন দিয়াছেন।

কিন্তু তিনি যে কেবল অভয় দিতেন, সান্ত্বনা দিতেন, অভাব পূর্ণ করিতেন, তাহা নহে; তিনি দর্পহারীও ছিলেন। এখন যাঁহারা বঙ্গসাহিত্যের সারথ্য স্বীকার করিতে চান, তাঁহারা দিনে নিশীথে বঙ্গদেশকে অত্যুক্তিপূর্ণ স্তুতিবাক্যে নিয়ত প্রসন্ন রাখিতে চেষ্টা করেন; কিন্তু বঙ্কিমের বাণী কেবল স্তুতিবাদিনী ছিল না, খড়্গধারিণীও ছিল। বঙ্গদেশ যদি অসাড় প্রাণহীন না হইত তবে কৃষ্ণচরিত্রে বর্ত্তমান পতিত হিন্দুসমাজ

ও বিকৃত হিন্দুধর্মের উপর যে অস্ত্রাঘাত আছে, সে-আঘাতে বেদনাবোধ এবং কথঞ্চিৎ চেতনা লাভ করিত। বঙ্কিমের ন্যায় তেজস্বী প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি ব্যতীত আর কেহই লোকাচার দেশাচারের বিরুদ্ধে এরূপ নির্ভীক স্পষ্ট উচ্চারণে আপন মত প্রকাশ করিতে সাহস করিত না। এমন কি, বঙ্কিম প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্রের প্রতি ঐতিহাসিক বিচার প্রয়োগ করিয়া তাহার সার এবং অসার ভাগ পৃথক্‌করণ, তাহার প্রামাণ্য এবং অপ্রামাণ্য অংশের বিশ্লেষণ এমন নিঃসঙ্কোচে করিয়াছেন যে, এখনকার দিনে তাহার তুলনা পাওয়া কঠিন।

বিশেষত দুই শত্রুর মাঝখান দিয়া তাঁহাকে পথ কাটিয়া চলিতে হইয়াছে। একদিকে, যাঁহারা অবতার মানেন না, তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি দেবত্বারোপে বিপক্ষ হইয়া দাঁড়ান। অন্যদিকে, যাঁহারা শাস্ত্রের প্রত্যেক অক্ষর এবং লোকাচারের প্রত্যেক প্রথাকে অভ্রান্ত বলিয়া জ্ঞান করেন, তাঁহারাও বিচারের লৌহাস্ত্র দ্বারা শাস্ত্রের মধ্য হইতে কাটিয়া কাটিয়া কুঁদিয়া কুঁদিয়া মহত্তর মনুষ্যের আদর্শ-অনুসারে দেবতা-গঠনকার্য্যে বড় প্রসন্ন হন নাই। এরূপ অবস্থায় অন্য কেহ হইলে কোনো এক পক্ষকে সর্ব্বতোভাবে আপন দলে পাইতে ইচ্ছা করিতেন। কিন্তু সাহিত্যমহারথী বঙ্কিম দক্ষিণে বামে উভয় পক্ষের প্রতিই তীক্ষ্ণ শরচালনা করিয়া অকুণ্ঠিতভাবে অগ্রসর হইয়াছেন—তাঁহার নিজের প্রতিভা কেবল তাঁহার একমাত্র সহায় ছিল। তিনি যাহা বিশ্বাস করিয়াছেন, তাহা স্পষ্ট ব্যক্ত করিয়াছেন—বাক্‌চাতুরী দ্বারা আপনাকে বা অন্যকে বঞ্চনা করেন নাই।

কল্পনা এবং কাল্পনিকতা দুইয়ের মধ্যে একটা মস্ত প্রভেদ আছে। যথার্থ কল্পনা, যুক্তি সংযম এবং সত্যের দ্বারা সুনির্দ্দিষ্ট আকারবদ্ধ—কাল্পনিকতার মধ্যে সত্যের ভান আছে মাত্র, কিন্তু তাহা অদ্ভুত অতিশয্যে অসঙ্গতরূপে স্ফীতকায়। তাহার মধ্যে যেটুকু আলোকের লেশ আছে ধূমের অংশ তাহার শতগুণ। যাহাদের ক্ষমতা অল্প, তাহারা সাহিত্যের প্রায় এই প্রধূমিত কাল্পনিকতার আশ্রয় লইয়া থাকে—কারণ, ইহা দেখিতে প্রকাণ্ড কিন্তু প্রকৃতপক্ষে অত্যন্ত লঘু। এক শ্রেণীর পাঠকেরা এইরূপ ভূরিপরিমাণ কৃত্রিম কাল্পনিকতার নৈপুণ্যে মুগ্ধ এবং অভিভূত হইয়া পড়েন এবং দুর্ভাগ্যক্রমে বাংলায় সেই শ্রেণীর পাঠক বিরল নহে।

এইরূপ অপরিমিত অসংযত কল্পনার দেশে বঙ্কিমের ন্যায় আদর্শ আমাদের পক্ষে অত্যন্ত মূল্যবান। কৃষ্ণচরিত্রে উদ্দামভাবের আবেগে তাঁহার কল্পনা কোথাও উচ্ছৃঙ্খল হইয়া ছুটিয়া যায় নাই। প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই তিনি পদে পদে আত্মসম্বরণপূর্ব্বক যুক্তির সুনির্দ্দিষ্ট পথ অবলম্বন করিয়া চলিয়াছেন। যাহা লিখিয়াছেন তাহাতে তাঁহার প্রতিভা প্রকাশ পাইয়াছে, যাহা লিখেন নাই তাহাতেও তাঁহার অল্প ক্ষমতা প্রকাশ পায় নাই।

বিশেষত বিষয়টি এমন, যে, ইহা কোনো সাধারণ বাঙালী লেখকের হস্তে পড়িলে তিনি এই সুযোগে বিস্তর হরি হরি, মরি মরি, হায় হায়, অশ্রুপাত ও প্রবল অঙ্গভঙ্গী

করিতেন এবং কল্পনার উচ্ছ্বাস, ভাবের আবেগ এবং হৃদয়াতিশয্য প্রকাশ করিবার এমন অনুকূল অবসর কখনই ছাড়িতেন না ; সুবিচারিত তর্ক দ্বারা, সুকঠিন সত্যনির্ণয়ের স্পৃহা দ্বারা পদে পদে আপন লেখনীকে বাধা দিতেন না ; সর্ব্বজনগম্য সরল পথ ছাড়িয়া দিয়া সূক্ষ্মবুদ্ধি দ্বারা স্বকপোলকল্পিত একটা নূতন আবিষ্কারকেই সর্ব্বপ্রাধান্য দিয়া তাহাকেই বাক্‌প্রাচুর্য্যে এবং কল্পনাকুহকে সমাচ্ছন্ন করিয়া তুলিতেন, এবং নিজের বিশ্বাস ও ভাষাকে যথাসাধ্য টানিয়া বুনিয়া আশে পাশে দীর্ঘ করিয়া অধিক পরিমাণ লোককে আপন মতের জালে আকর্ষণ করিতে চেষ্টা করিতেন।

বস্তুত আমাদের শাস্ত্র হইতে ইতিহাস-উদ্ধারের দুরূহ ভার কেবল বঙ্কিম লইতে পারিতেন! এক দিকে হিন্দুশাস্ত্রের প্রকৃত মর্ম্মগ্রহণে য়ুরোপীয়গণের অক্ষমতা, অন্যদিকে শাস্ত্রগত প্রমাণের নিরপেক্ষ বিচার-সম্বন্ধে হিন্দুদিগের সঙ্কোচ ; একদিকে রীতিমত পরিচয়ের অভাব, অন্যদিকে অতিপরিচয়জনিত অভ্যাস ও সংস্কারের অন্ধতা ; যথার্থ ইতিহাসটিকে এই উভয়সঙ্কটের মাঝখান হইতে উদ্ধার করিতে হইবে। দেশানুরাগের সাহায্যে শাস্ত্রের অন্তরে প্রবেশ করিতে হইবে এবং সত্যানুরাগের সাহায্যে তাহার অমূলক অংশ পরিত্যাগ করিতে হইবে। যে বল্গার ইঙ্গিতে লেখনীকে বেগ দিতে হইবে, সেই বল্গার আকর্ষণে তাহাকে সর্ব্বদা সংযত করিতে হইবে। এই সকল ক্ষমতা-সামঞ্জস্য বঙ্কিমের ছিল।—সেই জন্য মৃত্যুর অনতিপূর্ব্বে তিনি যখন প্রাচীন বেদ পুরাণ সংগ্রহ করিয়া প্রস্তুত হইয়া বসিয়াছিলেন, তখন বঙ্গসাহিত্যের বড় আশার কারণ ছিল, কিন্তু মৃত্যু সে-আশা সফল হইতে দিল না, এবং আমাদের ভাগ্যে যাহা অসম্পন্ন রহিয়া গেল, তাহা যে কবে সমাধা হইবে কেহই বলিতে পারে না।

বঙ্কিম এই যে সর্ব্বপ্রকার আতিশয্য এবং অসঙ্গতি হইতে আপনাকে রক্ষা করিয়া গিয়াছেন, ইহা তাঁহার প্রতিভার প্রকৃতিগত। যে-কেহ তাঁহার রচনা পড়িয়াছেন, সকলেই জানেন, বঙ্কিম হাস্যরসে সুরসিক ছিলেন। যে পরিষ্কার যুক্তির আলোকের দ্বারা সমস্ত আতিশয্য ও অসঙ্গতি প্রকাশ হইয়া পড়ে, হাস্যরস সেই কিরণেরই একটি রশ্মি। কতদূর পর্য্যন্ত গেলে একটি ব্যাপার হাস্যজনক হইয়া উঠে তাহা সকলে অনুভব করিতে পারে না, কিন্তু যাঁহারা হাস্যরস-রসিক তাঁহাদের অন্তঃকরণে একটি বোধশক্তি আছে যদ্দ্বারা তাঁহারা সকল সময়ে নিজের না হইলেও অপরের কথাবার্ত্তা আচার ব্যবহার এবং চরিত্রের মধ্যে সুসঙ্গতির সূক্ষ্ম সীমাটুকু সহজে নির্ণয় করিতে পারেন।

নির্ম্মল শুভ্র সংযত হাস্য বঙ্কিমই সর্ব্বপ্রথমে বঙ্গসাহিত্যে আনয়ন করেন। তৎপূর্ব্বে বঙ্গসাহিত্যে হাস্যরসকে অন্যরসের সহিত এক পংক্তিতে বসিতে দেওয়া হইত না। সে নিম্নাসনে বসিয়া শ্রাব্য অশ্রাব্য ভাষায় ভাঁড়ামি করিয়া সভাজনের মনোরঞ্জন করিত। আদিরসেরই সহিত যেন তাহার কোনো একটি সর্ব্ব-উপদ্রবসহ বিশেষ কুটুম্বিতার সম্পর্ক ছিল এবং ঐ রসটাকেই সর্ব্বপ্রকারে পীড়ন ও আন্দোলন করিয়া তাহার অধিকাংশ পরিহাস বিদ্রূপ প্রকাশ পাইত। এই প্রগল্‌ভ বিদূষকটি

যতই প্রিয়পাত্র থাক্ কখনও সম্মানের অধিকারী ছিল না। যেখানে গম্ভীরভাবে কোনো বিষয়ের আলোচনা হইত, সেখানে হাস্যের চপলতা সর্ব্বপ্রযত্নে পরিহার করা হইত।

বঙ্কিম সর্ব্বপ্রথমে হাস্যরসকে সাহিত্যের উচ্চ শ্রেণীতে উন্নত করেন। তিনিই প্রথমে দেখাইয়া দেন যে, কেবল প্রহসনের সীমার মধ্যে হাস্যরস বদ্ধ নহে; উজ্জ্বল শুভ্র হাস্য সকল বিষয়কেই আলোকিত করিয়া তুলিতে পারে। তিনিই প্রথম দৃষ্টান্তের দ্বারা প্রমাণ করাইয়া দেন যে, এই হাস্যজ্যোতির সংস্পর্শে কোনো বিষয়ের গভীরতার গৌরব হ্রাস হয় না, কেবল তাহার সৌন্দর্য্য এবং রমণীয়তার বৃদ্ধি হয়, তাহার সর্ব্বাংশের প্রাণ এবং গতি যেন সুস্পষ্টরূপে দীপ্যমান হইয়া উঠে। যে-বঙ্কিম বঙ্গসাহিত্যের গভীরতা হইতে অশ্রুর উৎস উন্মুক্ত করিয়াছেন, সেই বঙ্কিম আনন্দের উদয়শিখর হইতে নবজাগ্রত বঙ্গসাহিত্যের উপর হাস্যের আলোক বিকীর্ণ করিয়া দিয়াছেন।

কেবল সুসঙ্গতি নহে, সুরুচি এবং শিষ্টতার সীমা নির্ণয় করিতেও একটি স্বাভাবিক সূক্ষ্ম বোধশক্তির আবশ্যক। মাঝে মাঝে অনেক বলিষ্ঠ প্রতিভার মধ্যে সেই বোধ-শক্তির অভাব দেখা যায়। কিন্তু বঙ্কিমের প্রতিভায় বল এবং সৌকুমার্য্যের একটি সুন্দর সম্মিশ্রণ ছিল। নারীজাতির প্রতি যথার্থ বীরপুরুষের মনে যেরূপ একটি সসম্ভ্রম সম্মানের ভাব থাকে, তেমনই সুরুচি এবং শীলতার প্রতি বঙ্কিমের বলিষ্ঠ বুদ্ধির একটি ভদ্রোচিত বীরোচিত প্রীতিপূর্ণ শ্রদ্ধা ছিল। বঙ্কিমের রচনা তাহার সাক্ষ্য। বর্ত্তমান লেখক যে-দিন প্রথম বঙ্কিমকে দেখিয়াছিল, সেদিন একটি ঘটনা ঘটে যাহাতে বঙ্কিমের এই স্বাভাবিক সুরুচিপ্রিয়তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

সেদিন লেখকের আত্মীয় পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর মহোদয়ের নিমন্ত্রণে তাঁহাদের মরকতকুঞ্জে কলেজ-রিয়ুনিয়ন্ নামক মিলন-সভা বসিয়াছিল। ঠিক কত দিনের কথা ভালো স্মরণ নাই, কিন্তু আমি তখন বালক ছিলাম। সেদিন সেখানে আমার অপরিচিত বহুতর যশস্বী লোকের সমাগম হইয়াছিল। সেই বুধমণ্ডলীর মধ্যে একটি ঋজু দীর্ঘকায় উজ্জ্বলকৌতুকপ্রফুল্লমুখ গুম্ফধারী প্রৌঢ় পুরুষ চাপকান-পরিহিত বক্ষের উপর দুই হস্ত আবদ্ধ করিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন। দেখিবামাত্রই যেন তাঁহাকে সকলের হইতে স্বতন্ত্র এবং আত্মসমাহিত বলিয়া বোধ হইল। আর সকলে জনতার অংশ, কেবল তিনি যেন একাকী একজন। সেদিন আর কাহারো পরিচয় জানিবার জন্য আমার কোনোরূপ প্রয়াস জন্মে নাই, কিন্তু তাঁহাকে দেখিয়া তৎক্ষণাৎ আমি এবং আমার একটি আত্মীয় সঙ্গী একসঙ্গেই কৌতূহলী হইয়া উঠিলাম। সন্ধান লইয়া জানিলাম তিনিই আমাদের বহুদিনের অভিলষিতদর্শন লোকবিশ্রুত বঙ্কিমবাবু। মনে আছে, প্রথম দর্শনেই তাঁহার মুখশ্রীতে প্রতিভার প্রখরতা এবং বলিষ্ঠতা এবং সর্ব্বলোক হইতে তাঁহার একটি সুদূর স্বাতন্ত্র্যভাব আমার মনে অঙ্কিত হইয়া গিয়াছিল। তাহার পর অনেক বার তাঁহার সাক্ষাৎলাভ করিয়াছি, তাঁহার নিকট অনেক উৎসাহ এবং উপদেশ প্রাপ্ত হইয়াছি, এবং তাঁহার মুখশ্রী স্নেহের কোমলহাস্যে অত্যন্ত কমনীয়

হইতে দেখিয়াছি, কিন্তু প্রথম দশ নে সেই যে তাঁহার মুখের উদ্যত খড়্গের ন্যায় একটি উজ্জ্বল সুতীক্ষ্ণ প্রবলতা দেখিতে পাইয়াছিলাম, তাহা আজ পর্য্যন্ত বিস্মৃত হই নাই।

সেই উৎসব-উপলক্ষে একটি ঘরে একজন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত দেশানুরাগমূলক স্বরচিত সংস্কৃত শ্লোক পাঠ এবং তাহার ব্যাখ্যা করিতেছিলেন। বঙ্কিম একপ্রান্তে দাঁড়াইয়া শুনিতেছিলেন। পণ্ডিত মহাশয় সহসা একটি শ্লোকে পতিত ভারতসন্তানকে লক্ষ্য করিয়া একটা অত্যন্ত সেকেলে পণ্ডিতী রসিকতা প্রয়োগ করিলেন, সে-রস কিঞ্চিৎ বীভৎস হইয়া উঠিল। বঙ্কিম তৎক্ষণাৎ একান্ত সঙ্কুচিত হইয়া দক্ষিণ করতলে মুখের নিম্নার্দ্ধ ঢাকিয়া পার্শ্ববর্ত্তী দ্বার দিয়া দ্রুতবেগে অন্য ঘরে পলায়ন করিলেন। বঙ্কিমের সেই সসঙ্কোচ পলায়ন-দৃশ্যটি অদ্যাবধি আমার মনে মুদ্রাঙ্কিত হইয়া আছে।

বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে, ঈশ্বর গুপ্ত যখন সাহিত্যগুরু ছিলেন, বঙ্কিম তখন তাঁহার শিষ্যশ্রেণীর মধ্যে গণ্য ছিলেন। সে-সময়কার সাহিত্য অন্য যে-কোনো প্রকার শিক্ষা দিতে সমথ হৌক্, ঠিক সুরুচি-শিক্ষার উপযোগী ছিল না। সে-সময়কার অসংযত বাগ্‌যুদ্ধ এবং আন্দোলনের মধ্যে দীক্ষিত ও বর্দ্ধিত হইয়া ইতরতার প্রতি বিদ্বেষ, সুরুচির প্রতি শ্রদ্ধা এবং শীলতা-সম্বন্ধে অক্ষুণ্ণ বেদনাবোধ রক্ষা করা যে কী আশ্চর্য্য ব্যাপার তাহা সকলেই বুঝিতে পারিবেন। দীনবন্ধুও বঙ্কিমের সমসাময়িক এবং তাঁহার বান্ধব ছিলেন, কিন্তু তাঁহার লেখায় অন্য ক্ষমতা প্রকাশ হইলেও তাহাতে বঙ্কিমের প্রতিভার এই ব্রাহ্মণোচিত শুচিতা দেখা যায় নাই। তাঁহার রচনা হইতে ঈশ্বর গুপ্তের সময়ের ছাপ কালক্রমে ধৌত হইতে পারে নাই।

আমাদের মধ্যে যাঁহারা সাহিত্যব্যবসায়ী তাঁহারা বঙ্কিমের কাছে যে কী চিরঋণে আবদ্ধ, তাহা যেন কোন কালে বিস্মৃত না হন। একদিন আমাদের বঙ্গভাষা কেবল একতারা যন্ত্রের মতো এক তারে বাঁধা ছিল, কেবল সহজ সুরে ধর্ম্ম সঙ্কীর্ত্তন করিবার উপযোগী ছিল; বঙ্কিম স্বহস্তে তাহাতে এক একটি করিয়া তার চড়াইয়া আজ তাহাকে বীণাযন্ত্রে পরিণত করিয়া তুলিয়াছেন। পূর্ব্বে যাহাতে কেবল স্থানীয় গ্রাম্যসুর বাজিত, আজ তাহা বিশ্বসভায় শুনাইবার উপযুক্ত ধ্রুবপদ অঙ্গের কলাবতী রাগিণী আলাপ করিবার যোগ্য হইয়া উঠিতেছে। সেই তাঁহার স্বহস্তসম্পূর্ণ স্নেহপালিত ক্রোড়সঙ্গিনী বঙ্গভাষা আজ বঙ্কিমের জন্য অন্তরের সহিত রোদন করিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু তিনি এই শোকোচ্ছ্বাসের অতীত শান্তিধামে দুষ্কর জীবনযজ্ঞের অবসানে নির্ব্বিকার নিরাময় বিশ্রাম লাভ করিয়াছেন। মৃত্যুর পরে তাঁহার মুখে একটি কোমল প্রসন্নতা, একটি সর্ব্বদুঃখতাপহীন গভীর প্রশান্তি উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিল—যেন জীবনের মধ্যাহ্ন-রৌদ্রদগ্ধ কঠিন সংসারতল হইতে মৃত্যু তাঁহাকে স্নেহ-সুশীতল জননীক্রোড়ে তুলিয়া লইয়াছে। আজ আমাদের বিলাপ-পরিতাপ তাঁহাকে স্পর্শ করিতেছে না, আমাদের ভক্তি-উপহার গ্রহণ করিবার জন্য সেই প্রতিভাজ্যোতির্ম্ময় সৌম্য প্রসন্নমূর্ত্তি এখানে উপস্থিত নাই। আমাদের এই শোক এই ভক্তি কেবল আমাদেরই কল্যাণের জন্য।

বঙ্কিম সাহিত্যক্ষেত্রে যে আদর্শ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন, এই শোকে এই ভক্তিতে সেই আদর্শ প্রতিমা আমাদের অন্তরে উজ্জ্বল এবং স্থায়ী-রূপে প্রতিষ্ঠিত হৌক্। প্রস্তরের মূর্ত্তি স্থাপনের অর্থ এবং সামর্থ্য আমাদের যদি না থাকে, তবে একবার তাঁহার মহত্ত্ব সর্ব্বতোভাবে মনের মধ্যে উপলব্ধি করিয়া তাঁহাকে আমাদের বঙ্গ-হৃদয়ের স্মরণস্তম্ভে স্থায়ী করিয়া রাখি। ইংরেজ এবং ইংরেজের আইন চিরস্থায়ী নহে; রাজনৈতিক, ধর্ম্মনৈতিক, সমাজনৈতিক মতামত সহস্রবার পরিবর্ত্তিত হইতে পারে; যে-সকল ঘটনা যে-সকল অনুষ্ঠান আজ সর্ব্বপ্রধান বলিয়া বোধ হইতেছে এবং যাহার উন্মাদনার কোলাহলে সমাজের খ্যাতিহীন শব্দহীন কর্ত্তব্যগুলিকে নগণ্য বলিয়া ধারণা হইতেছে, কাল তাহার স্মৃতিমাত্র চিহ্নমাত্র অবশিষ্ট থাকিতে না পারে; কিন্তু যিনি আমাদের মাতৃভাষাকে সর্ব্বপ্রকার ভাবপ্রকাশের অনুকূল করিয়া গিয়াছেন, তিনি এই হতভাগ্য দরিদ্র দেশকে একটি অমূল্য চিরসম্পদ্ দান করিয়াছেন। তিনি স্থায়ী জাতীয় উন্নতির একমাত্র মূল উপায় স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। তিনিই আমাদের নিকট যথার্থ শোকের মধ্যে সান্ত্বনা, অবনতির মধ্যে আশা, শ্রান্তির মধ্যে উৎসাহ এবং দারিদ্র্যের শূন্যতার মধ্যে চিরসৌন্দর্য্যের অক্ষয় আকর উদ্‌ঘাটিত করিয়া দিয়াছেন। আমাদিগের মধ্যে যাহা-কিছু অমর এবং আমাদিগকে যাহা-কিছু অমর করিবে, সেই সকল মহাশক্তিকে ধারণ করিবার, পোষণ করিবার, প্রকাশ করিবার এবং সর্ব্বত্র প্রচার করিবার একমাত্র উপায় যে মাতৃভাষা তাহাকেই তিনি বলবতী এবং মহীয়সী করিয়াছেন।

রচনাবিশেষের সমালোচনা ভ্রান্ত হইতে পারে—আমাদিগের নিকট যাহা প্রশংসিত কালক্রমে শিক্ষা, রুচি এবং অবস্থার পরিবর্ত্তনে আমাদের উত্তর পুরুষের নিকট তাহা নিন্দিত এবং উপেক্ষিত হইতে পারে, কিন্তু বঙ্কিম বঙ্গভাষার ক্ষমতা এবং বঙ্গসাহিত্যের সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছেন; তিনি ভগীরথের ন্যায় সাধনা করিয়া বঙ্গ-সাহিত্যে ভাবমন্দাকিনীর অবতারণ করিয়াছেন এবং সেই পুণ্য-স্রোতঃস্পর্শে জড়ত্বশাপ মোচন করিয়া আমাদের প্রাচীন ভস্মরাশিকে সঞ্জীবিত করিয়া তুলিয়াছেন—ইহা কেবল সাময়িক মত নহে, এ-কথা কোনো বিশেষ তর্ক বা রুচির উপর নির্ভর করিতেছে না, ইহা একটি ঐতিহাসিক সত্য।

এই কথা স্মরণে মুদ্রিত করিয়া সেই বাংলা লেখকদিগের গুরু, বাংলা পাঠকদিগের সুহৃদ্, এবং সুজলা সুফলা মলয়জশীতলা বঙ্গভূমির মাতৃবৎসল প্রতিভাশালী সন্তানের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করি, যিনি জীবনের সায়াহ্ন আসিবার পূর্ব্বেই, নূতন অবকাশে নূতন উদ্যমে নূতন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবার প্রারম্ভেই, আপনার অপরিম্লান প্রতিভা-রশ্মি সংহরণ করিয়া বঙ্গ-সাহিত্যাকাশ ক্ষীণতর জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর হস্তে সমর্পণপূর্ব্বক গত শতাব্দীর বর্ষশেষের পশ্চিম দিগন্তসীমায় অকালে অস্তমিত হইলেন।

[১৩০০]

বিহারীলাল

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিহারীলালের কণ্ঠ সাধারণের নিকট তেমন সুপরিচিত ছিল না। তাঁহার শ্রোতৃমণ্ডলীর সংখ্যা অল্প ছিল এবং তাঁহার সুমধুর সঙ্গীত নির্জনে নিভৃতে ধ্বনিত হইতে থাকিত, খ্যাতির প্রার্থনায় পাঠক এবং সমালোচক-সমাজের দ্বারবর্ত্তী হইত না।

কিন্তু যাহারা দৈবক্রমে এই বিজনবাসী ভাবনিমগ্ন কবির সঙ্গীত-কাকলীতে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার কাছে আসিয়াছিল, তাহাদের নিকটে আদরের অভাব ছিল না। তাহারা তাঁহাকে বঙ্গের শ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া জানিত।

বঙ্গদর্শন-প্রকাশ হইবার বহুপূর্ব্বে কিছুকাল ধরিয়া অবোধবন্ধু নামক একটি মাসিক পত্র বাহির হইত। তখন বর্ত্তমান লেখক বালক-বয়স-প্রযুক্ত নিতান্ত অবোধ ছিল। কিঞ্চিৎ বয়ঃপ্রাপ্তিসহকারে যখন বোধোদয় হইল, তখন উক্ত কাগজ বন্ধ হইয়া গেল।

সৌভাগ্যক্রমে পত্রগুলি কতক বাঁধানো কতক-বা খণ্ড আকারে আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার আলমারির মধ্যে রক্ষিত ছিল। অনেক মূল্যবান্ গ্রন্থাদি থাকাতে সে আলমারিতে চপলপ্রকৃতি বালকদের হস্তক্ষেপ নিষিদ্ধ ছিল। এক্ষণে নির্ভয়ে স্বীকার করিতে পারি,—অবোধবন্ধুর বন্ধুত্ব-প্রলোভনে মুগ্ধ হইয়া সে নিষেধ লঙ্ঘন করিয়াছিলাম। এই গোপন দুষ্কর্ম্মের জন্য কোনোরূপ শাস্তি পাওয়া দূরে থাক, বহুকাল ধরিয়া যে আনন্দলাভ করিয়াছিলাম, তাহা এখনো বিস্মৃত হই নাই।

এই ক্ষুদ্র পত্রে যে-সকল গদ্যপ্রবন্ধ বাহির হইত, তাহার মধ্যে কিছু বিশেষত্ব ছিল। তখনকার বাংলা গদ্যে সাধুভাষার অভাব ছিল না, কিন্তু ভাষার চেহারা ফোটে নাই। তখন যাঁহারা মাসিক পত্রে লিখিতেন তাঁহারা গুরু সাজিয়া লিখিতেন; এই জন্য তাঁহারা পাঠকদের নিকট আত্মপ্রকাশ করেন নাই এবং এই জন্যই তাঁহাদের লেখার যেন একটা স্বরূপ ছিল না। যখন অবোধবন্ধু পাঠ করিতাম তখন তাহাকে ইস্কুলের পড়ার অনুবৃত্তি বলিয়া মনে হইত না। বাংলা ভাষায় বোধ করি সেই প্রথম মাসিক পত্র বাহির হইয়াছিল, যাহার রচনার মধ্যে একটা স্বাদ-বৈচিত্র্য পাওয়া যাইত। বর্ত্তমান বঙ্গসাহিত্যের প্রাণ-সঞ্চারের ইতিহাস যাঁহারা পর্য্যালোচনা করিবেন, তাঁহারা অবোধবন্ধুকে উপেক্ষা করিতে পারিবেন না। বঙ্গদর্শনকে যদি আধুনিক বঙ্গসাহিত্যের প্রভাত-সূর্য্য বলা যায়, তবে ক্ষুদ্রায়তন অবোধবন্ধুকে প্রত্যূষের শুকতারা বলা যাইতে পারে।

সে প্রত্যূষে অধিক লোক জাগে নাই এবং সাহিত্যকুঞ্জে বিচিত্র কলগীত কূজিত হইয়া উঠে নাই। সেই উষালোকে কেবল একটি ভোরের পাখী সুমিষ্ট সুন্দর সুরে গান ধরিয়াছিল। সে সুর তাহার নিজের।

ঠিক ইতিহাসের কথা বলিতে পারি না, কিন্তু আমি সেই প্রথম বাংলা কবিতায় কবির নিজের সুর শুনিলাম।

রাত্রির অন্ধকার যখন দূর হইতে থাকে, তখন যেমন জগতের মূর্ত্তি রেখায় রেখায় ফুটিয়া উঠে—সেইরূপ অবোধবন্ধুর গদ্যে এবং পদ্যে যেন প্রতিভার প্রত্যুষকিরণে মূর্ত্তির বিকাশ হইতে লাগিল। পাঠকের কল্পনার নিকটে একটি ভাবের দৃশ্য উদ্‌ঘাটিত হইয়া গেল,—

" সর্ব্বদাই হু হু করে মন,
বিশ্ব যেন মরুর মতন ;
চারি দিকে ঝালাপালা,
উঃ কি জ্বলন্ত জ্বালা !
অগ্নিকুণ্ডে পতঙ্গ-মতন।"

আধুনিক বঙ্গসাহিত্যে এই প্রথম বোধ হয় কবির নিজের কথা। তৎসময়ে অথবা তৎপূর্ব্বে মাইকেলের চতুর্দ্দশপদীতে কবির আত্ম-নিবেদন কখনো কখনো প্রকাশ পাইয়া থাকিবে, কিন্তু তাহা বিরল, এবং চতুর্দ্দশপদীর সংক্ষিপ্ত পরিসরের মধ্যে আত্মকথা এমন কঠিন ও সংহত হইয়া আসে যে, তাহাতে বেদনার গীতোচ্ছ্বাস তেমন স্ফূর্ত্তি পায় না।

বিহারীলাল তখনকার ইংরাজিভাষায় নব্যশিক্ষিত কবিদিগের ন্যায় যুদ্ধবর্ণনাসঙ্কুল মহাকাব্য, উদ্দীপনাপূর্ণ দেশানুরাগমূলক কবিতা লিখিলেন না, এবং পুরাতন কবিদিগের ন্যায় পৌরাণিক উপাখ্যানের দিকেও গেলেন না—তিনি নিভৃতে বসিয়া নিজের ছন্দে নিজের মনের কথা বলিলেন। তাঁহার সেই স্বগত উক্তিতে বিশ্বহিত, দেশহিত অথবা সভামনোরঞ্জনের কোনো উদ্দেশ্য দেখা গেল না। এই জন্য তাঁহার সুর অন্তরঙ্গরূপে হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া সহজেই পাঠকের বিশ্বাস আকর্ষণ করিয়া আনিল।

পাঠকদিগকে এইরূপে বিশ্রব্ধভাবে আপনার নিকটে টানিয়া আনিবার ভাব প্রথম অবোধবন্ধুর গদ্যে এবং অবোধবন্ধুর কবি বিহারীলালের কাব্যে অনুভব করিয়াছিলাম। পোল্-বর্জিনীতে (*Paul and Virginia*) যেমন মানুষের এবং প্রকৃতির নিকট-পরিচয় লাভ করিয়াছিলাম, বিহারীলালের কাব্যেও সেইরূপ একটি ঘনিষ্ঠ সঙ্গ প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। মনে আছে, নিম্ন-উদ্ধৃত শ্লোকগুলির বর্ণনায় এবং সঙ্গীতে মনশ্চক্ষের সমক্ষে সুন্দর চিত্রপট উদ্‌ঘাটিত হইয়া হৃদয়কে চঞ্চল করিয়া তুলিত :—

" কভু ভাবি কোন ঝরণার,
উপলে বন্ধুর যার ধার ;
প্রচণ্ড প্রতাপ-ধ্বনি,
বায়ুবেগে প্রতিধ্বনি
চতুর্দ্দিকে হতেছে বিস্তার ;—

গিয়ে তার তীরতরু-তলে,
পুরু পুরু নধর শাদ্বলে,
ডুবাইয়ে এ শরীর,
শব-সম রব স্থির—
কান দিয়ে জল-কলকলে।
যে সময় কুরঙ্গিণীগণ,
সবিস্ময়ে মেলিয়ে নয়ন,
আমার সে দশা দেখে',
কাছে এসে চেয়ে থেকে
অশ্রুজল করিবে মোচন ;—
সে সময়ে আমি উঠে গিয়ে,
তাহাদের গলা জড়াইয়ে,
মৃত্যুকালে মিত্র এলে
লোকে যেম্নি চক্ষু মেলে,
তেম্নিতর থাকিব চাহিয়ে।"

কবি যেমন—'হু হু'—করার কথা লিখিয়াছেন তাহা কি প্রকৃতির, বলিতে পারি না। কিন্তু এই বর্ণনা পাঠ করিয়া বহির্জগতের জন্য একটি বালক-পাঠকের মন হু হু করিয়া উঠিত। ঝরণার ধারে জলশীকর-সিক্ত স্নিগ্ধশ্যামল দীর্ঘকোমল ঘনকাশের মধ্যে দেহ নিমগ্ন করিয়া নিস্তব্ধভাবে জল-কলধ্বনি শুনিতে পাওয়া একটি পরম আকাঙ্ক্ষার বিষয় বলিয়া মনে হইত ; এবং যদিও জ্ঞানে জানি যে, কুরঙ্গিণীগণ কবির দুঃখে অশ্রুপাত করিতে আসে না এবং সাধ্যমতে কবির আলিঙ্গনেও ধরা দিতে চাহে না, তথাপি এই নির্ঝরপার্শ্বে ঘনশষ্পতটে মানবের বাহুপাশবদ্ধ মুগ্ধ কুরঙ্গিণীর দৃশ্য অপরূপ সৌন্দর্য্যে হৃদয়ে সম্ভববৎ চিত্রিত হইয়া উঠিত :—

"কভু ভাবি পল্লীগ্রামে যাই,
নাম-ধাম সকল লুকাই ;
চাষীদের মাঝে রয়ে,
চাষীদের মত হয়ে,
চাষীদের সঙ্গেতে বেড়াই।
প্রাতঃকালে মাঠের উপর,
শুদ্ধ বায়ু বহে ঝর্ ঝর্।
চারি দিক্ মনোরম,
আমোদে করিব শ্রম ;
সুস্থ স্ফূর্ত্ত হবে কলেবর।
বাজাইয়ে বাঁশের বাঁশরী,
শাদা সোজা গ্রাম্য গান ধরি,

সরল চাষার সনে,
প্রমোদ-প্রফুল্ল মনে
কাটাইব আনন্দে শর্ব্বরী।

বরষার যে ঘোরা নিশায়,
সৌদামিনী মাতিয়ে বেড়ায় ;
ভীষণ বজ্রের নাদ,
ভেঙে যেন পড়ে ছাদ,
বাবু সব কাঁপেন কোঠায় ;

সে নিশায় আমি ক্ষেত্র-তীরে,
নড়বোড়ে পাতার কুটীরে,
স্বচ্ছন্দে রাজার মত
ভূমে আছি নিদ্রাগত ;
প্রাতে উঠে দেখিব মিহিরে।"

কলিকাতার ছেলে পল্লীগ্রামের এই সুখময় চিত্রে যে ব্যাকুল হইয়া উঠিবে ইহাতে আর বৈচিত্র্য কিছুই নাই। ইহা হইতে বুঝা যায়, অসন্তোষ মানবপ্রকৃতির সহজাত। অট্টালিকার অপেক্ষা নড়্‌বোড়ে পাতার কুটীরে যে সুখের অংশ অধিক আছে, অট্টালিকা-বাসী বালকের মনে এ মায়া কে জন্মাইয়া দিল? আদিম মানবপ্রকৃতি। কবি নহে। কবিকে যিনি ভুলাইয়াছেন, সেই মহামায়া। কবিতায় অসন্তোষ-গানের বাহুল্য দেখা যায় বলিয়া অনেকে আক্ষেপ করিয়া থাকেন। কিন্তু দোষ কাহাকে দিব? অসন্তোষ মানুষকে কাজ করাইতেছে, আকাঙ্ক্ষা কবিকে গান গাওয়াইতেছে। সন্তোষ এবং পরিতৃপ্তি যতই প্রার্থনীয় হৌক্ তাহাতে কার্য্য এবং কাব্য উভয়েরই ব্যাঘাত করিয়া থাকে। অ যেমন বর্ণমালার আরম্ভ এবং সমস্ত ব্যঞ্জনবর্ণের সহিত যুক্ত, অসন্তোষ ও অতৃপ্তি সেইরূপ সৃজনের আরম্ভে বর্ত্তমান এবং সমস্ত মানবপ্রকৃতির সহিত নিয়ত সংযুক্ত। এই জন্যই তাহা কবিতায় প্রাধান্য লাভ করিয়াছে, কবিদিগের মানসিক ক্ষিপ্ততা বা পরিপাকশক্তির বিকারবশত নহে। কৃষক-কবি যখন কবিতা রচনা করে, তখন সে মাঠের শোভা, কুটীরের সুখ বর্ণনা করে না—নগরের বিস্ময়জনক বৈচিত্র্য তাহার চিত্ত আকর্ষণ করে—তখন সে গাহিয়া উঠে,—

"কি কল বানিয়েছে সাহেব কোম্পানি!
কলেতে ধোঁয়া ওঠে আপনি—সজনী!"

কলের বাঁশী যাহারা শুনিতেছে মাঠের 'বাঁশের বাঁশরী' শুনিয়া তাহারা ব্যাকুল হয় এবং যাহারা বাঁশের বাঁশরী বাজাইয়া থাকে কলের বাঁশী শুনিলেই তাহাদের হৃদয় বিচলিত হইয়া উঠে। এই জন্য সহরের কবিও সুখের কথা বলে না, মাঠের কবিও আকাঙ্ক্ষার চাঞ্চল্য গানে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করে।

সাময়িক কবিদিগের সহিত বিহারীলালের আর একটি প্রধান প্রভেদ তাঁহার ভাষা। ভাষার প্রতি আমাদের অনেক কবির কিয়ৎ পরিমাণে অবহেলা আছে।

বিশেষত মিত্রাক্ষর ছন্দের মিলটা তাঁহারা নিতান্ত কায়ক্লেশে রক্ষা করেন। অনেকে কেবলমাত্র শেষ অক্ষরের মিলকে যথেষ্ট জ্ঞান করেন এবং অনেকে ‘হয়েছে,’ ‘করেছে,’ ‘ভুলেছে’ প্রভৃতি ক্রিয়াপদের মিলকে মিল বলিয়া গণ্য করিয়া থাকেন। মিলের দুইটি প্রধান গুণ আছে: এক তাহা কর্ণতৃপ্তিকর, আর এক অভাবিতপূর্ব্ব। অসম্পূর্ণ মিলে কর্ণের তৃপ্তি হয় না, সেটুকু মিলে স্বরের অনৈক্যটা আরও যেন বেশি করিয়া ধরা পড়ে এবং তাহাতে কবির অক্ষমতা ও ভাষার দারিদ্র্য প্রকাশ পায়। ক্রিয়াপদের মিল যত ইচ্ছা করা যাইতে পারে—সেরূপ মিলে কর্ণে প্রত্যেকবার নূতন বিস্ময় উৎপাদন করে না, এই জন্য তাহা বিরক্তি-জনক ও ‘একঘেয়ে’ হইয়া উঠে। বিহারীলালের ছন্দে মিলের এবং ভাষার দৈন্য নাই। তাহা প্রবহমাণ নির্ঝরের মতো সহজ সঙ্গীতে অবিশ্রাম-ধ্বনিত হইয়া চলিয়াছে। ভাষা স্থানে স্থানে সাধুতা পরিত্যাগ করিয়া অকস্মাৎ অশিষ্ট এবং কর্ণপীড়ক হইয়াছে, ছন্দ অকারণে আপন বাঁধ ভাঙিয়া স্বেচ্ছাচারী হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু সে কবির স্বেচ্ছাকৃত—অক্ষমতাজনিত নহে। তাঁহার রচনা পড়িতে পড়িতে কোথাও এ কথা মনে হয় না যে, এইখানে কবিকে দায়ে পড়িয়া মিল নষ্ট বা ছন্দ ভঙ্গ করিতে হইয়াছে।

কিন্তু উপরে যে ছন্দের শ্লোকগুলি উদ্ধৃত হইয়াছে, বঙ্গসুন্দরীতে সেই ছন্দই প্রধান নহে। প্রথম উপহারটি ব্যতীত বঙ্গসুন্দরীর অন্য সকল কবিতার ছন্দই পর্য্যায়ক্রমে বারো এবং এগারো অক্ষরে ভাগ করা। যথা,—

“সুঠাম শরীর পেলব লতিকা,
আনত সুষমা-কুসুম-ভরে;
চাঁচর চিকুর নীরদ-মালিকা
লুটায়ে পড়েছে ধরণী ’পরে।”

এ ছন্দ নারী-বর্ণনার উপযুক্ত বটে—ইহাতে তালে তালে নূপুর ঝঙ্কৃত হইয়া উঠে। কিন্তু এ ছন্দের প্রধান অসুবিধা এই যে, ইহাতে যুক্ত অক্ষরের স্থান নাই। পয়ার, ত্রিপদী প্রভৃতি ছন্দে লেখকের এবং পাঠকের অনেকটা স্বাধীনতা আছে। অক্ষরের মাত্রাগুলিকে কিয়ৎপরিমাণে ইচ্ছামত বাড়াইবার কমাইবার অবকাশ আছে। প্রত্যেক অক্ষরকে এক-মাত্রার স্বরূপ গণ্য করিয়া একেবারে এক-নিশ্বাসে পড়িয়া যাইবার আবশ্যক হয় না। দৃষ্টান্তের দ্বারা আমার কথা স্পষ্ট হইবে:—

“হে সারদে দাও দেখা!
বাঁচিতে পারিনে একা,
কাতর হয়েছে প্রাণ, কাতর হৃদয়;
কি বলেছি অভিমানে
শুনো না শুনো না কাণে,
বেদনা দিও না প্রাণে ব্যথার সময়!”

ইহার মধ্যে প্রায় যুক্ত অক্ষর নাই। নিম্নলিখিত শ্লোকে অনেকগুলি যুক্তাক্ষর আছে, অথচ উভয় শ্লোকই সুখপাঠ্য এবং শ্রুতিমধুর :—

"পদে পৃথ্বী, শিরে ব্যোম,
তুচ্ছ তারা সূর্য্য সোম,
নক্ষত্র নখাগ্রে যেন গণিবারে পারে ;
সম্মুখে সাগরাম্বরা
ছড়িয়ে রয়েছে ধরা
কটাক্ষে কখন যেন দেখিছে তাহারে।"

এই দুইটি শ্লোকই কবির রচিত সারদামঙ্গল হইতে উদ্ধৃত। এক্ষণে বঙ্গসুন্দরী হইতে দুইটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া তুলনা করা যাক্ :—

"একদিন দেব তরুণ তপন
হেরিলেন সুরনদীর জলে—
অপরূপ এক কুমারী-রতন
খেলা করে নীল নলিনীদলে।"

ইহার সহিত নিম্ন-উদ্ধৃত শ্লোকটি একসঙ্গে পাঠ করিলে প্রভেদ প্রতীয়মান হইবে :—

"অপ্সরী কিন্নরী দাঁড়াইয়ে তীরে
ধরিয়ে ললিত করুণ তান ;]
বাজায়ে বাজায়ে বীণা ধীরে ধীরে,
গাহিছে আদরে স্নেহের গান।"

'অপ্সরী কিন্নরী' যুক্ত অক্ষর লইয়া এখানে ছন্দোভঙ্গ করিয়াছে। কবিও এই কারণে বঙ্গসুন্দরীতে যথাসাধ্য যুক্ত অক্ষর বর্জন করিয়া চলিয়াছেন।

কিন্তু বাংলা যে ছন্দে যুক্ত অক্ষরের স্থান হয় না, সে ছন্দ আদরণীয় নহে ; কারণ, ছন্দের ঝঙ্কার এবং ধ্বনিবৈচিত্র্য যুক্ত অক্ষরের উপরেই অধিক নির্ভর করে। একে বাংলা ছন্দে স্বরের দীর্ঘ-হ্রস্বতা নাই, তার উপরে যদি যুক্ত অক্ষর বাদ পড়ে, তবে ছন্দ নিতান্তই অস্থিবিহীন সুললিত শব্দপিণ্ড হইয়া পড়ে ; তাহা শীঘ্রই শ্রান্তিজনক তন্দ্রা-কর্ষক হইয়া উঠে, এবং হৃদয়কে আঘাতপূর্ব্বক ক্ষুব্ধ করিয়া তুলিতে পারে না। সংস্কৃত ছন্দে যে বিচিত্র-সঙ্গীত তরঙ্গিত হইতে থাকে, তাহার প্রধান কারণ স্বরের দীর্ঘ-হ্রস্বতা এবং যুক্ত অক্ষরের বাহুল্য। মাইকেল মধুসূদন ছন্দের এই নিগূঢ় তত্ত্বটি অবগত ছিলেন, সেই জন্য তাঁহার অমিত্রাক্ষরে এমন পরিপূর্ণ ধ্বনি এবং তরঙ্গিত গতি অনুভব করা যায়।

আর্য্যদর্শনে বিহারীলালের সারদামঙ্গল-সঙ্গীত যখন প্রথম বাহির হইল, তখন ছন্দের প্রভেদ মুহূর্ত্তেই প্রতীয়মান হইল। সারদামঙ্গলের ছন্দ নূতন নহে, তাহা প্রচলিত ত্রিপদী, কিন্তু কবি তাহা সঙ্গীতে-সৌন্দর্য্যে সিক্ত করিয়া তুলিয়াছেন। বঙ্গসুন্দরীর

ছন্দোলালিত্য অনুকরণ করা সহজ, সেই মিষ্টতা একবার অভ্যস্ত হইয়া গেলে তাহার বন্ধন ছেদন করা কঠিন, কিন্তু সারদামঙ্গলের গীতসৌন্দর্য্য অনুকরণসাধ্য নহে।

সারদামঙ্গল এক অপরূপ কাব্য। প্রথম যখন তাহার পরিচয় পাইলাম, তখন তাহার ভাষায়, ভাবে এবং সঙ্গীতে নিরতিশয় মুগ্ধ হইতাম, অথচ তাহার আদ্যোপান্ত একটা সুসংলগ্ন অর্থ করিতে পারিতাম না। যেই একটু মনে হয় এইবার বুঝি কাব্যের মর্ম্ম পাইলাম, অমনি তাহা আকার-পরিবর্ত্তন করে। সূর্য্যাস্তকালের সুবর্ণমণ্ডিত মেঘমালার মতো সারদামঙ্গলের সোনার শ্লোকগুলি বিবিধ রূপের আভাস দেয়, কিন্তু কোনো রূপকে স্থায়িভাবে ধারণ করিয়া রাখে না, অথচ সুদূর সৌন্দর্য্যস্বর্গ হইতে একটি অপূর্ব্ব পূরবী রাগিণী প্রবাহিত হইয়া অন্তরাত্মাকে ব্যাকুল করিয়া তুলিতে থাকে।

এই জন্য সারদামঙ্গলের শ্রেষ্ঠতা অরসিক লোকের নিকট ভালরূপে প্রমাণ করা বড়ই কঠিন হইত। যে বলিত, আমি বুঝিলাম না, আমাকে বুঝাইয়া দাও, তাহার নিকট হার মানিতে হইত।

কবি যাহা দিতেছেন, তাহাই গ্রহণ করিবার জন্য পাঠককে প্রস্তুত হওয়া উচিত; পাঠক যাহা চান, তাহাই কাব্য হইতে আদায় করিবার চেষ্টা করিতে গেলে অধিকাংশ সময়ে নিরাশ হইতে হয়। তাহার ফল হয়, যাহা চাই তাহা পাই না এবং কবি যাহা দিতেছেন তাহা হইতেও বঞ্চিত হইতে হয়। সারদামঙ্গলে কবি যাহা গাইতেছেন তাহা কান পাতিয়া শুনিলে একটি স্বর্গীয় সঙ্গীত-সুধায় হৃদয় অভিষিক্ত হইয়া উঠে, কিন্তু সমালোচনা-শাস্ত্রের আইনের মধ্য হইতে ছাঁকিয়া লইবার চেষ্টা করিলে তাহার অনেক রস বৃথা নষ্ট হইয়া যায়।

প্রকৃতপক্ষে সারদামঙ্গল একটি সমগ্রকাব্য নহে, তাহাকে কতকগুলি খণ্ড কবিতার সমষ্টিরূপে দেখিলে তাহার অর্থবোধ হইতে কষ্ট হয় না। দ্বিতীয়ত সরস্বতী-সম্বন্ধে সাধারণ পাঠকের মনে যেরূপ ধারণা আছে, কবির সরস্বতী তাহা হইতে স্বতন্ত্র।

কবি যে সরস্বতীর বন্দনা করিতেছেন, তিনি নানা আকারে, নানা ভাবে, নানা লোকের নিকট উদিত হন। তিনি কখনো জননী, কখনো প্রেয়সী, কখনো কন্যা। তিনি সৌন্দর্য্যরূপে জগতের অভ্যন্তরে বিরাজ করিতেছেন, এবং দয়া-স্নেহ-প্রেমে মানবের চিত্তকে অহরহ বিচলিত করিতেছেন। ইংরাজ কবি শেলি যে বিশ্বব্যাপিনী সৌন্দর্য্যলক্ষ্মীকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন,—

> "Spirit of beauty, that does consecrate
> With thine own hues all thou dost shine upon
> Of human thought or form."

যাহাকে বলিয়াছেন,—

> "Thou messenger of sympathies,
> That wax and wane in lovers' eyes,"

সেই দেবীই বিহারীলালের সরস্বতী।

সারদামঙ্গলের আরম্ভের চারি শ্লোকে কবি সেই সারদাদেবীকে মূর্ত্তিমতী করিয়া বন্দনা করিয়াছেন। তৎপরে, বাল্মীকির তপোবনে সেই করুণারূপিণী দেবীর কিরূপে আবির্ভাব হইল, কবি তাহা বর্ণনা করিতেছেন। পাঠকের নেত্র-সম্মুখে দৃশ্যপট যখন উঠিল তখন তপোবনে অন্ধকার রাত্রি।

" নাই চন্দ্র সূর্য্য তারা,
অনল-হিল্লোল-ধারা,
বিচিত্র বিদ্যুত-দাম-দ্যুতি ঝলমল ;
তিমিরে নিমগ্ন ভব,
নীরব নিস্তব্ধ সব,
কেবল মরুতরাশি করে কোলাহল।"

এমন সময়ে ঊষার উদয় হইল।—

" হিমাদ্রি-শিখর পরে
আচম্বিতে আলো করে
অপরূপ জ্যোতি ওই পুণ্য-তপোবনে।
বিকচ নয়নে চেয়ে
হাসিছে দুধের মেয়ে,—
তামসী-তরুণ-ঊষা কুমারী-রতন।

কিরণে ভুবন ভরা,
হাসিয়ে জাগিল ধরা,
হাসিয়ে জাগিল শূন্যে দিগঙ্গনাগণে।
হাসিল অম্বরতলে
পারিজাত দলে দলে,
হাসিল মানস-সরে কমল-কানন।"

তপোবনে এক দিকে যেমন তিমির রাত্তি ভেদ করিয়া তরুণ ঊষার অভ্যুদয় হইল, তেমনি অপর দিকে নিষ্ঠুর হিংসাকে বিদীর্ণ করিয়া কিরূপে করুণাময় কাব্যজ্যোতি প্রকাশ পাইল, কবি তাহার বর্ণনা করিতেছেন,—

" অম্বরে অরুণোদয়,
তলে দুলে দুলে বয়
তমসা তটিনী-রাণী কুলুকুলু স্বনে ;
নিরখি লোচনলোভা
পুলিন-বিপিন-শোভা
ভ্রমেন বাল্মীকি মুনি ভাবভোলা মনে।

শাখি-শাখে রসসুখে
ক্রৌঞ্চ-ক্রৌঞ্চী মুখে মুখে
কতই সোহাগ করে বসি' দু-জনায়,
হানিল শবরে বাণ,
নাশিল ক্রৌঞ্চের প্রাণ,
রুধিরে আপ্লুত পাখা ধরণী লুটায়।

ক্রৌঞ্চী প্রিয়-সহচরে
ঘেরে ঘেরে শোক করে,
অরণ্য পূরিল তার কাতর ক্রন্দনে—
চক্ষে করি' দরশন
জড়িমা-জড়িত মন,
করুণ-হৃদয় মুনি বিহ্বলের প্রায় ;
সহসা ললাট-ভাগে
জ্যোতির্ম্ময়ী কন্যা জাগে,
জাগিল বিজলী যেন নীল নবঘনে।

কিরণে কিরণময়
বিচিত্র আলোকোদয়,
ম্রিয়মাণ রবিচ্ছবি, ভুবন উজলে।
চন্দ্র নয়, সূর্য্য নয়,
সমুজ্জ্বল শান্তিময়
ঋষির ললাটে আজি না জানি কি জ্বলে !

কিরণ-মণ্ডলে বসি'
জ্যোতির্ম্ময়ী স্বরূপসী
যোগীর ধ্যানের ধন ললাটিকা মেয়ে
নামিলেন ধীর ধীর,
দাঁড়ালেন হ'য়ে স্থির
মুগ্ধনেত্রে বাল্মীকির মুখপানে চেয়ে।

করে ইন্দ্রধনু-বালা,
গলায় তারার মালা,
সীমন্তে নক্ষত্র জ্বলে, ঝল্‌মলে কানন ;
কর্ণে কিরণের ফুল,
দোদুল চাঁচর চুল
উড়িয়ে ছড়িয়ে পড়ে ঢাকিয়ে আনন।

* * * *

করুণ ক্রন্দন-রোল
উত উত উতোরোল,
চমকি' বিহ্বলা বালা চাহিলেন ফিরে;

হেরিলেন রক্তমাখা
মৃত ক্রৌঞ্চ ভগ্ন-পাখা,
কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে ক্রৌঞ্চ ওড়ে ঘিরে' ঘিরে'।

একবার সে ক্রৌঞ্চীরে
আরবার বাল্মীকিরে
নেহারেন ফিরে ফিরে, যেন উন্মাদিনী!
কাতরা করুণা-ভরে,
গা'ন সকরুণ স্বরে,
ধীরে ধীরে বাজে করে বীণা বিষাদিনী।

সে শোক-সংগীত-কথা
শুনে কাঁদে তরু-লতা,
তমসা আকুল হয়ে কাঁদে উভরায়।
নিরখি' নন্দিনী-ছবি
গদ্‌গদ আদি কবি,
অন্তরে করুণা-সিন্ধু উথলিয়া ধায়।"

সারদাদেবীর এই এক করুণামূর্ত্তি। তাহার পর ২১ শ্লোক হইতে আবার একটি কবিতার আরম্ভ হইয়াছে। সে কবিতায় সারদাদেবী ব্রহ্মার মানস-সরোবরে সুবর্ণ-পদ্মের উপর দাঁড়াইয়াছেন এবং তাঁহার অসংখ্য ছায়া বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে প্রতিবিম্বিত হইয়াছে। ইহা সারদাদেবীর বিশ্বব্যাপিনী সৌন্দর্য্যমূর্ত্তি।—

"ব্রহ্মার মানস-সরে
ফুটে ঢল ঢল করে
নীল জলে মনোহর সুবর্ণ-নলিনী,
পাদপদ্ম রাখি তায়
হাসি হাসি ভাসি যায়
ষোড়শী রূপসী বামা পূর্ণিমা-যামিনী।
কোটি শশী উপহাসি
উথলে লাবণ্যরাশি,
তরল দর্পণে যেন দিগন্ত আবরে;
আচম্বিতে অপরূপ
রূপসীর প্রতিরূপ
হাসি হাসি ভাসি ভাসি উদয় অম্বরে।"

এই সারদাদেবীর, এই Spirit of Beautyর নব-অভ্যুদিত করুণা বালিকামূর্ত্তি এবং সর্ব্বত্র-ব্যাপ্ত সুন্দরী ষোড়শীমূর্ত্তির বর্ণনা সমাপ্ত করিয়া কবি গাহিয়া উঠিয়াছেন,—

"তোমারে হৃদয়ে রাখি
সদানন্দ মনে থাকি,
শ্মশান অমরাবতী দু-ই ভাল লাগে;

গিরিমালা, কুঞ্জবন,
গৃহ, নাট-নিকেতন,
যখন যেখানে যাই, যাও আগে আগে।
*   *   *   *
যত মনে অভিলাষ,
তত তুমি ভালবাস,
তত মন-প্রাণ ভোরে আমি ভালবাসি ;
ভক্তিভাবে একতানে
মজেছি তোমার ধ্যানে ;
কমলার ধন-মানে নহি অভিলাষী।"

এই মানসীরূপিণী সাধনার ধনকে পরিপূর্ণরূপে লাভ করিবার জন্য কাতরতা প্রকাশ করিয়া কবি প্রথম সর্গ সমাপ্ত করিয়াছেন।

তাহার পরের সর্গ হইতে প্রেমিকের ব্যাকুলতা। কখনো অভিমান, কখনো বিরহ, কখনো আনন্দ, কখনো বেদনা, কখনো ভর্ৎসনা, কখনো স্তব। দেবী কবির প্রণয়িনীরূপে উদিত হইয়া বিচিত্র সুখ-দুঃখে শতধারে সঙ্গীত উচ্ছ্বসিত করিয়া তুলিতেছেন। কবি কখনো তাঁহাকে পাইতেছেন, কখনো তাঁহাকে হারাইতেছেন —কখনো তাঁহার অভয়-রূপ, কখনো তাঁহার সংহারমূর্ত্তি দেখিতেছেন। কখনো তিনি অভিমানিনী, কখনো বিষাদিনী, কখনো আনন্দময়ী। এইরূপ বিষাদ, বিরহ, সংশয়ের পর কবি হিমালয়শিখরে প্রণয়িনী দেবীর সহিত আনন্দ-মিলনের চিত্র আঁকিয়া গ্রন্থ শেষ করিয়াছেন।

কবি যে সূত্রে সারদামঙ্গলের এই শেষের কবিতাগুলি গাঁথিয়াছেন তাহা ঠিক ধরিতে পারিয়াছি কি-না জানি না—মধ্যে মধ্যে সূত্র হারাইয়া যায়, মধ্যে মধ্যে উচ্ছ্বাস উন্মত্ততায় পরিণত হয়, কিন্তু এ কথা বলিতে পারি, আধুনিক বঙ্গসাহিত্যে প্রেমের সঙ্গীত এরূপ সহস্রধার উৎসের মতো কোথাও উৎসারিত হয় নাই। এমন নির্ম্মল সুন্দর ভাষা, এমন ভাবের আবেগ, কথার সহিত এমন সুরের মিশ্রণ আর কোথাও পাওয়া যায় না। বর্ত্তমান সমালোচক এককালে বঙ্গসুন্দরী ও সারদামঙ্গলের কবির নিকট হইতে কাব্য-শিক্ষার চেষ্টা করিয়াছিল, কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছে বলা যায় না ; কিন্তু এই শিক্ষাটি স্থায়িভাবে হৃদয়ে মুদ্রিত হইয়াছে যে, সুন্দর ভাষা কাব্য-সৌন্দর্য্যের একটি প্রধান অঙ্গ ; ছন্দে এবং ভাষায় সর্ব্বপ্রকার শৈথিল্য কবিতার পক্ষে সাংঘাতিক। এই প্রসঙ্গে আমার এই কাব্যগুরুর নিকট আর একটি ঋণ স্বীকার করিয়া লই। বাল্যকালে বাল্মীকি-প্রতিভা নামক একটি গীতি-নাট্য রচনা করিয়া 'বিদ্বজ্জন-সমাগম' নামক সম্মিলন-উপলক্ষে অভিনয় করিয়াছিলাম। বঙ্কিমচন্দ্র এবং অন্যান্য অনেক রসজ্ঞ লোকের নিকট সেই ক্ষুদ্র নাটকটি [illegible]প্রদ হইয়াছিল। সেই নাটকের মূল ভাবটি, এমন কি, স্থানে স্থানে তাহার ভাষা [illegible] বিহারীলালের সারদামঙ্গলের আরম্ভভাগ হইতে গৃহীত।

আজ কুড়ি বৎসর হইল সারদামঙ্গল আর্য্যদর্শন পত্রে, এবং ষোল বৎসর হইল পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে; ভারতী পত্রিকায় কেবল একটিমাত্র সমালোচক ইহাকে সাদর-সম্ভাষণ করেন। তাহার পর হইতে সারদামঙ্গল ষোড়শ বৎসর অনাদৃত ভাবে প্রথম সংস্করণের মধ্যেই অজ্ঞাতবাস যাপন করিতেছে। কবিও সেই অবধি আর বাহিরে দর্শন দেন নাই। যিনি জীবন-রঙ্গভূমির নেপথ্যে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া দর্শক-মণ্ডলীর স্তুতিধ্বনির অতীত ছিলেন, তিনি আজ মৃত্যুর যবনিকান্তরালে অপসৃত হইয়া সাধারণের বিদায়-সম্ভাষণ প্রাপ্ত হইলেন না; কিন্তু এ কথা সাহসপূর্ব্বক বলিতে পারি, সাধারণের পরিচিত কণ্ঠস্থ শত-সহস্র রচনা যখন বিনষ্ট এবং বিস্মৃত হইয়া যাইবে, সারদামঙ্গল তখন লোকস্মৃতিতে প্রত্যহ উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিবে, এবং কবি বিহারীলাল যশঃস্বর্গে অম্লান বরমাল্য ধারণ করিয়া বঙ্গসাহিত্যের অমরগণের সহিত একাসনে বাস করিতে থাকিবেন।

[১৩০১]

মুকুন্দরাম ও ভারতচন্দ্র

রমেশচন্দ্র দত্ত

বাল্যকালে শুনিতাম, ভারতচন্দ্রের ন্যায় কবি আর কখনও জন্মগ্রহণ করে নাই। শুনিতাম, বাঙ্গালা ভাষায় ভারতের কবিত্বের ন্যায় কবিত্ব আর হয় নাই, তাঁহার ন্যায় মৌলিকতা অন্য কোনও কবির নাই, তাঁহার ন্যায় মধুরত্ব ও লালিত্যও অন্য কবির নাই।

এখনও অনেকে ভারতচন্দ্রকে বঙ্গদেশের প্রধান কবি মনে করেন। মাননীয় পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় লিখিয়াছেন, ভারতচন্দ্রের সিংহাসন গ্রহণ করিতে পারে, এরূপ কবি এখনও বঙ্গদেশে হয় নাই। অন্যান্য বঙ্গীয় লেখক ও পাঠকেরও মত এই যে, কাশীরাম, কৃত্তিবাস, মুকুন্দরাম প্রভৃতি প্রাচীন কবিগণ গুণাকর ভারতচন্দ্রের সমকক্ষ নহেন; আধুনিক কবি মধুসূদন দত্তও ভারতের নিকটে স্থান গ্রহণ করিতে পারেন না।

আমরা অদ্য এ বিষয়ে কোনও সমালোচনা করিব না। ভারতচন্দ্র কি দরের কবি, তাহার নিষ্পত্তি করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। তবে যাঁহারা ভারতচন্দ্রের মৌলিকতার প্রশংসা করেন, তাঁহারা একবার কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের কবিতা পড়িবেন, এইটি আমাদের প্রার্থনা। গুণাকর হৃদয়ে-পত্রে কবিকঙ্কণের নিকট ঋণী; কবি-কঙ্কণের কবিত্ব পত্রে-পত্রে নকল করিয়া থাকি, কবিকঙ্কণের স্বাভাবিক ও সুন্দর বর্ণনাগুলি অলঙ্কার দিয়া কিঞ্চিৎ অস্বাভাবিকতা দু-ই ভাতুলিয়াছেন। কবিকঙ্কণের কাব্য সরল,

স্বাভাবিক ও সুপাঠ্য ; গুণাকরের কাব্য অধিকতর সুললিত, কিন্তু অস্বাভাবিক এবং অনেক স্থানে অপাঠ্য। আমরা এ বিষয়ে অদ্য কয়েকটি উদাহরণ দিতে ইচ্ছা করি।

সতী ও দক্ষযজ্ঞের কথা লইয়া উভয় কবির কাব্য আরম্ভ হইয়াছে। শঙ্করের নিকট অনুমতি না পাইয়া, সতী অভিমানিনী হইয়া দক্ষালয়ে চলিলেন, এই কথা উভয় কবি বর্ণনা করিয়াছেন। মুকুন্দরাম সতীর অভিমানের স্বাভাবিক বর্ণনা দিয়াছেন, গুণাকর ভারতচন্দ্র এই স্থলে সতীর দশ রূপের বিস্তীর্ণ বর্ণনা দিয়া আপনার চাতুর্য্য ও পাণ্ডিত্য দেখাইয়াছেন :—

" অনুমতি দেহ হর, যাইব বাপার ঘর,
যজ্ঞ মহোৎসব দেখিবারে।
ত্রিভুবনে যত বৈসে, চলিলা বাবার পাশে,
তনয়া কেমনে প্রাণ ধরে ॥
চরণে ধরিয়া সাধি, কৃপা কর কৃপানিধি,
যাব পঞ্চ দিবসের তরে।
চিরদিন আছে আশ, যাইতে বাপের বাস,
নিবেদন নাহি করি ডরে ॥
পর্ব্বত-কন্দরে বসি, নাহি পাশে সুপড়সী,
সীমন্তে সিন্দুর দিতে সখী।
এক দিন যথা যাই, জুড়াইতে নাহি ঠাঁই,
বিধি মোরে কৈল জন্মদুঃখী ॥
সুমঙ্গল-সূত্র-করে, আইলুঁ তোমার ঘরে,
পূর্ণ হৈল বৎসর ছয় সাত।
দূর কর বিসম্বাদ, পূরহ আমার সাধ,
মায়ের রন্ধনে খাব ভাত ॥
পিতা মোর পুণ্যবান্, করিবে অনেক দান,
কন্যাগণে দিবে ব্যবহার।
আমি আগে পাব মান, আভরণ পরিধান,
ভেদবুদ্ধি নাহিক ব্যাপার ॥
সতীর বচন শুনি, কহিলেন শূলপাণি,
শুন প্রিয়ে আমার বচন।
বাপ-ঘরে যদি চল, তবে না হইবে ভাল,
অবশ্য হইবে বিড়ম্বন ॥
যাইবারে অনুমতি, [illegible]হি দিল পশুপতি,
হৈমবতী হৈলা [illegible]।
আপন স্বভাবে রামা, [illegible] ভ্রূকুটি-ভীমা,
একাকিনী বাপে[illegible]

হইয়া উন্মত্তবেশা, যান চণ্ডী মুক্তকেশা,
না শুনিয়া শিবের বচন।
হরের আদেশ পেয়ে, পিছে নন্দী যায় ধেয়ে,
বৃষভেরে করিয়া সাজন ॥"

—মুকুন্দরাম

"নিবেদন শুনহ ঠাকুর পঞ্চানন।
যজ্ঞ দেখিবারে যাব পিতার ভবন ॥
শঙ্কর কহেন বটে বাপঘরে যাবে।
নিমন্ত্রণ বিনা গিয়া অপমান পাবে ॥
যজ্ঞ করিয়াছে দক্ষ শুন তার মর্ম্ম।
আমারে না দিবে ভাগ এই তার কর্ম্ম ॥
সতী কন মহাপ্রভু হেন না কহিবা।
বাপঘরে কন্যা যেতে নিমন্ত্রণ কিবা ॥
যত কন সতী শিব না দেন আদেশ।
ক্রোধে সতী হৈলা কালী ভয়ঙ্কর বেশ ॥
মুক্তকেশী মহামেঘবরণা দন্তুরা।
শবারূঢ়া করকাঞ্চী শবকর্ণপূরা ॥
গলিতরুধিরধারা মুণ্ডমালা গলে।
গলিতরুধির মুণ্ড বামকরতলে ॥
আর বামকরেতে কৃপাণ খরশাণ।
দুই ভুজে দক্ষিণে অভয় বরদান ॥
লোলজিহ্বা রক্তধারা মুখের দুপাশে।
ত্রিনয়ন অর্দ্ধচন্দ্র ললাটে বিলাসে ॥ ১ ॥
দেখি ভয়ে মহাদেব ফিরাইলা মুখ।
তারারূপ ধরি সতী হইলা সম্মুখ ॥
নীলবর্ণা লোলজিহ্বা করালবদনা।
সর্পবান্ধা ঊর্দ্ধ্ব এক জটা-বিভূষণা ॥
অর্দ্ধচন্দ্র পাঁচখানি শোভিত কপাল।
ত্রিনয়ন লম্বোদর পরা বাঘছাল ॥
নীলপদ্ম খড়্গ কাতি সমুণ্ড খর্পর।
চারি হাতে শোভে আরোহণ শিবোপর ॥ ২ ॥"

দক্ষের শিব-নিন্দার কথাও সেইরূপ। মুকুন্দরামের বর্ণনা স্বাভাবিক; যথা—

"পরিধান বাঘছাল, [illegible] গলায় হাড়ের মাল,
বিভূতি-ভূ[illegible]ভ অঙ্গে।
শ্মশানে যাহার স্থা[illegible] কেবা তার করে মান,
প্রেত ভূ[illegible] সঙ্গে।"

ভারতচন্দ্রের বর্ণনা পাণ্ডিত্যপূর্ণ এবং দ্ব্যর্থ; যথা—

"সভাজন শুন, জামাতার গুণ,
বয়সে বাপের বড় ;
কোন গুণ নাই, যেথা সেথা ঠাঁই,
সিদ্ধিতে নিপুণ দড়।"

দক্ষযজ্ঞ-বিনাশের বর্ণনায়ও কবিদ্বয়ের বিভিন্নতা বিশেষ লক্ষিত হয়। মুকুন্দরাম সহজ কথায় লিখিয়াছেন—

"লয়ে নানা রুদ্র ক্রুদ্ধ বীরভদ্র
চলে যজ্ঞ নাশিবারে।
দক্ষের নিজ পুর ভাঙ্গিয়া করে চুর,
কেহ নিবারিতে নারে ॥
ব্রাহ্মণে ধরিয়া, পুথি লয় কাড়িয়া,
ডোর দিয়া ভুজ বান্ধে।
ব্রাহ্মণে না মার, ব্রাহ্মণে না মার,
পৈতা দেখাইয়া কান্দে ॥
বেগে হোথা ধায়, দানা ধরে তায়,
পাড়িয়া উপাড়ে দাড়ি।
ভাঙ্গিল দশন, ছিঁড়িল বসন,
স্রুবের মারিয়া বাড়ি ॥"

ভারতচন্দ্রের বর্ণনা সকলেই জানেন। তাঁহার কথার বিন্যাস ও ভাষার লালিত্য বিস্ময়কর—

"মহারুদ্র-রূপে মহাদেব সাজে।
ভভম্ভম্ ভভম্ভম্ শিঙ্গা ঘোর বাজে ॥
লটাপট জটাজূট সংঘট্ট গঙ্গা।
ছলচ্ছল টলট্টল কলক্কল তরঙ্গা ॥
ফণাফণ্ ফণাফণ্ ফণীফণ্ গাজে।
দিনেশ-প্রতাপে নিশানাথ সাজে ॥
* * * *
ভূতনাথ ভূতসাথ দক্ষযজ্ঞ নাশিছে।
যক্ষ রক্ষ লক্ষ লক্ষ অট্ট অট্ট হাসিছে ॥
প্রেতভাগ সানুরাগ ঝম্প ঝম্প ঝাঁপিছে।
ঘোর রোল গণ্ডগোল চৌদ্দ লোক কাঁপিছে ॥
মার মার ঘের ঘোর হান হান হাঁকিছে।
হুপ হাপ দুপ দাপ আশ পাশ ঝাঁকিছে ॥
অট্ট অট্ট ঘট্ট ঘট্ট ঘোর হা[illegible]সিছে।
হুম হাম খুম খাম ভীষণ[illegible]
ঊর্দ্ধ্ব বাহু যেন রাহু চ[illegible]ড়িছে।
লম্ফ ঝম্ফ ভূমিকম্প [illegible]ড়িছে ॥"

এই শব্দবিন্যাস যদি কবিত্ব হয়, তাহা হইলে ভারতচন্দ্রের ন্যায় কবি জগতে জন্মগ্রহণ করেন নাই!

তৎপরে উমার জন্ম-কথা উভয় কবি বর্ণনা করিয়াছেন। কুমারসম্ভব-নামক অতুল্য কাব্যে কবিগুরু কালিদাস যে সকল কথা বর্ণনা করিয়াছেন, অর্থাৎ কামদেবের ভস্ম হওন, রতির বিলাপ ইত্যাদি বৃত্তান্ত বঙ্গীয় কবিদ্বয়ও বর্ণনা করিয়াছেন। দুই-একটি অংশ উদ্ধৃত করিতেছি:—

"কামকান্তা কান্দে রতি কোলে করি মৃত পতি
ধূলায় ধূসর কলেবর।
লোটায়ে কুন্তল-ভার, ত্যজি নানা অলঙ্কার
সঘনে ডাকয়ে প্রাণেশ্বর॥
পড়িয়া চরণ-তলে, রতি সকরুণে বলে,
প্রাণনাথ কর অবধান॥
তিলেক দারুণ হৈয়া, পাসরিলা নিজ জায়া,
দূর কৈলা সোহাগ সম্মান॥
জাগিয়া উত্তর দেহ, রতিরে সংহতি লহ,
পাসরিলা পূর্ব্বের পিরীত।
তুমি নাথ যাবে যথা, আমি আগে যাব তথা,
তবে কেন কৈলা বিপরীত॥
মোর পরমায়ু লয়ে চিরকাল থাক জীয়ে,
আমি মরি তোমার বদলে।
যে গতি পাইবে তুমি, সে গতি পাইব আমি,
রহিব তোমার পদতলে॥"

—মুকুন্দরাম।

"পতিশোকে রতি কাঁদে বিনাইয়া নানা ছাঁদে,
ভাসে চক্ষু জলের তরঙ্গে।
কপালে কঙ্কণ মারে, রুধির বহিছে ধারে,
কাম-অঙ্গ-ভস্ম লেপে অঙ্গে॥
আলুথালু কেশ-বাস, ঘন ঘন বহে শ্বাস,
সংসার পূরিল হাহাকার।
কোথা গেল প্রাণনাথ, আমারে করহ সাথ,
তোমা বিনা সকলি আঁধার॥
তুমি কাম আমি রতি, আমি নারী তুমি পতি,
দুই অঙ্গ এক[illegible] হৃদয়ে [illegible]প।
প্রথমে যে প্রীতি ছিল[illegible] থাকি, শেষে তাহা না রহিল,
প্রীতির[illegible]তী দু-ই ভা[illegible]ান॥

যথা যথা যেতে প্রভু, মোরে না ছাড়িতে কভু,
এবে কেন আগে ছাড়ি গেলা।
মিছে প্রেম বাড়াইয়া, ভাল গেলা ছাড়াইয়া,
এখন বুঝিনু মিছে খেলা ॥
না দেখিব সে বদন, না হেরিব সে নয়ন,
না শুনিব সে মধুরবাণী।
আগে মরিবেন স্বামী, পশ্চাতে মরিব আমি,
এত দিন ইহা নাহি জানি ॥"

—ভারতচন্দ্র।

কবিগুরু কালিদাসের অনুসরণ করিয়া মুকুন্দরাম গৌরীর তপস্যা-বর্ণনা করিয়াছেন। তপস্যা-স্থানে মহাদেব দ্বিজবেশ ধারণ করিয়া উপস্থিত হইলেন :—

"অথাজিনাষাঢ়ধরঃ প্রগল্‌ভবাগ্
জ্বলন্নিব ব্রহ্মময়েন তেজসা।
বিবেশ কশ্চিজ্‌জটিলস্তপোবনং
শরীরবন্ধঃ প্রথমাশ্রমো যথা ॥" —কুমারসম্ভবম্।

কালিদাসের মহাদেবের ন্যায় মুকুন্দরামের দ্বিজরূপী মহাদেবও গৌরীকে জিজ্ঞাসা

"কহ নিরুপমা, কার বোলে রামা,
বাঞ্ছিলা তুমি জটাধরে।
হইয়া সুন্দরী, ভজহ ভিখারী,
দরিদ্র বর দিগম্বরে ॥
শুন গো চন্দ্রমুখি, তোমারে আমি দেখি,
রূপেতে ভুবনমোহিনী।
কতেক আছে বর, ভুবনে মনোহর,
ইচ্ছিলা বুড়া বর আপনি।"

অবশেষে মহাদেব নিজ-রূপ ধারণ করিলেন। হরগৌরীর বিবাহ হইল। মহাদেবের বেশ দেখিয়া মেনকা খেদ করিলেন। পরে মহাদেব সুন্দর রূপ ধারণ করায় মেনকা তুষ্ট হইলেন। এ সমস্ত কথা মুকুন্দরাম ও ভারতচন্দ্র—উভয়েই বর্ণনা করিয়াছেন।

পরের সৌভাগ্য দেখিলে নিজের মন্দ ভাগ্যের কথা অনেকেরই মনে উদয় হয়। মহাদেবের সুন্দর রূপ দেখিয়া অনেক অভাগিনী নারী আপনাদিগের মন্দ-ভাগ্য-সম্বন্ধে আক্ষেপ করিতে লাগিলেন। মুকুন্দরা[illegible] সেই বর্ণনাটি উদ্ধৃত করা আবশ্যক :

[illegible]লের
"দেখিয়া বরের রূপ [illegible]তী।
একে একে নিন্দা [illegible]র পতি ॥

এক নারী বলে সই মোর গোদা পতি।
সদা কোয়া-জ্বরের ঔষধ পাব কথি ॥
ভাদ্রপদ মাসে পায়ে পাঁকুই দুর্ব্বার।
গোদে তৈল দিতে মোর উঠয়ে নেকার ॥
কোলে যদি গোদর কোয়া জ্বর করে বল।
কত বা বাঁটিব আর ওকড়ার ফল ॥
প্রভুর দোসর নাহি উপায় কে করে।
কাটনার কড়ি কত জোগাব ওঝারে ॥
দাদনি না দেয় এবে মহাজন সবে।
টুটিল সুতার কড়ি উপায় কি হবে ॥
দু পণ কড়ির সুতা এক পণ বলে।
এত দুঃখ লিখেছিলা অভাগী-কপালে ॥
চক্ষু খায়ে বাপ বিয়া দিল হেন বরে।
মিথ্যা রাত্রি জেগে মরি কিঁ ধ্রুব গোদারে ॥
গোদের গেঁজের ফোড়া হয় বিপরীত।
পূর্ণিমা হইলে তায় বেরয় শোণিত ॥

আর জন বলে পতি বঞ্চিত-দশন।
ঝোলঝাল বিনা তার না হয় অশন ॥
কঠিন ব্যঞ্জন আমি যেই দিন রান্ধি।
মারয়ে পিঁড়ির বাড়ি কোণে বসে কান্দি ॥

আর জন বলে সই মোর কর্ম্ম মন্দ।
অভাগিয়া পতি মোর দুটি চক্ষু অন্ধ ॥
কোন দেশে দুঃখী নাহি সই মোর পারা।
কোলে কাছে থাকিতে সদাই হয় হারা ॥

কেহ বলে মোর পতি বড়ই নির্গুণ।
কত বা পুষিব দিয়া মা-বাপের ধন ॥
আর জন কহে সখি মোর পতি খোঁড়া।
নড়িতে চড়িতে নারে মর করে জোড়া ॥

আর সতী বলে সখি মোর পতি কুঁজা।
কুঁজ ভাল হইলে পূজিব দশভূজা ॥
চিত হয়ে শুতে নারে মরি মরি করে।
আড়াই হাত খাদ করে মেঝের ভিতরে ॥
লোকের গঞ্জনা আর সহিতে না পারি।
সংসার ছাড়িয়া আমি হব দেশান্তরী ॥

আর জন বলে সই [illegible] স্বামী কালা।
অন্যের সংসার ভা[illegible] বড় জ্বালা ॥
ঠারে ঠোরে কথা [illegible] পতি সনে।
রাত্রি হৈলে থা[illegible] শয়নে ॥

সার্থক তপস্যা গৌরী কৈল অভিলাষে।
সেই হেতু পাইল বর মনের হরিষে॥
অদৃষ্টের কথা কিছু কহনে না যায়।
যে লিখিয়া থাকে বিধি অবশ্য তা হয়॥
আর নারী বলে হোক না ভাবিহ ব্যথা।
মনোদুঃখ মনে রাখ ভাল পাবে কোথা॥
যে হোক সে হোক নারীর স্বামী ত ভূষণ।
পতি-সেবা কর সবে যেন নারায়ণ॥"

এই বর্ণনাটিতে বিশেষ সৌন্দর্য্য নাই, কিন্তু বর্ণনাটি সরল ও স্বাভাবিক। মুকুন্দরাম যাহাই লিখেন, তাহাই সরল ও স্বাভাবিক। নারীগণ আপনাদিগের মন্দ ভাগ্যের বিষয়ে আক্ষেপ করিতেছে বটে, কিন্তু পতিসেবাই যে পরম ধর্ম্ম, এই মহীয়সী কথাও স্মরণ করিতেছে।

এই বর্ণনার অনুকরণ করিয়া ভারতচন্দ্র তাঁহার বিদ্যাসুন্দরে কিরূপে নারীগণের পতিনিন্দা-বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা পাঠকগণের অবিদিত নাই। মুকুন্দরামের বর্ণনা স্বাভাবিক ও সুপাঠ্য ; ভারতচন্দ্রের বর্ণনা অস্বাভাবিক এবং ভদ্রসমাজে অপাঠ্য।

দেবদেবীর কথা সাঙ্গ করিয়া মুকুন্দরাম দুইটি উপাখ্যান লিখিয়াছেন—একটি কালকেতু ও ফুল্লরার উপন্যাস, অপরটি শ্রীমন্ত সদাগরের উপাখ্যান। দুইটি উপাখ্যানই সরল ভাষায় লিখিত, দুইটিতেই মানবহৃদয়ের স্বাভাবিক বৃত্তিগুলি ও নরনারীর সুখ-দুঃখ সহজভাবে বর্ণিত হইয়াছে। কালকেতু পশু-বধ করিয়া জীবন-ধারণ করে, তাহার গৃহিণী ফুল্লরা সেই পশু-মাংস হাটে বিক্রয় করিতে যায়, এবং স্বামীর গৃহকর্ম্ম সম্পাদন করে। চণ্ডীর অনুগ্রহে সেই কালকেতু দেশের রাজা হইল। চণ্ডী যখন প্রথমে ষোড়শী-রূপে কালকেতুর ঘরে দর্শন দিলেন, ফুল্লরা তাঁহাকে দেখিয়া বিস্মিত ও ভীত হইল, এবং পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল। চণ্ডী যে পরিচয় দিলেন, সেটি উদ্ধৃত করা আবশ্যক :—

"কি আর জিজ্ঞাসা কর, আলাম তোমার ঘর,
বীরের দেখিতে নারি দুখ।
দিয়া আপনার ধন, তুষিব বীরের মন,
আজি হ'তে পাবে অতি সুখ॥
কি কব দুঃখের কথা, গঙ্গা নামে মোর সতা,
স্বামী যারে ধরেন মস্তকে।
বরঞ্চ গরল খায়, মোর পানে নাহি চায়,
ভবন ছাড়িনু এই দুঃখে॥
গঙ্গা বড় আউচালি [illegible]োই পাড়িছে গালি,
স্বামীর সোহাগ[illegible]প।
দেখিয়া পতির দোষ, [illegible]ল পরম রোষ,
লাজে জলাঞ্জ[illegible]প॥

দারুণ দৈবের গতি, হইনু অবলা জাতি,
অহি সঙ্গে হয়ে গেল মেলা।
বিষকণ্ঠ মোর স্বামী, সহিতে না পারি আমি,
তাহে হইল সতিনী প্রবলা॥
সতীনের সম্মান, আপনার অপমান,
অভিমানে নাহি মেলি আঁখি।
দেখিয়া দারুণ সতা, বিবাহ দিলেন পিতা,
পিতৃকুলে হইনু বিমুখী॥
আমার কর্ম্মের গতি, উগ্র হইল মোর পতি,
পাঁচ মুখে মোরে দেয় গালি।
তাহে সতীনের জ্বালা, কতেক সহিবে বালা,
পরিতাপে হয়ে গেনু কালী॥
প্রভুর সম্পদ্ বড়, সাত সতীনেতে জড়,
অনুক্ষণ জঞ্জাল কোন্দল।
কি মোর কপালে এল, খাইয়া ধুতুরা ফল,
আচম্বিতে হইল পাগল॥
বিভূতি মাখেন গায়, ঝিমিকে ঝিমিকে যায়,
ভাগ্যে আছে পরে বাঘছাল।
ভুজঙ্গ-বেষ্টিত অঙ্গ, বাজায় ডম্বুর শৃঙ্গ,
গলায় শোভিছে হাড়মাল॥
কি হবে বিষয়-সুখ, তাহে পতি পরাঙ্মুখ,
তারে বলে সবে কাম-অরি।
সাত সতিনীরা মারে, বুঝিয়া না শাস্তি করে,
সাত সতা পরাণের বৈরী॥
যে ঘরে সতিনী রয়, কামানলে প্রাণ দয়,
যেমন লাগয়ে বিষ-জ্বালা।
বিধি মোরে হৈল বাম, না গণিনু পরিণাম,
বনবাসী হইনু একলা॥
এবে বিধি হৈল সখা, বীর-সঙ্গে পথে দেখা,
সত্য করি আনে নিজ ঘরে।
শুন গো ব্যাধের ঝি, তোমারে বুঝাব কি,
এবে আমি যাব কোথাকারে॥"

এই বর্ণনার অনুকরণ করিয়া ভারতচন্দ্র পাটুনীর নিকট অনুপূর্ণার পরিচয়-দান ব্যাখ্যা করিয়াছেন :—

"ঈশ্বরীরে পরিচয় [illegible] ঈশ্বরী।
বুঝহ ঈশ্বরী আমি [illegible] করি॥
বিশেষণে সবিশেষ [illegible] পারি।
জানহ স্বামীর না[illegible] নারী॥

গোত্রের প্রধান পিতা মুখবংশজাত।
পরম কুলীন স্বামী বন্দ্যবংশখ্যাত ॥
পিতামহ দিলা মোরে অন্নপূর্ণা নাম।
অনেকের পতি তেঁই পতি মোর বাম ॥
অতি বড় বৃদ্ধ পতি সিদ্ধিতে নিপুণ।
কোন গুণ নাহি তার কপালে আগুন ॥
কু-কথায় পঞ্চমুখ কণ্ঠভরা বিষ।
কেবল আমার সঙ্গে দ্বন্দ্ব অহর্নিশ ॥
গঙ্গা নামে সতা তার তরঙ্গ এমনি।
জীবন-স্বরূপা সে স্বামীর শিরোমণি ॥
ভুত নাচাইয়া পতি ফেরে ঘরে ঘরে।
না মরে পাষাণ বাপ দিলা হেন বরে ॥
অভিমানে সমুদ্রেতে ঝাঁপ দিলা ভাই।
যে মোরে আপনা ভাবে তারি ঘরে যাই ॥"

চণ্ডীর প্রসাদে যখন কালকেতু নূতন নগর নির্ম্মাণ করিয়া রাজা হইলেন, তখন তাঁহার সৌভাগ্যের উদয় হইতেছে দেখিয়া চারি দিক্ হইতে চতুর চাটুকারগণ ছুটিয়া আসিল। তাহাদিগের মধ্যে ভাঁড়ুদত্ত নামক একজন ধূর্ত্ত কায়স্থের কবি যে বর্ণনা দিয়াছেন, তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট স্বাভাবিক বর্ণনা সাহিত্য-ভাণ্ডারে দুষ্প্রাপ্য :—

"ভেট লয়ে কাঁচকলা, পশ্চাতে ভাঁড়ুর শালা,
আগে ভাঁড়ুদত্তের প্রয়াণ।
ফোঁটা-কাটা মহাদম্ভ, ছেঁড়া জোড়ে কোঁচা লম্ব,
শ্রবণে কলম লম্ববান ॥
প্রণাম করিয়া বীরে, ভাঁড়ু নিবেদন করে,
সম্বন্ধ পাতিয়া খুড়া খুড়া।
ছেঁড়া কম্বলে বসি, মুখে মন্দ মন্দ হাসি,
ঘন ঘন দেয় বাহু নাড়া ॥
আইলু বড় প্রীতি আশে, বসিতে তোমার দেশে,
আগেতে ডাকিবে ভাঁড়ু দত্তে।
যতেক কায়স্থ দেখ, ভাঁড়ুর পশ্চাতে লেখ,
কুল শীল বিচার মহত্ত্বে ॥
কহি আপনার তত্ত্ব, আমল হাঁড়ার দত্ত,
তিন কুলে আমার মিলন।
ঘোষ ও বসুর কন্যা, দুই নারী মোর ধন্যা
মিত্রে কৈল কন্যা-বিতরণ ॥
গঙ্গার দু কূল পাশে, যতেক কায়স্থ বৈসে,
মোর ঘরে কর[illegible]ন।
ধারি বস্ত্র অলঙ্কার, [illegible]া করে ব্যবহার,
কেহ নাহি ক[illegible]।

বহু পরিবার মেলা, দুই জায়া চারি শালা,
চারি পুত্র বহিনী শাশুড়ী।
ছয় জামাই ছয় চেড়ি, সেই হেতু ছয় বাড়ী,
ধান্য দিবে নাহি দিব বাড়ী॥
হাল-বলদ দিবে খুড়া, দিবে হে বিছন পুড়া,
ভেনে খাইতে ঢেঁকি কুলা দিবে।
আমি পাত্র তুমি রাজা, আগে কর মোর পূজা,
অবশেষে ভাঁড়ুরে জানিবে॥"

ভারতচন্দ্র বর্ণনায় অদ্বিতীয় পণ্ডিত, কিন্তু এরূপ স্বাভাবিক বর্ণনা ভারতচন্দ্রের গ্রন্থের মধ্যে কোথায় পাইব?

বিদ্যাসুন্দরে হীরা মালিনীর বর্ণনা পাঠ করিয়া সেকালের পাঠকগণ বিমোহিত হইতেন। কিন্তু মুকুন্দরাম শ্রীমন্ত সদাগরের উপাখ্যানে দুর্ব্বলা-নাম্নী এক দাসীর যে চরিত্র অঙ্কণ করিয়াছেন, হীরা মালিনী তাহারই ছায়া অবলম্বনে অঙ্কিত। শ্রীমন্ত সদাগরের পিতা ধনপতি সদাগর। তাহার দুই স্ত্রী, লহনা ও খুল্লনা। দুই সপত্নীর মধ্যে প্রথমে পরম প্রীতি ছিল, কিন্তু ধূর্ত্তা দাসী দুর্ব্বলা কালসর্পের ন্যায় তাহাদের মধ্যে যাইয়া বিচ্ছেদ-সাধন করিল; বড় সপত্নী লহনার নিকট যাইয়া বলিল:—

"শুন শুন মোর বোল শুন গো লহনা।
এবে সে করিলে নাশ আপনি আপনা॥
সাপিনী বাঘিনী সত্য পোষ নাহি মানে।
অবশেষে এই তোমায় বধিবে পরাণে॥
কলাপিকলাপ জিনি খুল্লনার কেশ।
অর্দ্ধ পাকা কেশে তুমি কি করিবে বেশ॥
খুল্লনার মুখশশী করে চল চল।
নাছিতায় মলিন তোমার গণ্ডস্থল॥
ক্ষীণমধ্যা খুল্লনা যেমন মধুকরী।
যৌবনবিহীনা তুমি হৈলা ঘটোদরী॥
আসিবেন সাধু গৌড়ে থাকি কত দিন।
খুল্লনার রূপে হবে কামের অধীন॥
অধিকারী হবে তুমি রন্ধনের ধামে।
মোর কথা স্মরণ করিবে পরিণামে॥"

এইরূপ পরামর্শ পাইয়া লহনা ক্র[illegible]দে[illegible]নার প্রতি বিরক্তমনা হইলেন এবং অনেক অত্যাচার করিতে লাগিলেন। কিন্তু চ[illegible]থাকি, [illegible]াকে স্বপ্ন দেওয়ায়, লহনা পুনরায় ছোট সপত্নীর প্রতি প্রসন্ন হইলেন। দুই[illegible] দু-ই ভা[illegible] মধ্যে পুনরায় প্রীতি হইয়াছে, স্বামী

বিদেশ হইতে ঘরে আসিতেছেন, খুল্লনার কপাল ফিরিয়াছে, তখন দুর্ব্বলা দাসী ছুটাছুটী করিয়া বড় মার নিন্দায় ছোট মার মনস্তুষ্টি-সাধনে প্রবৃত্ত হইল :—

"আর শুনেছ ছোট মা সাধু আইল ঘরে।
বাহির হইয়া শুন বাজনা নগরে ॥
পোয়াইল আজি যে তোমার দুঃখনিশা।
ভবানী-প্রসাদে তোর পূর্ণ হইল আশা ॥
আমারে আপনা বলে' রাখিবে চরণে।
দুর্ব্বলা অন্যের দাসী নহে তোমা বিনে ॥
তোমার প্রাণের অরি পাপমতি বাঁজী।
সাধুর নিকটে তার আলাইব পাঁজী ॥
দোষ মত যদি না করহ প্রতিকার।
কি জানি ঘটায় পাছে দুঃখ পুনর্ব্বার ॥
যত দুঃখ পাইলা তুমি মোর মনে ব্যথা।
তোমার হইয়া আমি কহিব সে কথা ॥
সোনার ছাট খুঞা বাস রাখ বাসঘরে।
সাধুর চক্ষের বালি করি লহনারে ॥ "

আবার তাহারই পর বড় মার নিকট আসিয়া ছোট মার নিন্দা আরম্ভ করিল :—

"আর শুনেছ বড় মা সতার চরিত।
হেন বুঝি সাধুর কাছে বলে বিপরীত ॥
যেই সদাগরের পাইল ভেরী-সাড়া।
আনিল ভাণ্ডার হইতে আভরণ-পেড়া ॥
অঙ্গদ কঙ্কণ হারে ভূষিত করি গা।
যৌবন-গরবে ভূমে নাহি পড়ে পা ॥
যেই সদাগর আইল আপনার বাসে।
মোহন কাজল পরি বৈসে তার পাশে ॥
আড় নয়নে কহে কথা অমৃতের কণা।
কোথায় নাহিক দেখি এমন ঠেঁটাপনা ॥
উহার শোভা গৌর গায়ে নবীন যৌবন।
গুরুজন দেখি অঙ্গে না দেয় বসন ॥
তুমি বড় ভগিনী জ্যেষ্ঠ সতীন তথি।
স্বামী ভেটিবারে নাহি লয় অনুমতি ॥
অব্যাজে দেখায় রূপ যৌবন-সম্পদ।
অন্য স্বামী হৈলে তার গলে দিত পদ ॥"

তাঁহার পর সাধু ঘরে আসিলে মহা [illegible] পড়িয়া গেল, রন্ধনের আয়োজন হইতে

লাগিল, দুর্ব্বলা হাটে খাদ্য ক্রয় করিতে গেল, তাহার বর্ণনা না দিয়া আমরা ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না :—

"দুর্ব্বলা বাজারে যায়, পাছু দশ ভারী ধায়,
কাহন পঞ্চাশ লয়ে কড়ি।
কপালে চন্দন চুয়া, হাতে পান মুখে গুয়া,
পরিধান তসরের শাড়ী॥
দুর্ব্বলা হাটেতে যায়, উভমুখে লোক চায়,
ঐ আইসে সাধু ঘরের ধাই।
বুঝিয়া এমন কাজ, যার আছে ভয় লাজ,
ভাল বস্তু রাখিল লুকাই॥
লাউ কিনে কচি কুমড়া, শও-মূলে পলাকড়া,
পাকা আম্র কিনে বোঝা-মূলে।
বিশা দরে ছেনা কিনি কিনিল নবাত চিনি,
গণ্যে পণ-মূলে পান নিলে॥
মূল্য দিয়া পণ দশ, কিনিল জীয়ন্ত শশ,
জরঠ কমঠ কিনে রুই।
খরসুলা কিনে কই, কিনিল মহিষা-দই,
কামরাঙ্গা কিনে কুড়ি দুই॥
চাঁপাকলা মর্ত্তমান, সরস গুবাক পান,
কিনিলেক কর্পূর চন্দন।
শাক বেগুন সারকচু, খাম-আলু কিনে কিছু,
বিশা দুই কিনিল লবণ॥
বাছি কিনে তাল-শাঁশ, হিঙ্গু জিরা রসবাস,
চই মেথি জোয়ানি মহুরী।
মুগ মাষ বরবটি, কিনিল সরল পুঁঠি,
সের দরে ঘৃত ঘড়া-পূরি॥
রন্ধন-সন্ধান জানে, চিতল বোয়ালি কিনে,
শোল পোনা কিনিল চিঙ্গড়ী।
চতুর সাধুর দাসী, আট কাহণেতে খাসী,
তৈল সের দরে দশ বুড়ি॥
কুড়ি-মূলে নারিকেল, কুলি করঞ্জা পানিফল,
কাঁটাল কিনিল দুই কুড়ি।
কিছু কিনে ফুলগাভা, করুণা কমলা টাবা,
সেরে জুখি কিনে ফুলবড়ি॥
তোলা-মূলে তেজপাত, ক্ষীর কিনে বিশা সাত,
আদা বিশা-দরে দেশ বুড়ি।
ধান ওল কিনে সারি, খাকি, দুগ্ধ কিনে ভার চারি,
ভার দুই কিনিল ভাঁড়॥

নির্ম্মাণ করিতে পিঠা, বিশা-দরে কিনে আটা,
খণ্ড কিনে বিশা সাত আট।
বেসাতি দুর্ব্বলা জানে, অবশেষে হাঁড়ি কিনে,
মাগ্যে লয় তবে কিছু ভাট॥
কিনিয়া রন্ধন-সাজ, অঙ্গুলিতে লয় ব্যাজ,
হরিদ্রা চুবড়ি ভরি কিনে।
স্নান করি দুর্ব্বলা, খায় দধি খণ্ড কলা,
চিড়া দই দেয় ভারী জনে॥
আগে পাছে ভারী জন, দুয়া আসে নিকেতন,
উপনীত সাধুর মন্দিরে।
চতুরা সাধুর দাসী, আগে ভেট দিয়া খাসী,
প্রণাম করিল সদাগরে॥"

এই স্থানে আমরা প্রবন্ধ সাঙ্গ করিলাম। আসলটি উৎকৃষ্ট কি নকলটি উৎকৃষ্ট, তাহা পাঠকগণ বিবেচনা করিবেন। আমরা এইমাত্র বলিতে পারি যে, মুকুন্দরামের নায়ক-নায়িকার ন্যায় নর-নারী আমরা প্রতিদিন বিশ্ব-সংসারে দেখিতে পাই। ধনপতির ন্যায় বিষয়ী, লহনা ও খুল্লনার ন্যায় সপত্নী, ভাঁড়দত্তের ন্যায় প্রবঞ্চক, দুর্ব্বলার ন্যায় দাসী—আমরা সংসারে সর্ব্বদাই দেখিতে পাই। সংসার দেখিয়া মুকুন্দরান নায়ক-নায়িকা চিত্রিত করিয়াছেন। ভারতচন্দ্র অসাধারণ পণ্ডিত, অসাধারণ চতুর, বাক্যবিন্যাসে অসাধারণ ক্ষমতাশালী; কিন্তু তাঁহার নায়ক-নায়িকাগুলি কি সংসারের নর-নারী? হীরার ন্যায় চতুরা মালিনী, সুন্দরের ন্যায় বিলাসপরায়ণ নায়ক, বিদ্যার ন্যায় বিলাসিনী নায়িকা সংসারের সচরাচর নর-নারী নহে।

মুকুন্দরাম সংসারের কথা বর্ণনা করিয়াছেন; ভারতচন্দ্র সমাজবিশেষের রসিকতা বর্ণনা করিয়াছেন।

[সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩০১]

নবীনচন্দ্র

পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়

সমাজ-দেহে জীবনীশক্তি বর্ত্তমান থাকিলে, উহাতে বাহিরের একটা নূতন বলের সঞ্চার হইলে, সে সমাজ-দেহ যতই কেন মুমূর্ষু হউক না, উহা কিছু কালের জন্য আবার সজীব হইয়া উঠে। ভাগ্য প্রসন্ন থাকিলে এই সজীবতার সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় পুনরভ্যুত্থান সম্ভব হয়, নহিলে এই কিছু কালের সজীবতা পরিণামে প্রগাঢ়তর স্থবিরতায় পর্য্যবসিত হয়। সমাজ-তত্ত্বের এই সিদ্ধান্তকে মান্য করিয়া ভারতেতিহাসের দুই

কালের দুইটি বিপ্লবের পর্য্যালোচনা করিলে, আমরা কবি নবীনচন্দ্রের বঙ্গসাহিত্যে স্থান ও মান—এই দুই বিষয় বুঝিতে পারিব।

প্রথম ইস্‌লাম ধর্ম্মের ও মুসলমান সভ্যতার সংঘর্ষে আসিয়া ভারতের হিন্দুসমাজের ও সাহিত্যের বিপ্লব ঘটে। সেই বিপ্লবের ফলে এক পক্ষে গোরক্ষনাথ, রামানন্দ, নানক ও শ্রীচৈতন্য ধর্ম্মপ্রচারক- ও সমাজ-সংস্কারক-রূপে অবতীর্ণ হন; অন্য পক্ষে, সুরদাস, শ্যামদাস, তুলসীদাস, বিহারীদাস প্রভৃতি সাহিত্যসেবিগণ আর্য্যাবর্ত্তে, আর বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, কৃষ্ণদাস, মুকুন্দরাম, গোবিন্দদাস, জয়ানন্দ, চন্দ্রশেখর প্রভৃতি কবিগণ মিথিলায় ও বঙ্গে আবির্ভূত হন। খৃষ্টীয় পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে ইহারাই পঞ্জাব হইতে বঙ্গদেশ পর্য্যন্ত সমগ্র আর্য্যাবর্ত্তে বিষম বিপ্লব উত্থিত করিয়াছিলেন। ভারতে ইস্‌লাম ধর্ম্মপ্রচারের ফলে জাতিভেদের মূলে কুঠারাঘাত হইল। হিন্দুসমাজ-দেহে যাহারা চিরকাল নীচ ও অন্ত্যজ হইয়া ছিল, ইস্‌লামের কৃপায় তাহারা শ্রেষ্ঠের সমান হইয়া উঠিল। যে চণ্ডাল হিন্দু থাকিলে কখনই কোন উচ্চ জাতির সহিত একাসনে বসিতে পাইত না, সে মুসলমান হইলেই ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের সহিত একাসনে বসিতে পাইত। ফলে, হিন্দুসমাজের ভিত্তি-স্বরূপ শিল্পকুশল শূদ্র-জাতি-সকল দলে দলে মুসলমান হইতে লাগিল। সমাজে একটা বিষম বিপ্লব উপস্থিত হইল। অন্য দিকে সাদী, হাফেজ, ফর্দ্দৌসী, ওমর খায়ম্ প্রভৃতি মুসলমান কবিগণের কাব্য ও গাথা নূতন ভাব ও নূতন তত্ত্ব হিন্দুর সম্মুখে আনিয়া দিল। হিন্দুর ভাব-বিপ্লবও ঘটিল। এই বিপ্লব হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য সমাজের মনীষিগণ ইস্‌লাম-শক্তির সহিত একটা আপোশ করিতে উদ্যত হইলেন। গোরক্ষনাথ জাতি-নির্ব্বিশেষে শৈব ধর্ম্মের প্রচার আরম্ভ করিলেন। তিনি ব্যাখ্যা করিলেন যে, মহাদেব সদাশিব নিরাকার, নির্ব্বিকার ঈশ্বর। তাঁহাতে রূপের আরোপ করিয়া তাঁহার উপাসনা করিতে হয় না। চিহ্ন- বা প্রতীক-স্বরূপ এক খণ্ড প্রস্তর লিঙ্গ-বিধায় পূজিত হইবে। আর এই মহাদেবের মন্দিরে ও উপাসনায় উচ্চ-নীচ নাই, ব্রাহ্মণ-শূদ্র নাই। রামানন্দও বৈষ্ণব ধর্ম্মকে এই হিসাবে সর্ব্বজাতির সেব্য করিতে চাহিলেন। তিনি ভক্তির পন্থা অবলম্বন করিয়া ম্লেচ্ছ, শূদ্র হইতে ব্রাহ্মণ পর্য্যন্ত সকলকেই এক সূত্রে বাঁধিতে চাহিলেন। হরিভক্ত, রামভক্ত, ম্লেচ্ছ-চণ্ডাল হইলেও ব্রাহ্মণের পূজ্য হইবে—ইহাই রামানন্দের আদেশ; কেন-না, ভক্তির পথ সকলেরই গম্য ও সেব্য। গুরু নানক ব্যবহার-ধর্ম্ম বা moralityকে ভক্তিতে ডুবাইয়া, সন্ন্যাসের সহিত মিশাইয়া, ইস্‌লাম ও হিন্দুত্বের আপোশে শিখধর্ম্মের সৃষ্টি করিলেন। শেষে বাঙ্গালায় শ্রীচৈতন্য শুদ্ধ হরিভক্তি-প্রবাহের প্রভাবে সকল বাধা অতিক্রম করিয়া এক নবীন ধর্ম্মের সৃষ্টি করিলেন। ঈশ্বরপ্রেম ও মধুর রসকে আশ্রয় করিয়া তিনি আচণ্ডালে হরিনাম বিলাইলেন।

এইভাবে ইস্‌লামের সহিত হিন্দুত্বের কতকটা আপোশ হইল। হিন্দুসমাজে কতকটা সামঞ্জস্যের ভাব দেখা দিল। অন্তরে, সাহিত্যেও এইরূপ বিপ্লব ঘটিল।

এই ভাবেই তাহারও সামঞ্জস্য হইয়াছিল। তবে এই সময়ে ভাবপ্রবাহ পশ্চিম হইতে বঙ্গে আসিয়াছিল। সুরদাস, শ্যামদাস, তুলসীদাস প্রভৃতির হিন্দী পদাবলী, গীত ও মহাকাব্য-সকল পাঠ করিয়া বাঙ্গালার চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, মুকুন্দরাম প্রভৃতির লেখা পড়িলে মনে হয়, যেন বাঙ্গালায় হিন্দীর প্রতিধ্বনি শুনিতেছি। মুকুন্দরামের চণ্ডী-কাব্যে তুলসীকৃত রামায়ণের অনেক ছত্র, অনেক শ্লোক আদত্ পাওয়া যায়। সুরদাসের গীত-লহরী হইতে চণ্ডীদাস ও জ্ঞানদাসের সর্ব্বস্ব পাওয়া যায়। এখন এক-একটি পদ তুলিয়া আশ্চর্য্য সম্মিলনের পরিচয় দিবার সময় নহে। তবে যাঁহারা হিন্দুস্থানী কবিদের লেখা পড়িয়াছেন, সেই সঙ্গে চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, মুকুন্দরাম, ঘনরাম প্রভৃতিও পড়িয়াছেন, তাঁহারা এই কথার যাথার্থ্য স্বীকার করিবেন। একটা কথা বলিয়া রাখা ভাল যে, এ দেশে ইংরেজের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে বাঙ্গালী হিন্দুস্থানের সহিত সম্বন্ধ-চ্যুত হন নাই,—বাঙ্গালী স্বতন্ত্র জাতি বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হন নাই। বাঙ্গালার শিক্ষিত হিন্দুকে পদমর্য্যাদা বজায় রাখিতে হইলে হিন্দী, উর্দ্দু ও ফার্সী শিখিতে হইত। তখন বাঙ্গালী-মাত্রই হিন্দী বলিতে ও বুঝিতে পারিতেন। বাঙ্গালা ভাষাও হিন্দী হইতে এখনকার মত এতটা পৃথক্ হইয়া যায় নাই। এই হেতু মনে হয়, বাঙ্গালার কবি হিন্দুস্থানের কবিকে আদর্শ করিয়া কাব্য-গাথা লিখিতেন।

সে যাহা হউক, এই জাতীয় নবোন্মেষের সময়ে যেমন ধর্ম্মে হিন্দু ও মুসলমানের বিশ্বাস-সামঞ্জস্য ঘটিয়াছিল, তেমনই সাহিত্যেও হিন্দু- ও মুসলমান-রুচির সামঞ্জস্য সাধিত হইয়াছিল। ভক্তি যেমন ধর্ম্মপক্ষে সামঞ্জসীকরণের উপাদান ছিল, তেমনই রূপজ মোহ, লালসা ও ভক্তির জন্য আত্মদান সাহিত্যের ভূষণ-স্বরূপ হইয়াছিল। সাহিত্যে ইসলাম-রুচি পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল। ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরে এই রুচির বিকট বিকাশ হইয়াছে। কবিকঙ্কণের কাঁচলীর বর্ণনা, আর কবি শ্যাম-দাসের শ্রীমতীর কাঁচলীর বর্ণনা ভাবে ও ভাষায় প্রায় একরূপ। এ বর্ণনা ইস্লাম-রুচি-জাত। এমন ভাবে নারীর আভরণের বর্ণনা হিন্দুর পুরাতন সাহিত্যে পাওয়া যায় না। হিন্দুর সমাজ-দেহের এই যে অভ্যুত্থান, ইহাকে ইংরেজিতে Indo-Islamic Renaissance বলা যাইতে পারে।

ইংরেজের অভ্যুদয় প্রথমে বাঙ্গালা দেশেই হয়। বাঙ্গালীই প্রথমে ইংরেজের সভ্যতার ও বিদ্যার পরিচয় পায়। সে পরিচয়ে বাঙ্গালী একটা নূতন সামগ্রী পাইল, উহা European Individualism —উচ্চ-নীচ নাই, পূজ্য-হেয় নাই। পুরুষকার সকলেরই আয়ত্ত; তাহার প্রভাবে সকলেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পদ পাইতে পারে। আর্য্যশাস্ত্রের পুরাতন পুরুষকার-তত্ত্ব ভুলিয়া গিয়া বাঙ্গালী এই পুরুষকারের মোহে মুগ্ধ হইয়াছিল। মুগ্ধ হইবার একটু হেতুও ছিল। ফরাসী-বিপ্লবের পরে ইউরোপ ফরাসীর অনুশীলিত ও প্রচারিত নূতন সাম্যবাদ পাইয়াছিল। সেই সাম্যবাদের উপঢৌকন প্রথমেই ইংরেজ বাঙ্গালীকে দিয়াছিল। এই সাম্যবাদ ও এই পুরুষকারের মোহে বাঙ্গালী প্রথমে দলে দলে খ্রীষ্টান হইতে লাগিল। নবাবী আমলে বরং জাতি-

বিচার ছিল, উচচ-নীচের পার্থক্য ছিল, সমাজে বিধি-নিষেধ ছিল। ইংরেজ এ দেশে আসিয়া সে সব উড়াইয়া দিতে চাহিলেন। ফরাসীদের নিকট হইতে ধার করিয়া Liberty, Fraternity ও Equality—এই তিন মহামন্ত্র ইংরেজ বাঙ্গালীকে শিখাইলেন। হিন্দুসমাজে এই নবীন শিক্ষার প্রভাবে একটা বিপ্লব ঘটিল। পাশ্চাত্য সভ্যতার ও খৃষ্টান ধর্ম্মের সহিত আপোশ করিয়া সমাজ-রক্ষার উদ্দেশ্যে রাজা রামমোহন রায় ব্রাহ্ম ধর্ম্ম গড়িলেন। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র শিক্ষা-প্রণালীর সাহায্যে দেশীয় ছাঁচে পাশ্চাত্য ভাব ও কথা এ দেশে প্রচুর পরিমাণে আমদানী করিলেন। পাশ্চাত্য-হিসাবে তিনিই প্রথম সমাজ-সংস্কারক হইলেন। পক্ষান্তরে, মাইকেল মধুসূদন, হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র এক দিকে, আর বঙ্কিমচন্দ্র ও ভূদেব অন্য দিকে, সাহিত্যের পথে স্বদেশীয আবরণে এ দেশে পাশ্চাত্য ভাব-তত্ত্বের আমদানী করিলেন। ইঁহারাই আধুনিক Indo-European Renaissanceএর প্রচারক- ও প্রবর্ত্তক-স্বরূপ।

প্রথমেই, ইংরেজের সাহিত্যে যাহা আছে, আমাদের বাঙ্গালা-সাহিত্যে যাহা নাই, তাহারই আমদানী আরম্ভ হইল। মাইকেল মিল্টনের অনুকরণে অমিত্রাক্ষরে মহাকাব্য মেঘনাদবধ রচনা করিলেন। এ কাব্যে পাশ্চাত্য Individualism পূর্ণ-পরিস্ফুট। আদিম মহাভারত বা বিষ্ণুপুরাণে যেমন কার্ত্তবীর্য্যার্জুন, হিরণ্য-কশিপু, ভীষ্ম প্রভৃতি পুরুষার্থ-প্রবণ চরিত-কথা আছে, ইস্লাম-যুগে অদৃষ্টবাদের প্রাবল্যে ভক্তির আত্ম-নিবেদনের আধিক্যে জাতীয় সাহিত্যে ঐরূপ চরিত-কথার অভাব হইয়াছিল। মাইকেল সে অভাব পূর্ণ করিলেন,—রাবণ, মেঘনাদ প্রভৃতির পুরুষার্থ-প্রবণ চরিতের অঙ্কন করিয়া জাতীয় সাহিত্যকে অলঙ্কৃত করিলেন। কবি হেমচন্দ্র এই Individualismকে বা পুরুষকারকে দেশহিতৈষণায় পরিবর্ত্তিত করিলেন; তাঁহার কবিতাবলী, গাথা ও বৃত্রসংহারে দধীচির চরিত্র ইহার পরিচায়ক। খাঁটী Patriotism ইউরোপের সামগ্রী—এ দেশের নহে। কবি হেমচন্দ্র উহা এ দেশে কবির ভাষায় ফুটাইয়াছিলেন।

কবি নবীনচন্দ্র প্রথমে মাইকেল ও হেমচন্দ্রের ভাবমোহে পড়িয়াছিলেন। তাহার ফলে তাঁহার শ্রেষ্ঠ কাব্য—পলাশীর যুদ্ধ। উহাতে Patriotism অতি মধুর-ভাবে বর্ণিত ও বিন্যস্ত আছে।

এই সময়ে এ দেশের ডাক্তার কংগ্রীভের মুখে অগস্ত কোম্তের (Auguste Comte) মতের আমদানী হয়। সে Humanitarianism আমাদের চক্ষে সম্পূর্ণ নূতন বোধ হইল। সে Humanitarianism এর প্রভাবে ভারতের নানা জাতি ও নানা ধর্ম্মের সমন্বয় সম্ভব মনে হইল। এই সময়ে আবার Nationalism বা জাতীয়তার প্রথম বিকাশ বাঙ্গালায় হয়। বঙ্কিমচন্দ্র ইউরোপীয় ভাবকে দেশীয় ছাঁচে ঢালিয়া বিলাইবার চেষ্টা করিতেছেন—ইউরোপের Culture-তত্ত্বটাকে কাব্যে আদর্শের শাস্ত্রসঙ্গত করিতে উদ্যত

হইয়াছেন, হিন্দুর শ্রীকৃষ্ণকে ভারতের বিস্‌মার্ক বানাইয়া খাড়া করিতেছেন। পক্ষান্তরে ভূদেববাবু অপূর্ব্ব মনীষার প্রভাবে হিন্দুর খাঁটী সমাজতত্ত্ব ও পারিবারিক তত্ত্বকে ইংরেজি যুক্তিতে নিষ্কলঙ্ক বলিয়া সপ্রমাণ করিতেছেন।

ঠিক এই সময়ে কবি নবীনচন্দ্র পাশ্চাত্ত্য Humanitarianismকে মহাভারতের গল্পের ছাঁচে ফেলিয়া নূতন Nationalism এর সৃষ্টি-পুষ্টি করিয়া, রৈবতক, কুরুক্ষেত্র ও প্রভাস এই তিনখানি কাব্য-গ্রন্থে বিংশ শতাব্দীর অভিনব মহাভারত রচনা করিয়াছিলেন। কোল্‌রিজ-প্রমুখ 'লেক'-কবিগণের Susquehannaর স্বপ্ন, কোম্‌তের বিশ্বমানবতার তত্ত্ব, অর্থাৎ Humanitarianism, এবং টেনিসনের লক্‌স্‌লি হলে বিশ্ববান্ধবতার বিবৃতি—এই সবগুলি সম্পিণ্ডিত করিয়া আমাদের সনাতন মহাভারতের ছাঁচে ফেলিয়া নবীনচন্দ্র তিনখানি কাব্যগ্রন্থের রচনা করিয়া গিয়াছেন। প্রৌঢ় শরতের শেফালী-বর্ষার ন্যায় তাঁহার ভাষা আপনি আসে, আপনি ফুটে, আর আপন সৌরভে দশ দিক্ আমোদিত করিয়া দেয়। তাই তাঁহার এই তিনখানি কাব্য উদ্দেশ্য-মূলক ও সিদ্ধান্ত-বিন্যাসক হইলেও ভাষার গুণে অনেকের আদরের হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র কৃষ্ণচরিত্রে ও ধর্ম্মতত্ত্বে যাহা শিখাইয়াছেন, সূত্র ও ভাষ্যাকারে যাহার বিন্যাস করিয়াছেন, উপকথার ছলে দেবী চৌধুরাণী, আনন্দমঠ ও সীতারাম—এই তিনখানি উপন্যাসে যাহার আংশিক ব্যাখ্যা করিয়াছেন, নবীনচন্দ্র তাঁহার তিনখানি কাব্যে সেই সকল তত্ত্বই বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। এই চেষ্টা সার্থক হউক আর নাই হউক, এই চেষ্টার জন্যই তিনি নূতন যুগের শেষ মহাকবি; কেন-না, মনে হয়, বাঙ্গালা ভাষায় আর তাত্ত্বিক কাব্যের প্রয়োজন নাই। তাই এখনকার কবিগণ Lyrics, Idylls লিখিয়া তাঁহাদের কাব্যশক্তির পর্য্যবসান করিতেছেন।

ইস্‌লাম ধর্ম্মের সংঘর্ষণের জন্য পূর্ব্বে যে অভ্যুত্থান ঘটিয়াছিল, তাহাতে ভাব-প্রবাহ পশ্চিম হইতে পূর্ব্বে বা বাঙ্গালায় আসিয়াছিল। খ্রীষ্টান ধর্ম্মের সংঘর্ষণে ও ইংরেজের অধিকার-বিস্তার-হেতু যে বিপ্লব এখন ঘটিয়াছে, তাহাতে ভাবপ্রবাহ বাঙ্গালা হইতে যুক্তপ্রদেশে ও পঞ্জাবে যাইতেছে। কাশীর হিন্দুস্থানী কবি হরিশ্চন্দ্র প্রথমে হেমচন্দ্রের ও নবীনচন্দ্রের কবিতা হিন্দীতে অনুবাদ করিয়াছিলেন। তাঁহার পর হইতে বাঙ্গালার ও বাঙ্গালীর নাটক, নভেল ও কাব্যগ্রন্থসকল বর্ষে বর্ষে হিন্দীতে ভাষান্তরিত হইয়া প্রচারিত হইতেছে। কাল-মাহাত্ম্যে ভাবের উজান গতি হইয়াছে।

এই সঙ্গে বলা ভাল যে, ইস্‌লাম-সভ্যতার জন্য যে রুচি আমাদের সাহিত্যে দেখা দিয়াছিল, তাহার অনেকটা অপনোদন হইয়াছে। হিন্দুর সহজ-বুদ্ধি অতীন্দ্রিয়বাদ-প্রসারিণী বা Transcendental, তাই সুরদাস ও চণ্ডীদাস প্রেমটাকে ভগবানের পারিজাত-হারে পরিণত করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান কালের ইংরেজি-নবীশ বাঙ্গালী কবিগণ ব্রাউনিং ও গেটের লেখায় উহারই সম্যক্ পরিচয় পাইয়া, বাঙ্গালা সাহিত্যে প্রকারান্তরে সেই সকলের আমদানী করিতেছেন। ইহার ফলে রুচি অনেকটা

পরিশুদ্ধ হইয়াছে। কবি নবীনচন্দ্র তাঁহার কাব্যে ইউরোপের এই বিচিত্র Transcendentalismএর কতকাংশের ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

কবি নবীনচন্দ্রের কাব্য-শক্তির পরিচয় দিবার এখনও সময় আসে নাই। তবে বঙ্গ-সাহিত্য ও সমাজে তাঁহার স্থান ও মান কেমন তাহার পরিচয় যথাশক্তি প্রদত্ত হইল। তিনি বর্ত্তমান অভ্যুত্থানের শেষ মহাকবি—শেষ ব্যাখ্যাতা ও প্রচারক। জয়ানন্দ, কৃষ্ণদাস কবিরাজ-প্রমুখ বৈষ্ণব কবিগণ কবিতার প্রভাবে ও কাব্যগ্রন্থ-প্রচারে যে উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবার চেষ্টা পাইয়াছিলেন, ঠিক সেই রকম উদ্দেশ্য না হউক, তদনুরূপ উদ্দেশ্য-সিদ্ধির প্রয়াসে কবি নবীনচন্দ্র ইদানীং কবিতাগ্রন্থ-সকল লিখিয়া গিয়াছেন। আপাততঃ ইহাই তাঁহার যথেষ্ট পরিচয়।

[সাহিত্য, ১৩১৫]

কবি হেমচন্দ্র*

পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়

কবি হেমচন্দ্র বাঙ্গালায় নবীন যুগের প্রবর্ত্তনার কালে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ১২৪৫ সালের ৬ই বৈশাখ তিনি ভূমিষ্ঠ হন। সে সময়ে বঙ্গদেশে নবীন ইংরেজি শিক্ষা ও সভ্যতার বন্যা আসিয়াছিল। সে ইংরেজি শিক্ষা ও সভ্যতায় ফরাসী-বিপ্লবজাত সিদ্ধান্তসকল অতিমাত্রায় বাঙ্গালায় আমদানী হইতেছিল। সে আমদানীর ফলে—"কালস্রোত তখন কেবলই ভাঙ্গিতেছিল; ভাঙ্গিব বলিয়া ভাঙ্গিতেছিল, গড়িব বলিয়া ভাঙ্গিতেছিল। হেমবাবুর জন্ম-সময়ে কোন-কিছু ভাঙ্গিতে পারিলেই কৃতবিদ্য আপনাকে গৌরবান্বিত মনে করিতেন। সমাজ ভাঙ্গিতে হইবে, ধর্ম্ম ভাঙ্গিতে হইবে, প্রথা ভাঙ্গিতে হইবে, চরিত্র ভাঙ্গিতে হইবে, সদাচার ভাঙ্গিতে হইবে। এমন কি, অনাচারে অত্যাচারে স্বাস্থ্যভঙ্গ করিয়া অকালে কালস্রোতে ডুবিতে পারাও যেন সেই সময়ে গৌরবের বিষয় বলিয়া ধারণা হইত।" জন্ মর্লী রুসোর জীবন-কথা লিখিতে যাইয়াও এই কথা বলিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন যে,—ফরাসী-বিপ্লব সমাজ-দেহের সংহার-মূর্ত্তি, যেখানে প্রবেশলাভ করিয়াছে, সেইখানেই ভাঙ্গিয়াছে; অতীতকে মুছিয়া ফেলিয়া সমাজের জন্য যেন এক নূতন বেদী গড়িয়া দিয়াছে। সেই বেদীর উপর সমাজ স্বীয় কুক্ষিগত প্রচ্ছন্ন শক্তির প্রভাবে নিজেকে দেশ-কাল-পাত্রের অনুকূল নূতন করিয়া গড়িয়া লইয়াছে। এই গড়নে প্রত্যেক দেশের প্রত্যেক জাতির Genius বা প্রকৃতি ফুটিয়া উঠিয়াছে। ইহাই জন্ মর্লীর সিদ্ধান্ত।

*অক্ষয়চন্দ্র সরকার-প্রণীত "কবি হেমচন্দ্র" গ্রন্থ।

শাস্ত্রে বিধিনিষেধ-দ্বারা সুরক্ষিত, গোঁড়ামী বা Conservatism-দ্বারা সুমণ্ডিত, স্থিতিশীল, সনাতন হিন্দুসমাজ কেন এমন আল্‌গা হইয়া গিয়াছিল, যাহার জন্য কেবল ইংরেজি শিক্ষার আমদানীতে বাঙ্গালায় এমন ভাঙ্গন ধরিল—সে কথাটা আচার্য্য অক্ষয়চন্দ্র ফুটাইয়া বলেন নাই। তিনি কেবল ফলটুকু ধরিয়া লইয়াছেন; কোন্ কারণ-পরম্পরার জন্য এমন ফললাভ হইল, তাহা বিশ্লেষণ করিয়া দেখেন নাই। গ্রন্থে এই ক্রটী আছে। ক্রটী বলিলাম এই জন্য যে, সে বিশ্লেষণ তিনি ছাড়া বঙ্গীয় সাহিত্যসেবীদের মধ্যে আর কেহ ঠিকভাবে করিতে পারিবেন না। একা তিনিই এই প্লাবন-পঙ্কে পাঁকাল মাছ হইয়া থাকিতে পারিয়াছিলেন; ঋষিকল্প ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের মনীষার শীতল আশ্রয়ে থাকিয়া তিনিই নিঃসঙ্গভাবে এই পরিবর্ত্তন-লীলা দেখিতে পারিয়াছেন। তাঁহার 'সনাতনী' সে দর্শনের সাক্ষ্য দিতেছে। এই 'কবি হেমচন্দ্র' গ্রন্থেও তিনি স্থানে স্থানে আকার-ইঙ্গিতে ধরা দিয়াছেন। অতএব ইংরেজের আমলের গোড়ার ও মধ্য যুগের ইতিহাস-কথা কবি হেমচন্দ্রের বিশ্লেষণ ফুটাইয়া না তোলাতে গ্রন্থকার আমাদিগকে অজ্ঞাতে একটু ফাঁকি দিয়াছেন।

হেমচন্দ্র ইংরেজি আমলের মধ্য-যুগের অবতার-স্বরূপ। সে যুগের দোষ-গুণ, পাপ-পুণ্য, আশা-আকাঙ্ক্ষা—সকলই তাঁহাতে পরিস্ফুট। সে যুগ না বুঝিলে যুগাবতারকে বুঝান যায় না। তাই হেমচন্দ্রের শেষ-জীবনের নিরাশার তত্ত্ব, অন্ধতা-জন্য বিহ্বলতার ভাবনা আচার্য্য অক্ষয়চন্দ্র ভাল করিয়া বুঝাইয়া দেন নাই। মনে হয়, তেমন নির্ম্মম কঠোর ভাবে সকল সত্য কথা প্রকাশ করিয়া তত্ত্ব বুঝাইবার সময় এখনও হয় নাই। যাহা হউক, সরকার মহাশয় তাঁহার এই ক্ষুদ্র পুস্তিকাখানিতে যাহা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা আমাদের পক্ষে পর্য্যাপ্ত বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। কেন-না, মনস্বী লেখক হেমবাবুকে ধরিয়া যে সকল কথার উত্থাপন করিয়াছেন, সে সকল কথার এখন যত অধিক আলোচনা হইবে, ততই সমাজের পক্ষে মঙ্গল। তাহাতে সাহিত্যসেবীদিগের সাহিত্যসেবার পথ প্রশস্ত হইবে; আমরা অনেকে নিজেকে ও সমাজকে চিনিতে পারিব।

সর্ব্বাগ্রে শেষের কথাটির আলোচনা করিব; সেটা জাতিবৈরের কথা। সাহিত্য-সম্রাট্ ৺বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় গত ১২৮০ সালের ১১ই কার্ত্তিকের 'সাধারণী' পত্রিকায় জাতিবৈরের আলোচনা করিয়াছিলেন। বঙ্কিমবাবু বলিয়াছেন—

"সাধারণ বাঙ্গালীর অপেক্ষা সাধারণ ইংরেজ যে শ্রেষ্ঠ, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। যেখানে এরূপ তারতম্য, সেখানে যদি শ্রেষ্ঠ পক্ষ নিস্পৃহ, হিতাকাঙ্ক্ষী এবং শমিত-বল হইয়া থাকিতে পারেন, নিকৃষ্ট পক্ষ তাঁহাদের নিকট বিনীত, আজ্ঞাকারী এবং ভক্তিমান্ হইয়া থাকিতে পারেন, তবেই উভয়ে প্রীতির সম্ভাবনা।....অতএব ইংরেজেরা যদি আমাদিগের প্রতি নিস্পৃহ, হিতাকাঙ্ক্ষী এবং শমিত-বল হইয়া আচরণ করিতে পারেন, আর আমরা যদি তাঁহাদিগের নিকট নম্র, আজ্ঞাকারী ও ভক্তিমান্ হইতে পারি, তবে জাতি-বৈর দূর হইতে পারে। .... আজ্ঞাকারী আমরা বটে, কিন্তু বিনীত নহি, এবং হইতেও পারিব না; কেন-না আমরা প্রাচীন জাতি। অদ্যাপি মহাভারত-রামায়ণ পড়ি, মনু-যাজ্ঞবল্ক্যের ব্যবস্থা-

অনুসারে চলি, স্নান করিয়া জগতের অতুল্য ভাষায় ঈশ্বর-আরাধনা করি। যত দিন এ সকল বিস্মৃত হইতে না পারি, তত দিন বিনীত হইতে পারিব না। মুখে বিনয় করিব, অন্তরে নহে। অতএব এই জাতি-বৈর আমাদিগের প্রকৃত অবস্থার ফল।

"যত দিন দেশী-বিদেশীতে বিজিত-জেতৃ-সম্বন্ধ থাকিবে, তত দিন আমরা নিকৃষ্ট হইলেও পূর্ব্ব গৌরব মনে রাখিব, তত দিন জাতি-বৈর-শমতার সম্ভাবনা নাই; এবং আমরা কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি যে, যত দিন ইংরেজের সমতুল্য না হই, তত দিন যেন আমাদিগের মধ্যে এই জাতি-বৈরিতার প্রভাব এমনই প্রবল থাকে। যত দিন জাতি-বৈর আছে, তত দিন প্রতিযোগিতা আছে। বৈরভাবের জন্যই আমরা ইংরেজদিগের কতক কতক সমতুল্য হইতে যত্ন করিতেছি। ইংরেজের নিকট অপমানগ্রস্ত, উপহসিত হইলে যত দূর আমরা তাঁহাদিগের সমকক্ষ হইবার যত্ন করিব, তাঁহাদিগের কাছে বাপু-বাছা ইত্যাদি আদর পাইলে তত দূর করিব না: কেন-না, সে গায়ের জ্বালা থাকিবে না। বিপক্ষের সঙ্গেই প্রতিযোগিতা ঘটে, স্বপক্ষের সঙ্গে নহে। উন্নত শত্রু উন্নতির উদ্দীপক। উন্নত বন্ধু আলস্যের আশ্রয়। আমাদিগের সৌভাগ্যক্রমেই ইংরেজের সঙ্গে আমাদিগের জাতি-বৈর ঘটিয়াছে।"

এই জাতি-বৈর ভাবটা ইংরেজি-শিক্ষাজাত। আমাদের নবীন বঙ্গসাহিত্যের মেদমজ্জা এই জাতি-বৈর। রঙ্গলাল হইতে রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত সকলেই এই জাতি-বৈরের ছড়াছড়ি করিয়াছেন। সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতা, এই তিনই ফরাসী-বিপ্লব-জাত। সিপাহী-বিদ্রোহের পূর্ব্বকাল পর্য্যন্ত এই তিন কথার মোহে মুগ্ধ হইয়া ইংরেজ শাসক-সম্প্রদায়ের বহু জনেই দেশ-শাসন করিবার চেষ্টা করিতেন। এই তিন কথার প্রভাব বুঝিবা সে কালের ইংরেজি-শিক্ষার প্রচলনও এ দেশে হইয়াছিল। গ্রন্থকার সত্যই বলিয়াছেন যে,—জাতি-বৈর আমাদেরও ছিল, কিন্তু তাহা ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের চতুষ্পাঠীর আটচালায় লুকাইয়া ছিল। ইহার তেমন জাঁক ছিল না বটে, পরন্তু প্রগাঢ় গভীরতা ছিল। প্রগাঢ়তা ছিল বলিয়াই চাকুরি-নবীশ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত এখনও টিকি-চটি ছাড়িতে পারে নাই। এই জাতি-বৈরে পেট্রিয়টিজমের গরম-মশলা দিয়া উহাকে রঙ্গলালই প্রথমে জাঁকাইয়া তোলেন। পরে হেমচন্দ্র সে জাঁক কোটী গুণে বাড়াইয়া দেন। এখন উহা ভাষার স্তরে স্তরে বিন্যস্ত। গ্রন্থকার বলিতেছেন—

"কিন্তু ঐ কাছারি-কলেজ পর্য্যন্ত। হাটে, মাঠে, ঘাটে, বাটে এ কথা পৌঁছে নাই। হাটে হাটুরিয়া জানে না, হেমবাবু কে? মাঠে চাষা হেমবাবুর নামগন্ধ শুনে নাই। স্নান-ঘাটের পল্লী-যুবতী বুঝে না যে 'ভারত কেবল ঘুমায়ে রয়!' বাটে লম্বা-লাঠিতে গামছা-বাঁধা কত লোক চলিয়াছে—জানে না, ভারত কাহাকে বলে। দাশরথির প্রসার হেমবাবু পান নাই।"

হেমবাবু কেন, কোনও বাবুই পান নাই। আজ নীলকণ্ঠের গান হাটে, মাঠে, ঘাটে, বাটে সুপ্রচলিত; রবীন্দ্রনাথের বা দ্বিজেন্দ্রলালের গান হাটে, মাঠে, ঘাটে, বাটে কেহ করিতে চাহে না। কেহ বলে, ভিখ্ পাই না; কেহ বলে, গৃহস্থ শুনে না। তাই আমি স্থানান্তরে বলিয়াছিলাম,—স্রোতের শেহলার মতন এই যে ইংরেজি-গন্ধী সাহিত্য-সমাজ-সাগরের উপর ভাসিয়া বেড়াইতেছে—যাহার জন্য আমরা এতটা মাথা-কোটা-কুটি করিতেছি—একটা তুফান উঠিলে, ঢেউয়ের মুখে উহা কোথায়

তলাইয়া যাইবে। আচার্য্য অক্ষয়চন্দ্র ইঙ্গিতে আমাদের এই মতের সমর্থন করিয়াছেন। তিনি বলেন—

"কিন্তু এই যে দৃপ্তি, এই যে উৎসাহ—সমস্তই বানরেব। তবে বানরের দ্বারা সীতা-উদ্ধারের সম্ভাবনা আছে বলিয়াই সীতাহারা হইয়া শ্রীরামের বাঁদরে আদর।"

অর্থাৎ নিছক অনুচিকীর্ষা-জাত যাহা, তাহা কখনই টেক্‌সহি হয় না। যাহা সমাজের নিম্নতর স্তর পর্য্যন্ত প্রবেশ-লাভ করিতে না পারে, তাহা ফুৎকারে উড়িয়া যায়। জল ঘোলাইতে হইলে তলার জল উপরে তুলিতে হয়; কেবল টোপা-পানা নাড়িলে জল ঘোলান হয় না। কথাটা ঠিক; আমরা অবনত-মস্তকে এ সিদ্ধান্ত মাথায় করিয়া লই। কিন্তু আচার্য্য অক্ষয়চন্দ্রকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করিব—যে বানর-কটক সমুদ্র-বন্ধন করিয়াছিল, লঙ্কা দগ্ধ করিয়াছিল, সীতার উদ্ধার করিয়াছিল, তাহারা কি নকল-নবীশ ছিল? বানর হইলেও তাহারা একনিষ্ঠায় দেব-নর-পরাজয়ী। সে বানর, আর এই বানর! হিন্দীতে আছে—'ক্যা কহে রাম অব্ বদীয়া খিচে ডোরী!'

জাতি-বৈরের উপর জাতীয় জীবন। কাজেই এইবার জাতীয় জীবনের কথাটা কহিতে হয়। গ্রন্থকার বলিতেছেন—

"প্রথমত, 'বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনে'—এই কথাটাই আমরা ভাল করিয়া বুঝিতে পারি না। 'ভারতীয় জাতীয় জীবন' কংগ্রেস-কর্ত্তারা বুঝিয়া থাকিবেন, আমরা কিছুই বুঝি না। সেই ভারতীয় জাতীয় জীবনের অংশ যদি বাঙ্গালীর জাতীয় জীবন হয়, তাহা হইলে সে ত আরও দুর্ব্বোধ্য হইয়া উঠিল। তা না বলিয়া, যদি হিন্দু-জীবনের অংশ বলিয়া বাঙ্গালীর জাতীয় জীবন বুঝিতে চেষ্টা করি, তাহাতেও বিশেষ সুবিধা হয় না। কতটুকু অংশ? যতটুকু বাঙ্গালার ভূগোলের মধ্যে? বাঙ্গালার ইতিহাসের মধ্যে? তবে কাশী কি আমাদের জাতীয় জীবনের কিছু নয়? রাম-লক্ষ্মণ? তাঁহারাও কি কিছু নন? সে আবার কিরূপ জাতীয় জীবন হইল? তা ত বুঝিলাম না।

"আসল কথা—'জাতীয়তা,' 'জাতীয় জীবন,' 'দেশহিতৈষিতা' প্রভৃতি বাক্যগুলি একটু বুঝিয়া-সুঝিয়া ব্যবহার করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে,—নতুবা 'কার্য্যহাগে'র মত সকলেই ঐ শব্দগুলি ব্যবহার করিবে, কেহ কিছু বুঝিবার চেষ্টা করিবে না—সেটা কিছু নয়। সব কথার ওরূপ ব্যবহার চলে, তাহাতে কিছু আসে যায় না; কিন্তু জাতীয়তা বলিয়া যদি কিছু জীবন্ত জিনিষ করিতে, রাখিতে বা বুঝিতে চাও, তাহা হইলে, 'কার্য্যহাগে'র মত করিলে চলিবে কেন? আর একটি কথা—দেশ-হিতৈষিতা। সে কিরূপ পদার্থ? দেশহিতৈষিতা কি বলে যে, কাশী-পুরী-শ্রীধাম হইতে মালদা-মুর্শিদাবাদ ভাল? তা ত আমরা বুঝিব না। তবেই হইল, —আমরা হইলাম বর্ণাশ্রমবাদী, অধিকার-ভেদবাদী হিন্দু। কাজেই ঐ কথাগুলি আমাদের জন্য নহে। আমরা ব্যবহার করি তোতাপাখীর মত। সে ব্যবহারে কোন কাজ হয় না।

"আমাদের কথা—কার্য্য হয় ধর্ম্মে। সৎকার্য্য হয় ধর্ম্মমূলে। কিন্তু ইহকালেই ধর্ম্মের শেষ নহে। ধর্ম্ম ইহকাল-পরকাল ব্যাপিয়া অবস্থিত। সেই ধর্ম্ম-রক্ষা করাই সকলের কর্ত্তব্য। আমাদের আর দ্বিতীয় কর্ত্তব্য নাই। তাহাতে জাতীয়তা আসে আসুক, পেট্রিয়টিজ্‌ম্ পড়ে পড়ুক। বাস্তবিক সকলই উহাতে আসে। মনুষ্যত্বের সকল উপাদানই ধর্ম্মে। স্বধর্ম্ম-রক্ষা করিতে পারিলেই মনুষ্যত্বের স্থিতি ও পুষ্টি হয়।

"বহুকাল হইতে চীনামান চীন অর্থাৎ স্বদেশ-রক্ষা করিতেছে। ধর্ম্ম-রক্ষা করিতে পারে নাই; জাতি-রক্ষা করিতে পারে নাই। ধর্ম্মে চীন কখন কনফুসীয়, কখন তান্ত্রিক, কখন বৌদ্ধ, অথচ কৃমি-কীট-'ঞপি'-ভোজী। জাতিতে চীন হূন-তুরস্ক-মোগল-মিশ্র। কিন্তু দেশ—খাস চীন; এলাকা—মহাচীন। এ একরূপ দেশহিতৈষিতা।

"ধর্ম্ম আছে, জাতি আছে, পুরাণ আছে, শাস্ত্র আছে, দেশ নাই—য়ূদীর। ধর্ম্ম আছে বলিয়াই দেশান্তরী হইয়াও য়ূদী জ্ঞানে জ্ঞানবান্, ধনে ধনবান্, দীর্ঘায়ু, স্বচ্ছন্দ, সবল, সুন্দর। য়ূদী পালেস্তীনের ব্যাঙ্ক হইতে সম্রাট্‌দিগকে ঋণদান করে। য়ূদী সঙ্গীত-পটু, ভাস্কর্য্য-নিপুণ, চিত্র-বিশারদ।"

কথাটা খুব মোটা করিয়া বলা হইয়াছে বটে। তবে জাতি-বৈরের বেদীর উপর যখন জাতীয় জীবনের প্রতিষ্ঠা, তখন উহা ইংরেজের Nationalism এর মত আকাশকুসুমবৎ মুখরোচক Nationalism; উহা কাজে নাই, কথায় আছে। তোমার যাহা আছে, আমারও তাহাই আছে—এইটুকু ইংরেজকে বুঝাইবার জন্য এই জাতীয় জীবনের উৎপত্তি। হেমচন্দ্র স্বয়ংই তাহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন—

"এই কৃষ্ণজাতি পূর্ব্বে যবে
মধুমাখা গীত শুনাইল ভবে,
স্তব্ধ বসুন্ধরা শুনি বেদগান,
অসাড় শরীরে পাইল পরাণ;
পৃথিবীর লোক বিস্ময়ে পূরিয়া
উৎসাহ-হিল্লোলে সে ধ্বনি শুনিয়া
দেবতা ভাবিয়া স্তম্ভিত রহে।"

লেথ্‌ব্রিজ যে বাঙ্গালীকে গারোদিগের সামিল করিয়াছিল, উহা তাহারই উত্তর। সে উত্তর এখন Shibboleth বা পরিচয়ের শ্লাঘায় দাঁড়াইয়াছে। ঐ পর্য্যন্ত। তবে আচার্য্য অক্ষয়চন্দ্র একটা বড় কথা বলিয়া ফেলিয়াছেন—

"তুমি ম্যাপ দেখাইয়া বল,—'ঐ দেখ, ইংরেজি কতদূর বিস্তৃত'; আমি ইতিহাস খুলিয়া দেখাইয়া দিই—বলি,—'ঐ দেখ বৈদিকী সংস্কৃত ভাষা কতদূর হইতে প্রবাহিত হইতেছে।' তোমার দেশে বিস্তৃতি, আমার কালে বিস্তৃতি।"

—কথাই ত এই। আমি হিন্দু, আমি চাহি স্থিতি; এক জন্ম আমার কাছে পরিমাণ-যোগ্য কালই নহে। আমি স্থিতি চাহি বলিয়াই আমি পরকালে বিশ্বাসী; আমি স্থিতি চাহি বলিয়াই আমার জীবন-মরণ নববস্ত্র-গ্রহণ ও জীর্ণ-বস্ত্র-পরিত্যাগের তুল্য সামান্য ব্যাপার। আমি স্থিতি চাহি বলিয়াই দেহের জন্য আমি কখনই চিন্তিত নহি, আমার দেহ আমার কর্ম্মের যন্ত্র-স্বরূপ। আর তুমি ইউরোপ, তোমার দৃষ্টি গতির দিকে, উন্নতির প্রতি। সে উন্নতি দেহের পূর্ণ অপেক্ষা করে; তাই তুমি দেহ লইয়া কেবল বিব্রত, তোমার জ্ঞান, বিজ্ঞান, পদার্থবিদ্যা—সকলেরই বিনিয়োগ ভোগায়তন দেহের তুষ্টি-পুষ্টির প্রতি। দেহাত্মবুদ্ধ তুমি, তোমার ব্যাপ্তি, দেশের বিস্তৃতি ধরিয়া; কর্ম্মাত্মবুদ্ধ হিন্দু আমি, আমার ব্যাপ্তি কাল লইয়া। আমি যুগে

যুগে আছি, যুগে যুগে থাকিব ; তোমার দেহ ভাঙ্গিলে, জলবুদ্‌বুদ তুমি অজ্ঞেয় সাগরে ডুবিয়া যাইবে।

এইবার হেমচন্দ্রের কবিতার কথা বলিব। গ্রন্থকার আচার্য্য অক্ষয়চন্দ্র প্রায় সাতাইশ বর্ষ পূর্ব্বে ‘নবজীবনে’ লিখিয়াছিলেন—

“বলিতে একটু দুঃখ হয়, একটু সঙ্কোচও হয়,—কিন্তু কথাটা ঠিক যে, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত বাঙ্গালার শেষ কবি। মধুসূদন বাঙ্গালার মিল্টন, হেমচন্দ্র পিণ্ডার, নবীনচন্দ্র বায়রণ, রবীন্দ্রনাথ শেলি,—বেশ কথা ; কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত বাঙ্গালার কি ? ঈশ্বর গুপ্ত—বাঙ্গালার ঈশ্বর গুপ্ত। ঐ কথায় ঈশ্বর গুপ্তের নিন্দা, ঐ কথায় ঈশ্বর গুপ্তের প্রশংসা। তাঁহার কবিত্ব বাঙ্গালীর নিজস্ব। সেটুকু দরিদ্রের ক্ষুদ্র মুদ্রা হইলেও তাহার নিজস্ব। আর নিজস্ব বলিয়াই বড় আদরের সামগ্রী।

“তবে কি হেমবাবুর কবিতা আমাদের নিজস্ব নহে ? আমাদের আদরের সামগ্রী নহে ? নিজস্বও বটে, বিশেষ আদরের সামগ্রীও বটে,—কিন্তু একটু কথা আছে।

“তোমার সহধর্ম্মিণী বিরলে বসিয়া একান্ত মনে মখ্‌মলের উপর ফুল তুলিয়া একটি সুন্দর টুপি তোমার জন্য তৈয়ার করিলেন। তোমাকে দিলেন; তুমি হাসিতে হাসিতে মাথায় দিলে, হাসিতে হাসিতে বাহিরে আসিয়া দশ জন বন্ধুবান্ধবকে দেখাইলে। সেই টুপিটি তোমার প্রিয়া-স্ব, তোমার নিজস্ব, তোমার কত আদরের সামগ্রী! কিন্তু উলগুলি সমস্তই বিলাতি উল ; ফুলগুলি বিলাতি ফুল ; চিত্রের বিলাতি লতাটি বিলাতি প্যাঁচে জড়াইয়া আছে। সেই নিজস্বের ভিতর হইতে একরূপ পরস্ব পরতে পরতে উঁকি মারিতেছে। তাহার পর, সেই দশ জন বন্ধুবান্ধবকে লইয়া যখন ভোজনে বসিলে, তখন তোমার গৃহিণী নিজে রাঁধিয়া-বাড়িয়া স্বহস্তে পলান্ন পরিবেষণ করিতে লাগিলেন। দেখিলে নয়ন জুড়ায়, গন্ধে গৃহ ভুরভুর করিতেছে ; তাহাতেও পেস্তা, কিশ্‌মিশ্‌ প্রভৃতি বিদেশী দ্রব্যের আবির্ভাব আছে, কিন্তু সে কেবল মশ্‌লা বৈ ত নয়। আতপ তণ্ডুল, গব্য ঘৃত, সদ্য মাংস—অপূর্ব্ব মিশ্রণে মিশ্রিত করিয়া গৃহিণী অন্নপূর্ণার নাম লইয়া রাঁধিয়াছেন। আর পাকা সোনার বালা দু’গাছি ননীর হাঁতে বসাইয়া সেই যে অর্দ্ধ-অবগুণ্ঠনে, ধীরে ধীরে পরিবেষণ করিতেছেন, এ সকলি—পদার্থ, প্রকরণ, ভাবভঙ্গি,—আমাদের নিজস্ব। পরস্ব কিছু থাকিলেও নিজস্বের অথাধে তাহা ডুবিয়া গিয়াছে, নিজস্বের বৃহত্ত্বে তাহা বিলীন হইয়াছে। ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা তেমন ভুর্‌ভুরে পলান্ন না হইলেও চন্‌চনে মাছের ঝোল ত বটে! তাঁহার কবিতা আমাদের নিজস্বের নিজস্ব, আমাদের আদরের সামগ্রী, আমরা বড় ভালবাসি।

“গৃহিণীর সূত ঐ টুপি ফেলিয়া দিয়া, গৃহিণীর প্রস্তুত ঐ পলান্ন বা মৎস্যসূপ খাইয়া দিন যাপন করিতে বলি না। তবে মাছের ঝোলের স্থানে কাট্‌লেট্‌কে আদর করিতে দেখিলে, সত্য সত্যই দুঃখ হয়। দিন দিন কিন্তু তাহাই হইতে চলিল। বাঙ্গালীর খাঁটি বাঙ্গালা পদ্য এখন আনাচে-কানাচে আশ্রয় লইয়াছে। ইংরাজী-গন্ধী, ইংরাজী-ছন্দী,—তাহার উল ইংরাজী, তাহার ফুল ইংরাজী,—একরূপ পরস্ব পদ্য কেবল আসর জাঁকাইয়া পসার করিতেছে।—দুঃখ হয় না ? তোমাদের হয় ত হয় না ; আমাদের কিন্তু হয়।”

—এ কথা ত স্বীকার করিতেই হইবে। ইংরেজি-নবীশ হেমচন্দ্র ইংরেজি ভাবে মুগ্ধ। কেবল তাহাই নহে ; ইংরেজের সাহিত্যে যাহা আছে, পাছে বাঙ্গালীর সাহিত্যে তাহা খুঁজিয়া না পাওয়া যায়, এই ভয়ে তিনি অভাব-পূরণে সদা ব্যস্ত ছিলেন। মাইকেলকে মিল্টনের আসনে বসাইয়া মাইকেলের পরিচয় তিনিই বাঙ্গালীকে দিয়াছিলেন। বাঙ্গালায় স্বদেশ-ভক্তির গান ছিল না, তিনিই তাহার অভাব-পূরণ করিলেন। এই অভাব-পূর্ত্তির চেষ্টায় তাঁহাকে বিদেশ হইতে অনেক সামগ্রীর

আমদানী করিতে হইয়াছিল। কিন্তু হেমচন্দ্র সে সকলকে বাঙ্গালীর আকারে পরিণত করিয়া, হেম-স্ব করিয়া আমদানী করিতে পারিয়াছিলেন। তাই তাঁহার কবিতায় ইংরেজিয়ানার খট্‌মটে ভাব কাণে ঠেকে না। সত্যই এ পক্ষে হেমচন্দ্র ভারতচন্দ্র অপেক্ষা শক্তিধর। হেমচন্দ্রের শক্তি আমাদিগকে মন্ত্রমুগ্ধ করে। তাঁহার শক্তি-মন্ত্রবলে আমরা অনেক পরস্বকে নিজের করিয়া লইয়াছি। হেমচন্দ্র সত্য সত্যই সরস্বতীর বরপুত্র। ভাবের কোটাল যখন তাঁহার চিত্তক্ষেত্রে ডাকিয়া উঠিত, তখন তিনি যেন কতকটা বিহ্বল হইয়া পড়িতেন; যেন তাঁহার মনে হইত, এ ভাষা পর্য্যাপ্ত হইতেছে না—যেন সকল কথা খুলিয়া বলা হইল না। ভাবের মুখে তিনি জ্ঞানহারা—আত্মহারা হইয়া পড়িতেন। তখনই পরাধীনতার জ্বালা শত বৃশ্চিক-দংশনের জ্বালার মতন তাঁহার পক্ষে অসহ্য হইত; তখনই রাজকীয় বিধিনিষেধের বন্ধন তাঁহার অস্থিরাশিকে যেন চূর্ণ করিয়া ফেলিত। তাই তাঁহার কবিতার স্তরে স্তরে কাতরতার অশ্রু যেন মাখান—ছড়ান রহিয়াছে। ব্রাহ্মণসন্তান হইয়া, উচ্চকুলোদ্ভব বন্দ্যঘটী হইয়াও তিনি জীবনের কোনও ব্যাপারে বন্ধন সহ্য করিতে পারিতেন না। জাতির বন্ধন, সমাজের বন্ধন, সম্বন্ধের বন্ধন, ধর্ম্মের বন্ধন, রাজার বন্ধন—কোনও বন্ধনই তিনি কখনই সহিতে পারেন নাই। শৈশবে আদর পাইয়াছেন, যৌবনে ভাগ্যদেবতার কৃপায় যাহা করিয়াছেন, তাহাই সাজিয়াছে, মানাইয়াছে; তাই তাঁহার ভাবের উচ্ছৃঙ্খলতা অনন্যসাধারণ ছিল। বড় অভিমানী, বড় আদুরে তিনি, বার্দ্ধক্যে অন্ধ হইলে এই বন্ধনের ভয় তাঁহাকে বিহ্বল করিয়া তুলিয়াছিল। সে কথা তিনি স্পষ্ট করিয়া আমার কাছে অনেকবার বলিয়াছিলেন। তাঁহার 'অতৃপ্তি'-শীর্ষক কবিতায় এ কথাটা খুলিয়াই বলিয়াছেন—

"বিধাতা হে, নাহি জানি, প্রাণে কেন হেন গ্লানি,
মাঝে মাঝে বিরক্তি-উদয়।
থাকিতে এ ভবনিধি, পরাণে কেন এ ব্যাধি,
বল বিধি, বল হে আমায়।
আজ নয়, নহে কাল, এই ভাব চিরকাল,
কেন মন হেন তিক্ত হয়।
কিছুই না ধরে মনে, অসাধ সদাই প্রাণে,
কিছুতেই সাধ নাহি রয়।"

এই নৈরাশ্য-জন্য তাঁহার কবিতায় Pessimism ভরা আছে। সাধ মিটে না—মনের মতন করিয়া মনের কথা বলা হয় না—তাই 'অশোক-তরু'কে লক্ষ্য করিয়া তিনি বলিয়াছেন—

তরুরে, আমার মন তাপদগ্ধ অনুক্ষণ,
কেহ নাই শোকানলে ঢালে বারিধারা;
আমি, তরু, জগতের স্নেহ-সুখ হারা

জায়া, বন্ধু, পরিবার, সকলি আছে আমার,
তবু এ সংসার যেন বিষতুল্য কারা ;—
মনে ভাল, কেহ মোরে বাসে না তাহারা।
এ দোষ কাহারো নয়, আমিই কলঙ্কময়,
আমারি অন্তর হায়, কলঙ্কেতে ভরা,—
আমি, তরু, বড় পাপী, তাই ঠেলে তারা !"

ইহাই কবির আত্ম-পরিচয়। এ পরিচয়টা পারিবারিক ঘটনার উল্লেখ করিয়া ফুটাইয়া তুলিব না। তাহার সহিত বাঙ্গালার সাহিত্যসেবীদিগের সংস্রব বড় কম। তবে বুঝিয়া রাখা ভাল যে, যে উচ্ছৃঙ্খলতা হইতে 'হতাশের আক্ষেপ,' সেই উচ্ছৃঙ্খলতা হইতে 'অতৃপ্তি'র সূচনা। পাছে সেই অতৃপ্তিজাত কাতরতার প্রভাবে বাঙ্গালী বিগড়ায়, তাই তিনি 'মন্ত্র-সাধন' লিখিয়াছেন, আশার কথায় সুধীবর্গকে উদ্দীপ্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। হিন্দুত্বের ও ব্রাহ্মণ্যের মাপকাঠিতে হেমচন্দ্রকে মাপিলে চলিবে না : তাঁহার সময়ে বঙ্গীয় ইংরেজি-শিক্ষিত সমাজে ঐ দুইটার একটাও ছিল না। ঋষিতুল্য ভূদেব মুখোপাধ্যায় পরে ইংরেজির আবরণে আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যে ঐ দুইটার আমদানী করিয়াছেন। সে আমদানীর প্রতি হেমচন্দ্র তেমন দৃষ্টিপাত করেন নাই। 'প্রচার' ও 'নবজীবন' যখন এই হিন্দুয়ানীর ঢেউ তুলিয়াছিল, যখন বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গালীকে পুরুষোত্তমের ঘাটে যাইয়া সাগরের ঢেউ লইতে উপদেশ করিতে-ছিলেন, তখন হেমচন্দ্র অসাড় হইয়া আসিতেছিলেন। তবে অন্ধ হইয়া বিধাতার কশাঘাত খাইয়া, সে ভাবের একটুকু অংশ তাঁহার মনে জাগিয়াছিল। তখন 'নির্ব্বাণ-দীপে কিমু তৈলদানম্।'

হেমচন্দ্র ও মাইকেলের তুলনায় সমালোচনার কাল যে আইসে নাই, এমন কথা আমি বলি না। আসিলেও সে কাজ এখন করে কে ? তেমন কাজের কাজী থাকিলেও তেমন মাপকাঠী ঠিক করিয়া দিবে কে ? যে কালে মধুসূদনের উদয়, সেই কালের পরিণতি-সময়ে হেমচন্দ্রের অভ্যুদয়। মধুসূদন যে ভাবে পরস্বকে নিজস্ব করিতে পারিয়াছিলেন, মধুসূদন যে দেশী মশলায় পরস্বকে ছানিয়া নিজস্ব করিতে পারিয়াছিলেন, সে মশলার ব্যবহার হেমচন্দ্র জানিতেন কি ? মধুসূদন গুরু, হেমচন্দ্র শিষ্য ; মধুসূদন ওস্তাদ, হেমচন্দ্র সাক্‌রেদ। কিন্তু হেমচন্দ্র এক গুরুর শিষ্য নহেন—তিনি ভারত-চন্দ্রকেও গুরু করিয়াছিলেন। তিনি পূর্ব্বগামী কবিগণের ছন্দের ও ভাষার অনুশীলন করিয়াছিলেন। তাই হেমচন্দ্র পূর্বাদস্তর মধুসূদনের অনুবর্ত্তী হইতে পারেন নাই। তাই 'বৃত্রসংহার' ভাষায় ও ছন্দে কতকটা জগা-খিচুড়ী হইয়া গিয়াছে। তাই 'বৃত্রসংহার' মহাকাব্য হইলেও, জাতি-বৈরের ব্যাখ্যাপুস্তক হইলেও, ভাষার বাঁধুনীর হিসাবে, ভাষার জমাটহিসাবে মেঘনাদের নিম্নস্তরে অবস্থিত। মেঘনাদে মিল্টনের গন্ধ পাইলেও সে গন্ধ দুর্গন্ধ বলিয়া মনে হয় না। কবির শব্দসম্পদে ও ভাবৈশ্বর্য্যে সে গন্ধ তীব্র ও মনোম্মো[illegible]য়া বোধ হয়। 'বৃত্রসংহার'এ তেমনই দান্তের ইনফার্নোর

গন্ধ পাওয়া যায় ; সঙ্গে সঙ্গে দেখিতে পাওয়া যায়, কবি যেন সে গন্ধ ঢাকিবার প্রয়াস পাইয়াছেন ; পদে পদে যেন সেই ব্যর্থ চেষ্টায় গলদ্‌ঘর্ম্ম হইয়াছেন। এইখানে ওস্তাদে ও সাক্‌রেদে পার্থক্য ; এইটুকুতে কে ছোট, কে বড়, তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়। হেমচন্দ্র জাতি-বৈরের অপরাজেয় ও অদ্বিতীয় কবি—ইহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। যেখানে জাতি-বৈরের কথা, সেইখানেই হেমচন্দ্র গুরুর উপর টেক্কা দিয়াছেন, সেইখানেই তিনি মধুসূদনের উপর চলিয়া গিয়াছেন। জাতি-বৈরের কাব্যের হিসাবে 'বৃত্রসংহার' বাঙ্গালার অদ্বিতীয় কাব্য-গ্রন্থ—ভাবে, রসে ও ঝাঁজে যেন ফাটিয়া পড়িতেছে ; এমন হয় নাই, বুঝি-বা এমন হইবে না। আচার্য্য অক্ষয়চন্দ্র সত্যই বলিয়াছেন যে,—

"সে জাতি-বৈরে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিয়া বীর-কাব্যের অভিনব প্রতিমা হেমচন্দ্র বঙ্গে অধিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন—বৃত্রসংহার।"

'দশমহাবিদ্যা'র কথা লইয়া আমরা আচার্য্য অক্ষয়চন্দ্রের সহিত বিতণ্ডায় মাতিব না। বস্তুতঃ, হেমচন্দ্র 'দশমহাবিদ্যা'র ভূমিকায় স্পষ্টই বলিয়া রাখিয়াছেন যে, আমি শাস্ত্রিকতা, অথবা চলিত মতের প্রশুদ্ধতার মীমাংসায় প্রবৃত্ত হই নাই। দশমহাবিদ্যার রূপ-বর্ণনায় সকল তন্ত্রও একমত নহেন। নানা তন্ত্রে নানা ভাবে দশমহাবিদ্যার চিত্র-সকল অঙ্কিত হইয়াছে। সুতরাং সে পক্ষ ধরিয়াও হেমচন্দ্রকে দোষ দেওয়া চলে না। কাব্যের হিসাবে 'দশমহাবিদ্যা' বাঙ্গালা ভাষায় অপূর্ব্ব সামগ্রী—বড় মধুর, বড় সুন্দর, বড়ই প্রগাঢ়। ঠিক ডারবিন্‌-তত্ত্বের মাপকাঠীতে উহাকে মাপিলে চলিবে না, ইভোলিউশন থিওরী ধরিয়া ষোল-আনা বুঝিবার চেষ্টা করিলে স্থানে স্থানে বাধা পাইতে হইবে সত্য ; কারণ, উহা কেবল ডারবিন্‌-তত্ত্ব নহে ; কেবল তন্ত্র নহে। লেসিঙ্গের লেওকুন যেমন ভাবোন্মেষ, তেমনই একটা ভাবের ধারা ধরিয়া উহাতে স্ত্রীত্বের—মাতৃত্বের—উন্মেষ-স্তর-বিন্যাস দেখান হইয়াছে। সে তত্ত্বের ব্যাখ্যার এখনও সময় আইসে নাই, সে তত্ত্ব বুঝিবার আগ্রহ ও এখনও বাঙ্গালার কাব্যামোদিগণের মধ্যে দৃষ্টিগোচর হয় না। কাজেই সে কথা লইয়া আলোচনার বা বিতণ্ডার প্রয়োজন নাই।

[সাহিত্য, ১৩১৯]

মহাকবি মধুসূদন

সুরেশচন্দ্র সমাজপতি

১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের ২০শে জুন রবিবার বেলা দুইটার সময়ে আলিপুরের দাতব্য-চিকিৎসালয়ে মধুসূদন ইহলীলা সংবরণ করেন। তাঁহার মৃত্যুকালে 'সমাজ-দর্পণ' নামক সংবাদপত্রের সম্পাদক লিখিয়াছিলেন,—'দুঃখের বিষয় এই, আমরা মাইকেলের অশৌচ গ্রহণ করিতে পারিলাম না। কারণ, ওরূপ করিলে তৎক্ষণাৎ জাত্যন্তর ও সমাজচ্যুত হইতে হইবে। .... হা মাইকেল, তোমার অন্ত্যেষ্টির সময়ে তোমার নিকটে গিয়া তোমার আত্মীয়গণ রোদন করিতে পারিল না! তুমি পরের মত বিদেশী ম্লেচ্ছগণের হস্তে মস্তক প্রদান করিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছ! তুমি কবরে যাইবার সময়ে বিজাতীয়েরা তোমার সঙ্গে সঙ্গে গমন করিয়াছিল, আমরা সজলনয়নে দূর হইতেই কিয়ৎকাল নিরীক্ষণ করিয়াছিলাম, নিকটে যাইবার ইচ্ছা করিলেও যাইতে পারিলাম না! হিন্দু ধর্ম্মের পারে গমন করিয়া তুমি যেন সমুদ্র-পারবর্ত্তী জনের ন্যায় বহুদূরবর্ত্তী হইয়া পড়িলে!'

'সমাজ-দর্পণে'র এই খেদে তখনকার বাঙ্গালার ছবি প্রতিফলিত হইয়াছে। মাইকেলের প্রতি বাঙ্গালীর মনের ভাবও প্রতিবিম্বিত হইয়াছে। আত্মরক্ষাকল্পে আত্মস্থ, অতিসাবধান, স্বধর্ম্মনিষ্ঠ, পরধর্ম্মভীরু সেকালের বাঙ্গালী মধুসূদনকে জাতির মহাকবি বলিয়া বরণ করিয়াছিলেন, মধুসূদনের প্রতিভার পূজা করিয়াছিলেন। কিন্তু তখনও 'স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ' ও 'পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ' হিন্দুর সমাজস্থিতির এই দুই পরস্পর-সাপেক্ষ মূলমন্ত্র, কাল-প্রবাহে প্রতিহত হইয়াও, সমাজে সমুজ্জ্বল ছিল। তাই মাইকেলের প্রতিভায় মুগ্ধ হিন্দু, জাতীয় কবিকে 'আপনার হ'তে আপনার' বলিয়া ভাবিয়াও, 'সমুদ্রপারবর্ত্তী জনের ন্যায় বহুদূরবর্ত্তী' বিবেচনা করিয়া দূরে রাখিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। সমাজ-শাসন-নিয়ন্ত্রিত হিন্দুর শ্রদ্ধা তখন বাহিরে বিকশিত হয় নাই;—কিন্তু হিন্দু খৃষ্টান মধুসূদনের জন্য কাঁদিয়াছিল—তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যোগ দিবার অধিকারে বঞ্চিত হইয়া কাঁদিয়াছিল।

তাহার পর বহু বর্ষ অতীত-সাগরে মিশিয়াছে। সমাজের সে দুর্গ ভূমিসাৎ হইয়াছে। এখন বাঙ্গালী অকুণ্ঠিতচিত্তে সমাধিক্ষেত্রে অন্যধর্ম্মাবলম্বীর শবের অনুসরণ করে; গির্জায় বিবাহের নিমন্ত্রণ রক্ষা করে। সে-কাল বিধানে শৃঙ্খলিত ছিল, এ-কাল মুক্ত! এ-কালে দাঁড়াইয়া সে-কালের বিচার করিলে অনেক কথা বুঝা যায়।

পরধর্ম্মাশ্রিত, স্ব-সমাজচ্যুত পরসমাজভুক্ত মাইকেল, সর্ব্বপ্রকারে বাঙ্গালীর জাতীয়-জীবন-পরিধির বহির্ভূত হইয়াও, কোন্ গুণে, কোন্ অধিকারে, কিসের প্রভাবে বাঙ্গালীর হৃদয় জয় করিয়াছিলেন, আজ তাহা ভাবিয়া দেখিলে লাভ আছে। ব্যথিত পিতার মত যে হিন্দু সমাজ ভ্রূকুটী কুটিলমুখে উরগক্ষত অঙ্গুলীর ন্যায় স্বধর্ম্মত্যাগী মধুসূদনকে ত্যাগ [illegible]লেন, মাইকেল মধুসূদন কোন্ শক্তিতে অনুপ্রাণিত হইয়া

সেই ক্রুদ্ধ সমাজের রুদ্ধ-দ্বার ভাঙ্গিয়া হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া গরুড়ের মত সমগ্র জাতির প্রেমামৃত হরণ করিয়াছিলেন ?

ইহা ভাবিয়া দেখিবার কথা, বুঝিয়া দেখিবার কথা।

কবি মধুসূদন বাঙ্গালা সাহিত্যে নূতন রত্ন দান করিয়াছিলেন, সেই জন্য তাঁহার নামে বঙ্গদেশ ধন্য হইয়াছে, ধন্য হইতেছে। কিন্তু কাব্য, কবিতা ও কবিত্বই তাহার কারণ নয়। যে গুণে কাব্য, কবিতা ও কবিত্ব অমর হয়, যে ধর্ম্মে কাব্য, কবিতা ও কবিত্ব পবিত্র, সার্থক ও ধন্য হয়, মাইকেল সেই ধর্ম্মের অধিকারী ছিলেন।

সমবেদনা ও সহানুভূতিই কবির জীবন সার্থক করে। মাইকেল সেই সমবেদনা ও সহানুভূতির উৎস ছিলেন।

আজন্ম বিদেশী তন্ত্রে শিক্ষিত, বিজাতীয় ধর্ম্মে দীক্ষিত, বিদেশের ভাষায়, চিন্তায়, ভাবে, সাহিত্যে অনুপ্রাণিত হইয়াও মধুসূদন স্বদেশী তন্ত্র বিস্মৃত হন নাই। স্বদেশের ভাষায়, ভাবে তাঁহার—শুধু অনুরাগ নয়—সহানুভূতি ও সমবেদনা ছিল। সেই সহানুভূতি ও সমবেদনার সঙ্গমে দেশবাৎসল্যের স্বর্গীয় কহ্লার সহস্র দলে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছিল। সেই কহ্লারের সৌন্দর্য্যে, সৌরভে বাঙ্গালার সাহিত্য ও সমাজ মাতিয়া উঠিয়াছিল! মমতা-বুদ্ধির 'চোখের জলের বাঁধন দিয়ে' মাইকেল বাঙ্গালীকে 'মায়াডোরে বাঁধিয়াছিলেন!'

যৌবনে উন্মাগগামী, দেশপ্লাবী নব-ভাবের আকস্মিক দীপ্তিচ্ছটায় অন্ধ মধুসূদন পর-ধর্ম্মের আশ্রয়-ভিক্ষা করিয়াছিলেন।—তাঁহার উত্তর-জীবন দেখিয়া বোধ হয়, গত-জীবনের মোহ শেষ-জীবনে ছিল না। পরধর্ম্মাশ্রিত মাইকেল স্বধর্ম্ম-নন্দনের কল্পতরু পুরাণ হইতে মেঘনাদ, তিলোত্তমা, ব্রজাঙ্গনা চয়ন করিয়াছিলেন; চতুর্দ্দশপদী কবিতায় বাঙ্গালার ভাব, ভাষা ও মহাপুরুষগণের পূজা করিয়াছিলেন; কৃষ্ণকুমারী ও শর্ম্মিষ্ঠায় ইতিহাসের ও পুরাণের ছবি আঁকিয়াছিলেন; বুড়ো শালিক ধরিয়া রঙ্গ করিয়াছিলেন; 'একেই কি বলে সভ্যতা'য় কলঙ্কের কালী দিয়া বানরের বিদ্রূপ-চিত্র টানিয়া 'চিন্তা করিয়া' বলিয়াছিলেন,—'বেহায়ারা আবার বলে কি যে, আমরা সাহেবদের মতন সভ্য হয়েছি। হা আমার পোড়া কপাল! মদ-মাংস খেয়ে ঢলাঢলি কল্লেই কি সভ্য হয়? একেই কি বলে সভ্যতা?'

ইহা আত্ম-বিশ্লেষণের ফল কি না, সাহস করিয়া বলিতে পারি না। কিন্তু ইহা মাইকেলের সরলতা ও অকপটতার পরিচায়ক, সে পক্ষে সন্দেহ নাই।

মাইকেলের 'আত্মবিলাপে' তীব্র অনুশোচনার ও গভীর হতাশার আর্ত্তি ও অভিব্যক্তি দেখিয়া চোখে জল আসে :—

"আশার ছলনে ভুলি কি ফল লভিনু, হায়,
তাই ভাবি মনে।"

পর-ধর্ম্ম-গ্রহণেও কি সে 'আশার ছলন' ছিল না?

মাইকেল বিদেশী সাহিত্যের সৌখীন উদ্যান হইতে স্বদেশী সাহিত্যের মনোজ্ঞ মালঞ্চে ফিরিয়াছিলেন। পর-তন্ত্রে সুপ্ত সিংহ সহসা জাগিয়া স্ব-তন্ত্রের জন্য লালায়িত হইয়াছিলেন। তাই তিনি মাতৃভাষাকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন—

"হে বঙ্গ। ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন,
তা সবে, (অবোধ আমি) অবহেলা করি,
পরধনলোভে মত্ত, করিনু ভ্রমণ
পরদেশে ভিক্ষাবৃত্তি কুক্ষণে আচরি।
কাটাইনু বহু দিন সুখ পরিহরি,—
অনিদ্রায় অনাহারে, সঁপি কায়, মন,
মজিনু বিফল তপে অবরেণ্যে বরি;—
কেলিনু শৈবালে, ভুলি কমল-কানন।
স্বপ্নে তব কুললক্ষ্মী ক'য়ে দিলা পরে,—
'ওরে বাছা! মাতৃকোষে রতনের রাজি,
এ ভিখারী-দশা তবে কেন তোর আজি?
যা ফিরি, অজ্ঞান তুই, যা রে ফিরি ঘরে।'
পালিলাম আজ্ঞা সুখে, পাইলাম কালে
মাতৃ-ভাষা-রূপে খনি, পূর্ণ মণিজালে।"

এমন স্বপ্ন ক' জনের ভাগ্যে ঘটে? এমন ভাবে পরদেশ-মুগ্ধ ভিক্ষুক-জীবন পদদলিত করিয়া স্বদেশে ফিরিয়া মাতৃভাষারূপ মণিজালে পূর্ণ খনির অক্ষয় ভাণ্ডারে নূতন হীরা, মাণিক, মতি ঢালিয়া দিবার সৌভাগ্য কয় জন লাভ করে?

আবার ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সের ভারসেলস্ নগরে প্রবাসী মাইকেল 'চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী'র 'সমাপ্তে' আত্ম-নিবেদন করিয়াছিলেন—

"—নাবিনু, মা, চিনিতে তোমারে
শৈশবে, অবোধ আমি, ডাকিলা যৌবনে;
(যদিও অধম পুত্র—মা কি ভুলে তাবে?)
এবে ইন্দ্রপ্রস্থ ছাড়ি যাই দূর বনে!"

ইহাও কি মহাকবির আত্মবিস্মৃতির পর উদ্বোধনের পরিচায়ক নহে? মোহের ফল বিস্মৃতি :—তাহার পর স্বপ্ন ও জাগরণ। মাইকেলের চিত্ত-নির্ঝরের 'স্বপ্নভঙ্গ' কি সুন্দর!

প্রতিভার বরপুত্র মধুসূদন স্বদেশের বৈভবে অবহেলা করিয়া, পরধনলোভে মত্ত হইয়া, পরদেশে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়া, 'অবরণ্যে বরিয়া' বহুদিন 'বিফল তপে' মজিয়া ছিলেন; নিরাশ হইয়াছিলেন। কিন্তু অনিদ্রায়, অনাহারে, 'সুখ পরিহরি' রত্নের অন্বেষণ করিলে, বরেণ্যের ধ্যান করিলে, সাধকের 'তপ' নিষ্ফল হয় না। বাঙ্গালার কুল-লক্ষ্মী মাইকেলের সাধনায় প্রসন্ন হইয়া স্বপ্নে তাঁহাকে পর-তন্ত্র ছাড়িয়া স্ব-তন্ত্র আশ্রয় করিবার ইঙ্গিত করিয়াছিলেন। মাইকেল সংক্ষিপ্ত

জীবনে কুল-লক্ষ্মীর ইঙ্গিত যথাসম্ভব পালন করিয়া গিয়াছেন। আজ —পর-তন্ত্র, পর-ভাব-মত্ত, আত্মবিস্মৃত, মাতৃভূমির বৈভবে বঞ্চিত, স্ব-তন্ত্রের ঐশ্বর্য্যে অন্ধ বাঙ্গালী! আত্ম-অন্বেষণ জীবনের সার কর। 'অবরণ্যে বরি' মানব-জীবন সাথক—সফল—চরিতার্থ হয় না। প্রতিভাশালী পুরুষসিংহ মাইকেল পর-পথের পথিক হইয়া অনুশোচনায় মথিত হইয়াছিলেন। সেই মহাকবির অভিজ্ঞতার মহাফল আজ তোমার। স্মরণ কর আত্মগৌরব, বর্জন কর 'পরদেশে' ভিক্ষাবৃত্তি, বরণ কর আত্ম-শক্তি। 'নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়'।

স্বদেশী তন্ত্রে শ্রদ্ধাই দেশভক্তি। দেশভক্তি সোনার পাথর-বাটী নয়। মাইকেলের বঙ্গভূমির প্রতি সম্ভাষণ দেশ-তন্ত্রের প্রথম গান—দেশভক্তির প্রথম উচ্ছ্বাস—স্বদেশী কবির প্রথম ঝঙ্কার। মাইকেলের বঙ্গ-স্তোত্র সৌন্দর্য্য-পুষ্পের গুচ্ছ নয়। সে গান—মিনতি—প্রার্থনা—মা'র কাছে আদুরে ছেলের আব্দার। তাহাতে বাঁচিবার সাধ আছে, কামনা আছে। বাঙ্গালী, জাতীয় কবির 'কামনা' পাঠ কর :—

" সাধিতে মনের সাধ,
ঘটে যদি পরমাদ,
মধুহীন করো না গো তব মনঃ-কোকনদে।
প্রবাসে দৈবের বশে
জীবতারা যদি খসে
এ দেহ-আকাশ হ'তে, নাহি খেদ তাহে।
জন্মিলে মরিতে হবে,
অমর কে কোথা কবে ?
চির-স্থির কবে নীর হায় রে জীবন-নদে ?
কিন্তু যদি রাখ মনে,
নাহি মা ডরি শমনে—
মক্ষিকাও গলে না গো পড়িলে অমৃত-হ্রদে !
সেই ধন্য নরকুলে,
লোকে যারে নাহি ভুলে,
মনের মন্দিরে নিত্য সেবে সর্ব্ব জন।
কিন্তু কোন্ গুণ আছে,
যাচিব যে তব কাছে
হেন অমরতা আমি, কহ গো শ্যামা জন্মদে !
তবে যদি দয়া কর,
ভুল দোষ, গুণ ধর,
অমর করিয়া বর দেহ দাসে, সুবরদে !
ফুটি যেন স্মৃতি-জলে
মানসে, মা, যথা ফলে,
মধুময় তামরস, কি বসন্তে, কি শরদে !"

মাইকেল 'নূতন মালা গাঁথিয়া,' গৌড়জন-সুখাবহ 'মধুচক্র রচিয়া' বহুদিন নশ্বর সংসার ত্যাগ করিয়াছেন। আজ বিরোধ, বিদ্বেষ ও ঐহিক সুখ-দুঃখের অতীত মহাকবি মধুসূদনের স্মৃতি সপ্রমাণ করিতেছে,—'কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি।' মধুসূদন বাঙ্গালীর মানসে, স্মৃতি-জলে, কি বসন্তে কি শরদে, মধুময় তামরসের মত দিব্য-শ্রীমণ্ডিত হইয়া ফুটিয়া আছেন। নিন্দুকের—পরকীর্ত্তিদ্বেষী প্রগল্‌ভের—সাম্প্রদায়িক নিন্দার ঝড়ে সে তামরস ঝরে নাই, ঝরিবে না।

যে মধুসূদন 'স্বর্গ, মর্ত্ত, পাতাল—ত্রিভুবনের রমণীয় এবং ভয়াবহ প্রাণী ও পদার্থ সমূহ সম্মিলিত করিয়া পাঠকের দর্শনেন্দ্রিয় লক্ষ্য চিত্রফলকের ন্যায় চিত্রিত' করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার কাব্য ও কবিত্বের বিশ্লেষণ ক্ষুদ্র পরিসরে সম্ভব নয়। তাই আজ তাঁহার কাব্য ও কবিত্বের মূলমন্ত্র স্মরণ করিতেছি। মধুসূদন দেশবৎসল। 'সীন' তাঁহার স্মৃতি-পট হইতে কপোতাক্ষের ছবি মুছিয়া ফেলিতে পারে নাই:—

• ••

'জুড়াই এ কাল আমি ভ্রান্তির ছলনে!
বহু দেশে দেখিয়াছি বহু নদ-জলে,
কিন্তু এ স্নেহের তৃষা মিটে কার জলে?
দুগ্ধ-স্রোতরূপী তুমি জন্মভূমি-স্তনে।'

—দেশমাতার প্রতি প্রেম-ভক্তির এমন সুন্দর ছবি, দেশাত্মবোধের এমন মমতাপূত অভিব্যক্তি বাঙ্গালা সাহিত্যে আর আছে কি?

মাইকেল সহানুভূতি ও সমবেদনার উৎস, এবং তাহাই মাইকেলের বিশেষত্ব, পূর্ব্বে তাহা বলিয়াছি। মাইকেল উদার, অকুতোভয়, সমবেদনায় নির্বিচার। বীর কবি বীরের ভক্ত। ব্যথিতের বেদনায় কবির প্রাণ কাঁদে। স্বর্গে, মর্ত্তে, পাতালে মধুসূদনের মমতার অমৃতনদী বহিয়া যায়।

আদি-কবি বাল্মীকি হইতে লস্কর পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের সকল কবিই অযোধ্যার রাজ-বংশের সহিত সমবেদনা ও সহানুভূতির সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। সোনার লঙ্কা ছারখার হইল, রাবণের বংশ গেল; এ জন্য ভারতের কোনও কবির চিত্ত বেদনায় চঞ্চল হয় নাই,—কেহ এক বিন্দু অশ্রুজলে সে শোচনীয় নিয়তির বিধানকে স্নিগ্ধ করিবার চেষ্টা করেন নাই। কিন্তু মাইকেল রাবণ-পরিবারেও সমবেদনা ও সহানুভূতির অমৃতধারা ঢালিয়া দিয়াছেন। ইন্দ্রজিতের বীরত্বে মুগ্ধ না হয়, এমন বাঙ্গালী কে আছে? প্রমীলার দুঃখে বিগলিত না হয়, এমন পাষাণ কে আছে? যুগযুগান্তর-সঞ্চিত বিরাগের হিমাচলকে যিনি সমবেদনার অশ্রুজলে ভাসাইয়া দিতে পারেন, তাঁহার শক্তির গভীরতার পরিমাণ কে করিবে?

মাইকেল শুধু বীররসের কবি নন, তিনি করুণরসেও সিদ্ধহস্ত। মাইকেলের সমবেদনা, সহানুভূতি ও করুণায় বাঙ্গালার মরুক্ষেত্র স্নিগ্ধ হউক!

মাইকেলের দুইটি উপদেশ যেন বাঙ্গালীর মনে যুগযুগান্তর দেদীপ্যমান থাকে। 'তিলোত্তমা-সম্ভবে' মধুসূদনের নিরাকারা দূতী বলিয়াছেন—

'ভ্রাতৃ-ভেদে ক্ষয় আজি দানব দুর্জ্জয়।'

তুমি সু-জয় মানব বাঙ্গালী! ইহা স্মরণ রাখিও।

মেঘনাদবধের ষষ্ঠ সর্গ বাঙ্গালীর জীবন-বেদ হউক। অরিন্দম, কর্ব্বুরকুলগর্ব্ব, মেঘনাদ রাঘবের দাস বিভীষণকে যে তিরস্কার করিয়াছিলেন, তাহা বাঙ্গালীর মনে আগ্নেয় অক্ষরে লিখিয়া দাও। আর—

'—শাস্ত্রে বলে গুণবান্ যদি
পরজন, গুণহীন স্বজন, তথাপি
নির্গুণ স্বজন শ্রেয়ঃ; পর পর সদা।'

আজ মধুসূদনের স্মরণে বাঙ্গালার গগনে-পবনে এই 'লাখ কথার এক কথা' ছড়াইয়া দাও! প্রত্যেক বাঙ্গালীর—ভারতবাসীর হৃদয়ে এই কয়টি কথা যেন গাঁথা থাকে। তা যদি থাকে, তাহা হইলে এ দেশে মধুসূদনের জন্ম সার্থক। তা যদি না হয়, তাহা হইলে, বাঙ্গালায় মধুসূদনের আবির্ভাব নিস্ফল।

[সাহিত্য, ১৩২৩]

স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

আদিকবি বাল্মীকির রামায়ণের পর কালিদাস আবার সেই রাম-চরিতেরই পুনরায় বর্ণনা করিলেন। রামায়ণ শ্লোকবদ্ধ মহাকাব্য, কালিদাসের রঘুবংশও শ্লোক-বদ্ধ মহাকাব্য। কালিদাসের আবির্ভাবের বহু পূর্ব্ব হইতে রামায়ণ ভারতের সকল সমাজে কীর্ত্তিত, গীত, অধীত ও ভক্তি-পূর্ব্বক শ্রুত হইত। তথাপি কালিদাসের রঘুবংশ ভারতের বিদ্বদ্বৃন্দ সাদরে গ্রহণ করিলেন। ইহার হেতু কি? একান্ত সুপরিচিত ও সর্ব্বদা শ্রুত বৃত্তান্তের পুনঃ পঠন-পাঠনে এই যে আগ্রহ, এত যে আদর, তাহার একমাত্র কারণ কালিদাসের প্রাঞ্জল ভাষা ও ভাবের সুস্পষ্টতা। যদি ভাষা এত সুন্দরী এবং সম্পদ্‌শালিনী না হইত, তাহা হইলে কেবল ভাবের তরঙ্গলীলায় বা কল্পনার ক্রীড়ায় কালিদাসের কাব্য সুধী-সমাজের চিত্তাকর্ষণ করিতে পারিত না।

কল্পনা-বিষয়ে বাল্মীকির সহিত কালিদাসের তুলনা করিতে প্রয়াস পাওয়া বৃথা। তবুও যে, কালিদাস এত প্রসিদ্ধি-লাভ করিয়াছেন, তাহার প্রধান কারণ তাঁহার সুমধুর ভাষা। কালিদাস ব্যতীত আরও অনেকে রামায়ণ উপজীব্য করিয়া কাব্যাদি রচনা করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের গ্রন্থ জন-সমাজে রঘুবংশাদির ন্যায় আদৃত হয় নাই। এই আদর-অনাদরের একমাত্র কারণ, ভাষাগত প্রাঞ্জলতা এবং ভাবের সুস্পষ্টতা। কালিদাস এমন মনোহারিণী ভাষায় তদীয় কাব্য রচনা করিয়াছেন যে, যে কোন সময়ে, যে কোন সমাজের লোকেই তাহা পাঠ করুক না কেন, বিমুগ্ধ হইবে। সংস্কৃত সাহিত্যে এই ভাষাগত উৎকর্ষের জন্য যেমন কালিদাসের শ্রেষ্ঠতা, বঙ্গীয় সাহিত্যেও তেমনই ভাষাগত উৎকর্ষের নিমিত্ত কৃত্তিবাসের শ্রেষ্ঠতা। যে ভাষা সম্প্রদায়-বিশেষের জন্য গঠিত, অর্থাৎ কেবল শিক্ষিত বা কেবল অশিক্ষিতদিগের জন্য যে ভাষা ব্যবহৃত, ধনী-নির্ধন, পণ্ডিত-মূর্খ, ইহার একতরের উদ্দেশ্যে যে ভাষা গ্রথিত, তাহা কদাচ স্থায়ী বা সর্ব্ব-বাদিসম্মত উৎকৃষ্ট ভাষা হইতে পারে না। সেরূপ ভাষায় নিবদ্ধ গ্রন্থাদি কখনও কাল-জয়ী হইতে পারে না। তাহাকে প্রকৃত ভাষা বলা যায় না। তাদৃশী ভাষায় বিরচিত গ্রন্থাদি কালের তরঙ্গে দেখিতে দেখিতে ভাসিয়া যায়; অল্প কালমধ্যেই তাহার অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়।

যে ভাষা কোনও সম্প্রদায়-বিশেষে সীমাবদ্ধ নহে, সকল সম্প্রদায়-নির্ব্বিশেষে, সমাজ-দেহের প্রত্যেক শিরা-ধমনী-কৈশিকায় যে ভাষা প্রবেশ করিতে পারে, প্রত্যেক সম্প্রদায়ের লোকে যে ভাষাকে "আমার" বলিয়া গ্রহণ করিয়া পরিতৃপ্তি লাভ করেন,—শিক্ষিত-অশিক্ষিত, ধনী-নির্ধন, পণ্ডিত-অপণ্ডিত সকলে সমানভাবে যে ভাষাকে আদর করিয়া লয়েন, তাহাই যথার্থ ভাষা। কালিদাস সর্ব্বকালানুযায়িনী, সর্ব্বতো-গামিনী, সর্ব্বতোব্যাপিনী ভাষায় গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন বলিয়াই যেমন তাঁহার কাব্য সকল সম্প্রদায়ে সকল সময়ে, সকলের প্রিয়, মহাকবি কৃত্তিবাসও তদীয় অনবদ্য রামায়ণ-কাব্য সেইরূপ সর্ব্বতোগামিনী ও সর্ব্বতোব্যাপিনী ভাষায় রচনা করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার রামায়ণ এত প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। যে সমুদয় কাব্যের ভাষা প্রাঞ্জল নহে, বা ভাবও সুস্পষ্ট নহে, সেই সকল কাব্যের প্রভাব সমাজে স্থায়িত্ব লাভ করিতে পারে না। ভাষা ও ভাব উভয় সম্পদে সম্পন্ন বলিয়াই কৃত্তিবাসের রামায়ণ কাল-জয়ী হইয়া রহিয়াছে। সংস্কৃতে কালিদাস এবং বঙ্গভাষায় কৃত্তিবাস—এই দুই জন একই কারণে অমরত্ব লাভ করিয়াছেন।

কৃত্তিবাসের পরে আরও অনেক কবিযশঃপ্রার্থী ব্যক্তি রামায়ণ রচনা-পূর্ব্বক বঙ্গসাহিত্যের অঙ্গ পরিপুষ্ট করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের সকলের দ্বারাই যে ভাষার শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইয়াছে, এ কথা নিঃসঙ্কোচে বলা কঠিন।

- কৃত্তিবাস এবং তৎপরবর্ত্তী অনেকে একই রামায়ণ-অবলম্বনে কাব্য রচনা করিলেন, কিন্তু কৃত্তিবাসের কাব্য আবালবৃদ্ধবনিতার প্রিয়, সকল সমাজের আদরণীয় হইল, ইহার প্রকৃত কারণ কি?

কৃত্তিবাস মহর্ষি বাল্মীকির রামায়ণমাত্র অবলম্বন করিয়াই কাব্য লিখেন নাই। আমাদের দেশে কথকতায়, যাত্রায়, গোষ্ঠীবন্ধনে—সর্ব্বত্রই নানা ভাবে ও নানা আকারে রাম-বিষয়ক বৃত্তান্ত বহুকাল হইতে—কৃত্তিবাসের বহু পূর্ব্ব হইতে—চলিয়া আসিতেছিল। ফলতঃ, লোক-মুখে স্ত্রী-পুরুষ-সমাজে রাম-সীতার কথা কীর্ত্তিত হইত, এখনও হইতেছে। কৃত্তিবাস তদীয় গ্রন্থ-রচনায় এই লোকপরম্পরাগত গাথার অনেকটা অনুসরণ করিয়াছিলেন। কেবল অনুবাদে বা মহর্ষি-চিত্রিত আলেখ্যাবলীর পুনশ্চিত্রণেই যদি কৃত্তিবাস রত থাকিতেন, তাহা হইলে তদীয় কাব্য এত প্রসিদ্ধি লাভ করিতে পারিত না। তাঁহার পরবর্ত্তী রামায়ণ-লেখকগণের অনেকের গ্রন্থে কৃত্তিবাসের ন্যায় মৌলিকতা নাই। অধিকাংশ স্থানই অনুবাদমাত্রে পর্য্যবসিত। কোনও রামায়ণকার স্বকীয় কল্পনার চঞ্চল বৈদ্যুতী প্রভায় গ্রন্থ ক্কচিৎ ভাস্বর করিয়াছেন সত্য, কিন্তু পরক্ষণেই আবার কল্পনার দৈন্যে গ্রন্থের শ্রীহানি ঘটিয়াছে। এই স্থলে কবিচন্দ্রের নাম উল্লেখযোগ্য। কবিচন্দ্র তাঁহার রচিত রামায়ণে অঙ্গদ-রায়বার নামে যে অধ্যায় লিখিয়াছিলেন, যাহা আজ কৃত্তিবাসের বলিয়া বঙ্গের অধিকাংশ গৃহে গৃহে আদৃত, সেই অধ্যায়টি বাস্তবিকই অনেকটা কবিত্বপূর্ণ। কিন্তু সেই অনুপাতে কবি-চন্দ্রের গ্রন্থের অপরাংশসমূহ গ্রহণ করা যায় না। সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত অনেকে যেমন দু'একটি মনোহারিণী কবিতা রচনা করিয়া থাকেন, প্রাচীন কালেও করিতেন, —যে কবিতাগুলি "উদ্ভট" আখ্যায় জন-সমাজে প্রচারিত, কিন্তু ঐ উদ্ভট-কর্ত্তাদের কোনও বিশিষ্ট এবং উল্লেখযোগ্য কবিতাগ্রন্থ পাওয়া যায় না, চঞ্চল কল্পনার ক্ষণিক অনুগ্রহে মাত্র দু'চারিটি হৃদয়াকর্ষিণী কবিতাতেই তাঁহাদের কবিত্ব পরিসমাপ্ত—তদ্রূপ অন্যান্য রামায়ণকারগণের অনেকেরই দু'একটি, বা কাহারও দু'চারিটি রসভাবপূর্ণ অধ্যায়-রচনার পরই কবিত্বের পর্য্যবসান ঘটিয়াছে। সমগ্র গ্রন্থে কবিতার উচ্ছলিত তরঙ্গলীলা একমাত্র কৃত্তিবাসেই পরিদৃষ্ট হয়।

কৃত্তিবাস জানিতেন যে, যাঁহাদের জন্য তিনি কাব্য লিখিয়াছেন, তাঁহারা কি চান, কতটুকু বা কতটা তাঁহাদের অভিলষিত, কিরূপ আলেখ্যে তাঁহাদের নয়ন-রঞ্জন হইবে। কবিত্বের সার্থকতার এই মূলমন্ত্রে তিনি দীক্ষিত হইয়া তবে কাব্য লিখিতে বসিয়াছিলেন, সর্ব্বদা এই মন্ত্র স্মরণ করিয়া কাব্য লিখিয়াছেন, তাই তাঁহার কাব্য এত জমিয়াছে। এই জন্যই, কেবল বাল্মীকির আদর্শ তাঁহার উপজীব্য ছিল না, তিনি প্রয়োজন-মত অন্যান্য পুরাণ, উপপুরাণ প্রভৃতিরও সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন। কালিকাপুরাণ, অধ্যাত্মরামায়ণ, অদ্ভুতরামায়ণ প্রভৃতি হইতেও তিনি আদর্শ সঙ্কলন করিয়াছেন।

অনেক কাব্য কবির সমসাময়িক সমাজের রুচি এবং ছায়ার অনুসরণে নির্ম্মিত হওয়ায়, সেই নিয়মিত সমাজে এবং নির্দ্দিষ্ট সময়ে সেই কাব্য আদৃত হইয়া থাকে, কিন্তু পরবর্ত্তী ও পরিবর্ত্তিত সমাজে তাহার আদর ক্রমেই কমিয়া যায়। যে কবির কাব্য, যত অধিক পরিমাণে এইরূপ সাময়িক ভাবে প[illegible] [illegible]স কবির কা[illegible] ততই

অল্পকালস্থায়ী। অন্যান্য অনুবাদকগণের রামায়ণ-গ্রন্থের অপ্রসিদ্ধির ইহাও অন্যতম কারণ। তাঁহাদের রামায়ণের যে যে অধ্যায়গুলি এই প্রকার কোন বিশেষভাবে লিখিত নহে, অর্থাৎ সাধারণভাবে, সকল সময়ের অনুগত করিয়া লিখিত, সেই সেই অধ্যায়গুলির মর্য্যাদা এখনও একেবারে লুপ্ত হয় নাই। দৃষ্টান্তরূপে কবিচন্দ্রের "অঙ্গদ-রায়বার" ও রঘুনন্দন গোস্বামীর "রাম-রসায়নে" অশোকবন-বর্ণন প্রভৃতির উল্লেখ করা যাইতে পারে। বস্তুতঃ, সরল ভাষা এবং সুস্পষ্ট ভাব—এই দুই দুর্লভ সম্পদে কৃত্তিবাসের কাব্য বঙ্গসাহিত্যে অপ্রতিদ্বন্দ্বী। অতি সরল কথায়, সকলের বোধগম্য ভাষায় তিনি তাঁহার হৃদয়ের ভাব অতি স্পষ্টরূপে সাধারণের সম্মুখে প্রকাশ করিতে পারিতেন। ভাষার দীনতায় বা ভাবের জড়তায় তাঁহার কাব্য কোথায়ও দুষ্ট হয় নাই। তিনি যখন যে চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন, তাহার কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে কোনরূপ অসম্পূর্ণতা রাখেন নাই। যে কবি যত অধিক পরিমাণে প্রাঞ্জল ভাষায় মনের ভাবরাশি তদীয় সমাজের সমক্ষে অতি সুস্পষ্টরূপে তুলিয়া ধরিতে পারিবেন, সেই কবি তত অধিক আদৃত হইবেন। কৃত্তিবাস সেইটি অতি উত্তমরূপে পারিতেন বলিয়াই তাঁহার রামায়ণ অপরাপর রামায়ণ অপেক্ষা ভাবুক-সমাজের, অথবা শিক্ষিত-অশিক্ষিত সকল সমাজেরই এত প্রিয় হইয়াছে।

দয়া, দাক্ষিণ্য, সমবেদনা, স্নেহ, প্রেম, ভক্তি প্রভৃতি স্বর্গীয় সম্পদে মানব দেবতা হয়, আবার এই গুলির অভাবে মানব দানব হইয়া থাকে। কৃত্তিবাস এই মহনীয় গুণাবলীর এমন সুস্পষ্টভাবে বর্ণন করিয়াছেন যে, পাঠকালে হৃদয় অনির্ব্বচনীয় আনন্দ-রসে আপ্লুত হয়। মহাকবি ভবভূতি যেমন তাঁহার উত্তররামচরিতের নিরবদ্য ও নয়নরঞ্জন চিত্রগুলির আদর্শ কালিদাসের কাব্যাবলী হইতে গ্রহণ করিয়া, পরে সেই আদর্শের উপর নৈপুণ্য-সহকারে রঙ ফলাইয়া সুন্দর মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়াছেন—যে মূর্ত্তির গরিমায় সংস্কৃত সাহিত্য গৌরবান্বিত হইয়াছে—কৃত্তিবাসও সেইরূপ মহর্ষি-কৃত আদর্শের উপর সতর্ক হস্তে বর্ণসংযোগ-পূর্ব্বক, সেই সেই চিত্র বঙ্গীয় সমাজের অনুগত-ভাবে উপস্থাপিত করিয়াছেন—অলঙ্কারের গুরু ভারে বা ভাষার আড়ম্বরে তদীয় কবিতাসুন্দরী ক্লিষ্ট হন নাই। তাঁহার কবিতা সর্ব্বত্র এক ভাবে, ভাগীরথীর প্রবাহের ন্যায় তর তর করিয়া চলিয়া গিয়াছে, আবিলতায় সে কবিতার প্রবাহ দুষ্ট হয় নাই, বা ভাবের জড়তায় সে কবিতার অমর্য্যাদা ঘটে নাই। অন্যান্য কবি অপেক্ষা তদীয় প্রাধান্যের এইটিই মুখ্য কারণ। ভাষার প্রাঞ্জলতা এবং ভাবের সুস্পষ্টতার সহিত তাঁহার আশ্চর্য্য চিত্রনৈপুণ্যের সম্মিলনে তদীয় কাব্য ত্রিবেণীসঙ্গমের ন্যায় পবিত্র ও সকলের উপভোগ্য হইয়াছে।

কৃত্তিবাসের রামায়ণ-রচনার প্রায় এক শত বৎসর পরে নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্যদেব আবির্ভূত হন। চৈতন্যের আবির্ভাবের এবং তদীয় প্রেম-বন্যায় বঙ্গদেশ প্লাবিত হইবার পূর্ব্ববর্ত্তী কালের হস্তলিখিত কোন কৃত্তিবাসী রামায়ণের পুস্তক এ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই। যদি [illegible] পাওয়া যায়, তবে তখন কৃত্তিবাসের প্রক্ষিপ্ত অংশগুলির

সমাধানের উপায় অনেকটা সহজ হইবে। চৈতন্যের আবির্ভাবের পর বঙ্গদেশে যে ভক্তির স্রোত, প্রেমের বান ডাকিয়াছিল, পরবর্ত্তী কালের রামায়ণসমূহে তাহার প্রভাব সম্পূর্ণরূপে বিদ্যমান। যে সময়ে যে ভাব দেশের মধ্যে মাথা তুলিয়া দেশকে বিভোর করিয়া ফেলে, সেই সময়ের জাতীয় সাহিত্যাদিতেও সেই ভাবের প্রভাব প্রবিষ্ট হইয়া সহস্র সাহিত্যিককে "তদ্ভাবভাবিত" করিয়া তোলে। তাই পরবর্ত্তী কালের কৃত্তিবাসে আমরা কি বীর কি করুণ সকল রসেই নদীয়ার ভক্তির তরঙ্গের উচ্ছ্বাস দেখিতে পাই। লিপিকারগণ, সুবিধা পাইলেই, রামের স্থলে শ্যাম করিয়াছেন। পরিবর্ত্তিত কৃত্তিবাসের অনেক অনাবশ্যক স্থলে অতর্কিত বৈষ্ণবী দীনতার পরাকাষ্ঠা দেখিতে পাই। কৃত্তিবাসের স্বকপোলকল্পিত বীরবাহু, পরবর্ত্তী কালের বৈষ্ণব লিপিকারগণের কৃপায়, দীনাতিদীন বৈষ্ণবসেবকগণের ন্যায়, করযুগল জুড়িয়া ধরণীতে লুটায়। তুলসীতলায় মৃত্তিকায় অঙ্গরাগ করিয়া বৈষ্ণব যেমন "শ্রীবাসের আঙ্গিনায়" মহাপ্রভুর ভক্তগণকে প্রণাম করেন, সেইরূপ রাক্ষসগণও কপিগণকে গল-লগ্নীবাসে প্রণাম করে। এইরূপ অনেক স্থলেই বৈষ্ণবীয় কোমলতার ও দীনতার চরম দেখিতে পাই। এ সমস্তই চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পর কৃত্তিবাসে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। এইরূপ সংক্রামক রোগের পরিচয় আমরা অন্যত্রও দেখিতে পাই। অনেক বৌদ্ধ গ্রন্থের দু'একটি স্থল ঈষৎ পরিবর্ত্তনপূর্ব্বক, কোথাও বা প্রমাণসূত্রটিকে বদলাইয়া, সমগ্র গ্রন্থখানিকে "হিন্দু" করিয়া তোলা হইয়াছে। কৃত্তিবাসে পাঠবৈষম্যের ইহাই একমাত্র কারণ নহে। বহুকাল পূর্ব্বের হস্তলিখিত যে সকল পুথি পাওয়া গিয়াছে, তাহাদের সহিত বর্ত্তমান কৃত্তিবাসের ত মিল নাই-ই, এমন কি ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামপুরের মিশনারিগণের দ্বারা প্রথম যে "কৃত্তিবাস" মুদ্রিত হয়, তাহার সহিতও বর্ত্তমান কৃত্তিবাসের অনেক স্থলে আদৌ মিল নাই। মিশনারিদের পুস্তকে যেখানে আছে—

"পাকল চক্ষে রামের পানে চাহিলেক বালি।
দন্ত কড়মড়ায় বীর রামেরে পাড়ে গালি॥"

সেই স্থানে পরবর্ত্তী কালের সংশোধিত বটতলার সংস্করণে আছে—

"রক্তনেত্রে শ্রীরামের পানে চাহে বালি।
দন্ত কড়মড় করে, দেয় গালাগালি॥"

পরবর্ত্তী কালে ভাষার পরিমার্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালার আদিকবি কৃত্তিবাসও "পরিমার্জ্জিত" হইয়াছেন! কবির কাব্য পরিষ্কৃত করিতে যাইয়া সংশোধকগণ আবর্জ্জনারাশির দ্বারা কৃত্তিবাসকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছেন! এই ব্যাপারের মূলে আর একটি সত্য নিহিত আছে। আমাদের দেশে যখন যে কোনও নূতন জিনিষের আবির্ভাব হইয়াছে, আমরা তাহাকে ধীরে ধীরে পুরাতনের সহিত মিশাইয়া নিজেদের ছাঁচে ঢালাই করিয়া "আপন" করিয়া লইয়াছি। আমাদের এই adaptability আছে বলিয়াই আমাদের ধর্ম্ম, আমাদের সাহিত্য এখনও টিঁকিয়া আছে।

শাক্ত এবং বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের লিপিকারগণের কল্যাণে কৃত্তিবাসের অনেক স্থলে যেমন শাক্ত-প্রভাব পরিদৃষ্ট হয়, তেমনই বৈষ্ণব-প্রভাবও পরিদৃষ্ট হয়। ইহা ছাড়া, অন্যান্য পুরাণ, উপপুরাণ প্রভৃতি হইতে অনেক মনোরম অংশও লিপিকারগণ বাছিয়া আনিয়া কৃত্তিবাসে জুড়িয়া দিয়াছেন। অনেকে অনেক নূতন কবিতার প্রণয়ন করিয়া কৃত্তিবাসের গ্রন্থে পূরিয়া দিয়া স্ব স্ব আত্মাভিমানের পূজা করিয়াছেন। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ কৃত্তিবাস হইতে শত শত স্থল উদ্ধৃত করা যাইতে পারে,—ঐতিহাসিকের সে কার্য্য হইতে আমি বিরত হওয়াই সঙ্গত মনে করি।

রামায়ণী কথার আশ্রয়ে কালিদাস, ভবভূতি, রঘুবংশ, উত্তররামচরিত রচনা করিয়াছেন বটে, কিন্তু যে স্থানে যেরূপ প্রয়োজন, তাঁহারা নূতন মূর্ত্তিও গঠন করিয়াছেন। কবির কল্পনা বৈদ্যুতিক শক্তিতে শক্তিমান্। সেই সতত চঞ্চলা শক্তি কদাচ কোন নির্দ্দিষ্ট পথে, কোন পূর্ব্ব-নির্দ্দিষ্ট রেখা বাহিয়া চলিতে পারে না, জানেও না। তাই কবি-কৃত স্থষ্টিতে অনেক স্থলে মূল আদর্শেরও পরিবর্ত্তন দেখিতে পাই। কালিদাস, ভবভূতি প্রভৃতি মহাকবিগণ তাই মহর্ষি-কৃত পথ কল্পনার দৌত্যে অল্প-বিস্তর ছাড়িয়া অন্য পথেও গিয়াছেন। কৃত্তিবাসও সেইরূপ নিজ-কল্পনার দ্বারা অনেক আলেখ্য অঙ্কিত করিয়া তাঁহার গ্রন্থ মনোজ্ঞ করিয়াছেন, সর্ব্বত্রই বাল্মীকির অনুসরণ করেন নাই। বীরবাহু, তরণীসেন প্রভৃতির স্থষ্টি তাঁহার চরম কল্পনা-শক্তির উৎকর্ষ খ্যাপন করিতেছে। কবিগণ কাহারও অঙ্গুলি-সঙ্কেতে চলেন না। কল্পনা কাহারও দাসীত্ব করিতে জানে না। কল্পনা কখনও কবিকে মেঘের উপর লইয়া গিয়া সৌদামিনীর বিলাসচঞ্চলা মূর্ত্তি প্রদর্শন করে, কখনও আবার তুষারমণ্ডিত কমলের কেশরের মধ্যে লুকাইয়া রাখিয়া তাঁহাকে কত নিভৃত সৌন্দর্য্য দেখায়। উন্মাদিনী চঞ্চলার ন্যায় কবির উন্মাদিনী কল্পনা কাহারও অঙ্গুলি-সঙ্কেতে পরিচালিত বা ভ্রূ-কম্পনে বিকম্পিত হয় না। সে আপনার ভাবেই আপনি বিভোর হইয়া ছুটে, পরের ভাবে ভুলে না। কৃত্তিবাসের স্বেচ্ছাবিহারিণী কল্পনা কোনও নির্দ্দিষ্ট সীমার মধ্যে আবদ্ধ হইয়া রহে নাই। কোথাও প্রাচীন পথে, কোথাও-বা নূতন পথে—যেখানে যেমন ইচ্ছা, সে কল্পনা চলিয়া গিয়াছে। তরণীসেন, বীরবাহু প্রভৃতির স্থষ্টি এই নূতন পথে যাত্রারই ফল।

কৃত্তিবাস ধরাধামে অবতীর্ণ হইবার পর পাঁচ শত বৎসরেরও অধিক কাল অতীত হইয়াছে বটে, কিন্তু আজও প্রতিক্ষণে তাঁহার নাম বঙ্গের গৃহে গৃহে, বিপণির পণ্যকুটীরে, চাষার আশার কষিক্ষেত্রে—সর্ব্বত্র—কীর্ত্তিত হইতেছে। আজ আর

"দক্ষিণে পশ্চিমে যার গঙ্গা তরঙ্গিণী"—

সে "ফুলিয়া" নাই, সে "ফুলিয়া"য় কৃত্তিবাসের সেই "চাপিয়া বসতি"র চিহ্নও নাই; কিন্তু সেই ফুলিয়া-পণ্ডিতের মোহন বাঁশরীর ঝঙ্কার এখনও বাঙ্গালীর "কানের ভিতর দিয়া মরমে" প্রবেশ করিতেছে, বাঙ্গালীকে উন্মত্ত করিয়া—বিভোর করিয়া রাখিয়াছে।

কৃত্তিবাসের এই সার্ব্বভৌম প্রসিদ্ধির অপর কতকগুলি কারণও দেখা যায়। ভারতবর্ষের মৃত্তিকা বড়ই কোমল, বড়ই উর্ব্বর। রামচন্দ্র, যুধিষ্ঠির, কর্ণ, ভীষ্ম, দধীচি, শিবি, সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, অরুন্ধতী, লোপামুদ্রা, ঔশীনরী প্রভৃতি এই ভারতবর্ষেরই চিত্র। যাহার প্রাণে প্রেম, নয়নে ভক্তির অশ্রু, ভারতবাসীরা তাহাকে হৃদয় পাতিয়া গ্রহণ করে—প্রাণ দিয়া পূজা করে। কৃত্তিবাস এ রহস্য বুঝিতেন। তিনি আরও বুঝিতেন যে, নিশীথে নিস্তব্ধ রজনীর সৌম্যমূর্ত্তি যাহার চিত্তকে অভিভূত, বা অনুভূতি বিমল কর ধৌত করিতে না পারে, সে কদাচ ঐ নৈশ নীরবতার মাধুর্য্য অপরকে বুঝাইতে পারে না; সায়ংকালের শ্যামায়মানা বনভূমির প্রাঞ্জল মূর্ত্তি যাহার প্রাণে আকুলতা জন্মাইতে অসমর্থ, সে কখনও সান্ধ্য সুষমার পবিত্র আলেখ্য অঙ্কন করিতে পারে না। সকল পদার্থেরই অনুভূতি চাই। সমস্ত বিষয়েই মগ্ন হওয়া চাই,—প্রাণ অকৃপণভাবে ঢালিয়া দেওয়া চাই, অন্যথা সিদ্ধিলাভ সুদূরপরাহত। কৃত্তিবাস অকৃপণভাবে আপনার প্রাণ কবিতাদেবীর পাদপদ্মে ঢালিয়া দিয়াছিলেন, তাঁহার হাতে আর কিছুই ছিল না; সমস্তই ঐ চরণে অঞ্জলি দিয়াছিলেন, তাই তাঁহার কবিতার কোথায়ও কোনরূপ বাধা দেখিতে পাই না—সর্ব্বত্রই সমান এবং অপ্রতিহত গতি। অসম্ভব হইলেও মনে হয়, যেন এক সময়ে, এক স্থানে বসিয়া, অন্য চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া, মহাকবি তাঁহার সাধের রামায়ণ-গান গাহিয়াছেন। তিনি নিজে সে গানে মজিতে পারিয়াছিলেন, তাই তাঁহার শ্রোতৃবর্গও মজিয়াছে, আত্মবিস্মৃত হইয়া তাঁহার সেবা করিয়াছে, যতদিন চন্দ্র-সূর্য্য থাকিবেন ততদিন করিবেও।

তুমি যখন অভ্রভেদী শুভ্রতুষারশীর্ষ হিমাচলের পাদদেশে বসিবে, বিধাতার কৃপায় তখন যদি তোমার হৃদয়ে কোন প্রশান্ত ছবির ছায়াপাত হয়, কোন বিরাট্ শক্তির স্পন্দন অনুভূত হয়, তবেই তুমি ঐ বিরাট্ হিমাচলের প্রশান্ত ভাবের, প্রশান্ত মূর্ত্তির কিয়দংশ হয়ত তোমার কল্পনা-দর্পণের সাহায্যে অন্যকে প্রদর্শন করিতে পারিবে। অন্যথা তোমার সাধ্য কি যে তুমি হিমাচলের ঐ গম্ভীর-মাধুর্য্যের বর্ণন করিবে? তুমি যে স্থানে, যে সময়ে, যে অবস্থায় বর্ত্তমান, যদি সেই স্থানের, সেই সময়ের, সেই অবস্থার সহিত নিজেকে মিশাইতে না পার, "তদ্ভাবভাবিত" করিতে না পার, তবে কদাচ তদ্দেশীয় ও তৎকালীন ভাবের স্ফুরণ তোমার দ্বারা সম্ভব হইবে না। তোমার দ্বারা তদ্দেশবাসিগণের হৃদয় কদাচ বিমোহিত হইতে পারে না। দীপক রাগের সময়ে তুমি বেহাগ পূরবীতে আলাপ করিলে, তাহা কখনও জমিতে পারে না। সে আলাপে শ্রুতির সুখ হয় না, বরং পীড়াই জন্মে। ভারতবর্ষের, বিশেষতঃ বঙ্গদেশের, ধর্ম্মপ্রাণ অধিবাসীরা কি চায়, কি ভালবাসে, এ তত্ত্ব মহাকবি কৃত্তিবাস বুঝিতেন। এ দেশের লোকের হৃদয় কি উপাদানে গঠিত, কোন্ উপকরণ অধিক, তাহা কৃত্তিবাস জানিতেন, তাই তাঁহার দেশবাসিগণের হৃদয়ের ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া তিনি তদীয় কল্পনার মোহন বীণায় ঝঙ্কার দিয়াছিলেন। তাই সে ঝঙ্কার, [illegible] পিক-ঝঙ্কারের ন্যায়,

বাসীদিগকে বিমুগ্ধ—একেবারে আকুল করিয়া তুলিয়াছিল। এই হিসাবেও সংস্কৃতে কালিদাস ও বাঙ্গালায় কৃত্তিবাস একই মন্ত্রে দীক্ষিত, একই পথের যাত্রী। তোমার পাঠকগণ কি চান, কতটুকু চান, তোমার বীণার কোন্ তার স্পর্শ করিলে তাহার ধ্বনি তোমার পাঠকের হৃদয়ে অনুরণিত হইবে, তাহার "কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিবে"—এ জ্ঞান যদি তোমার না থাকে, তবে তুমি যত বড় শক্তিশালী লেখকই হও না কেন, যত বড় কলাবিদ্যাবিশারদই হও না কেন, তোমার লেখায় বা তোমার অঙ্কিত আলেখ্যে তোমার সামাজিকবর্গের বা তোমার দর্শকবৃন্দের পরিতৃপ্তি হইবে না। তোমার সে লেখায় বা সে চিত্রে তোমার দেশবাসী সহৃদয়বর্গের হৃদয় আকৃষ্ট ও বিমোহিত হইবে না। যে সমুদয় লেখকের এই জ্ঞান আছে, তাঁহাদের লেখাই কালজয়ী হয়, থাকিয়া যায়; আর যাঁহাদের এই জ্ঞান নাই, তাঁহাদের লেখা ছিন্ন তুষারের ন্যায় অতি অল্পকালমধ্যেই কোথায় মিলাইয়া যায়। আর্ষ রামায়ণ অবলম্বনপূর্ব্বক অন্য অনেক কবি বঙ্গভাষায় রামায়ণ রচনা করিয়াছেন, কিন্তু তন্মধ্যে কৃত্তিবাসের রামায়ণ যে এত প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে, প্রায় পাঁচ শত বৎসরেরও অধিক কাল সমানভাবে বা উত্তরোত্তর ক্রমেই অধিকতরভাবে শিক্ষিত-অশিক্ষিত, স্ত্রী-পুরুষ, ইতর-ভদ্র সকল সমাজেই পূজিত হইতেছে, ইহার কারণ হইল পূর্ব্বোক্ত জ্ঞান। কৃত্তিবাসের ঐ জ্ঞান প্রচুর পরিমাণে ছিল। যে দেশে তিনি অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, সে দেশের অধিবাসীরা কি ভালবাসে, কি চায়, তাহা তিনি জানিতেন এবং তিনিও তাহাই চাহিতেন ও ভালবাসিতেন। তাই তিনি যদি কখনও সামান্য একটু গুন্ গুন্ করিয়া স্বরবিলাস করিয়াছেন, অমনই সেই গুন্ গুন্ ধ্বনি শতগুণে বর্দ্ধিত হইয়াই যেন তদীয় দেশবাসীদিগের হৃদয় বিমোহিত করিয়া তুলিয়াছে। দিবাবসানে সাগরগামিনী তটিনীর প্রাণের আকুল গীতিকা কুলকুল ধ্বনিতে যেমন শ্রান্ত পথিকের চিত্তে একটা জড়তা, একটা তন্দ্রা আনিয়া দেয়, পথিক অকস্মাৎ তাঁহার কর্ম্মময় দীর্ঘ দিবসের সমস্ত ক্লেশ ভুলিয়া যান, কেমন একটা ঘুমের ঘোরে তাঁহার নয়ন নিমীলিত হইয়া আসে, সেইরূপ প্রেমিক কবি কৃত্তিবাসের মোহিনী বীণার ঝঙ্কারেও বঙ্গবাসীর হৃদয় বিমোহিত—আনন্দালস হইয়া রহিয়াছে।

কবে কোন্ দিন, কত শত সহস্র বৎসর পূর্ব্বে, তমসার তীরে "মা নিষাদ" বলিয়া বাল্মীকি গান ধরিয়াছিলেন, আর আজও যেন সেই গানের ধ্বনির বিরাম হয় নাই। সে স্বরলহরী যেন বাতাসে এখনও ভাসিয়া বেড়াইতেছে ও ভারতবাসীদের প্রাণে কেমন একটা তন্দ্রা জন্মাইয়া দিতেছে; সেইরূপ কবে কোন্ দিন, কোন্ শুভমুহূর্ত্তে পতিতোদ্ধারিণীর তীরে বসিয়া, তাঁহারই কুলকুল গীতির সুরে সুর মিলাইয়া ফুলিয়ার পণ্ডিত তান ধরিয়াছিলেন—আজ সে ফুলিয়া নাই, সে ভাগীরথীও দূরে সরিয়া গিয়াছেন—কিন্তু সেই স্বপ্নময়, আবেশময় তানের এখনও যেন শেষ লয় হয় নাই। সে রাম, সে অযোধ্যা—কিছুই

নাই, তবুও সেই রামের কথা, রামের স্মৃতি যেমন ভারতের নরনারীর প্রাণে-প্
গাঁথা রহিয়াছে, আজীবন থাকিবেও,—তদ্রূপ আজ সে ফুলিয়া নাই, সে জা
নাই, সে কৃত্তিবাস নাই, কিন্তু কৃত্তিবাসের কথা, কৃত্তিবাসের স্মৃতি বঙ্গবাসী
বিস্মৃত হইবে না।

[নারায়ণ, ১৩২